# দিব্য-জীবন

## প্রথম খণ্ড



শ্রীঅরবিন্দ

আর্য পাবলিশিং হাউস
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

অনুবাদক :

অনির্বাণ

প্রথম সংস্করণ : ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৮

কলিকাতা আর্য পাবলিশিং হাউস, শ্রীতারাপদ পাত্র

কর্তৃক প্রকাশিত

ও

পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস

কর্তৃক মুদ্রিত

PRINTED IN INDIA

# উপায়ন

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্
গভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত
কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান॥
—ঋগ্বেদ ১।৩৫।৩

কিরণ-কমল—দলে দলে তার
কত-যে জগৎ উঠিছে ফুটি,
কাঁপিছে গভীরে প্রাণের নিঝর—
নিতেছে হেথায় বাঁধন টুটি।
এখনি ছিল যে উজলি গগন,
মিলাল কোথায় জানে কি কেউ—
কোন্-সে নবীন দ্যুলোকের 'পরে
ছড়াল তাহার আলোর ঢেউ!

—অনির্বাণ

# সূচীপত্র

## সূচীপত্র

# দিব্য-জীবন

## প্রথম খণ্ড

# ব্রহ্ম ও জগৎ

# ১

# নচিকেতার অভীপ্সা

ওপারের বুকে মিলিয়ে যান যে উষারা, তাঁদেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন—ঐ যে আসেন যাঁরা সেই শাশ্বতীদের প্রথমা এই উষা; বিচ্ছুরিতা হলেন তিনি—বেঁচে আছে যা তাকে ফুটিয়ে তুলে উপর পানে, মরে ছিল যে-কেউ আবার তাকে জাগিয়ে দিয়ে।...কতদূর ছড়ান তিনি যখন মিলিয়ে দেন অতীতের উষাদের তাঁদের সাথে, এখনই ফুটবেন যাঁরা ঝলমলিয়ে? প্রাক্তনী উষাদের তরে ব্যাকুলা তিনি, তেমনি করেই ভরে তোলেন তাদের আলো; প্র-চ্ছুরিত করে' তাঁর দিব্যবিভা, জড়িয়ে ধরেন নিবিড় করে সেই উষাদের আজও যাঁরা অনাগতা।

—কুৎস আঙ্গিরস—ঋগ্বেদ (১।১১৩।৮,১০)

অগ্নিরূপে এই বিশ্বে আছেন যে দেববীর্য, তিনটি পর্বে ঘটে তাঁর সেই পরম আবির্ভাব—সত্য তারা, বরেণ্য তারা; অনন্তেরই অন্তরেতে আপনাকে মেলে দিয়ে চলেন তিনি,—শুচি শুভ্র দীপ্তরুচি, সব কিছুকে ভরে তোলেন।...মর্ত্যের মাঝে অমৃত যিনি ঋতের আধার, আমাদের চিৎশক্তিরাজির গভীরেতে প্রতিষ্ঠিত দেবতা তিনি তাদেরই উৎসারণের প্রৈতিরূপে।...উৎশিখ হও হে তপোবীর্য—বিদ্ধ-বিদীর্ণ কর সব আবরণ—আমাদের মাঝে ফুটিয়ে তোল দেবত্বের বিভূতি যত!

—বামদেব—ঋগ্বেদ (৪।১।৭; ৪।২।১; ৪।৪।৫)

কোন্ ধূসর অতীতে প্রবুদ্ধমনের প্রথম কিরণ-সম্পাতেই মানুষের মাঝে জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা;—দিব্য-স্বরূপের এক অস্ফুট আভাস তার মাঝে এনেছে পূর্ণতার প্রৈতি। তাকে ছুটিয়েছে নিখাদ সত্যের অনির্বাণ আনন্দদীপ্তির সন্ধানে, অমৃতত্বের নিগূঢ় চেতনায় আকুল করেছে তার অন্তর। যুগযুগান্তের ধারা বেয়ে চলেছে তার অবিশ্রাম এষণা; তার আদি নাই। বুঝি বা অন্তও নাই; সংশয়ের নাস্তিকতার দীর্ঘতম অমানিশার পরেও জীবনের প্রাচীমূলে বারবার দেখা দিয়েছে তার অরুণ-লেখা,—মানবের প্রাচীন ইতিহাস তার সাক্ষী। আর আজ বহিঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের বিপুল দানে যখন ভরে

উঠেছে মানুষের অঞ্জলি, তখনও তার প্রাণের গহনে কোথায় বেজেছে এক অতৃপ্ত হাহাকার, আবার সেই চিরন্তনী আকৃতিতে এই প্রমত্ত বিশ্লেষণার মাঝেও তাকে করে তুলেছে উন্মনা। আলো চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই, চাই অমৃতত্বের অধিকার, চাই দিব্যজীবনের ভাস্বর মহিমা—এই অভীপ্সা নিয়ে যেমন মানুষের যাত্রা শুরু, তেমনি এর চরিতার্থতাতেই তার ইতি; এর চেয়ে বৃহত্তর কামনা তার মনেরও অগোচর।

*মানুষের মাঝে এই যে অজর এষণা, ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতায়* কোনও সায় নাই তার; তবুও এরি মাঝে রয়েছে তার অতিপ্রাকৃত জীবনের এক অন্তর্গূঢ় লোকোত্তর অনুভবের নিশানা, যার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে—হয় ব্যক্তির উজান-বওয়ার তপস্যায়, নয়তো বিশ্বপ্রকৃতিরই স্বাভাবিক পরিণামের ছন্দে। অহমিকা-ক্লিষ্ট প্রাকৃত-চেতনার এই আধারেই দিব্য-পুরুষের বিজ্ঞান বীর্য ও সত্তাকে মূর্ত করে তোলা, এই জড়ীয় মনের প্রদোষচ্ছায়াকে অতিমানসের জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে উদ্‌ভাস্বর করা, আধি-ব্যাধির বেদনাবিধুর প্রাণের ক্ষণিক তর্পণের ক্লিষ্টতার 'পরে নিয়ে আসা স্বত-উৎসারিত শান্তি ও আনন্দের জোয়ার, এই জগতের আপাত-প্রতীয়মান নিয়তিকৃত-নিয়মের মাঝে জাগিয়ে তোলা অকুণ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের প্রমুক্ত উল্লাস, এই নশ্বর মৃত্যুচ্ছায়া-কবলিত দেহের মাঝেই অমৃতের নিরন্ত নির্ঝর আবিষ্কার করে দেবতার সোম-পাত্রে একে রূপান্তরিত করা—এমনি করে জড়ের মাঝেই পরমদেবতার দিব্য রূপায়ণ, এই তো পার্থিব-পরিণামের চরম নিয়তি। প্রাকৃত জড়-বুদ্ধি জানে, চেতনার বর্তমান সংস্থানই চিৎ-পরিণামের শেষ পর্ব; তার মতে, আদর্শবাদ যে মিথ্যা, কল্পিত আদর্শের সঙ্গে অনুভূত বাস্তবের প্রত্যক্ষ বিরোধই তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু আরও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তথাকথিত এই বিরোধ মহাপ্রকৃতির অনভিপ্রেত তো নয়ই, বরং একে আশ্রয় করেই ঘটছে তার সিসৃক্ষার অনুপম সার্থকতা।

কারণ, জীবনের সকল সমস্যাই স্বরূপত সৌষম্য-সাধনার সমস্যা। স্পষ্টই অনুভব করছি, কোথায় যেন বেসুর বাজছে, তারি অন্তরালে পাই সুরের প্রচ্ছন্ন আভাস; তাকে ধরতে পারি না বলে সুরসঙ্গতির সাধনা বারবার হয়ে যায় ব্যর্থ এবং তাতেই জীবন হয়ে ওঠে কত না সমস্যায় জটিল। মানুষের মাঝে যেখানে ব্যবহারিক অথবা জান্তব দিকটাই ফুটেছে শুধু, বেসুর বজায় রেখেও সেখানে দিন চলে যেতে পারে—জীবন সমস্যার প্রতি অন্ধ থেকে অথবা

কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ-চলা-গোছের একটা আপোস-রফা দাঁড় করিয়ে; কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে সোয়াস্তি নাই তার। কেননা সমস্ত প্রকৃতির মাঝেই রয়েছে ছন্দ-সুষমার প্রতি একটা আকূতি; সে আকূতি যেমন আছে প্রাণ ও জড়ের জগতে, তেমনি আছে মনের জগতে—অনুভবের সঙ্গতি-সাধনার স্বাভাবিক প্রচেষ্টায়। প্রকৃতির মাঝে দেখি, তার বহুবিচিত্র সাধনসামগ্রীর মাঝে বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য যতই প্রবল হয়ে ওঠে, বিরোধ যতই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, তাকে জয় করবার প্রৈতিও হয় ততই প্রবল এবং তারি ফলে অনৃতের পরাভবে জাগে ঋতের এমনই সূক্ষ্ম অপরাজেয় ছন্দোবীর্য, সাধনা অনায়াস হলে যার আবির্ভাব সম্ভব হত না কোন মতেই। বিরোধের সমাধান প্রকৃতি কতভাবেই না করছে: প্রাণের দুর্দম প্রবৃত্তি রূপায়িত হতে চায় জড়ের মাঝে, যে জড়ের সকল প্রবৃত্তি আপাত-অসাড়তায় পর্যবসিত; কিন্তু স্পন্দ ও অসাড়তার এই বিরোধের সমাধান প্রকৃতি করেছে জীবদেহে এবং সে সমাধানের উৎকর্ষ সাধনাই হল তার বর্তমানের তপস্যা; চরম সিদ্ধি ঘটবে তার, যেদিন মনোময় জীবের অন্নময় কোশ হবে অমৃতেরই স্বরূপ-বিভূতি। দেহ এবং প্রাণ স্পষ্টত আত্মসচেতন নয়, তাদের মাঝে বড়জোর দেখা দেয় অবচেতনার একটা যান্ত্রিক প্রবৃত্তি। অথচ এদিকে চিত্তে ও সঙ্কল্পে চেতনার প্রকাশ সুস্পষ্ট; এ দুটি বিরুদ্ধ উপাদানের একত্র সমাবেশ ও সঙ্গতি-সাধনা প্রকৃতির আর এক বিস্ময়কর কীর্তি। এক্ষেত্রেও তার তপস্যার ইতি হয়নি আজও; সে তপস্যার চরম চমৎকার হবে, এই জৈব-চেতনাতেই সত্য ও জ্যোতির নিরূঢ় সিদ্ধিতে সকল এষণার চরিতার্থতা এবং অপরোক্ষ বিজ্ঞান-সিদ্ধির ফলে এই ব্যবহারের জগতেই মহেশ্বরের অকুণ্ঠ ঈশনার আবির্ভাব। অতএব বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সমাধানের ক্রমিক উৎকর্ষ-সাধনার প্রয়াস অযৌক্তিক তো নয়ই মানুষের পক্ষে, বরং মনে হয় এই তার নিয়তি কেন-না বিশ্বপ্রকৃতির সকল তপস্যার মূলে রয়েছে এই দ্বন্দ্ব-সমাধানেরই প্রৈতি।

আমরা জড়ের প্রাণে পরিণাম অথবা মনে পরিণামের কথা বলি; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পরিণামবাদ ঘটনা-পরম্পরার একটা বিবরণ মাত্র, ব্যাখ্যা তো নয়। জড়ভূতের মাঝে কেন জাগবে প্রাণ, কেনই বা প্রাণি-দেহে জাগবে মন, তার কোনও হেতুই খুঁজে পাইনা যদি না বেদান্তের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বলি, প্রাণ জড়ের মাঝে এবং মন প্রাণের মাঝে সংবৃত হয়ে ছিল বলেই এমনি করে বিবৃত হতে পেরেছে; স্বরূপত জড় প্রাণের একটি কঞ্চুক মাত্র, এবং

প্রাণও চেতনার তাই। এই ধারা ধরেই একটু এগিয়ে গেলে একথাও স্বীকার করতে আপত্তি থাকে না যে শেষ পর্যন্ত আমাদের মনশ্চেতনাও কোনও লোকোত্তর অমনীভাবেরই একটা কঞ্চুক বা বিভূতি মাত্র। তাহলে, মানুষের মাঝে এই যে দিব্যভাবের এষণা, আলো আনন্দ স্বাতন্ত্র্য ও অমৃতত্বের তরে এই যে দুর্দম আকূতি, এরও একটা হেতু পাওয়া যায়; বোঝা যায়, বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে রয়েছে যে প্র-চেতনার প্রৈতি, যা ফুটতে চাইছে মনেরও পরে, মানুষের, মাঝে সে-ই জ্বালিয়েছে এই নচিকেতার অভীপ্সা। এ তো অসঙ্গত বা অবাস্তব কিছুই নয়; বিশ্বপ্রকৃতিতে জড়ের একটা বিশিষ্ট সংস্থানে যেমন দেখা দিয়েছে প্রাণের আকূতি, আবার প্রাণের একটা বিশিষ্ট সংস্থানে জেগেছে মনের আকূতি, তেমনি মনোময় পরিণামেরও বিশিষ্ট একটা পর্বে একান্ত সহজভাবেই দেখা দেবে এই চিন্ময়ী আকূতি। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি,—আধারে আধারে এই প্রৈতি কোথাও প্রচ্ছন্ন কোথাও অস্পষ্ট কোথাও বা বিস্পষ্ট হলেও সবার মাঝে অনুস্যূত হয়ে আছে অপরাজেয় সিদ্ধির একটা উপচীয়মান সংবেগ; এখানেও প্রকৃতির উর্ধ্ব-পরিণামের বিরাম নাই, সাধন-সম্পদের পরিপূর্ণ সঞ্চয়ে এখানেও আধারকে দিব্যভাবের বাহন করে তুলবেই সে একদিন। ধাতুখণ্ড বা উদ্ভিদের মাঝে প্রাণের অতিসূক্ষ্ম সাড়ায় সূচিত হয় যে মনের আভাস, সে যেমন পর্বে পর্বে তরঙ্গায়িত হয়ে অবশেষে মানুষের মাঝে ফুটে ওঠে পরিপূর্ণ মহিমায়, তেমনি মানুষের নিজের মাঝেও আছে এক উত্তরায়ণের প্রবৃত্তি— দিব্যজীবনের পানে, তার বর্তমান জীবন যার প্রবেশক মাত্র। পশুর প্রাণের বীক্ষণাগারে প্রকৃতি যদি মানুষ গড়ে থাকে যুগযুগান্তের সাধনায়, তা হলে মানুষের প্রাণ-মনের বীক্ষণাগারে তারি সচেতন সহযোগিতায় সে যে অতিমানব বা দেবতা গড়বার সাধনা করছে না, তাই-বা কে বলতে পারে? শুধু দেবতাই বা কেন এ-ও কি বলা যায় না যে মর্ত্য আধারে দিব্য-পুরুষকে মূর্ত করবার তপস্যাই তার চলছে এখানে? কেননা প্রকৃতি-পরিণামের অর্থ তো শুধু তার সুপ্ত ও সংবৃত বিভূতির ক্রমিক স্ফুরণই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে এ যে তার গুহাহিত আত্মস্বরূপেরও একটা রূপায়ণ। অতএব তার প্রগতির পথে আমরা দাঁড়ি টানতে পারি না কোথাও,—ধর্মবাদীর মত একথা বলতে পারি না, বর্তমানের গণ্ডিকে পার হবার আকূতি বা প্রচেষ্টা তার পক্ষে বিকৃত স্পর্ধা মাত্র, অথবা যুক্তিবাদীর মত বলতে পারি না, এ তার একটা কল্পনার বিকার বা বিভ্রম শুধু। এ যদি সত্য হয় যে মৃৎ-শক্তির মাঝে চিৎ-শক্তিই রয়েছে

সংবৃত হয়ে, এই প্রকৃতি সেই গুহাশয় দিব্য-পুরুষেরই আ-ভাস মাত্র, তা হলে দিব্যভাবকে নিজের মাঝে ফুটিয়ে তোলা, অন্তরে-বাইরে সেই দিব্য-পুরুষের অনুভবকে মূর্ত করাই হবে মর্ত্য মানবের চরম ও পরম পুরুষার্থ।

এই দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখি, তাহলে মানুষের প্রাকৃত দেহেই যে নিহিত রয়েছে অপ্রাকৃত দিব্যজীবনের শাশ্বত সম্ভাবনা, মার্জিত বুদ্ধির কাছে এ কথা আর প্রহেলিকা বলে মনে হয় না ; স্বভাবের প্রেরণায় অথবা বোধি-চেতনার উন্মেষে এই মর্ত্য আধারেই মানুষ যে অনুভব করে অমৃতত্বের প্রদীপ্ত অভীপ্সা, একেও আর তখন ভাবের কুহেলিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক অখণ্ড বিশ্বচেতনাই যে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন সীমিত চিত্ত ও খণ্ডিত অহং-এর বিচিত্র বিভূতিতে, এক অনির্দেশ্য বিশ্বোত্তীর্ণ পরমার্থ সৎই যে দেশকালের অতীত হয়েও দেশ ও কালের কলনায় আপনাকে বিশ্বরূপে করছেন রূপায়িত এবং আমাদের অবর চেতনাতেই যে অবিকৃত স্বরূপে নেমে আসতে পারে ঐ সব লোকোত্তর অনুভব, একথা অযৌক্তিক বলে তখন আর প্রতিভাত হয় না। তর্কবুদ্ধিতে যে-সব জিজ্ঞাসার সমাধান আজও হয়নি, তাদের পাশ কাটিয়ে চিত্তের সকল শক্তিকে শুধু ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাতেই নিয়োজিত রাখা উচিত,—বস্তুতান্ত্রিকের এ উপদেশ মানুষ অনেকবারই শুনেছে; তবুও তার জিজ্ঞাসার বিরতি কোনও কালেই ঘটেনি, বরং বাধা পেয়ে তার সুর হয়েছে আরও চড়া, জানার পিপাসা মানুষের হয়েছে আরও অসহন। সেই পিপাসার সংবেগেই ভাবকের চিত্তে ফুটেছে সত্যের নূতন রূপ, প্রাণহীন প্রাচীন ধর্মের মূঢ়তার জঞ্জাল দূর করতে জেগেছে সংশয় ; সে সংশয় কখনও পুরাতনকে ভেঙে করেছে নূতন ধর্মের সংস্থাপন, কখনও বা বীর্যের অভাবে সত্যানুসন্ধিৎসার মুখোস পরে চিত্তকে শুধু করেছে ধূমায়িত অথচ অতৃপ্ত। সত্যের পরিপূর্ণ রূপটি একদিনেই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না, হয়তো অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন বিশ্বাসের আকারে চিত্তে জাগে তার প্রথম আভাস ; কিন্তু তার প্রকাশ অস্পষ্ট বা ব্যাহত বলেই তাকে অস্বীকার করা বা দাবিয়ে রাখাও আর এক ধরণের অন্ধতা। যে সত্যের স্ফুরণকে জানি বিশ্বের নিয়তি বলে, আজ যদি দুশ্চর হয় তার তপস্যা, বাস্তব প্রত্যক্ষের অগোচর হয় তার পরিণাম, মন্থর হয় তার প্রবৃত্তি, তাহলেই কি এড়িয়ে যেতে পারি তার দায়? বিশ্বপ্রকৃতির মর্মচর সত্যকে এমনিভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি চিন্ময়ী মহাশক্তির গুহাহিত অবন্ধ্য ক্রতুর বিরুদ্ধেই নিষ্ফল বিদ্রোহ ঘোষণা করা নয়? যে আকূতিকে বিশ্বজননী

নিখিল-হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন অনির্বাণ আগুনের গোপন শিখারূপে, তার দায়কে স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। সংস্কারের মূঢ়তা হতে, বোধির স্তিমিতালোক হতে, অভীপ্সার খদ্যোত-দ্যুতি হতে প্রজ্ঞার ভাস্বর-দীপ্তিতে উন্নীত করা তাকে, তার কুণ্ঠিত প্রবেগকে সত্যসঙ্কল্পের স্বয়ম্ভূবীর্যে রূপান্তরিত করা—এই তো পৌরুষের যথার্থ পরিচয়। প্রদীপ্ত বোধি অথবা স্বপ্রকাশ সত্যের উত্তরজ্যোতি যদি আজ মানুষের মাঝে কুণ্ঠিত বা স্তিমিত হয়েই থাকে, অথবা আঁধারের আড়াল হতে কখনও যদি মানুষের চিত্তে স্ফুরিত হয় তার ক্বচিৎ-কিরণ, অথবা তার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে যদি কদাচিৎই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই মর্ত্যের আকাশ, তাহলেই বা আমাদের কোথায় ভয়, কোথায় সংশয়? কেননা এই আলোর ইশারাতেই কি আমরা দেখতে পাব না দেবযানের সেই জ্যোতির্ময় পথ, যার অনির্বচনীয় বর্ণৈশ্বর্যের ভিতর দিয়েই চলেছে নিখিল মানবের উত্তরায়ণের অভিযান তূর্যাতীতের শাশ্বত ধামের পানে?

# ২

# জড়বাদীর নাস্তি

তপোদীপ্ত মনন দ্বারা চিৎশক্তিকে উদ্রিক্ত করে জানলেন তিনি, অন্ন বা জড়ই ব্রহ্ম, কেননা অন্ন হতেই জন্ম নেয় এই সমস্ত ভূত, জন্ম নিয়ে বেড়ে চলে তারি আশ্রয়ে, আবার এখান হতে চলে যায়—অনুপ্রবিষ্ট হয় তারা তারি মাঝে। তারপর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন তিনি, 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন।' কিন্তু তিনি বললেন তাঁকে, 'চিৎ-তপস্‌কে আবার উদ্দীপ্ত কর তোমার মাঝে, কারণ তপশ্চেতনাই ব্রহ্ম।'

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (৩৷১-২)

চিন্ময় যিনি তাঁরি বিলাস এই মৃণ্ময় তনুতে, শাশ্বত যিনি এমনি করে তিনিই পরেছেন দুদিনের সাজ—শুধু তাই নয়, যে জড়কে নিয়ে তাঁর এই সাজের মেলা, অফুরান এই ঘরবাঁধার খেলা, সে-ও কখনও অসার্থক বা অগৌরবের নয়—নিঃসংশয়ে যদি একথা জানি, তবেই অসঙ্কোচে বলা চলে, এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রেতি।

দেহের প্রতি যে বিতৃষ্ণা আমাদের অভ্যস্ত তার মোহ কাটিয়ে উঠতে, চাই উপনিষদের ঋষির সেই সত্য এবং গভীর দৃষ্টি, যা চিন্ময় এবং অন্নময়ের সকল বিরোধ ছাপিয়ে এক অদ্বয়তত্ত্বকেই দেখতে পায় দুয়ের মূলে ; দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে বলা চাই তাঁদেরই মত—'অন্নও ব্রহ্ম' ; নিখিল বিশ্বকে তাঁরা যে দেখেছিলেন দিব্য-পুরুষেরই কায়ারূপে, সেই দৃষ্টির বীর্যকে সত্য করে তোলা চাই আমাদের চেতনায়। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি বলবে: চিৎ এবং জড় একান্তবিরোধী দুটি তত্ত্ব ; দুয়ের মিথুনে আমাদের ব্যবহার চললেও তার প্রতি পদে দেখি কেবল ঠোকাঠুকি, অতএব দুয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে জীবন-সমস্যার কোনও সত্য সমাধান সম্ভব নয় ; চিৎ আর জড় হয় মূলে একই, নয়তো পরস্পরের পরিণাম তারা,—এমন উক্তিতে তথ্য বা যুক্তির কোনও সমর্থন নাই, আছে শুধু বিকল্পবৃত্তির পরিচয়, যা যুক্তিহীন ভাবকালির বিলাস মাত্র।...চিৎ-জড়ের তফাৎটাই প্রাকৃতবুদ্ধির চোখে পড়ে, তাই এ আপত্তি তার খুবই স্বাভা-

বিক। বিশ্বে শুধু চিৎ ও জড় ছাড়া আর কোনও তত্ত্ব যদি না থাকত, এ আপত্তি টিকত তাহলে। কিন্তু জড় হতে চিৎ পর্যন্ত আরোহক্রমে রয়েছে প্রাণ মন অতিমানস এবং মন ও অতিমানসের মাঝামাঝি আরও কতগুলি পর্ব। তাই আকস্মিক পরিণাম বুদ্ধির কাছে প্রহেলিকা হলেও পরিণাম যেখানে ধারাবাহিক, সেখানে আদি এবং অন্ত্য কোটির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া তো কঠিন নয়।

যদি বলি, বিশ্বে আছে শুধু ঈশ্বর বা পুরুষ নামে এক বিশুদ্ধ চিন্ময় তত্ত্ব আর প্রকৃতি নামে এক অচিৎ বস্তু বা শক্তির যন্ত্রলীলা, তাহলে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনও উপায় থাকে না, কারণ বুদ্ধি এবং জীবনকে চলার পথে এ দুটি কোটির একটিকে বেছে নিতেই হয়। বুদ্ধি তখন ঈশ্বর বা আত্মাকে বলবে কল্পনার একটা বিভ্রম, প্রকৃতিকে ভাববে ইন্দ্রিয়সংবিতের মায়া ; তেমনি জীবনও হয় পালাতে চাইবে নিজের কাছ থেকে শুদ্ধ-চিতের অনুরাগে বিবাগী হয়ে—আপনভোলা সমাধিরসে তলিয়ে গিয়ে, নয়তো নিজের অমৃতস্বরূপকে অস্বীকার করে দিব্যভাবের চেয়ে পশুত্বের সাধনাতেই হবে তার বিশেষ রুচি। বাস্তবিক, একটা দুরপনেয় বিরোধের কল্পনা রয়েছে যে-সমস্যার মূলে, তার সমাধান যে সর্বনাশের পথেই শুধু—এদেশের দর্শনেও তার প্রমাণ আছে। সাংখ্যের পুরুষ চিৎস্বরূপ কিন্তু নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি পরিণামিণী অথচ যন্ত্রমূঢ়—দুয়ের মধ্যে সাম্য কোথাও নাই,—এমন কি দুয়ের অবিক্ষুব্ধ অব্যক্ত-স্বরূপেও নাই ; তাই পুরুষের বিক্ষোভহীন প্রশান্তির বুকে যদি ঘটে ক্ষুব্ধা বিমূঢ়া প্রকৃতির বন্ধ্যা প্রতিবিম্বলীলার অত্যন্ত-প্রলয়, সাংখ্যমতে তবেই তাদের দ্বন্দ্ব ঘোচে! এমনি অনতিক্রমণীয় বিরোধ শঙ্করের অবর্ণ প্রপঞ্চোপশম আত্মা আর তাঁর বহুবর্ণা পুরুরূপা মায়ার মাঝে ; সেখানেও পরমার্থসতের শাশ্বত নৈঃশব্দ্যে বিভ্রমবৈচিত্র্যের একান্ত-প্রলয়েই ঘটে সকল দ্বন্দ্বের অবসান।

জড়বাদীর সমাধান কিন্তু এর চেয়ে সোজা। চিৎসত্তাকে অস্বীকার করে শুধু জড় বা শক্তিকে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব বলে ঘোষণা করলে মেলে এক ধরণের বাস্তব অদ্বৈতবাদ,—তা যেমন বোঝা সহজ, তেমনি বোঝানোও সহজ। কিন্তু মুশকিল এই, এমনিতর কাটছাঁট উক্তিতে মানুষের জানার পিপাসা মেটে না, তাই উদ্দিষ্ট তত্ত্বের সে চায় লক্ষণ, চায় সমীক্ষা। তখন বাধ্য হয়ে জড়বাদীকেও বলতে হয়, তার কল্পিত অদ্বয়তত্ত্বও প্রত্যক্ষের অগোচর, অকর্তা পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই দৃশ্যজগৎ হতে বিবিক্ত উদাসীন। তাই এ

সমাধানও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে, কেননা এতে প্রকাশ পায় শুধু চিন্তাশক্তিরই দীনতা—শাণিত বুদ্ধির কঠিন দাবিকে অস্পষ্ট উক্তির ছলনায় ভুলিয়ে রাখবার অথবা 'জানা যায় না' বলে জানার কৌতূহলকে জোর করে দাবিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

বাস্তবিক, বিরোধের ভাবনা যদি চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যাই করে, মানুষের মন কিন্তু তাতে খুশি হয়ে ওঠে না। কেননা শুধু নেতিবাদের দিকে তার ঝোঁক নয়, সে চায় পরিপূর্ণ ইতির খবর—যা একমাত্র সর্বসমন্বয়ী বোধির দীপ্তিতেই মিলতে পারে। তার জন্যে অন্তশ্চেতনার সকল দাবি মেনে আমাদের চলতে হবে তারি পরিণামের ধারা ধরে। প্রাণ ও মনকে জড়ের মত পরাক্-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেই হোক্, অথবা প্রত্যক্-দৃষ্টিতে তাদের *সমন্বয় ও সন্দীপন দ্বারাই হোক—আমাদের পৌঁছাতে হবে চরম ঐক্যের* পরম প্রশান্তিতে, অথচ তার বহুধা-রূপায়ণের বীর্যকেও অস্বীকার করলে চলবে না। ইতিবাদের সর্বসমন্বয়ী ঔদার্যের পরিবেশেই আমরা খুঁজে পাব জীবনের আপাতবিরোধী বিচিত্র দ্বন্দ্বের সুষম সমাধান। আমাদের ভাবে ও কর্মে যে বহুমুখী শক্তির সংঘাত, তার মূলে আছে এক অখণ্ড সত্যেরই আত্ম-রূপায়ণের প্রৈতি, কিন্তু সম্যক অনুভবের দীপ্তি ছাড়া সে সংঘাতের মাঝে ছন্দ ও সুর আবিষ্কার করা সম্ভব নয় কখনও। সত্তার মর্মসত্যের সন্ধান পেলেই আমাদের বুদ্ধি চক্রাবর্তন ছেড়ে চিৎ-কেন্দ্রে হবে প্রতিষ্ঠিত; তখন উপনিষদের ব্রহ্মের মত নিখিল বিশ্বে লীলায়িত হয়েও সে থাকবে স্বপ্রতিষ্ঠায় ধ্রুব ও অচঞ্চল এবং তারি ছন্দ মেনে প্রশান্ত আনন্দজ্যোতিতে জীবন হবে সেই শুদ্ধ বুদ্ধিরই অনুগামী—শক্তির সুষম বিচ্ছুরণে হিল্লোলিত।

কিন্তু অস্তিত্বের ছন্দে যদি তালভঙ্গ হয় কখনও, তখন বিরোধের দুটি কোটিকেই ঐকান্তিক মর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের মূল্য নিরূপণ করার একটা সার্থকতা আছে একথা সত্য। বৈষম্যকে এমনিভাবে একান্ত করে তুলে আবার বৃহত্তর সাম্যে ফিরে আসা মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ফেরবার মুখে মাঝপথে সে অনেক জায়গাতেই থমকে দাঁড়াতে পারে বটে,—অস্তিত্বের সমস্ত লীলায়নকে নিছক প্রাণস্পন্দ বা ইন্দ্রিয়সংবেদন বা ভাবের খেলা বলে ব্যাখ্যাও করতে পারে; কিন্তু এধরণের তত্ত্বমীমাংসাতে সব সময়েই থাকে অবাস্তবতার একটা অস্বস্তিকর ছোঁয়াচ। এতে যুক্তিবুদ্ধির সাময়িক তর্পণ হয়তো হয়, কেননা তার কারবার কেবল ভাব নিয়ে; কিন্তু বস্তুরসিক মনকে

শুধু ভাব দিয়ে তো ভোলানো যায় না। মন জানে, তার পিছনে এমন কিছু আছে যা ভাবসর্বস্ব নয় শুধু; তার গভীর গহনে যা স্তব্ধ হয়ে আছে, সে শুধু প্রাণবায়ুর লীলা নয়। চিৎ বা জড়কে চরম তত্ত্ব বললে তাতে সাময়িক ভাবে সে সায় দিতেও পারে, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি কোনও তত্ত্বকে চরম বলে সে মানতে নারাজ। অতএব সম্যক-দর্শনের উদার পরিবেশে সত্যের সমগ্ররূপটি ধরবার আগে, তাকে অবগাহন করতে হয় তারি দুটি প্রত্যন্ত কোটিতে। মনের পক্ষে এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেননা মন তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করে ইন্দ্রিয় এবং ভাষা দিয়ে; ইন্দ্রিয় অখণ্ড সত্তার খণ্ডরূপকেই দেখে স্পষ্ট করে, আর ভাষা সীমার রেখায় সুনিপুণ ভাবে ভাবকে খণ্ডিত করে ফোটায় তার রূপ; অতএব এ দুটি সাধনের সহায়ে মন যখন বিশ্বের বহুবিচিত্র মৌল বিভাবের সমাহার করতে চায় কোনও একটি চরম তত্ত্বের মাঝে, তখন সব কিছুকে ভেঙে-চুরে একাকার করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না তার। বাস্তব-রসিক মন এককে রাখতে গিয়ে আর-সবাইকে বিদায় তো করবেই। তাই, এমনিতর কাট-ছাঁটের পথ বাদ দিয়ে সবার মূলে একের সত্যকে আবিষ্কার করতে গেলেই নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে হয় তাকে—কখনও লাফ দিয়ে, কখনও বা গুনে গুনে পা ফেলে। অথচ প্রতিবারই পথের শেষে সে দেখতে পায় সেই 'অলক্ষণম্ অব্যপদেশ্যম্' তৎ-স্বরূপকে, যাঁর মধ্যে সব কিছুর অবসান, অথচ 'অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ' যিনি। বাস্তবিক যে-পথই ধরি না কেন, সবার শেষে আছেন শুধু সেই তৎস্বরূপ; পথের ধারে যদি খুঁটি গেড়ে বসি, তবেই তাঁকে এড়ানো চলে, নইলে নয়।

দীর্ঘযুগের বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষার পর আজ আমরা পৌঁছেছি আদর্শ-বাদের দুটি প্রত্যন্তকোটির সামনে এসে। অন্যোন্যবিরোধী এই দুটি লক্ষ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষ অক্লান্ত তপস্যায় তার অনুভবকে করছে শাণিত; কিন্তু কঠোর সাধনার চরমে যা সে পেল, সে যে সম্যক-দর্শনের অনুকূল, বিশ্ব-মানবের সহজ-বুদ্ধি আজ তা স্বীকার করতে চাইবে না। অথচ এ বিষয়ে তার রায়ই চূড়ান্ত, কেননা এই সহজবুদ্ধিই বিশ্বসত্যের রক্ষক ও প্রতিভূ—চেতনার গহনে 'গোপা ঋতস্য দীদিবিঃ'। ইউরোপে আর ভারতে যথাক্রমে জড়বাদীর 'নাস্তি-বাদ' আর বৈরাগীর 'নেতি-বাদ' উদাত্তকণ্ঠে হয়েছে ঘোষিত, তারস্বরে উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো মানুষের জীবন বেদ, এ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!' ভারতবর্ষ নেতি-মন্ত্রে কুবেরের ঐশ্বর্য সঞ্চিত করেছে

অধ্যাত্মলোকে, একথা মিথ্যা নয় ; কিন্তু সেই সঙ্গে তার জীবন হয়েছে দেউলিয়া। তেমনি ইউরোপ উপকরণের বাহুল্যে, পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের অকুণ্ঠিত উপচয়ে পৌঁছেছে ঋদ্ধির চরমে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আত্মা হয়েছে ফতুর ; জড়বাদে জীবন সমস্যার সকল সমাধান খুঁজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও আজ অতৃপ্ত, অশান্ত।

অন্যোন্যবিরোধী দুটি জীবনাদর্শ এমনি যে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, একে শুভ লক্ষণই বলতে হবে, কেননা এতে দুয়ের মাঝে যে ন্যূনতা ছিল, আজ তা ধরা পড়েছে বিবেকীর দৃষ্টিতে। 'নেতি' বা 'নাস্তি'—কোনও মন্ত্রেই এখন মানুষের মন শান্ত হবার নয় ; তার অন্তরের প্রৈতি এবার মহত্তর নূতনতর 'ইতি'র পানে, অন্তরের অনুভবে এবং জীবনের কর্মে সে চায় প্রাণের প্রসার এবং তাই দিয়ে, কি ব্যক্তিতে কি জাতিতে সে খুঁজছে অখণ্ড মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ। আজ নবযুগের তোরণদ্বারের পানে মহাকালের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত—আপাতপ্রতীয়মান সকল বিরোধ ও বিপর্যয় সত্ত্বেও।

চিৎ এবং জড় একই অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভূতি হলেও অজ্ঞেয়ের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ এক ধরণের নয়, তাই জড়বাদ আর চিৎবাদের নাস্তি-বা নেতি-মন্ত্র মানুষের উপর সমান ভাবে কাজ করে না। জড়বাদীর নাস্তিকতা লোকায়ত, বারবার শুনে মানুষ সহজে তাতে ভোলেও ; কিন্তু তবুও বৈরাগ্যর নেতিবাদের মত তা অত সাংঘাতিক মজ্জাগত হয়ে পড়ে না তার। কারণ, নাস্তিকতার নিজের মাঝেই রয়েছে তার মুশকিল-আসান। নাস্তিক প্রকট বিশ্বের পিছনে প্রতিষ্ঠিত করে অজ্ঞেয়কে, কিন্তু তার কোনও সীমা নির্দেশ করে দিতে পারে না ; মানুষের জিজ্ঞাসা সে অজ্ঞেয়ের রাজ্যে নিরন্তর অভিযান চালিয়ে ক্রমেই তরল করে আনে তার রহস্য এবং অবশেষে 'অজ্ঞেয়' পর্যবসিত হয় শুধু 'অজ্ঞাত'তে ; তখন বিশ্বের রহস্য 'জানা যায় না' এমন কথা বলা চলে না, বলা চলে—'আজও জানা যায়নি।'

অজ্ঞেয়বাদীর যুক্তিধারা এই : জড়-ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; বুদ্ধি যত উঁচুতেই উড়ুক তর্কের পাখায় ভর করে, ইন্দ্রিয়-সংবিতের সঙ্গে তার যোগসূত্র কিছুতেই ছিন্ন হবার নয় ; ইন্দ্রিয় যে তথ্য আহরণ করে আনবে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, তাই দিয়ে তাকে গড়তে হবে তত্ত্বের ভিত ; লৌকিক তথ্যের মাঝে অলৌকিক তত্ত্বের ইঙ্গিত যদি থাকে কোথাও, তার শিকড় যে রয়েছে এই মাটিতেই, সে কথা ভুললে চলবে না। বুদ্ধির স্বগে জ্ঞানবৃত্তির অসঙ্কুচিত স্ফুরণে জিজ্ঞাসার নূতন পথ খুলবার

সম্ভাবনা যতই প্রবল হোক্ না কেন—অলৌকিকের ইঙ্গিতকে স্বর্গারোহণের সিঁড়ি করে মাটির মায়া কাটিয়ে যাব, সে অধিকার আমাদের নাই।

এই ধরণের অযৌক্তিক যুক্তিতে সহজেই ধরা পড়ে তার ভিতরের দুর্বলতা। এর মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু মতুয়ার বুদ্ধির একটা জেদ। অপরোক্ষ-অনুভবের অগুন্তি প্রমাণ তার বিরুদ্ধে স্তূপাকার করে তুললেও সে তাতে হয় কান দেবে না, নয়তো তাকে উড়িয়ে দেবে নানা অছিলায়; অন্তরের নিগূঢ় অথচ সাথক দিব্যবৃত্তিকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করবে—মানুষের মধ্যে তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েও; অতিপ্রাকৃতের সত্যতা মান্‌বে শুধু জড়ের রহস্যময় স্পন্দনে, জড়শক্তিরই একটা অবর অভিব্যক্তিরূপে; এর বাইরেও যে অতিপ্রাকৃতের অধিকার প্রসারিত হতে পারে, সে সম্পর্কে তথ্য বা তত্ত্বের অনুসন্ধানকেও সে মনে করবে বাহুল্য। কিন্তু জড়বাদই তো সত্যনিরূপণের একমাত্র পথ নয়। জড়বাদী মনের প্রবৃত্তিকে যে জড়শক্তির একটা অবর লীলা রূপে দেখেন শুধু, এ-ও তো তাঁর কুসংস্কার। মন থেকে জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মন এবং অতিমানসের স্বধর্ম নিরূপণ করতে যাই যখন, তখন অলৌকিক তথ্যের যে বিচিত্র সম্ভার আমাদের অনুভবে আসে, তাদের আর জড়ীয় বিধানের সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে আটকে রাখা যায় না। অনুভবের প্রসারের সঙ্গে আমরা তখন বুঝতে পারি, 'জ্ঞানের সীমা শুধু ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাঝে'—জড়বাদী নাস্তিকের এ যুক্তি একেবারেই অচল। অতীন্দ্রিয়জগতে *কত তথ্য কত তত্ত্ব রয়েছে, যা মানুষের দুর্জ্ঞেয় হলেও অজ্ঞেয় নয়। মানুষের মাঝেই নিগূঢ় হয়ে আছে এমন কত শক্তি ও বৃত্তি, যারা ইন্দ্রিয়সংবিতের নিয়ন্ত্রণ* তো মানেই না, বরং তারাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা,—ইন্দ্রিয়কে শুধু বাহন করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগ রেখে চলে তারা। চিরাভ্যস্ত বহির্জীবন বিপুল অন্তর্জীবনের একটা বহিরাবরণ মাত্র—এই অনুভবের আভাস মাত্রে আমাদের মনের জড়ত্ব ও সংশয় যায় কেটে; তখন অস্তিত্বকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে এবং জিজ্ঞাসাকে নিত্যনূতনের অভিযানে উদ্যত রাখতে আর ভয় পাই না আমরা।

অল্প কিছুদিন ধরে জড়বাদ মানুষের মনকে নিয়ে চলেছে যুক্তির পথে; কিন্তু তাতেই তার যে উপকার হয়েছে, তার অপরিহার্যতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। অলৌকিক তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্পর্কে আবার আমরা সচেতন হয়ে উঠছি, তার অনুকূলে প্রামাণিক তথ্যের সঙ্কলনও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু কর্কশ যুক্তির পাথরে শাণ দিয়ে বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও

উজ্জ্বল না করে অলৌকিকের রাজ্যে ঢোকায় বিপদ আছে। অপরিণত অপরিশালিত চিত্তের উদ্ভ্রান্ত কল্পনায় অলৌকিক অতি সহজেই হয়ে ওঠে কিম্ভূতকিমাকার—নানা অনর্থের সূত্রপাত হয় সেখানেই। অতীতে এমনি করে এক কণিকা সত্যের চারপাশে বিকৃত কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন হঠধর্মের এত জঞ্জাল এসে জড়ো হয়েছিল যে তার ফলে সত্যের অভিযান প্রতিপদে হয়েছে ব্যাহত। তারি জন্যে প্রয়োজন হল, অন্তত কিছুকাল কণাপ্রমাণ সত্য এবং স্তূপাকার সত্যের ভান উভয়কেই একসঙ্গে ঝেটিয়ে বিদায় করা, যাতে নূতন পথে প্রগতির অভিযানে আর কোনও বাধা এসে না পড়ে। জড়-বাদের মধ্যে যে যুক্তিপ্রবণতা রয়েছে, মানুষের বুদ্ধিকে সে মোহমুক্ত ও শাণিত করে তার এই উপকারটুকু করেছে।

সাধারণত চিত্তে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির স্ফুরণ হয় আধারের জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে; তার 'পরে থাকে কায়িক স্থূলত্বের প্রলেপ, অপ্রবুদ্ধ বাসনার ঘোর, অনিয়ন্ত্রিত নাড়ীচক্রের উত্তালতা; তাই তার ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিতে সত্যের স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে ফোটে না বরং সত্যানৃতের মিথুনলীলাই হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট। অপরিশীলিত চিত্ত এবং অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়চেতনা নিয়ে মানুষ যখন অধ্যাত্মলোকের উত্তরভূমিতে আরোহণ করতে চায়, তখন ঐ ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিই তার বিপদ ঘটায় বিশেষ করে। অপরিণত বুদ্ধির এই ধৃষ্ট অভিযান যে-লোকে তাদের উত্তীর্ণ করে, সেখানে অবাস্তবের মেঘচ্ছায়া বা অর্ধদীপ্ত কুহেলিকার মায়ায় *কি তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে না—ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকে কি তাদের চোখ* আরও ধাঁধিয়ে যায় না? অবশ্য দুরূহের প্রতি লোভ মানুষের আছেই; তার এই দুঃসাহসী অভিযানের ভিতর দিয়েই প্রকৃতি খুলে দেয় প্রগতির নূতন পথ। হয় তো এই তার কাজের ধারা, অথবা এ শুধু তার খেয়াল খুশির লীলা; কিন্তু তবুও মানুষের বিচারবুদ্ধি অপরিণত চিত্তের এই ধৃষ্টতাকে সমর্থন করতে পারে না কিছুতেই।

অতএব দীপ্ত শুদ্ধ মার্জিত বুদ্ধির 'পরে নির্ভর করেই যে চলবে বিদ্যার অভিযান, একথা অনস্বীকার্য। এও মানতে হবে, চলার পথে মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য ও জড়জগতের নিরেট সত্যের শাসন মেনে বিদ্যাকে শুধরে নিতে হবে তার চলনের ত্রুটি। মানুষ 'পুত্রঃ পৃথিব্যাঃ'; তাই সে অজড় সত্যের সন্ধানী হলেও এই মাটির ছোঁয়া সব সময়েই তাকে ভরে তুলবে নতুন তেজে। বরং এই কথাই সত্য, জড়ের বুকে অটল হয়ে দাঁড়িয়েই আমরা পেতে

পারি অজড় সত্যের পূর্ণ অধিকার ; মাটির মায়া কাটিয়ে অজড়ের বুকে উড়ে যাওয়া, সে তো আমাদের আছেই,—কিন্তু পুরোপুরি পাওয়া তাকে বলা যায় না কিছুতেই। বিশ্বরূপ পুরুষের স্বরূপ-কথায় উপনিষদ তাই বারবার বলছেন 'পদ্ভ্যাং পৃথ্বী', 'পৃথিবী পাজস্যম্'—এই পৃথিবীরই বুকে তাঁর চরণ দুটি। অতএব পৃথিবীর তত্ত্বজ্ঞানকে যত সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করব আমরা, ততই উত্তর-জ্যোতি—এমনকি উত্তম-জ্যোতিঃ-সাধনার ভিত্তিও আমাদের হবে অটল এবং উদার। ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের অধিগত হবে এমনি করেই।

অতএব জড়বিদ্যার যুগমায়াকে কাটিয়ে উঠবার বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের বর্জননীতির মাঝে যেন অবজ্ঞা বা হঠকারিতার উত্তাপ না থাকে, অথবা বর্জনের দুরাগ্রহে সত্যের একটি কণিকাও যেন খোয়া না যায়। চিন্ময় সাধন-সম্পদকে যতদিন না হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছি, ততদিন জড়ের সাধনকে উপেক্ষা করবার কোনও অধিকার নাই আমাদের। বরং নিরীশ্বরবাদ যে ঈশ্বরের মহিমাকেই উজ্জ্বল করেছে প্রকারান্তরে, অজ্ঞেয়বাদ যে অন্তহীন দিগন্তের ইশারা এনেছে জ্ঞানের অভিযানে—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে এই সত্যকেই আমরা স্বীকার করে নেব। এ-জগতে ভ্রান্তিও সত্যেরই চিরপরিচারিণী, অজানার পথে কখনও বা তার দিশারিণী ; কারণ ভ্রান্তি অর্ধসত্য মাত্র, সত্যের প্রতিষেধ নয়—শুধু সঙ্কোচে তার 'চলিতে চরণ বাধে' ; কখনও বা ভ্রান্তির ওড়নায় মুখ ঢেকে সত্যই বেরিয়ে পড়ে অজানার গোপন অভিসারে। আধ্যাত্মিকতার অভিমানে যাকে ভ্রান্তি বলে লাঞ্ছিত করি আমরা, সে যদি হয় সত্যেরই বিশ্বস্ত পরিচারিণী, নিষ্ঠাপূত এবং ছলনাহীন হয় যদি তার তপস্যা, নিজের পরিমিত অধিকারের মাঝে যদি সে হয় সত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, তাহলে উদ্ভ্রান্তচিত্তের কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনার চেয়ে সে যে শ্রদ্ধেয়, এ কি অস্বীকার করা চলে ? আর এ যুগে জড়বিজ্ঞানীর তথাকথিত ভ্রান্তি কি বস্তুত সত্যেরই ছদ্মরূপ নয় ?

সকল জানারই শেষে ফোটে সত্যের চিরন্তন রহস্যরূপ ; তাই সমস্ত জিজ্ঞাসার চরম অঙ্কে দেখা দেয় অজ্ঞেয়বাদেরই একটা ছায়া। যে পথ ধরেই চলিনা কেন, পথের শেষে দেখি,—বিশ্ব এক অজ্ঞেয় তত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিভাস; এক অবিজ্ঞেয় বস্তুকেই আমরা বিশ্বের রূপে দেখছি জড়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ, বুদ্ধি, ভাব, অধ্যাত্মচেতনা—এমনি কত রকমারি পরকলার ভিতর দিয়ে। তৎস্বরূপ যত সত্য হয়ে ওঠেন চেতনায়, ততই তাঁকে অনুভব করি মনোবাণীর

অগোচররূপে—'ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।' কিন্তু মায়াবাদী যেমন প্রতি-ভাসের অবাস্তবতাকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেখেন, চরমতত্ত্বের অজ্ঞেয়তাকেও তেমনি বৃহৎ করে দেখা চলে। যখন বলি তৎস্বরূপ অবিজ্ঞেয়, তখন তার অর্থ এ নয় যে সব রকমেই চেতনার বাইরে তিনি; বস্তুত তার অর্থ এই যে, আমরা চিন্তা বা ভাষা দিয়ে বেড় পাই না তাঁর, কেননা চিন্তা এবং ভাষা আমাদের বোধ জাগায় বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সৃষ্টি করে, বিষয়কে খণ্ডিত ও সীমিত করে; অথচ স্বরূপত তিনি অভেদ, অখণ্ড, আত্ম-স্বরূপ। কিন্তু মননের বিষয়রূপে জ্ঞেয় না হলেও, চেতনার চরম প্রসারে তিনি উপলব্ধির বিষয় তো বটে। তাদাত্ম্যবোধের মাঝেও এক ধরণের জ্ঞান-বৃত্তি আছে, যা দিয়ে তৎস্বরূপকে 'জানা যায়' বলা চলে। সে বিজ্ঞানকে বাক্ বা মন দিয়ে প্রকাশ করা যায় না সত্য, কিন্তু তার উপলব্ধিতে তৎস্বরূপকে আমরা পাই বিশ্বচেতনার অভিনবা বৃত্তিরূপে এবং সে বৃত্তির বিচিত্র ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে চেতনার স্তরে স্তরে। তখন সে যে শুধু অন্তর্জীবনের রূপান্তর ঘটায় তা নয়, আমাদের বহির্জীবনেও বিকীর্ণ হয় তার নবচ্ছটা। তা ছাড়া আর এক ধরণের বিজ্ঞান আছে যার মাঝে তৎস্বরূপ প্রাতিভাসিক নাম-রূপের ভিতর দিয়েই নিজকে ফুটিয়ে তোলেন এই চেতনায়: যদিও প্রাকৃতবুদ্ধি জানে নাম-রূপ তাঁর স্বরূপের কঞ্চুক শুধু। এ বিজ্ঞান গুহ্যতম না হলেও 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর' তো বটেই; কিন্তু এখানে পৌঁছাতে গেলেও জড়বাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে উঠতে হয়, প্রাণ মন ও অতিমানসের তত্ত্বসমীক্ষা করতে হয় তাদের স্ব-ধর্মের পরিশীলন দিয়ে—জড়ে তাদের যে অবর বিভূতির প্রকাশ, শুধু তাই দিয়ে নয়।

উপনিষদ বলেন, 'অন্যদেব তদ্ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি'—যা জানা যায়, তৎস্বরূপ তা হতে আলাদা—আবার যা জানা যায় না তারও উপরে তিনি। বাস্তবিক, যা অজ্ঞাত, তা-ই অজ্ঞেয় নয়; জানতে না চাই যদি, অথবা গোড়াতেই জ্ঞানবৃত্তির সঙ্কোচকে আঁকড়ে থাকি, তাহলেই অজানা থেকে যায় জানার বাইরে। যা-কিছু স্বরূপত অজ্ঞেয় নয় (একটা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুই তাই), তাকে জানবার বৃত্তিও সে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর আছে। মানবরূপা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডেও আছে (জ্ঞেয় ও জ্ঞানের এই সামানাধিকরণ); অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে তার মাঝে। তাদের ফোটানোর চেষ্টা না করতে পারি, অথবা আধফোটা কুঁড়িকে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থাও করতে পারি;

কিন্তু তবু জ্ঞান সম্ভব হলে সাধ্যও হবে—বিশ্বের এ মৌলিক বিধানের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারি না কিছুতেই। মানুষের মাঝে প্রকৃতি ফুটিয়েছে স্বরূপ-উপলব্ধির দুর্নিবার আকূতি; অতএব শুধু বুদ্ধির জুলুমে তার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের সীমাকে সঙ্কুচিত করবার প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না। জড়ের রহস্য উদ্ভেদ করে যখন তার শক্তিকে হাতের মুঠোয় আনব, তখন জড়বিজ্ঞানের সেই সঙ্কীর্ণ সিদ্ধিই বৈদিক প্রগতিবিরোধীদের মত আমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করবে এই প্রৈষ-মন্ত্র: 'নিরন্যতশ্চিদারত।'—বেরিয়ে পড়—ছুটে চল আরও যে সব ভূমি আছে তারি পানে।

আধুনিক জড়বাদের লক্ষ্য যদি হত শুধু মূঢ়ের মত জড়ের জীবনকে আঁকড়ে থাকা, তাহলে মানুষের প্রগতি হত অনিশ্চিত ও বহুবিলম্বিত। কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সা জড়বাদেরও মর্মসত্য, অতএব সেও মধ্যপথে থমকে দাঁড়াতে পারে না। আজ হয়তো সে ঠেকে গেছে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও প্রাকৃত বিচার বুদ্ধির বাঁধে এসে; কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রচেতনার প্রবেগে এ বাঁধ সে ভাঙবেই। তখন, যে দুর্ধর্ষ বীর্যে এই দৃশ্যজগৎকে সে করেছে করামলকের মত, সেই বীর্যই যে প্রচোদিত করবে তাকে লোকোত্তরের বিজয়-অভিযানে—আমাদের এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না। এবার শুধু তার বাকি আছে বাঁধের বাইরে পা বাড়ানোটুকু; তারও আয়োজন যে শুরু হয়েছে, সেই সূচনা দেখছি আজ দিকে দিকে।

শুধু চরম দর্শনেই নয়, তার অবান্তর-সিদ্ধির সামান্য-ধারাতেও দেখি—একবিজ্ঞানেই সার্থক হতে চাইছে বিদ্যার বিচিত্র সাধনা। তাই, উপনিষদের বৈদান্তিক ঋষি (পরবর্তী তার্কিক বেদান্তীর কথা বলছি না) যে-ভাবে এবং যে-ভাষায় সত্যের স্বরূপ-কথা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানী যখন বিপরীত ধারায় সাধনা করেও সেই ভাবে ও সেই ভাষাতেই কথা বলেন, তখন উভয়ের এই অর্থপূর্ণ সাম্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই চিরন্তন একবিজ্ঞানেরই সুর। শুধু তাই নয়, বর্তমান বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের নবীন আলোকে প্রাচীন বেদান্তের মর্মসত্য স্ফুটতর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যেমন ধরা যেতে পারে উপনিষদের সেই উক্তিটি—'বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি'—বহুর একটি বীজ, কিন্তু বিশ্বশক্তি তাকেই করেছেন বহুধারূপায়িত।……বেদের ঋষি বলেছিলেন, বিশ্বের মূলে যে 'একং সৎ' তিনিই হয়েছেন 'বহুধা'; আর আজ বিজ্ঞানও চলেছে এমন এক অদ্বৈতবাদের পানে, যার বিরোধ নাই বহুর সঙ্গে;

এখানেও বেদ ও বিজ্ঞানে ভাবের সারূপ্য অর্থপূর্ণ নয় কি ? বিজ্ঞান যখন জড় ও শক্তির দ্বৈতকে মানে, তখন সে তো দ্বৈতবাদী,—এমন কথা বললেও তার এই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না। কারণ, বৈজ্ঞানিক যাকে বলেন জড়ের স্বরূপ-তত্ত্ব, স্পষ্টই তা সাংখ্যের প্রধানের মতই একটা অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত পদার্থ—যাকে বলা চলে বস্তুর ভাবরূপ। অতএব চেতন পুরুষকে বাদ দিলে সাংখ্যকে যেমন বলা যায় প্রধানাদ্বৈতবাদ, বিজ্ঞানের জড়বাদকেও তেমনি বলা যায় জড়াদ্বৈতবাদ। তাছাড়া বিজ্ঞান জগতেও জড়ের তত্ত্ব এবং শক্তির তত্ত্ব ক্রমেই এগিয়ে চলেছে এক মহাসঙ্গমতীর্থের পানে,—শুধু ব্যবহারিক কল্পনায় টিকে আছে তাদের যেটুকু পার্থক্য। অতএব একবিজ্ঞান যে বিজ্ঞানেরও চরম লক্ষ্য একথা অনস্বীকার্য।

জড় কোনও অজ্ঞাত শক্তির রূপায়ণ, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও এই হল তার চরম পরিচয়। প্রাণরহস্যের শেষ আজও মেলেনি, তবু মনে হয় সে যেন জড়ের আধারে বন্দী সংবিতের অব্যক্ত স্পন্দন। আজও আমাদের অবিদ্যা কবলিত দ্বৈতবুদ্ধিই জড় ও প্রাণের মাঝে টেনে রেখেছে ভেদের রেখা। এ রেখা যেদিন মুছে যাবে, সেদিন একথা মানতে কোনই বেগ পেতে হবে না যে জড় প্রাণ ও মন একই বিশ্বশক্তির ত্রিধা রূপায়ণ মাত্র, বৈদিক ঋষি যাকে বলেছেন 'তিনটি ভুবন'। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করছে যে-শক্তি, তার স্বরূপ হল ইচ্ছা বা সঙ্কল্প, আর সঙ্কল্পের অর্থই হল একটা নির্দিষ্ট পরিণামের অভিমুখে চেতনার প্রবৃত্তি।

কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও পরিণামের স্বরূপ কি ?—সে শুধু চৈতন্যের আত্মসংবৃতি ও আত্মবিবৃতি : চৈতন্য রূপের গুহায় নিজকে গুটিয়ে নিয়ে আবার ফুটতে চাইছে সেই আবরণ দীর্ণ করে বিশ্বের কোন্ অন্তর্গূঢ় সুমহতী সম্ভাবনাকে মূর্ত করতে,—এই তো তার লীলা। মানুষের মাঝে তার কোন্ দিব্যক্রতুর প্রকাশ ? সে কি তার মাঝে নিয়ে আসেনি অন্তহীন প্রাণ, অসীম জ্ঞান ও অকুণ্ঠ বীর্যের প্রৈতি ? তাইতো আজ বিজ্ঞানের চোখেও এই স্বপ্নের ঘোর : এই মর্ত্যদেহেই মানুষ হবে মৃত্যুঞ্জয়, চির-অতৃপ্ত তার জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটবে যেদিন, এই পৃথিবীর মানুষই সেদিন হবে জড়শক্তির মহেশ্বর। দেশ আর কাল আজ সঙ্কুচিত হয়ে এক দুর্লক্ষ্য বিন্দুতে গুটিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের কাছে ; কার্য-কারণের কঠিন নিগড় শিথিল করে মানুষকে অকুণ্ঠ সাম্রাজ্যের অধিকার দিতে কতশত কৌশলই না আবিষ্কার করে চলেছে সে। সিদ্ধির কোথাও সীমা আছে, জগতে

অসম্ভব বলে কিছু আছে—এ ধারণা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এসেছে মানুষের কাছে; বরং তার অবিচ্ছেদ আকূতিতে যে-কোনও সিদ্ধি মূর্ত হবেই একদিন, এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল তার মাঝে। তার এ প্রত্যয়কে মিথ্যাও বলতে পারি না কেননা শেষ পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধিই তো জাতির চিন্ময় ক্রতুরই পরিণাম। বস্তুত অকুন্ঠ ঈশনা ব্যক্তির বিবিক্ত সাধনার ফল নয়,—তার মাঝে সমষ্টি মানবের সঙ্কল্প ফুটে ওঠে ব্যষ্টির আধারকে আশ্রয় করে। আরও একটু গভীরে গেলে দেখি, এ শুধু সমষ্টিচেতনারই ক্রতু নয়, সমষ্টির উদার পরিবেশে ব্যষ্টিকে কেন্দ্র ও সাধন করে এক অতিচেতনা মহাশক্তিই আপনাকে রূপায়িত করছেন এই ঐশ্বর্যের বিভূতিতে। এই মহাশক্তিই মানুষের 'হৃচ্ছয় পুরুষ', তাদাত্ম্যের অনন্তব্যঞ্জনা, ঐক্যের বহুধা রূপায়ণ। বিশ্বপ্রজ্ঞ বিশ্বেশ্বর তিনি, মানুষের মাঝে ফুটিয়ে তুলছেন নিজেরই স্বরূপ,—তাঁরি দিব্যক্রতুর চিন্ময় বিন্দু তার ব্যষ্টি-অহং; আর জাতির সমষ্টি-অহংএ,—বিশ্বমানবরূপী নারায়ণের বিশ্ব বিগ্রহে সেই বিন্দুরই পরিধি ও বিচ্ছুরণের কল্পনা; এই যুগল আধারে তাঁর স্বরূপনিষ্ঠ একত্ব, সর্বজ্ঞতা ও সর্বৈশ্বর্যের আ-ভাসকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর সিসৃক্ষার তাৎপর্য। 'মর্তের মাঝে অমৃত যিনি, আমাদের অন্তরে তিনি নিহিত আছেন চিন্ময় হয়ে এবং আমাদের চিৎশক্তিরাজিতেই চলছে তাঁর কবিক্রতুর বিলাস।' আধুনিক জগৎ নিজের লক্ষ্য না জেনেও তার সকল কর্মে সকল সাধনায় অবচেতন ভাবে অনুসরণ করে চলেছে বিশ্বচেতনার এই বিপুল প্রৈতি।

তবুও এ সাধনায় আছে সঙ্কোচ, আছে বাধা; সঙ্কোচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে—জড়ত্বের পরিবেশে; আর বাধা শক্তির ক্ষেত্রে—জড়যন্ত্রের ব্যবহারে। কিন্তু ভবিষ্যতে এ কুণ্ঠাটুকুও যে থাকবে না, বিজ্ঞানের অতি সাম্প্রতিক প্রগতিতে তার আভাস মেলে। জড়বিজ্ঞানের পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হয়ে এখন এসে ঠেকেছে জড় আর অজড়ের প্রত্যন্ত ভূমিতে; আর বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগও চাইছে যন্ত্রের বাহুল্যকে যথাসম্ভব খর্ব করেই বিরাট সিদ্ধিকে আয়ত্ত করতে। বেতার-বার্তার আবিষ্কারে সূচিত হচ্ছে প্রকৃতির প্রগতিতে একটা নূতন ধারা: জড়শক্তির পরিচালনায় কোনও মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বাহনের প্রয়োজন রইল না, জড়ের ছোঁয়া রইল শুধু শক্তির ক্ষেপণ ও গ্রহণের দুটি প্রান্তবিন্দুতে। শেষ পর্যন্ত এই ছোঁয়াটুকুও থাকবে না; তখন জড়াতীতের গতি-প্রকৃতি আলোচিত হবে জগৎ-রহস্যের সত্য ধারা ধরে এবং তারি ফলে মানুষ খুঁজে পাবে শুধু মনঃশক্তি দিয়েই জড়শক্তির নির্ভুল প্রশাসনের কৌশল। প্রগতির এই

সম্ভাবনাকে ঠিক যদি বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের চোখের সামনে খুলে যাবে বিপুল ভবিষ্যের অন্তহীন চক্রবাল।

এমনি করে জড়ের অব্যবহিত উর্ধ্ব ভূমির বিজ্ঞান ও প্রশাসনের অধিকার পেলেও সামর্থ্যের সঙ্কোচ আমাদের ঘুচবে না—ওপারের হাতছানি তবু মানুষকে ডাক দেবে অজানার অভিযানে। আমাদের শেষ গ্রন্থিমোচন তখনই হবে,—যখন ভিতর-বাহির হবে একাকার, সঙ্কীর্ণ অহংএর বিলাস সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে শূন্যে যাবে মিলিয়ে; একত্বের আবেশে জারিত হবে নানাত্বের যত বিভূতি এবং সেই একরস প্রত্যয়ই আমাদের কর্মে আনবে প্রেরণা;—তখন নানাত্ব-ভাবনার জোড়াতালি দিয়ে একত্ব গড়বার ব্যর্থ প্রয়াস আর থাকবে না। বিশ্বচেতনার সেই পরম অনুভবে দেখতে পাব,—বৈন্দবাসনা মহাসরস্বতীর চরণতলে প্রসারিত রয়েছে অন্তহীন বিশ্বপটের অনুপম শিল্পচাতুরী। সেই ভূমিতেই আমরা ফিরে পাব স্বারাজ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার, সালোক্য-মক্তির সঙ্গে সাধর্ম্য-মুক্তির অসমোর্ধ্ব আস্বাদন—ধূলিলুণ্ঠিত এই মর্ত্য জীবনের দিব্য রূপায়ণে।

# ৩

# বৈরাগীর নেতি

এ সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাই ব্রহ্ম—আর এই আত্মা চতুষ্পাৎ।......
অব্যবহার্য-অলক্ষণ-অচিন্ত্য-প্রপঞ্চের উপশম যার মাঝে।

—মাণ্ডূক্য উপনিষদ (২,৭)

অথচ এরও পরে আছে ওপারের হাতছানি।

বিশ্বচেতনার ওপারে আছে এক বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যের অমেয় স্তব্ধতা (কিন্তু তবু মানুষের উপলব্ধির বাইরে নয় সে)—যা শুধু আমাদের ব্যষ্টি-অহংকে নয়, নিখিল বিশ্বকেও গেছে ছাড়িয়ে,—বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যার অপরিসীম পট-ভূমিকায় তুচ্ছ একটি তুলির লিখন মাত্র। বিশ্ববিধানের সে-ই ভর্তা অথবা উপদ্রষ্টা শুধু; মহাবৈপুল্যের আলিঙ্গনে বিশ্বপ্রাণকে সে জড়িয়ে আছে, অথবা আনন্ত্যের অমিতিতে উদাসীন হয়ে ছাড়িয়ে গেছে তাকে।

জড়বাদী যদি বলেন: জড়ই একমাত্র তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগতই একমাত্র বস্তু যার প্রামাণ্যকে মোটের উপর নিশ্চিত মনে করা চলে; এর পরেও যদি কিছু থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে—সম্ভবত তা অসৎ বা মনের বিকল্প অথবা বস্তু হতে আচ্ছিন্ন ভাবের একটা খেয়াল শুধু;—তাহলে অধরার টানে বাউল সন্ন্যাসীও বলতে পারেন: শুদ্ধ চিৎই একমাত্র তত্ত্ব—তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিণাম নাই; এই ব্যবহারিক জগৎ শুধু ইন্দ্রিয় ও মনের কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস; শুদ্ধবিদ্যার শাশ্বতদীপ্তি হতে পরাঙ্মুখ অবিদ্যাচিত্তের এ একটা বিকল্প মাত্র।...এমনি করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হতে দুজনেই ভাবতে পারেন তাঁর মতই সত্য।

বাস্তবিক, যুক্তিতে হোক্ অনুভবে হোক্, অন্যোন্যবিরোধী এই দুটি মতেরই সপক্ষে হাজির করা চলে তুল্যবল প্রমাণের পরম্পরা। জড়জগৎ যে বাস্তব, তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভবে। জড়ের মত স্থূল হয়ে যা ফোটে না, ইন্দ্রিয় তাকে ধরতে পারে না অতএব যা-কিছু অতীন্দ্রিয় তা-ই অসৎ—এই হবে তার রায়। দৈহ্য-ইন্দ্রিয়ের এই ভ্রান্তি অত্যন্ত

স্থূল ও বর্বর, অতএব দর্শনের যুক্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করলেই তার মর্যাদা বাড়ে না, কেননা যে অনুভবের 'পরে এই উক্তির ভিত্তি, সে যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি কাঁচা। ইন্দ্রিয়ের দাবি যে সত্য নয়, হাতের কাছেই তার প্রমাণ আছে। জড়ের জগতে এমন সব সূক্ষ্ম বস্তু রয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যাদের ধরা যায় না, অথচ তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ গোঁড়া জড়বাদীও করতে পারেন না। তবু যে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বিভ্রম বা কুহকের খেলা বলে উড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, তার কারণ ব্যবহারিক জগতের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই তাত্ত্বিক মনে করা তাঁদের চিরাভ্যাস ; অথচ এ খেয়াল তাঁদের নাই যে তাঁদের এ সংস্কারও একটা কুহকের খেলা। তাই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যাকে, গোড়াতেই তাকে মেনে নেওয়ায় তাঁদের তর্ক হয় শুধু সিদ্ধ-সাধন—অতএব নিরপেক্ষবাদীর কাছে নিষ্প্রমাণ।

জড়জগতেরই অনেক বস্তু শুধু যে অতীন্দ্রিয় তাই নয়। অনুভবের সাক্ষ্যকে যদি সত্যের প্রমাণ বলে মানি, তাহলে বলা চলে—স্থূলদেহের স্থূল-ইন্দ্রিয় ছাড়াও আমাদের সূক্ষ্মদেহে এমন সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় আছে যা দিয়ে জড়-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও জড়জগতের বস্তুকে জানা যায়, এমন কি জড়াতীত ঊর্ধ্বলোকের অতীন্দ্রিয় বস্তুকেও প্রত্যক্ষ করা চলে। বলা বাহুল্য, যে স্থূল-জড়পদার্থ দিয়ে আমাদের গ্রহ-তারা-পৃথিবীর পত্তন, এই সমস্ত লোকের উপাদান তা হতে পৃথক, অতএব তাদের অনুভবও চিৎসত্তার একটা নূতন ভূমির বিশিষ্ট অনুভবেরই সগোত্র।

মানুষ ভাবতে শিখেছে যখন, তখন থেকেই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে তার বিশ্বাস ও অনুভবকে সে ব্যক্ত করে এসেছে নানা ভাবেই। জড় জগতের রহস্য নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতির ফলে এ প্রবৃত্তিতে তার ভাঁটা ধরেছিল বটে, কিন্তু আজ সেদিকের জিজ্ঞাসা কতকটা শান্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ঝোঁক আবার নতুন করে পড়েছে এই দিকে। এ সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে ; তার মধ্যে চিন্তা-সংক্রমণ এবং তারি অনুরূপ অলৌকিক রহস্যের কোনও কোনও বহিরঙ্গ বিভূতিকে এখন আর কেউ সংশয়ের চোখে দেখে না। এর পরেও যদি কেউ বস্তুনিষ্ঠার অজুহাতে এ সব ব্যাপারের প্রতি অন্ধ থাকতে চান, তাহলে বুঝতে হবে অতীত দীপ্তির মোহে এখনও আচ্ছন্ন তাঁদের মন, অনুভব ও জিজ্ঞাসার স্বরচিত সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে কুণ্ঠিত হয়ে ফিরছে তাঁদের শাণিত বুদ্ধির এষণা ; অথবা অতীত শতকের উচ্ছিষ্ট

বিজ্ঞানের মন্ত্রকে নিষ্ঠাভরে আউড়িয়েই মনে করেন, তাঁরা বুঝি যুক্তি-যুগের নূতন আলোর ঋত্বিক, তাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মৃত বা মুমূর্ষু অন্ধ সংস্কারগুলিকে সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আগলে রাখাই তাঁদের কর্তব্য!

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জড়াতীত তত্ত্বের যেটুকু আভাস আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তা যেমন অস্পষ্ট তেমনি অনতিনিশ্চিত, কেননা সে গবেষণার ধরণে এখনও রয়েছে অনেক গলদ অনেক আনাড়িপনা। তবু এমনি করে, নতুন-ফিরে-পাওয়া সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গেছে জড়জগতেরই অনেক অতীন্দ্রিয় তথ্যের সত্য খবর। অন্নময় কোশের এলাকা ছাড়িয়ে জড়াতীত যে জগৎ, এই তথ্যগুলি যখন তারি বার্তাবহ, তখন তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না নিশ্চয়ই। যে-রীতিতে স্থূল-ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যাচাই হয়, অবশ্য সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও সে রীতিই খাটবে; তাদের আনা খবরকেও যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সাজিয়ে নিতে হবে, এখানকার ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঠিক ঠিক তর্জমা করতে হবে,—তাদের ধর্ম প্রবৃত্তি ও অধিকারকে তলিয়ে বুঝতে হবে। জড়জগৎ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম-সাধন-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম-ধাতুর জগৎ, সেখানেও পড়ে আছে সত্য অনুভবের এক বিশাল ক্ষেত্র; তার প্রামাণ্যকে অস্বীকার করার কোনও অর্থ হয় না। এই জগতের পরেও আছে আরও কত উত্তর-জগৎ; বৈরাজ-সামের ছন্দে আঁকা, অনির্বচনীয় রূপরেখায় বিপুল তাদের রূপায়ণ; তাদেরও আছে অমেয়-বীর্যের স্বয়ম্ভূ ব্রত—সুদিব্য জ্ঞানের জ্যোতির্ময় সাধন। আমাদের এই জড়ের জীবনে জড়ীয় দেহে নেমে আসে তাদের অলৌকিক শক্তির আবেশ, এই ভূমিতেই চলে তাদের উন্মেষের আয়োজন, এই চেতনাতেই তাদের আলোকদূত বয়ে আনে সে গোপন রহস্যের ইশারা।

অবশ্য বিশ্বলোক আমাদের অনুভবের ক্ষেত্র শুধু, এবং ইন্দ্রিয়ই সে অনুভবের অনুকূল সাধন। কিন্তু সবার মূলে রয়েছে চৈতন্য, এই হল আসল কথা। সাক্ষি-চৈতন্যে ভাসবে বলেই জগৎ হল অনুভবের বিরাট ক্ষেত্র আর ইন্দ্রিয় তার সাধন। বিশ্বলোক যে সত্য, সাক্ষীর চেতনা ছাড়া তার আর কোনও প্রমাণ নাই—হোক্ না সে ইহলোক বা পরলোক, এক লোক বা একাধিক লোক। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই যে অবিনাভাবের সম্বন্ধ, কারও কারও মতে এ যে শুধু মনুষ্যচেতনারই বৈশিষ্ট্য, জগৎকে বিষয়রূপে দেখার সংস্কার হতেই যে তার উৎপত্তি, তা নয়; সত্তার স্ব-ধর্মই হল এই সাক্ষী

ও সাক্ষ্যের অবিনাভাব ; বিশ্বের সকল প্রতিভাসেরই দুটি কোটি—একদিকে তার সাক্ষি-চৈতন্য আর এক দিকে সাক্ষ্যের স্পন্দন ; কিন্তু সাক্ষী না থাকলে স্পন্দন থাকতে পারে না, কারণ সাক্ষীই বিশ্বের আধার এবং ভাসক, সাক্ষি-ভাস্যতা ছাড়া তার কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার জড়বাদী এর জবাবে বলছেন : এই জড়বিশ্বই শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ ; প্রাণ ও মনের আবির্ভাবের পূর্বেও তার সত্তা ছিল এবং প্রাণের ক্ষণভঙ্গ ও মনের ক্ষণদীপ্তি একদিন মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে যখন, তখনও আকাশ জুড়ে চলবে ঐ অগণিত সূর্যতারার চেতনাহীন শাশ্বত ছন্দলীলা।······দুটি উক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসার শুধু দুটি বিপরীত ধারা হলেও একটা অনস্বীকার্য বাস্তব মূল্যও তাদের আছে, কেননা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ধারা হতেই মানুষের মাঝে ফোটে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, নিরূপিত হয় তার সাধনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্র। এ জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে বিশ্বেরই তাত্ত্বিকতার প্রশ্ন এবং মানব-জীবনের সত্য ও সার্থকতার প্রশ্নও জড়িত তারি সঙ্গে।

জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্যক্তির জীবন ও জাতির নিয়তি দুইই তুচ্ছ এবং অবাস্তব। অতএব ন্যায়ত আমাদের সামনে খোলা দুটি মাত্র পথ : হয় হন্তদন্ত হয়ে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে নিঙড়ে যথাসম্ভব তার রস-টুকু আদায় করে নেওয়া—ঋণ করেও ঘৃত পান করা চার্বাকের মত ; নয়তো জাতি ও ব্যক্তির লক্ষ্যহীন ও মমত্বশূন্য সেবায় জীবন দেওয়া—যদিও জানি ব্যক্তি শুধু নাড়ীচক্রের বিকারজাত মনশ্চেতনার একটা স্বপ্নবুদ্বুদ, আর জাতির মাঝেও জড়ের সেই নাড়ীয় স্পন্দনই হয়েছে আর একটু সংহত এবং দীর্ঘায়ত। কর্ম আর ভোগ দুয়েরই মূলে আছে অন্ধ জড়শক্তির তাড়না, যা আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে জীবনের একটা ক্ষণিক বিভ্রম অথবা ধর্মানুশাসন এবং মানসী সিদ্ধির একটা বর্ণাঢ্য প্রবঞ্চনা। জড়বাদও এমনি করে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের মতই শেষ পর্যন্ত ঠেকে এসে 'সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্বচনীয়া মায়া'তে ; তারও মতে জড়জগৎ সৎ, কেননা সে প্রত্যক্ষ এবং অনস্বীকার্য ; তেমনি আবার সে অসৎ কারণ সে প্রাতিভাসিক এবং বিনশ্বর।···আবার, মায়া-বাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠিক উলটো পথ ধরে যে লক্ষ্যে এসে পৌঁছাই, তা জড়বাদী সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ, অথচ তার চেয়েও সে আমাদের কড়া মহাজন। তার মতে : ব্যক্তির অহং আকাশকুসুমেরই মত অলীক, মানুষের জীবন অবাস্তব, কোনও স্বকীয় লক্ষ্য তার নাই, প্রাতিভাসিক জীবনের অর্থহীন জালের জটিল

বন্ধন হতে নির্বিশেষ-সৎ অথবা পরম-অসতের অনুপাখ্য শূন্যতায় মুক্তি পাওয়াই তার একমাত্র পুরুষার্থ।

প্রাকৃত জীবনের বাস্তব তথ্যের 'পরে যে-তর্কবুদ্ধির নির্ভর, অস্তিত্বের রহস্য সমাধান কখনও সে করতে পারবে না,—কেননা এসব তথ্যের মাঝে অনুভবের ফাঁক যেখানে, সেখানে যুক্তিরও ফাঁক জুটবে এসে। প্রাকৃত চেতনায় আমরা যেমন বিশ্বমানস অথবা অতিমানসের বিশিষ্ট অনুভবকে কল্পনায়, আনতে পারি না শরীরী ব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে, তেমনি প্রত্যগাত্মা বাস্তবিকই শরীরী, অথবা দেহপাতের পরেও তার সদ্ভাব বা দেহকে ছাপিয়েও তার সম্প্রসারণ একেবারেই অসম্ভব,—জোর করে এমন কথা বলবার মত প্রামাণ্য অনুভবও আমাদের নাই। কাজেই জড়বাদের দাবি সত্য না মায়াবাদের দাবি সত্য—এই প্রাচীন বিতর্কের মীমাংসা সম্ভব একমাত্র চেতনার সম্প্রসারণে অথবা সাধন-সম্পত্তির অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষে,—শুধু প্রাকৃতবুদ্ধির তর্ক-নৈপুণ্যে নয়।

চেতনার সম্প্রসারণ তখনই সাথক হতে পারে যখন বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয় ব্যক্তির অন্তর্জীবন। বস্তুত, জগতে জীবজন্মের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে যে শরীরী মন, তাকে সাক্ষি-পুরুষ বলা কখনই চলে না। সাক্ষী যিনি, তিনি বিশ্বচেতন—বিশ্ব তাঁরি কুক্ষিগত; নিখিল বিসৃষ্টিতে অন্তর্যামী বোধি-রূপে আবির্ভূত তিনি—বিশ্ব তাঁর চিরন্তন তত্ত্বভাবের পরিস্পন্দরূপে সত্য ও শাশ্বত হয়ে আছে তাঁরি মাঝে অথবা তাঁর প্রজ্ঞা ও চিৎশক্তির বিলাস রূপে 'তঁহি উপজি পুন তঁহি সমাওত—সাগর-লহরী-সমানা।' আমাদের প্রাকৃত মনের সংঘাতরূপকে বিশ্বের সাক্ষী ও প্রভু বলা যায় না কখনও; উপদ্রষ্টা মহেশ্বর তিনিই, যুগপৎ যিনি পৃথিবীর প্রাণে ও জীবদেহে শাশ্বতী শান্তির অচল প্রতিষ্ঠায় অন্তর্যামীরূপে সমাসীন—মানুষের ইন্দ্রিয়-মন যাঁর দিব্যক্রতুর পরোক্ষ সাধন শুধু।

আধুনিক মনোবিদ্যা মানুষের মাঝেও বিশ্বচেতনার সম্ভাবনাকে ধীরে ধীরে মেনে নিচ্ছে। এমন কি আমাদের জ্ঞানের সাধন যে আরও সূক্ষ্ম ও প্রসারধর্মী হতে পারে, একথা মানতেও বিশেষ আপত্তি নাই তার। অথচ সে সাধনের সামর্থ্য ও সার্থকতাকে কবুল করেও তার কৃতিকে কুহকের পর্যায়ে ফেলতে আজও তার বাধে না। প্রাচ্য মনোবিদ্যায় কিন্তু বিশ্বচেতনতা ও সাধনের উৎকর্ষকে বরাবরই গণ্য করা হয়েছে অধ্যাত্ম-প্রগতির একটা

বাস্তব সাধ্য বলে। তার মতে, সিদ্ধির একমাত্র সঙ্কেত হল—ব্যক্তির কল্পিত অহং-চেতনার সঙ্কোচকে অতিক্রম করা, জড়ে ও জীবে সর্বত্র গুহাহিত রয়েছে যে অন্তর্যামী আত্মসংবিৎ, তার সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে যুক্ত হওয়া—অন্তত পক্ষে তার সার্ষ্টি্ত্ব অর্জন করা।

বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে আমরা বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে পারি তারি মত। তখন আমাদের চেতনায় এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভবেরও মাঝে দেখা দেয় যে-রূপান্তর, তার দীপ্তিতে বুঝতে পারি—বিশ্বজড় এক অখণ্ড সত্তা; সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত ঐ অন্নময় সত্তাই বিবিক্ত দেহের বিভূতিতে ঘটে-ঘটে করেছে স্বগতভেদের বিসৃষ্টি, আবার আত্মসত্তার পরিকীর্ণ সেই বিন্দুজালে যোগাযোগ ঘটিয়েছে অন্নময় সাধন দিয়ে। তেমনি প্রাণ-মনেও এক অখণ্ড সত্তাকেই দেখি বহুধা রূপায়িত; আপন আপন অধিকারে তারাও দেখি নিজকে বিবিক্ত-বিকীর্ণ করে আবার যুক্ত করছে উপযুক্ত সাধন দিয়ে। এই ধারায় আরও এগিয়ে গিয়ে, চেতনার অনেক পর্ব পার হয়ে অবশেষে উত্তীর্ণ হই অতিমানসের অধিকারে, প্রৈতি যার নিগূঢ় রয়েছে বিশ্বের সকল অবর প্রবৃত্তির মর্মমূলে। অখণ্ড বিশ্বসত্তাকে শুধু যে অনুভবে আনা যায় এমনি করে, শুধু যে ইন্দ্রিয়বোধে ধরা যায় তার রূপ, তাই নয়; অনুভবের অন্তরঙ্গতায় আমরা আবিষ্ট জারিত হয়ে যেতে পারি এই গভীর চেতনায়—আত্ম-সংবিৎরূপে অপরোক্ষ করতে পারি তাকে। অহংপ্রত্যয়ের মাঝে যেমন স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করেছি এতদিন, তেমনি বাসা বাঁধতে পারি এই বিশ্বচেতনাতেও, নিত্য-স্পন্দিত হতে পারি তার উপচীয়মান নিবিড়তায়, খণ্ডিত সত্তার অভিমান ভুলে গভীরতর আত্মীয়তায় এক হয়ে যেতে পারি অপর মন প্রাণ ও দেহের সঙ্গে। কেবল যে আমাদের চিত্তে ও সঙ্কল্পে এবং অপরের প্রত্যক্-চেতনাতেই ছড়িয়ে পড়ে এই নিবিড় তাদাত্ম্যবোধের বীর্য, তা নয়; জড়জগতের গতিপ্রকৃতিতেও সঞ্চারিত হয় তার দিব্য প্রশাসন—যার কল্পনাও আজ আমা-দের সঙ্কুচিত অহমিকার অগোচর।

তাই, বিশ্বচেতনার স্পর্শ বা আবেশ যে পেয়েছে, তার অনুভবে এর সত্যতা বাস্তবকেও ছাড়িয়ে গেছে; তার কাছে এ শুধু স্বরূপে সত্য নয়,—পরিণামে ও প্রবৃত্তিতেও সত্য। এ জগৎ ফুটেছে বিশ্বচেতনারই পরিপূর্ণ সম্ভূতির লীলারূপে; অতএব বিশ্বচেতনা যেমন জগতের সত্য, তেমনি জগৎও তার কাছে সত্য—কিন্তু স্ব-তন্ত্র সিদ্ধসত্তারূপে নয়। চেতনার উত্তরায়ণে

সংস্কারের সকল বাঁধন খসে যায় যখন, তখন অনুভব করি, চৈতন্য আর সত্তাতে ভেদ নাই কোনও—সকল আত্মভাবই স্বরূপত পরাসংবিৎ এবং সকল সংবিৎই স্বয়ম্ভাব মাত্র। চৈতন্য শাশ্বত ও স্বকৃৎ; অতএব তার বিসৃষ্টিও সত্য; সে তার আত্মসত্তারই অবিকৃত-পরিণাম—স্বপ্ন বা পরিণাম-বিকার নয় শুধু। এজগৎ সত্য, কেননা একমাত্র চৈতন্যই এর সত্তা। চিৎশক্তি এর স্বরূপ এবং পরমার্থসতের সঙ্গে সে শক্তি অবিনাভত, কেননা সে তো শুদ্ধ সত্তারই, স্ব-ভাবের স্ফূর্তি। স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তিই ধরেছে জড়ের রূপ; জড়ের একটা বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকত যদি, তাহলে তা-ই বরং হত স্ব-ভাবের বিপর্যয় স্বপ্নকুহক মতিভ্রম বা অসম্ভাব্য অনৃতের ছলনা।

যে চিৎ-সত্তা অন্তহীন অতিমানসের স্বরূপসত্য, সে কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণ; যেমন বিশ্বছন্দে সে লীলায়িত, তেমনি অনির্বচনীয় আনন্ত্যের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে আত্মসমাহিতও সে। জগৎই আছে তৎস্বরূপকে আশ্রয় করে, তৎ-স্বরূপ জগৎকে আশ্রয় করে নাই। বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যেমন এক হয়ে যেতে পারি আমরা, তেমনি বিশ্বসত্তাকে ছাড়িয়েও ডুবে যেতে পারি বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যের অব্যক্ত গহনে। তখনই আমাদের মাঝে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন—বিশ্বোত্তীর্ণের স্বরূপ কি নেতিতে? বিশ্ব-লোকের কী সম্বন্ধ লোকোত্তরের সঙ্গে?

বিশ্বোত্তীর্ণের দুয়ারে আছে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের অসঙ্গ কৈবল্য, উপনিষদ যাঁকে বলেছেন: শুভ্র শুদ্ধ তিনি, 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' কিন্তু 'অনেজৎ'; তিনি 'অস্নাবির'—শক্তি সঞ্চরণের জন্য স্নায়ু নাই তাঁতে, দ্বৈতের পাপ নাই—ভেদের ব্রণ নাই তাঁর মাঝে, তিনি কেবল অদ্বয়রূপ অব্যবহার্য প্রপঞ্চোপশম। অদ্বৈতবেদান্তীরা তাঁকেই বলেন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রপঞ্চাতীত নৈঃশব্দ্য। অধ্যাত্মচেতনার তীব্রসংবেগে সাধকের মন যখন পর্বসংক্রমণের অপেক্ষা না রেখে সহসা এই অগমরাজ্যে ঢুকে পড়ে প্রলয়ের দুয়ার ঠেলে, তখন ঐ অমেয় নৈঃশব্দ্যের নীল বিদ্যুতে ধাঁধিয়ে যায় তার চেতনা, মনে হয় এই অবর্ণই সত্য,—মিথ্যা জগতের বর্ণচ্ছটা। মানুষের মনে এর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড অনুভবের বিচ্ছুরণ আর বুঝি হয় না। এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের দর্শনে অথবা তারও অতীত অসম্ভূতির অনুভবে শুরু হয় প্রতিষেধের আর এক কোটি,—যা জড়বাদীর প্রতিষেধেরই অনুরূপ, অথচ তারও চেয়ে চূড়ান্ত, তার চেয়েও সর্বনাশা। তার উদাত্ত আহ্বান যে ব্যক্তি বা জাতির কানে বাজে,

সে মরণের নেশায় মাতাল হয়ে ঘর ছেড়ে ছোটে বনের পানে। এই প্রলয়ঙ্কর প্রতিষেধকেই আমরা বলেছি 'বৈরাগীর নেতি'।

বৌদ্ধধর্ম যেদিন হতে প্রাচীন আর্যজগতে নিয়ে এল বিক্ষোভের আলোড়ন, তার পর থেকে দু'হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের হৃদয়ে মন্দ্রিত হয়েছে মহাকালের ডমরুধ্বনি—জড়ের বিরুদ্ধে চিৎ করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা। কিন্তু মায়াবাদই যে ভারতীয় ভাবধারার সর্বস্ব, তা নয়; এ ছাড়াও এখানে ফুটেছে আরও কত দর্শন, সাধকহৃদয়ের আরও কত অভীপ্সা! দার্শনিক চরমপন্থীরাও যে জড় আর চিতের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চাননি, তাও নয়। কিন্তু নেতিবাদের করালছায়ায় সকল সাধনাই হয়ে গেছে পাণ্ডুর, সন্ন্যাসীর গৈরিকে রাঙা হয়েছে সবার মন। বৌদ্ধ কর্মবাদের—প্রতীত্য সমুৎপাদের অচেছদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে অস্তিত্বের সকল উল্লাস এবং তা হতে এসেছে বন্ধন ও মুক্তির দ্বিকোটিক বিরোধ—ভব-প্রত্যয়ে বন্ধন আর ভব-নিরোধে মুক্তি! তাই সকল সাধকের কণ্ঠে একমাত্র এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে সমস্বরে—'হেথা নয়, হেথা নয়,—অন্য কোন্ খানে': বৈকুণ্ঠ কোথায় এই দ্বৈতের রাজ্যে? শাশ্বত বৃন্দাবনের অন্তহীন রসোল্লাস, ব্রহ্মলোকে আত্মার অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দিব্যসম্ভোগ, প্রপঞ্চোপশম অনুপাখ্য মহানির্বাণে অহং বাসনা ও কর্মের আত্যন্তিক প্রলয় অথবা অলক্ষণ অব্যবহার্য আত্মপ্রত্যয়সার পরমার্থসতে সকল ভেদসত্তার নির্বাপণ—এ সমস্তই তো ওপারের অনুভব, এপারে তার কোথায় আভাস? কত শতাব্দীর ধারা বেয়ে চলেছেন উত্তরায়ণের অভিযাত্রী যত—ঋষি সাধু ও প্রবক্তার বিরাট জ্যোতির্বাহিনী—ভারতের স্মৃতি ও কল্পনায় দুর্মোচন বিদ্যুৎ-রেখায় জ্বলছে যাঁদের নাম ও রূপ, তার দু'কান ভরেছে তাঁদের এই অবিসম্বাদিত উত্তুঙ্গ আহ্বানমন্ত্রে—'বৈরাগ্যই বিজ্ঞানের একমাত্র পথ, অজ্ঞান যে সে-ই আঁকড়ে থাকে এই জড়ের মায়া! জন্মনিবৃত্তিতেই মানবজন্মের সার্থকতা! অতএব শোন চিৎস্বরূপের আহ্বান—তফাৎ হও জড়ের থেকে!'

সন্ন্যাসীর এই আহ্বানে সাড়া দেবার মত সমবেদনা আধুনিক মনে আর বেঁচে নাই; মনে হয় জগতের সর্বত্রই সন্ন্যাসীর যুগ ফুরিয়ে গেছে বা যেতে বসেছে। তাই এ যুগের মানুষ ভাবতে পারে: বৈরাগ্যের ধুয়া একটা পরিশ্রান্ত জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পরিচয় শুধু; একদিন সমগ্র মানব সভ্যতার বিপুল দায়কে সে বহন করেছে, মানুষের জ্ঞান ও কৃতির ভাণ্ডারে আহরণ করে এনেছে কত না বিচিত্র ঐশ্বর্য; আজ যদি তার ক্লান্ত হৃদয় সংসার হতে ছুটিই

চায়, সে কি দোষের!···কিন্তু আমরা দেখেছি, এই বৈরাগ্যও সত্তার একটা সত্যবিভাব—মানুষের প্রচেতনার চরম শিখরে স্ফুরিত হয় তার অপরোক্ষ অনুভবের চিন্ময়ী দীপ্তি। শুধু তাই নয়—মানুষের পূর্ণতা-সাধনারও অপরিহার্য অঙ্গ এই বৈরাগ্যের ভাবনা ; মানুষের বুদ্ধি ও প্রাণ-সংস্কার পাশবিকতার নাগ-পাশ হতে মুক্ত নয় যতক্ষণ, ততক্ষণ বৈরাগ্যের বিবিক্ত সাধনা যে জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর একথা অস্বীকার করি কী করে?

আমরা নেতি- বা নাস্তি-বাদী নই ; একটা বৃহত্তর পূর্ণতর ইতির সত্যে আমরা খুঁজি জীবনের সার্থকতা। ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ, 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—বেদান্তের এই মহাবাক্যকেই মেনেছে ; কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই আর একটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেয়নি সে। মানুষের অভীপ্সা লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের পানে ; কিন্তু দ্যুলোকের অভীপ্সাও যে নুয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে চির-আলিঙ্গনে বেঁধে নিতে তার চিন্ময়ী মায়াকে। এ দুটি আকূতির মিলন-রাগিণী ভারতীর বীণায় তেমন করে বেজে উঠল কই? চিৎ-স্বরূপের সত্যকেই বড় করেছে ভারত, কিন্তু মৃৎ-স্বরূপের তাৎপর্যকে তলিয়ে বোঝেনি। পরমার্থ-প্রত্যয়ের উত্তুঙ্গতায় সন্ন্যাসীর জন্মেছে পূর্ণ অধিকার, অথচ প্রাচীন বেদান্তীর মত তার পরিব্যাপ্ত সম্ভূতির পূর্ণতায় দখল জমেনি তাঁর।···কিন্তু নেতি ছেড়ে ইতির প্রশস্ততর ভূমিকায় খুঁজবো যখন সাধনার প্রতিষ্ঠা, তখনও চিন্ময়ী প্রেতির বর্ণ-হীন শুদ্ধ প্রকাশকে এতটুকু খাটো করলে চলবে না। জড়বাদও যেমন আজ দিব্য-পুরুষের দিব্য-ক্রতুর সাধন ; বৈরাগ্যবাদও যে একদিন তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাধন ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে অকপটে। জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে সংহরণ ও বর্জন করতে হবে ভবিষ্যতে, হয়তো বা ঘটাতে হবে তার আমূল রূপান্তর ; কিন্তু তবুও তার মাঝে যা-কিছু সত্য ও শ্রেয়স্কর বৃহৎ-সামের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে না। তেমনি আজ পিতৃ-রিক্থ যত ঊর্ণীকৃত বা বিকৃত হয়েই আমাদের হাতে আসুক, প্রাচীন আর্যসভ্যতার দায়াদরূপে তার গ্রহণ-বর্জনের দায়কে আমাদের নির্বাহ করতে হবে আরও সূক্ষ্মতর বিবেক নিয়েই।

# ৪

# সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

অসৎ-ই সে হয়ে যায় অসৎ বলে ব্রহ্মকে কেউ জানে যদি, ব্রহ্ম অস্তি-স্বরূপ এ যদি কেউ জানে, তাহলে সৎ বলেই তাকে যায় জানা।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

শুদ্ধচিৎ তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মাঝে; আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যখন, তখন সত্যের এমন একটা পরিপূর্ণ রূপ আবিষ্কার করতে হবে আমাদের, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁৎ সমন্বয়, যার মিলন মন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থন। কোথাও তাদের মূল্য হবে না ক্ষুণ্ন, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও হবে না ম্লান; স্বীকার করতে হবে,—দুয়েরই মূলে আছে এক মর্মসত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা; নইলে তাদের ভ্রান্তি বা অতিকৃতির মাঝেও কোথা হতে আসে স্পর্ধিত সামর্থ্যের অফুরন্ত জোগান? বস্তুত যেখানেই কোনও চরম উক্তি মন্ত্রশক্তির মত অভিভূত করে মানুষের মন, বুঝতে হবে তার পেছনে প্রচ্ছন্ন আছে—কোনও ভ্রান্তি কুসংস্কার বা কুহকের ছলনাই শুধু নয়; আছে কোনও পরম সত্যের দুর্নিরীক্ষ্য অথচ প্রচণ্ড দাবি যাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে আমাদের দণ্ড পেতেই হবে তার দরবারে। এই জন্যই চিৎ ও জড়ের মধ্যে যত আপোস-রফাই করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার কোনটাকেই আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি না, সমস্যা-সমাধানের একটা সহজ রাস্তা খুঁজে পাই না কোনমতেই। রফামাত্রেই একটা চুক্তি—দুটি বিরোধী শক্তির কলহে স্বার্থের বনিবনাও; তাকে সমন্বয় বলা চলে না কিছুতেই। সত্যিকার সমন্বয়ের মূলে আছে দুয়ের মাঝে একটা মন-জানা-জানির প্রেরণা, একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায় যার শেষ পরিণাম। অতএব চিৎ ও জড়ের মাঝেও সমন্বয়ী সত্যের সন্ধান পাব উভয়ের ঐক্যসাধনার চরম

নিবিড়তায় ; এবং সেই সত্যের অটল ভিত্তিতেই আমাদের গড়তে হবে ব্যক্তি-জীবনের অন্তরে বাইরে সমন্বয় সাধনার ইমারত।

বিশ্বচেতনাকে আমরা দেখেছি দুটি ভাবনার সন্ধিভূমি রূপে ; দেখেছি, এইখানে এসে চিতের কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিৎও হয় সত্য। কারণ বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার অন্তরিক্ষলোক—পরাবর-তত্ত্বের মাঝে সেতু যেন তারা। কিন্তু অহমিকাদুষ্ট প্রাকৃত-চিত্তে তারা দেখা দেয় সংভেদের হেতু হয়ে—একই অবিজ্ঞেয় পরমার্থ-সতের ইতি ও নেতি-মূলক দুটি বিভাবের মাঝে একটা কৃত্রিম কলহের তখন তারা উদ্যোক্তা। বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে মন জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে সেই একবিজ্ঞানের দীপ্তিতে, যা একের সত্যের সঙ্গে নানার সত্যকে মিলিয়ে উভয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে যোগাযোগের সূত্রটি। সেই আলোতেই দীপ্ত মনে ঘুচে যায় সকল দ্বিধা, বৃহৎ-সামের দিব্য-রাগিণী ঝঙ্কৃত হয় তার তারে-তারে ; সৌষম্যের রসে তৃপ্ত হয়ে পরমদেবতার সঙ্গে এই জীবনের চিরাকাঙিক্ষত চরম মিলনের সে তখন হয় দূতী। বিশ্বচেতনার আবেশে মননশক্তিতে সঞ্চা-রিত হয় অপরোক্ষ-অনুভবের বীর্য, ইন্দ্রিয় শক্তিতে আসে সূক্ষ্মদর্শনের দিব্য সামর্থ্য ; তারি ছটায় জড়ের স্ব-রূপ ফুটে ওঠে চিৎ-স্বরূপেরই ঘনবিগ্রহরূপে—তার আত্মবিভাবনী পরিব্যাপ্তিরূপে। আবার সেই দিব্য সাধনসম্পদের আনুকূল্যে চিৎ-ও দেখা দেয় জড়েরই আত্মভূত সত্য ও সারতত্ত্ব হয়ে। পরস্পরকে স্বীকার করতে তখন আর তাদের কোনও বাধা থাকে না, উভয়েই তখন উভয়কে জানে দিব্য, বাস্তব এবং একাত্মসার বলে। চেতনার সেই দীপনীতে মন আর প্রাণ যুগপৎ প্রকাশ পায় পরাসংবিতের রূপায়ণ ও সাধনরূপে—যাদের দিয়ে নিজকে তিনি ছড়িয়ে দেন রূপে রূপে জড়বিগ্রহের গহন গুহায়, আবার সেই বিগ্রহে থেকেই বহুধাবিকীর্ণ তাঁর চিৎকেন্দ্রের কাছে নিজকে করেন অনাবৃত। পরমার্থসতের যে আত্মরূপায়ণ বিশ্বরূপে, তার অখণ্ড সত্যকে ধারণ করবার স্বচ্ছতা যদি পায় মনের মুকুর, তবেই তার নিজকে পাবার তপস্যা হয় সার্থক। বিশ্বসত্তার নিত্যনবীন রূপোচ্ছ্বাসে ব্রহ্মের পরিপূর্ণ রূপায়ণের যে আয়োজন, তারি মাঝে সকল শক্তি ঢালে যখন চেতন প্রাণ, তখনই তার সিদ্ধি।

এমনি করে ভাবলে পরে এই মর্ত্যেরই বুকে দেখতে পাই দিব্য-জীবনের একটা সত্য সম্ভাবনা। তার মধ্যে বিশ্ব- ও পার্থিব-পরিণামের একটা

সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও জীবন্ত ব্যঞ্জনার আবিষ্কারে একদিকে যেমন মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার সার্থকতা হবে সপ্রমাণ, তেমনি আর একদিকে জীবভাবের দিব্য-ভাবে রূপান্তরে সিদ্ধ হবে তার আধ্যাত্মিক আদর্শের সকল আকূতি।

কিন্তু যে অশব্দ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ আত্মারাম, বৈরাগীর বিবিক্ত জীবনের পরম পুরুষার্থ, আমরা কি তাঁকে স্বীকার করব না? এখানেও দুস্তর বৈষম্যে নয়—কিন্তু সৌষম্যের সহজ সত্যেই দীপ্ত করতে হবে আমাদের চেতনা। নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্ব নিরাকৃত আর সগুণ ব্রহ্মে স্বীকৃত সুতরাং এ দুটি বিবিক্ত বিরুদ্ধ ও বিষম দুটি তত্ত্ব—এ ধারণা সত্য নয়। বস্তুত সগুণ এবং নির্গুণ এক পূর্ণ ব্রহ্মেরই ইতি এবং নেতি-ভাব মাত্র—তাদের একটি দাঁড়াতেই পারে না আর একটিকে ছেড়ে। অশব্দ নির্গুণ যিনি, তাঁর থেকেই তো বিশ্বজননী পরা-বাকের শাশ্বতী প্রবৃত্তি, কারণ অশব্দের মধ্যে গূঢ়োত্মা হয়ে রয়েছে যা, বাক্ তারি ব্যঞ্জনা মাত্র। এই শাশ্বত নৈষ্কর্ম্য আছে বলেই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে স্ফুরিত হচেছ্ তাঁর শাশ্বত 'দিব্যকর্মের' পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও অকুণ্ঠিত ঈশনা। তাঁর দিব্য সম্ভূতিতে রয়েছে যে বিপুল বীর্য, বৈচিত্র্য ও সৌষম্যের যে অন্তহীন সামর্থ্য, তার প্রৈতি আসে—স্বয়ং অপরিণামী হয়েও যে তিনি অফুরন্ত বিসৃষ্টির নিরপেক্ষ ভর্তা ও অনুমন্তা, সেই তাঁর অবিকৃত-পরিণামের দিব্য-মায়া হতেই।

মানুষের জীবনেও সিদ্ধির পূর্ণতা আসে এমনি করেই—যখন তার অন্তরে থাকে ব্রহ্মীভূত চেতনার পরম নৈষ্কর্ম্য ও প্রশান্তি অথচ তা হতেই উচছ্সিত হয় অফুরন্ত কর্মের স্বাতন্ত্র্য—ব্রহ্মেরই মত প্রশান্ত আনন্দের স্বচছন্দ অনুমোদনে। নিজের মধ্যে যারা খুঁজে পেয়েছে এই প্রশান্তির নির্ঝর, তারা দেখতে পায় বিশ্বকর্মে ক্ষয়হীন শক্তির জোগান উৎসারিত হচেছ্ তারি অমেয় নৈঃশব্দ্য হতে। অতএব বিশ্বস্পন্দের নিরাকরণ বা নিরোধই অশব্দ-স্বভাবের সত্য, এ ধারণা ঠিক নয়। কর্মে ও নৈষ্কর্ম্যে আপাত বৈষম্যের অনুভব সঙ্কুচিত মনের একটা ভ্রান্তি মাত্র। ব্যবহারিক জীবনে ইতি-নেতির অপরিহার্য দ্বন্দ্বে অভ্যস্ত মন যখন হঠাৎ অনুভবের অবর কোটি হতে উত্তীর্ণ হয় পরমকোটিতে, তখন সম্ভূতি-সংবিতের বীর্যময় উদার ব্যাপ্তিতে দুটিকেই জড়িয়ে নেবার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলে। যিনি অশব্দ, বিশ্বের ভর্তা তিনি—নিরাকর্তা নন। অথবা কর্মপ্রবৃত্তি এবং কর্মনিবৃত্তি উভয়কেই ধরে আছেন তিনি নিষ্পক্ষ হয়ে। যোগস্থ জীব যখন কর্মরত হয়েও অন্তরে থাকে শুদ্ধ ও অবন্ধন, তখন তার এই স্বভাবস্থিতিতেও আছে তাঁর পরিপূর্ণ সায়।

কিন্তু তার পরেও তো আছে অত্যন্ত-নিবৃত্তি বা অসতের কল্পনা। উপনিষদ বলছেন—'অসৎই ছিল এসব আগে, অসৎ হতেই তো সতের জন্ম।' অতএব যা-কিছু হয়েছে, অসতেরই মাঝে আবার তা তলিয়ে যাবে। অন্তহীন অব্যাকৃত সৎস্বরূপ হতে যদি সম্ভবও হয় বহুধা-বিভূতির ব্যাকৃতি, তাহলেও কি বাস্তব বিশ্বের সকল সম্ভাবনাই প্রতিষিদ্ধ ও নিরাকৃত হচেছ না অসৎ দ্বারা—কেননা অসৎ যে সতেরও প্রাগ্‌ভাবী অনাদি পরমার্থ তত্ত্ব?…এযুক্তিতে, বৈনাশিক বৌদ্ধের শূন্যবাদই হবে বৈরাগীর রুচিসম্মত সিদ্ধান্ত; অহংএর মত আত্মাও তখন হবে অতাত্ত্বিক বিজ্ঞান-সন্তানের একটা বিকল্পনা শুধু।

কিন্তু এও তো কেবল কথার প্যাচে পথ খোয়ানো! সঙ্কীর্ণ আমাদের চিত্ত, তারি মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে অপরিহার্য-বিরোধের সংস্কার; তাকে সে চাপায় চরম সত্যেরও বিবৃতিতে—নির্দ্বন্দ্ব অনুভূতিতেও কথার দ্বন্দ্বকে তোলে জাঁকিয়ে। তাই তার তর্জমায় অতিমানস অনুভবও হয়ে ওঠে দুস্তর বিরোধের কন্টক-শয়ন। বস্তুত অসৎ একটা কথার কথা—একটা বিকল্প শুধু। যখন তলিয়ে বুঝতে যাই 'অসৎ' শব্দের মূলে কোনও বস্তু আছে কি না, তখন দেখি, শাশ্বত আত্মাকে মনের বিকল্প বলতে পারি যে-যুক্তিতে, সে-যুক্তি তো অসতের বেলাতেও খাটে। বাস্তবিক অসৎ বা 'কিছু-না' বলতে আমরা বুঝি এমন একটা কিছু—যা এই জগতের জ্ঞান বা কল্পনার মাপে বস্তু-সত্তার যে সূক্ষ্মতম নির্বিশেষ অনুভব ও শুদ্ধতম ধারণা তাকেও গেছে ছাড়িয়ে। তাহলে 'কিছু-না'র অর্থ হল 'এমন কিছু'—আমাদের ধারণা দিয়ে ইতি হয় না যার। এমনি করে সমস্ত ইতি-কার হতে অত্যন্ত-ব্যাবৃত্ত সর্ব-শূন্যের একটা বিকল্পকে আমরা খাড়া করেছি—অনুভবের সকল সীমা ও স্বরূপের বিশিষ্ট চেতনাকে পেরিয়ে যাব বলেই। দাশনিকের শূন্যবাদকে যাচাই করলে বোঝা যায়, শূন্য আসলে পূর্ণেরই নামান্তর,—'কিছু-না' 'সবকিছু'রই আর এক পিঠ। মন অভ্যস্ত সান্তের ধারণায়, তাই অনন্ত তার কাছে অনির্বচনীয় অতএব ফাঁকা। অথচ সত্যি বলতে এই 'অসৎ'ই কিন্তু একমাত্র সত্যিকার 'সৎ'।*

* একটি উপনিষদে আছে, 'অসৎ হতে কী করে হবে সতের উৎপত্তি? সৎ তো সৎ হতেই জন্মাতে পারে শুধু।' কিন্তু অসৎ বলতে একান্ত-অবাস্তব শূন্যতা না বুঝে যদি বুঝি সত্তা-সম্পর্কে আমাদের অনুভব বা ধারণার অতীত একটা অনির্বচনীয় তত্ত্ব, তাহলে উপনিষদ-কল্পিত অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন মোটেই ওঠে না। অসৎকে তখন বলতে পারি অদ্বৈতবেদান্তীর নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা বৌদ্ধের শূন্য। এই 'তৎ'-স্বরূপ অসৎ হতে বিবর্ত্ত বা পরিণামের মায়ায় কিংবা আ-ভাস বা আত্মবিসৃষ্টির বশে সতের আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

# সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

যখন বলি অসৎ হতে সতের আবির্ভাব, তখন কিন্তু কালাতীতকে আমরা লাঞ্ছিত করি কালের বিশেষণে। এও আমাদের মনের একটা বিকল্প-মাত্র, কারণ অসতের বুকে সতের জন্ম হল যে পরম-ক্ষণে, অথবা যে কাল-মুহূর্তে অবাস্তব সতের প্রলয় হল শাশ্বত শূন্যের করাল গহ্বরে, সে দুটি মহালগ্নের সন্ধান মিলবে কার পাঁজিতে ? সৎ আর অসৎকে গাঁথতেই যদি হয় অন্যোন্য-সম্বন্ধের সূত্রে, তাহলে দুয়ের যৌগপদ্য না মেনে তো উপায় নাই। পরস্পরকে তারা বইতে পারে কিন্তু সইতে পারে না ; আবার কালের ভাষায় বলতে গেলে উভয়েই তারা শাশ্বত। কিন্তু সৎ যদি শাশ্বতই হয়, তাহলে 'তত্ত্বত সৎ নাই, আছে শুধু শাশ্বত অসৎ,' এ কথার অর্থ হয় কোনও ? এমনি করে সর্বনাশের অতলে সকল অনুভব তলিয়ে দিলে তার তত্ত্ব আবার কোথায় পাব ?

অতএব মানতে হবে পরমার্থসৎ স্বরূপত অবিজ্ঞেয়। বিশ্বসম্ভূতির স্ব-তন্ত্র অধিষ্ঠান রূপে নিজকে যখন কলিত করেন তিনি, তখন তাঁকে বলি সৎ-স্বরূপ' : আর বিশ্বের সম্ভূতি হতে নির্মুক্ত তাঁর পরম স্বাতন্ত্র্যকেই বলি তার 'অসৎ-রূপ'। এই শেষের স্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝি : বিশ্বের মাঝে থেকেই তাঁর স্বরূপ সত্তা বুঝতে গিয়ে, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তুরীয় হতেও তুরীয় যত নিরু-পাধিক ইতিকারের ভাবনাই করুক না কেউ—তাকেও গেছে ছাড়িয়ে তাঁর অতিমুক্তি। অথচ ইতিকার দিয়ে তাঁর স্বরূপের সত্য ভাবনা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু কোনও ইতিকারের বেষ্টনীতেই বাঁধা পড়েন না, অন্তহীন ইতি-তেও ফুরিয়ে যান না, তাই তো তিনি 'অসৎ'। আবার সেই অসৎ হতেই উথলে ওঠে সৎ, নৈঃশব্দ্য হতে যেমন ঝরে লীলার ধারা। এমনি করে ইতি আর নেতির সমাহারে অন্যোন্যসম্বন্ধই সূচিত হয় পরিপূরকের মত—অন্যোন্য-অভাব নয়। তাই প্রবুদ্ধ জীবচেতনায় আত্মসংবিতের তত্ত্বরূপ ফুটে ওঠে তুর্যাতীতের অবিজ্ঞেয় ভূমিকাতেই—পরাসংবিতের অসমোর্ধ্ব অনুভবে মিটে যায় ইতি ও নেতির দ্বন্দ্ব। সম্যক-সম্বোধিতে এ সৌষম্য সম্ভব বলেই বুদ্ধদেব লোকোত্তর নির্বাণপদে আরূঢ় থেকেও কর্মের প্রচণ্ড আন্দোলন তুলেছিলেন জগতে, অন্তশ্চেতনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়েও সার্থক ব্রতের উদ্‌যাপনে ব্যক্তিচেতনার চরম চমৎকার দেখিয়ে গেছেন পৃথিবীতে।

বাস্তবিক অনুভবের জগতেও 'বাগ্ বৈখরী শব্দঝরীর' কী যে জুলুম ! সত্যদৃষ্টি ফোটে যখন, তখন দেখি এই জুলুমের পিছনে লুকিয়ে আছে কী

যে গভীর ভাবের দৈন্য, চুলচেরা সূক্ষ্মতার অজুহাতে মূঢ়বুদ্ধির কত যে বঞ্চনা। এই যে ব্রহ্মের 'পরেও আমরা আরোপ করি ইতি-নেতির যত লাঞ্ছন, তাতে প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তি-মনেরই অনুভবের সঙ্কীর্ণতা। অবিজ্ঞেয়ের একটি বিভাব যদি সে আঁকড়ে ধরে ইতি দিয়ে, অমনি আর সব বিভাব মুড়িয়ে বা উড়িয়ে দিতে চায় নেতির ঝটকায়। নির্বিশেষের যে-কোনও অনুভব বা ধারণাকে আমরা তর্জমা করি ব্যক্তিগত বিশেষণের রং মাখিয়ে। 'এক-, মেবাদ্বিতীয়ম্'-এর তত্ত্বই যখন প্রচার করি জোর গলায়, উগ্র অহঙ্কারে তখনও অপরের খণ্ডদর্শন ও ক্লিষ্ট মতের বিরুদ্ধে ঝেঁটিয়ে তুলি নিজেরই অসম্যক অনুভব ও মতুয়ার বুদ্ধির ধুলো। তার চেয়ে ভাল নয় কি সহিষ্ণু হয়ে শিক্ষার্থীর বিনয় নিয়ে অনুভবের পুঁজি বাড়ানো ? ভাষাতীতকে যখন ভাষায় রূপ দিতেই হবে আমাদের, আর কিছু না হোক্ অন্তত নিজকে ভরিয়ে তুল-বার জন্যেই,—তখন কেন সবার চেয়ে বৃহৎ স্বচ্ছন্দ ও উদার হবেনা তাঁর পরিচিতির সকল বাণী, যাতে তারি মাঝে রণিত হয়ে ওঠে বৃহৎসামের বিপুল মূর্চ্ছনা ?

তাই আমরা স্বীকার করি, ব্যক্তিচেতনা এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারে যেখানে অব্যক্তে লীন হয়ে যায় সব ব্যবহার ;—এমন কি আত্মার সংজ্ঞাও একটা বিকল্পনা সে ভূমিতে। নৈঃশব্দ্যের ওপারে, গহনতর নৈঃশব্দ্যে, 'আদিত্যের কৃষ্ণরূপকে ছাড়িয়ে পরঃকৃষ্ণরূপে'ও অবগাহন চলতে পারে। কিন্তু এতেই কি আমাদের অনুভবের পূর্ণ ও চরম চরিতার্থতা—শুধু বিনাশের সত্যেই কি মিথ্যা হয়ে যাবে সম্ভূতির সত্য ? আমরা জানি, আত্মার এই পরিনির্বাণে অন্তরে নেমে আসে পরাশান্তি ও প্রমুক্তির যে বিপুল প্রবাহ, স্বচ্ছন্দেই সে উৎসারিত এবং যুক্ত হতে পারে ব্যবহারিক জীবনের কামনাহীন অথচ বীর্যময় কর্মে। স্পন্দহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় এবং প্রশান্তির রিক্ততায় নিজের মাঝে অবিচল থেকে শীল সত্য ও প্রীতির শাশ্বত ছন্দে বাইরের জগৎকে দুলিয়ে দেওয়া—সম্ভবত বুদ্ধের ধর্মচক্রের এই ছিল মূল প্রবৃত্তি। কারণ, এ-আদর্শের মূলে আছে অহং হতে ব্যক্তিগত কর্মের শৃঙ্খল হতে, ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের অভিনিবেশ হতে প্রমুক্তির প্রেরণা—শুধু স্থূল দেহ-ধারণের দুঃখ ও দৌর্মনস্য হতে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবার হীনবুদ্ধি নয়। আসল কথা, সিদ্ধ-পুরুষের জীবনে যেমন ঝঙ্কৃত হবে নৈঃশব্দ্যের গীতি-স্পন্দ, পূর্ণচেতন জীবও তেমনি ফিরে যাবে অসম্ভূতির নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে, কিন্তু বিশ্বসম্ভূতির ছন্দদোলাকে সে ভুলবে না তা বলে।

এমনি করে চলবে তার মাঝে দিব্য-পুরুষের দৈবী মায়ার অন্তহীন আবর্তন, যে মায়ার উল্লাসে বিশ্বে থেকেও বিশ্বকে এমন কি আপনাকেও ছাড়িয়ে যান তিনি। কিন্তু বিনাশের অনুভব তার বিপরীত ; তাতে আছে শুধু অসতের পানে ব্যক্তি-মনের একাগ্র ভাবনা। তার ফলে কেবল ব্যক্তিরই বিস্মৃতি এবং নিবৃত্তি ঘটে বিশ্বস্পন্দ হতে, কিন্তু পরমার্থসতের শাশ্বত চেতনায় বিশ্বের মহারাস তেমনি অক্ষুণ্ণ আনন্দেই চলে লীলায়িত হয়ে।

এমনি করে বিশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনায় পাই সকল ইতি ও নেতির পরম সমন্বয়। ইতিবাদ দিয়ে আমরা অবিজ্ঞেয়ের স্থিতি বা স্পন্দকেই চাই প্রকাশ করতে ; এবং নেতিবাদ দিয়ে বোঝাতে চাই সেই স্থিতি বা স্পন্দে অনুস্যূত অথবা তা হতে নির্মুক্ত তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য। যাঁকে বলি অবিজ্ঞেয়, একান্ত-অসৎ তো নন তিনি ; অথচ সৎস্বরূপ হয়েও অনিরুক্ত পরম আশ্চর্য তিনি আমাদের কাছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে এই চেতনায় বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়েও প্রতিমুহূর্তেই তিনি সেই রূপায়ণের— 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ !' তার এই লুকোচুরিকে তো নষ্টামি বলতে পারি না,— বলতে পারি না খেয়ালী 'মায়াবী'র মত প্রতিপদেই তিনি শুধু বঞ্চনার ঘোর ঘনিয়ে তুলছেন এই জগতে। কিন্তু তাঁকে বলব, পরম 'মায়ী' ; সত্যের উত্তরায়ণে এই মর্ত্য-চেতনারই চিন্ময় দিশারী তিনি, নিয়ে চলেছেন সেই মহাবিষুবের উত্তরবিন্দুতে, যেখান হতে শুরু হল আদিত্য-দীপ্তির লোকোত্তর অভিযান। চিন্ময় বস্তুসৎরূপেই ব্রহ্ম সর্বগত,—দুরপনেয় বিভ্রমের সর্বগত নিমিত্ত তিনি নন।

ইতি-বাদের 'পরেই যদি সৌষম্যের ভিত্তি গড়তে চাই এমনি করে, ( এছাড়া কী-ই বা হতে পারত সৌষম্যের আধার ? )—তাহলে অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের সম্পর্কে যত ভাবনা বা সঙ্কল্পনা, মনের মাঝে তাদের সবাইকে ঠাঁই দিতে হবে অবিরোধে—বাস্তব জীবনের 'পরে প্রভাবকে তাদের মেনে নিয়ে। কারণ তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে অধরাকে ধরবার একটা অকৃত্রিম প্রয়াস, অবর্ণনীয়ের একটা সত্যিকার বর্ণবিভূতি ; তাই তাদের যে-কোনও একটিকে বিবিক্ত বা ঐকান্তিক প্রাধান্য দিয়ে আর সবাইকে ছেঁটে ফেললে কি দাবিয়ে রাখলে চলবে না। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দর্শনই সত্যিকার অদ্বৈতদর্শন ; তার মাঝে অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বকে সত্য-অনৃত, ব্রহ্ম-অব্রহ্ম, আত্মা-অনাত্মা, আত্মবস্তু আর অবস্তু অথচ শাশ্বত মায়া—এমনিতর বিরুদ্ধ তত্ত্বে ভাগা-

ভাগি করবার কথাই ওঠে না। একমাত্র আত্মাই আছেন এই যদি সত্য হয়, তাহলে এও সত্য যে যা-কিছু দেখছি সমস্তই আত্মা। আত্মা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে যদি স্বয়ংপ্রজ্ঞ ও সর্বময় বলে জানি, যদি তাঁকে অনীশ্বর খিল-বীর্য কঞ্চুকাবৃত পুরুষ বলে না মনে করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁর এই বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আছে একটা সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক হেতু-প্রত্যয়। তখন সেই হেতুকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাই হবে মানুষের পুরুষার্থ; তারি জন্যে, এই বিসৃষ্টির মূলে যে রয়েছে প্রজ্ঞা বীর্য ও স্বভাব-সত্যেরই একটা প্রৈতি—এই কথা মেনেই সত্যের সন্ধানে আমরা এগিয়ে যাব। জগতে বৈষম্য আছে, অনর্থ আছে কোথাও-কোথাও, একথা মানতে আপত্তি নাই আপাতত। কিন্তু মানুষ হয়ে কী করে হার মানব তাদের কাছে? মানুষের অন্তরতম সহজবুদ্ধি এই বিশ্ব-বিসৃষ্টির মূলে চিরকাল খুঁজে এসেছে এক দিব্যকবির মনীষা—শাশ্বত বিভ্রমের ছলনা নয়, এক নিগূঢ় কল্যাণশক্তিরই চরম অভ্যুদয়—সর্বপ্রসবিনী অনর্থ-সন্ততির অচল প্রতিষ্ঠা নয়, এক সর্বজয়া মহাশক্তিরই পরমা সিদ্ধি—উত্তরায়ণের অভিযান হতে ব্যর্থকাম জীবের অবসন্ন পরাবর্তন নয়। তার এই আশা ও এষণাকে কি বলব মূঢ়তা?

অদ্বিতীয় পরমার্থসতের বাইরে কিছুই যখন থাকতে পারে না, তখন বহিরঙ্গ কোনও শক্তির জোর খাটে কি তাঁর 'পরে, কোনও পরবশতায় কি ক্ষুণ্ন হতে পারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য? একথাও তো বলা চলে না যে তাঁর অখণ্ড সত্তার একদেশে আছে এমন একটা বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ, যার কাছে অনিচ্ছা-তেই হার মানতে হয় তাঁকে, তাকে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন না তিনি। কারণ একথা বললে সর্বময়ের সঙ্গে তাঁরি বাইরের একটা-কিছুর বিরোধকে যুক্তিযুক্ত বলে মানতে হয় প্রকারান্তরে। যদি বলি: বিশ্বে যা-কিছু ঘটছে আত্মা তার সম্পূর্ণ নিষ্পক্ষ উপদ্রষ্টা শুধু, যা ভূত এবং ভব্য তিনি তাদের ঈশান নন, কেবল ভ্রূক্ষেপহীন ঔদাসীন্যে চেয়ে আছেন তাদের পানে এবং তাতেই বিশ্ব চলছে; তাহলেও মানতে হবে—এই বিসৃষ্টির মূলে আছে কারও সঙ্কল্প, কারও বিধৃতি,—নইলে শুধু যদৃচ্ছার বশে এ চলছে কেমন করে? কিন্তু ব্রহ্ম সর্বময় হলে এই সঙ্কল্প ও বিধৃতি আর কারও হতে পারে না তাঁর ছাড়া। অখণ্ড ব্রহ্ম বিশ্বে আছেন সর্বগত হয়ে; অতএব যা-কিছু সঙ্কল্পের খেলা তার মাঝে, মূলত তা ব্রহ্মসঙ্কল্পেরই প্রবেগ হতে জাত। বিশ্বের আপাতিক অনর্থ অজ্ঞান ও দুঃখে ত্রস্ত এবং পরাহত হয়েই আমাদের

খণ্ডচেতনা মনে করে—এই সর্বনাশা বিপত্তির দায় হতে ব্রহ্মকেও অব্যাহতি না দিলে বুঝি চলে না ; তাই জগতের আঁধার দিকটার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতে তার দরকার হয় শিব-সঙ্কল্পের বিরোধী মায়া, যার শয়তান বা অহ্রিমনের মত একটা স্বয়ম্ভূ অশিব-শক্তির কারসাজি। কিন্তু এ কল্পনাও মনের মায়া শুধু, কেননা তত্ত্বত এক অখণ্ড পরমাত্মাই আছেন মহেশ্বররূপে—বহু তাঁরি প্রতীক এবং বিভূতি মাত্র।

জগৎ যদি স্বপ্ন বিভ্রম বা ভ্রান্তিও হয়, তবু এ স্বপ্নের মূলে আছে অখণ্ড আত্মস্বরূপেরই সঙ্কল্প এবং প্রৈতি ; শুধু তাই নয়, সে স্বপ্নকে নিত্য ধারণ ও চরিতার্থও করছেন তিনিই। তাছাড়া পরমার্থসতের মধ্যেই তো এ স্বপ্নের বাস্তব বিলাস, তিনিই তো স্বরূপ-ধাতু এর ; কারণ ব্রহ্ম যেমন জগতের আধার এবং অধিষ্ঠান, তেমনি তার উপাদানও তো তিনিই। যে-সোনা দিয়ে পাত্র হল, সে-সোনা যদি সত্য হয়, পাত্রটা তাহলে কী করে হয় মরীচিকা ? বস্তুত 'স্বপ্ন', 'বিভ্রম' এসব শুধু কথার মারপ্যাঁচ বা আমাদের খণ্ডিত চেতনার সংস্কারমাত্র ; কিছু সত্য তাদের মাঝে আছে এবং তার গুরুত্বও কম নয়, তবুও সত্যের প্রকাশকে বিকৃত করেছে তারা। যেমন 'অসৎ' শুধু অর্থক্রিয়াকারিতা-শূন্য নাস্তিত্ব নয়, তেমনি স্বপ্নও শুধু মনের বিভ্রম বা কুহক নয়। প্রতিভাস সত্যেরই বাস্তব রূপায়ণ, অবাস্তব মরীচিকা নয় শুধু।

অতএব এক সর্বগত পরমার্থসতের স্বীকৃতি নিয়ে হল আমাদের এষণার শুরু। এই পরমার্থের এক কোটিতে অসৎ, আর এক কোটিতে বিশ্ব, কিন্তু দুয়ের মাঝে মারাত্মক বিরোধ নাই কোনও ; বরং তারা একই তত্ত্বের দুটি বিভাব মাত্র—নেতি আর ইতির আকারে। বিশ্বে এই পরমার্থসতের সর্বোত্তম অনুভবে ফোটে তাঁর চিন্ময় সত্তাই নয় শুধু—ফোটে তাঁর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও বীর্যের ঐশ্বর্য, তাঁর স্বয়ম্ভূ আনন্দের বিলাস ; আবার বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবে জাগে তাঁর অ-বিজ্ঞেয় সদ্ভাব, অনির্বচনীয় পরমানন্দের মূর্ছনা। তাই ইন্দ্রিয়বোধের আশ্রিত একদেশী বৃত্তি দিয়ে নয়, প্রমুক্ত বুদ্ধির অখণ্ড অপরোক্ষ বৃত্তি দিয়ে যদি অনুভব করি বিশ্বের দ্বৈতলীলা, তবে তারও মধ্যে যে সচ্চিদানন্দের লোকোত্তর মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করব, আমাদের এ সঙ্কল্পনা অসঙ্গত নয়। যতক্ষণ দ্বৈতের চাপে বুদ্ধি থাকবে ভারাক্রান্ত ততক্ষণ এই দিব্য অনুভবের সম্ভাবনাকে শুধু শ্রদ্ধায় আমরা লালন করব বটে, কিন্তু তবু জানব সে শ্রদ্ধার পিছনে আছে বুদ্ধিযোগেরই দীপ্তি এবং সংস্কারমুক্ত সর্বতোদর্শী বিচারের অকুণ্ঠ সমর্থন।

এই শ্রদ্ধার অবদানই হল উত্তরায়ণের যাত্রাপথে মানুষের প্রথম দিশারী; কিন্তু অধ্যাত্ম-পরিণামের ফলে একদিন এমন ভূমিতে পৌঁছাবে সে, যেখানে শ্রদ্ধা ধরবে অখণ্ড অনুভব ও বিজ্ঞানের রূপ এবং পূর্ণ-প্রজ্ঞার মাঝে সার্থক হবে তার লীলায়ন।

৫

# জীবের নিয়তি

অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে করে সম্ভোগ ;...বিনাশ দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা সম্ভূতি দ্বারা অমৃতকে করে সম্ভোগ।

—ঈশ উপনিষদ ( ১১,১৪ )

বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বসত্তা সবিশেষ-নির্বিশেষ, সকায়-অকায়, সজীব-নির্জীব, সচেতন বা অচেতন যা-ই হোক্ না কেন, এক সর্বগত পরমার্থ-সৎই যে তার মর্মসত্য—এই শ্রদ্ধাই আমাদের প্রচেতনার ভিত্তি। ব্যবহারিক জীবনের নিত্যপরিচিত নানা দ্বন্দ্ব হতে শুরু করে মার্জিত বুদ্ধির যে সূক্ষ্মতম দ্বন্দ্ব অসীমের অনির্বচনীয় রহস্যের কূলে এসে এলিয়ে যায়, সে-সবারই মাঝে আছে পরমার্থ সতেরই অনন্তবিচিত্র আত্মরূপায়ণের লীলা ; অথচ নিত্য-উপচিত এই বিরোধাভাসের মাঝেও তিনি অখণ্ড, অবিভাজ্য, পরম এক—শুধু বহুর সমষ্টি বা সমাহার তিনি নন। সেই অখণ্ড সত্তা হতেই এই বিচিত্র বিভূতির উদ্ভব, তাঁতেই তারা লীলায়িত, পরিণামে তাদের প্রলয়ও তাঁরি মাঝে। তাঁর সম্পর্কে সর্ববিধ ইতির প্রতিষেধ আমাদের নিয়ে যায় তাঁরি অনুত্তরা পরমা স্বীকৃতির পানে। 'অরা নাভাবিব'—চক্রের নাভিতে অরের মত বিরুদ্ধপ্রত্যয়ের সকল দ্বন্দ্ব সমাহিত হয় অখণ্ড সত্যেরই পরম প্রত্যয়ে ; প্রত্যয়ের আপাত-বৈষম্যে ফুটে ওঠে একই সত্যের বিভূতি-ভেদ শুধু—অন্যোন্যদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তারা খুঁজে পায় অন্যোন্যসঙ্গমেরই পথ। ব্রহ্মই নিখিলের আদি এবং অবসান,—ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু এই একত্ব স্বরূপত অনির্বচনীয়। মন দিয়ে যখন তার নাগাল পেতে চাই, তখন বিচিত্র ধারণা ও অনুভবের অন্তহীন পরম্পরার ভিতর দিয়েই রচতে হয় আমাদের মানস-অভিসারের পথ। কিন্তু যাত্রাশেষে সত্যধৃতির চরম ব্যাপ্তি ও অনুভবের সর্বাবগাহী বিস্তারকেও আমাদের লাঙ্ঘিত করতে হয়

'নেতি'-বাচন দ্বারা—শুধু এই প্রত্যয়কে ব্যক্ত করতে যে, পরমার্থসৎ সকল বিশেষণের অতীত। উপনিষদের ঋষির মতই তখন আমাদের বলতে হয়—'নেতি—নেতি' : এমন কোনও অনুভব আমাদের সম্ভব নয়, ব্রহ্ম হবেন যার কবলিত ; এমন কোনও ধারণা আমাদের নাই, যা দিয়ে তাঁকে করব বিশেষিত।

পরম-সত্যের বেলায় এই হতে পারে মনের চরম রায় : বস্তু-সৎ স্বরূপত অজ্ঞেয় ; আমাদের কাছে সে শুধু ধরা পড়ে সত্তার বিচিত্র বিভাব ও পর্যায়ে, চেতনার বিচিত্র রূপায়নে, শক্তির বিচিত্র উল্লাসে। অথচ এই বস্তু-সৎ শুধু যে আমাদের স্বরূপ-ধাতু তা নয়, বুদ্ধি- এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল কিছুতেই আমরা পাই তারি অনুভব। সত্তা, চেতনা ও শক্তির এই বিচিত্র বিভূতি দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, তাদের আশ্রয় করেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে সেই অজানার অভিসারে। অধরাকে ধরে আপন মুঠোয় রাখবে বন্দী করে, অনন্তকে বাঁধবে সান্তের ব্যাকুল আলিঙ্গনে—এমন একটা ব্যগ্রতা আছে মানুষের মনে। তারি প্ররোচনায়, পরমার্থের অনুত্তর সত্তার একটি বিশিষ্ট বিভাবকেই শাশ্বত-নিরঞ্জন জ্ঞানে যদি সে দেয় স্বরূপ সত্যের আসন ; তার যে-কোনও বিশিষ্ট পর্যায় বা ধর্মে ব্যাপ্তির যত ঔদার্যই থাকুক, তাকেই সত্যের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে যদি ধরে নেয় ; চেতনার যে-কোনও বিশিষ্ট রূপায়ন যত বিপুল ব্যঞ্জনারই বাহন হোক্, তাকেই যদি দেয় অখণ্ড চিৎস্বরূপের মর্যাদা ; শক্তির যে-কোনও স্ফুরণ অমেয় সামর্থ্যের বিলাস সত্ত্বেও তার দৃষ্টিকে যদি করে সঙ্কীর্ণ ; এমনি করে পরমার্থ-সতের একটি বিভাবকেই একান্ত করে তুলে আর সকল বিভাবের প্রতি যদি সে হয় অন্ধ ;—তাহলে অবিজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের কোঠায় নামিয়ে এনে মানুষের মন তাঁর অপ্রতর্ক্য মহিমাকেই করে খর্ব এবং তার ফলে সে পৌঁছায় অখণ্ডেরই খণ্ডবোধে শুধু—একবিজ্ঞানের পরম সত্যে নয়।

পরমার্থ-সৎ সকল বিশেষণের অতীত, এ-প্রত্যয় প্রাচীন বৈদান্তিক ঋষিদের দর্শনে এতই নিরূঢ় ছিল যে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অপরোক্ষ অনুভবকে তৎপদার্থের স্বরূপখ্যাতি বা 'ইতি'-রূপের চরম ভাবনা বলে ঘোষণা করেও থেমে যাননি তাঁরা। তারও পরে, বিকল্পবৃত্তি দিয়েই হোক্ অথবা সাক্ষাৎ অনুভব দিয়েই হোক্, সতেরও ওপারে স্থাপন করেছেন তাঁরা এক 'অসৎ', এক চরম ও পরম প্রতিষেধ—যা আমাদের তুরীয়-প্রত্যয়-গ্রাহ্য পর-সৎ, শুদ্ধ-চিৎ ও অনন্ত আনন্দেরও উজানে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আমাদের সকল অনুভবের উৎস ও পর্যবসান ; কিন্তু ঋষির 'অসৎ' তাকেও গেছে পেরিয়ে।

তার অনুভব বস্তুতই অনির্বচনীয়। যদি সৎ চিৎ অথবা আনন্দই বলতে হয় তাকে, তাহলেও সচ্চিদানন্দ বলতে আমরা সৎস্বরূপের যে বিশুদ্ধতম পরম অনুভব পাই ইতির চেতনায়, অসৎ-স্বরূপের সচ্চিদানন্দ হবে তারও পরপারে। অতএব আমাদের পরিচিত সচ্চিদানন্দের সংজ্ঞা আরোপ করা চলবে না তাতে। এ দেশের শাস্ত্র পণ্ডিতেরা কতকটা অবিচার করেই বৌদ্ধ ধর্মকে ঘোষণা করেছেন অবৈদিক বলে, কেননা বৌদ্ধেরা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের শাসন মানেন না। কিন্তু এই বৈদান্তিক অসৎ-বাদ বস্তুত বৌদ্ধধর্মেরও লক্ষ্য। তার সঙ্গে উপনিষদের অনুশাসনের এই তফাৎ শুধু—উপনিষদের বাণীতে আছে সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা, অনুভবের 'ইতি'র দিকটাকেই বড় করে দেখা। তাই সৎ আর অসৎ দুটি অন্যোন্যব্যাবৃত্ত তত্ত্ব নয় তার মাঝে; তারা বুদ্ধিজাত বিরোধ-প্রত্যয়ের চরম নিদর্শন মাত্র। আবার এই বিরোধের পট-ভূমিকারূপেই আমরা পাই অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের একটা আভাস। বাস্তবিক কোথায় বিরোধ নাই? ইতি-প্রত্যয় নিয়ে যে-দর্শনের কারবার তাতেও এক-বিজ্ঞানকে বোঝাপড়া করতে হয় বহু-বিজ্ঞানের সঙ্গে, কেননা বহুও যে ব্রহ্ম-স্বরূপ। একবিজ্ঞান বা বিদ্যা দিয়ে আমরা জানি পরম দেবতাকে; বিদ্যার সমাবেশ না থাকলে অবিদ্যা 'অন্ধং তমঃ', বা 'ভূরি অনৃত'—সে ফোটায় শুধু বহুর বিশিষ্ট চেতনা। অথচ বিজ্ঞানের সাধনায় যদি বাদ দিয়ে চলি অবিদ্যাকে, অসৎ ও অবস্তু ভেবে নিরাকৃত করি তাকে, তাহলে বিদ্যাও হয় 'ভূয় ইব তমঃ'—যেন আরও অন্ধকার—পূর্ণ সিদ্ধির অন্তরায় যেন। বিদ্যার আলোতে চোখ ঝলসে যাওয়ায় অবিদ্যার কোন্ ক্ষেত্রকে সে উদ্ভাসিত করছে, তার আর দিশা পাই না তখন।

প্রাচীনতম ঋষিদের এই অনুশাসনে আছে স্বপ্রতিষ্ঠ প্রজ্ঞার নির্মল দৃষ্টি। ধৈর্য এবং বীর্য দুইই ছিল ঋষিদের বিদ্যার এষণায়; কোথায় মানুষের জ্ঞানের সীমা, নম্রভাবে তা স্বীকার করবার মত প্রজ্ঞার বৈশারদ্যও ছিল তাঁদের। মানুষের জ্ঞান আপন সীমার বাইরে চলে যায় যে প্রত্যন্ত ভূমিতে এসে, তার খবর তাঁদের অজানা ছিল না। পরের যুগে এল হৃদয় এবং মনের একটা অদম্য অধীরতা, অনুত্তর আনন্দের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ, শুদ্ধ-সংবিতের একটা সর্বগ্রাসী প্রভাব। বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একের এষণাকে প্রতিষ্ঠিত করল বহুর অস্বীকৃতির 'পরে। অনুভবের তুঙ্গ শৃঙ্গে মুক্তি পেয়ে রহস্যের অতলতার প্রতি বুদ্ধি হল বিরূপ অথবা পরাঙ্মুখ। কিন্তু

'পুরাণী প্রজ্ঞার' স্থির দৃষ্টির কাছে এ বিরোধ ছিল না। প্রাচীন ঋষিরা বুঝতেন, পরমদেবতাকে তত্ত্বত জানতে হলে সর্বত্র সমভাবে তাঁকে দেখতে হবে অভেদ বুদ্ধি নিয়ে; তাঁর আত্মরূপায়ণের বৈচিত্র্যে যে আপাতবিরোধের লীলা, শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার দ্বারা অভিভূত হলে চলবে না।

তাই একদেশদর্শী তর্কবুদ্ধি ভেদদৃষ্টিকেই একান্ত করে যদি বলে: বহুত্ব একটা অবাস্তব বিভ্রম মাত্র, কারণ অদ্বিতীয়-একই পরমার্থসত্য; একমাত্র নির্বিশেষই আছেন সৎস্বরূপ হয়ে, অতএব সবিশেষ বন্ধ্যাপুত্রের মতই অসৎ;— তাহলে তার এই রায়কে আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। বহুর মাঝে একের এষণাই আমাদের পরম পুরুষার্থ সত্য, কিন্তু তার সিদ্ধি আমাদের চেতনাকে প্লাবিত করবে অপরোক্ষ অনুভবেরই সেই পুণ্যচ্ছটায় যাতে আমরা আবার সেই এককেই দেখব ভূতে ভূতে 'সর্বেষাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।'

আর একটা বিষয়ে সতর্কতা চাই। অন্তর্গূঢ় শক্তির বিস্ফোরণে মন যখন এক ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় উদারতর আর একটা ভূমিতে, তখন সেই গোত্রান্তরের ফলে যে-কোন বিশিষ্ট দৃষ্টি অতিমাত্রায় একান্ত হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। সত্যার্থীকে সাবধানে এড়িয়ে যেতে হয় মনের এই অতিচার। জড়মনের যে দর্শন লোকোত্তর-ব্রহ্ম-বাদকে ভাবে একটা অলীক কল্পনা, আমরা তাকে ঠেলে ফেলি। কিন্তু চিন্ময় মন যদি উপলব্ধি করে, বিশ্ব একটা অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র, তাহলে তার অনুভবকেই বা নির্ব্যূঢ় সত্য মনে করব কেন? জড় মন ইন্দ্রিয়সংবেদনে অভ্যস্ত শুধু, তাই বস্তুর তত্ত্বকে স্থূলবিগ্রহের তথ্যে না ঢেলে বুঝতে পারে না সে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বাইরেও যে কোনও প্রমাণ থাকতে পারে, কিংবা সত্যধৃতিকে যে জড়াতীত ভূমিতেও উত্তীর্ণ করা চলে, এ তার কল্পনায় আসে না। আবার সেই মনই যখন প্রাকৃত চেতনার এলাকা ছাড়িয়ে চলে যায় বিদেহ-তত্ত্বের সর্বাতিভাবী অনুভবে, তখন সম্যক-দর্শনের অসামর্থ্যকে সে-ও সংস্কার রূপে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় ভূমিতে। তাই তার একদেশী দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়সংবেদন দেখা দেয় স্বপ্ন বা কুহকরূপে। কিন্তু অনুভবের এই দুটি মেরুতেই আছে স্বরূপসত্যের কুণ্ঠাবিকৃত প্রকাশ শুধু। তার আসল পরিচয়ও তো আমাদের অগোচর নয়। এ কথা সত্য, আমাদের আত্মোপলব্ধির সাধন ক্ষেত্র এই যে রূপের জগৎ, তার মাঝে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বলে মানতে পারি তাকেই, যা অপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃত চেতনায় আবিষ্ট হয়েছে তার লোকোত্তর বিভূতিকে এখানকারই ছন্দে ঢেলে। আবার

একথাও সত্য, জড় এবং তার ব্যাকৃতিতে যে স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বরূপের ভান, তাও আর কিছুই নয় অবিদ্যার বিভ্রম ছাড়া। জড়ের ব্যাকৃতি যদি হয় জড়াতীত বিদেহ-সত্যের আত্মরূপায়ণের উপাদান ও রূপরেখা, তবে সেই হবে তার সত্য পরিচয়। বস্তুত জড়ের রূপ দিব্যচেতনারই একটা লীলায়ন,—এই তার স্বরূপ, চিৎস্বরূপের স্বধাকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলছে সে,—এই তার প্রয়োজন।

কথাটা এই। অরূপ ব্রহ্ম রূপী হয়ে চিন্ময় সত্তাকে তাঁর বিভাবিত করেছেন জড়ধাতুতে; তাঁর এ লীলার তাৎপর্য শুধু চিদাভাসের সবিশেষ ব্যঞ্জনাতে আত্মবিসৃষ্টির আনন্দকে সম্ভোগ করা। ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন প্রাণের বৈচিত্র্যে নিজকে ফুটিয়ে তুলতে; প্রাণ ব্রহ্মে নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত, নিজের মাঝেই ব্রহ্মের ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করবে বলে। এইখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবচেতনার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। বিশ্বের চেতনাকে মানুষ উত্তীর্ণ করে সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মস্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে তার রূপান্তরসিদ্ধি হয় সহজ। পরম-দেবতাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলা—মানুষের মনুষ্যত্বের এই তো পরিচয়। তার যাত্রা শুরু পশু-প্রাণের বিচিত্র প্রবৃত্তি হতে, কিন্তু দিব্যজীবনের উদ্‌যাপনে তার যাত্রা শেষ।

কি মননে, কি জীবনে আত্মোপলব্ধির ঋতময় ছন্দ ফোটে সর্বাবগাহী সংবিতেরই উপচয়ে। ব্রহ্ম নিজকে প্রকাশ করছেন চেতনার বহু-বিচিত্র পর্যায়ে। সকল পর্যায়ই যুগপৎ আবির্ভূত মহাকালের স্বরূপসত্তায়। তবু তাদের মাঝে আছে সম্বন্ধের পারম্পর্য। প্রাণকেও সেই ধারা ধরে আত্মসত্তার নিত্যনূতন ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে চলতে হয় নিজের রূপ। কিন্তু তা বলে এক ভূমি হতে আর এক ভূমিতে উঠতে গিয়ে প্রাক্তন সিদ্ধিকে বর্জন করলে চলে না নবীন সিদ্ধির উন্মাদনায়। মনোময় জীবনে পৌঁছে তার অন্নময় ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান বা তাচ্ছিল্য করি যদি, অন্ন-মনোময় ভূমির প্রতি বিমুখ হই যদি চিন্ময় ভূমির আকর্ষণে, তাহলে একথা বলতে পারব না যে ব্রাহ্মী চেতনার সম্যকসিদ্ধি আমাদের হয়েছে অথবা তাঁর পরিপূর্ণ আত্মরূপায়ণের সকল ছন্দকেই আমরা মেনে নিয়েছি। জীবনে সিদ্ধি কখনও এমনি করে আসে না। এ শুধু অপূর্ণতাকেই এক ভূমি হতে আর এক ভূমিতে ঠেলে তোলা, বড় জোর সিদ্ধির কয়েকটি ধাপ পার হওয়া। অনুভূতির যত উচচ শিখরেই উঠি না কেন, এমন কি অসতের দুর্গম উত্তুঙ্গতাতেও যদি নিজকে

হারিয়ে ফেলি, তবু এ অভিযান ব্যর্থ হবে যদি ভুলে যাই কোথায় ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠা। অবর ভূমিকে শুধু ছেড়ে আসা নয় ঔদাসীন্য ভরে, পরন্তু উত্তর-ভূমির জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে প্লাবিত করে রূপান্তর ঘটানো তার—এই হল দিব্য-প্রকৃতির স্বধর্ম। ব্রহ্ম অখণ্ড সমগ্রতায় পূর্ণস্বরূপ, তাঁর মাঝে আছে বহু-বিচিত্র চেতনার যুগপৎ সমন্বয়; অতএব আধারে ব্রাহ্মীচেতনাকে ফোটাতে হলে আমাদেরও হতে হবে অখণ্ড সম্যক সর্বাধার এবং সর্বাবগাহী।

মর্ত্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ছাড়াও উগ্রবৈরাগ্যের আর একটা অনুচিত অভিনিবেশ আছে আমাদের মাঝে, যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি, যদি অখণ্ড-চেতনার সম্যক-স্ফুরণকেই করি জীবনাদর্শ। চেতনার আছে তিনটি সামান্যরূপ—জীব বা ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বচেতনা এবং তুরীয় বা বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনা; প্রাণ এই ত্রয়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যোন্য সম্বদ্ধ হয়ে। প্রাকৃত চেতনায় প্রাণপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক প্রকাশ, জীব তাতে নিজকে জানে বিশ্বেরই অন্তর্গত একটা বিবিক্ত সত্তা বলে; আবার নিজকে ও বিশ্বকে সে মনে করে জীবোত্তীর্ণ ও বিশ্বোত্তীর্ণ এক তুরীয় সত্তার অধীন। এই তুরীয় ভাবকেই সাধারণত বলি ব্রহ্ম। আমরা ভাবি, বিশ্বকে তিনি শুধু যে ছাড়িয়ে গেছেন তা নয়, তিনি আছেন তার বাইরে দাঁড়িয়ে। ব্রহ্মকে এমনি করে জীব ও জগৎ হতে বিবিক্ত ভাবার স্বাভাবিক পরিণাম এই হল যে জীব আর জগৎ দুইই আমাদের কাছে হয়ে গেল তুচ্ছ এবং অপকৃষ্ট। অতএব, তুরীয় ভাবের সিদ্ধিতে জীবভাব ও জগৎভাবের নিবৃত্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ,—যুক্তির ধারা ধরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া আমাদের কোনও উপায় রইল না আর।

কিন্তু ব্রহ্মের অদ্বৈত ভাবকে যদি অনুভব করি সম্যক দর্শনের পূর্ণতা নিয়ে, তাহলে আর এই বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় না। মনোময় ও চিন্ময় জীবন ফুটিয়ে তুলতে তো এই স্থূল দেহটাকে ছেড়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি সম্যক দর্শনও এমন ভূমিতে পৌঁছে দিতে পারে মানুষকে, যেখানে জীবপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রেখেই বিশ্বচেতনায় অবগাহন অথবা বিশ্বাতীত তুরীয় চেতনায় অবস্থান—এর মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই থাকে না। বিশ্বোত্তীর্ণ যিনি, বিশ্ব যে বাঁধা রয়েছে তাঁরি আলিঙ্গনে। বিশ্বে যে তিনি অনুস্যূত, একীভূত—বিশ্ব তো নিরাকৃত নয় তাঁর দ্বারা। তেমনি বিশ্বের বুকেই জীবের বাস, বিশ্ব এক হয়ে আছে তার সঙ্গে,—সেও তো জীবকে করেনি নিরাকৃত। সমগ্র বিশ্বচৈতন্যের কেন্দ্র বিন্দু হল জীব। আর বিশ্ব সেই

## জীবের নিয়তি

নির্বিশেষ অরূপের বিশেষ রূপায়ন, যাঁর সর্বাত্মভাবের সমগ্রতায় জারিত এই সৃষ্টিলীলা।

জীব জগৎ ও ব্রহ্মের এই হল সত্য সম্বন্ধ। এসত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের অবিদ্যাবিকৃত দৃষ্টির কাছে। অবিকৃত সত্যচেতনাকে ফিরে পাই যখন বিদ্যার উন্মেষে, তখনও এই শাশ্বত সম্বন্ধের তত্ত্বত কোনও বিপর্যয় হয় না শুধু জীবের চিৎকেন্দ্র হতে বিচ্ছুরিত তার প্রত্যক্ ও পরাক্ দৃষ্টিতে ফোটে কোন্ অনুত্তরের দিব্যবিভা। অতএব তার প্রবৃত্তিতেও দেখা দেয় একটা অভিনব পরিণামের ব্যঞ্জনা। জীব তখনও বিশ্বোত্তীর্ণের 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া'র অপরিহার্য আধার, অতএব দ্যুলোকের জ্যোতিঃসম্পাতেও সে-ক্রিয়ার নিবৃত্তি ঘটে না তার মাঝে। বরং সম্বুদ্ধ ও প্রভাস্বর জীবচেতনার বিশ্বকর্মে অভিনিবেশ ও অনুবৃত্তি যে চলে তখনও, সে তো বিশ্বলীলারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে। কারণ, বিশ্বগত সমষ্টির মাঝে আত্মচেতনা ফোটে—ব্যষ্টিতেই বিশ্বোত্তীর্ণের চিন্ময় স্ফুরণ হতে। অতএব ব্রহ্মজ্যোতির সংস্পর্শে জীবের আত্যন্তিক প্রলয়ই তার নিয়তি হত যদি, তাহলে এ সংসার যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দুঃখ তাপ ও মরণের রঙ্গশালা হয়েই থাকবে অনন্তকাল ধরে, এনিয়তিও হত দুর্লঙ্ঘ্য। এমন সংসার তখন জীবের কাছে হয় একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষা, নয়তো একটা অনাদি বিভ্রমের চক্রাবর্তন।

বৈরাগ্যবাদীর ঝোঁক হল সংসারকে দেখা এই দৃষ্টিতে। কিন্তু বিশ্বের মাঝে আমাদের ঠাঁই পাওয়াটাই একটা বিভ্রম হয় যদি, তাহলে ব্যক্তির মুক্তির তো বাস্তবিক অর্থই থাকে না কোনও। অদ্বৈতবাদী বলেন: জীব আর ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম হতে তার ভেদভাব অবিদ্যা মাত্র; যে ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করেছে ভেদভাব হতে অব্যাহতি পেয়ে, সেই মুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হবে, এমন অব্যাহতিলাভে ইষ্টসিদ্ধি হল কার? পরব্রহ্মের ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই জীবের অব্যাহতিতে, কেননা অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত প্রশান্ত নির্বিকার—স্বভাবচ্যুতি কিছুতেই ঘটতে পারে না তাঁর। সমষ্টি বিশ্বেরও কোনও লাভ নাই তাতে, কেননা সমষ্টিগত বিভ্রম হতে একটি জীবব্যক্তি যদি মুক্তি পায় কোন রকমে, বিশ্বের তো মুক্তি হয় না তাতে। তার বন্ধন থাকে তেমনি অটুট, কারণ বিশ্বের বেলায় বন্ধ-হেতু অবিদ্যা যেমন অনাদি তেমনি অনন্ত, জীবের মত সান্ত তো নয়। অতএব সংসারচক্র হতে অব্যাহতি পেয়ে লাভ যদি কারও হয়, সে শুধু জীবের। দুঃখতাপ ও খণ্ডবোধের আড়ষ্ট বন্ধন হতে

ছাড়া পায় সে-ই ; শাশ্বতী শান্তির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে পুরুষার্থের পরমা সিদ্ধিতে সে-ই হয় কৃতার্থ। তাহলেই মানতে হয়, প্রমুক্ত চেতনার জ্যোতিতে উদ্ভাস্বর হয়েও ব্রহ্ম ও জগৎ হতে বিশিষ্ট একটা বাস্তব সত্তা জীবাত্মার বজায় থাকেই কোন রকমে। কিন্তু মায়াবাদীর মতে আত্মার জীবভাব একটা বিভ্রম মাত্র ; অনির্বচনীয় মায়ার মাঝে তার সত্তা কোনও উপায়ে সম্ভাবিত হলেও বস্তুত সে অসৎ। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই পৌছাতে হয় : অসৎ মায়িক বিশ্বের অসৎ মায়িক বন্ধনজাল হতে মুক্তি লাভ করছে অসৎ মায়িক জীব এবং এই অনির্বচনীয় মুক্তির সাধনাই হল সেই অসৎ জীবের পরম পুরুষার্থ। কেননা যেখানে সমস্তই কল্পিত অতএব অসৎ, সেখানে কেউ নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে, অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই ; এই হল বিদ্যার চরম অনুভব! অথাৎ অবিদ্যাও যেমন প্রতিভাস মাত্র, বিদ্যাও শেষ পর্যন্ত তাই! আবার দেখি, সেই অনির্বচনীয়া মায়া—আমাদের মুক্তি-পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে। তার রহস্যজালকে ছিন্নভিন্ন করেছে বলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল যে তর্কবুদ্ধি, মায়াবিনীর হাসির কল্লোলে কোথায় ভেসে গেল তার মূঢ় আস্ফালন!

মায়াবাদী জানেন তর্কে তাঁর ফাঁক আছে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন তিনি : যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না বন্ধন-মুক্তির প্রহেলিকা ; এ রহস্য অনাদি, এর সমাধান নাই কোনও। তবু আমাদের সাধন-জীবনে এ যে একান্ত বাস্তব একটা তথ্য, সে তো মানতেই হবে। একটা ধাঁধা এড়াতে আর একটা ধাঁধার আশ্রয় নিতে হয় যদি, তাতেই বা ক্ষতি কী? ক্ষুদ্র অহংএর বাঁধন ছিঁড়তে পারে জীবাত্মা একটা চরম অহমিকার অভিঘাতেই—তার ব্যক্তিগত মুক্তির দায়কেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তাতে মায়ার জগতে তারি ব্যক্তি-সত্তা অত্যন্ত উগ্র ও বিবিক্ত হয়ে দেখা দেয় যদি, আপত্তি কী? আমি ছাড়া আর কোনও জীবের তাত্ত্বিক সত্তা আছে কি না, তার প্রমাণ নাই। আমি ছাড়া আর সবাই আমারই মনের বিকল্প শুধু, তাদের মুক্তির প্রশ্নও তাই নিরর্থক আমার কাছে। শুধু আমার আত্মাই একান্ত বাস্তব এবং আমার মুক্তিই একমাত্র পুরুষার্থ। বন্ধন হতে আমার ব্যক্তিগত মুক্তিই বিশ্বের একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব ; আর-সব জীব আমার আত্মস্বরূপ হলেও থাক্ না তারা বন্ধনেরই মাঝে পড়ে।

স্বতোবিরোধে কন্টকিত এই তর্কের ধাঁধা মিটে গিয়ে সুসঙ্গতি দেখা দিতে পারে আমাদের দর্শনে—যদি একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি না করি

ব্রহ্ম অথবা আত্মা আর জগতের মাঝে। বিসৃষ্টি অখণ্ডেরই, এ কথা সত্য; কিন্তু তা বলে কি বৈচিত্র্য নাই সে বিসৃষ্টিতে, নাই বহুমুখী বিচ্ছুরণ? চোখ থাকতেও যদি অন্ধ না সাজি, তাহলে বিশ্বের যেদিকে তাকাই, সেদিকেই কি দেখিনা এই চিত্রবহ অপরূপ সত্যেরই নিদর্শন? চিৎ-সত্তার তো বন্ধন নাই কোনও,—যেমন নাই বহুত্বের বন্ধন, তেমনি নাই ঐক্যেরও। রহস্যময় হলেও এই কি নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় নয় তাঁর? তাঁকে 'নির্বিশেষ' বলি এই জন্য যে, বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণের অনন্ত সম্ভাবনাকে আপন কুক্ষিগত করে স্বধায় বিলসিত করবার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে। বস্তুতই কেউ নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে, অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই, কেন না তৎস্বরূপ অব্যাহত স্বাতন্ত্র্যে তাঁর নিত্যমুক্ত। এমনিই অকুণ্ঠিত সে স্বাতন্ত্র্য যে মুক্ত থাকার দায়টুকুও তাঁর নাই। অতএব বাস্তব বন্ধনের দ্বারা অস্পৃষ্ট থেকেই বন্ধনলীলার অভিনয় করতে পারেন তিনি। বন্ধন স্বকল্পিত একটা বিশেষণ তাঁর পক্ষে। অহংএর সীমায় আপনাকে বাঁধা তাঁর বিসৃষ্টির একটা সাময়িক ভঙ্গি শুধু, এই দিয়ে ব্রাহ্মীচেতনার ব্যষ্টি বিভাবে সমষ্টির ঐশ্বর্য এবং তুরীয়ের অনির্বচনীয়তাকে চাইছেন তিনি ফুটিয়ে তুলতে।

বিশ্বোত্তীর্ণ তুরীয় যিনি, স্বগত নিষ্কল স্বাতন্ত্র্যে তিনি দেশকালের অতীত। মনঃকল্পিত সান্ত ও অনন্ত ভাবনার দ্বন্দ্ব স্পর্শ করে না তাঁকে। কিন্তু বিশ্বে আছে তাঁর আত্মরূপায়ণের স্বাতন্ত্র্য বা মায়াশক্তির বিলাস। তাই দিয়ে একত্ব ও বহুত্বের আপূরণে আপন নিষ্কল স্বরূপকে করলেন তিনি স-কল, এবং অদ্বৈত-সম্পুটিত বহু-ভাবনাকে স্থাপিত করলেন অবচেতন চেতন ও অতিচেতন এই তিনটি ভূমিতে। তাঁর বহু-ভাবনা রূপায়িত হল যখন জড়বিশ্বে তখন তার মূলে দেখতে পেলাম এক অবচেতন অন্বয় ভাবেরই লীলা। বিশ্বের উপাদান ও ক্রিয়ারূপে প্রকট হয়েও সে অন্বয়ভাবে নিজের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে রইল না কোনও সুস্পষ্ট চেতনা। তার পরেই জীবচেতনায় ভেসে উঠল অহং-এর ব্যক্তবিন্দু অদ্বৈত চেতনার প্রমুখ হয়ে। কিন্তু সেখানেও জীব তার অদ্বৈতবোধকে খাটায় শুধু রূপের জগতে—বহিরাবৃত ক্রিয়ার জগতে; তাই ব্যক্ত অহংএর অন্তরালে কী ঘটছে তার খবর রাখে না সে। এই জন্যই, সংহতি-বোধ তার নিজের মাঝেই যে নয় শুধু, বিশ্বের সঙ্গেও যে এক সে,— এ প্রত্যয় তার জাগে না কোনমতেই। বিশ্বের অহংকে ব্যষ্টি অহংএর খণ্ডতায় সঙ্কুচিত করেছি, তাই জীব হিসাবে সবাই আমরা অপূর্ণ। কিন্তু ব্যষ্টি-চেতনার

সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অতিচেতনার স্ফুরণ ঘটে অহংএর মাঝে এবং তারি অমোঘবীর্যে অনুষিক্ত হয়ে আমরা পাই বিশ্বাত্মভাবের অনুভব। সে অনুভব আমাদের নিয়ে যায় ব্রহ্মের তুরীয় সত্তার মহাগহনে, বিশ্ব যাঁর অনির্বচনীয় স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলছে বহুধা-বিকল্পিত অদ্বৈতেরই লীলায়নে।

অতএব বিশ্বব্যাপিনী দৈবী মায়ারই একটা চরম আকূতি সার্থক হচ্ছে জীবাত্মার প্রমুক্তিতে। এই প্রমুক্তিই হল সৃষ্টির দিব্যনিয়তি, এই দিব্যভাবনার নাভিতে আশ্রিত থেকেই আবর্তিত হয়ে চলেছে বিশ্বচক্র। জীব-চেতনা বিশ্বের সেই জ্যোতির্বিন্দু, যেখান হতে শুরু হল অরূপের বহুধা-রূপায়ণের সুদূর অভিযান—পরিপূর্ণ রূপসিদ্ধির অলক্ষ্য দিগন্তের পানে। এই বিন্দু হতেই প্রমুক্ত-জীবাত্মা তার অদ্বৈত-অনুভবকে অগ্র্যাবুদ্ধির এষণায় যেমন করেন উৎসর্পিত, তেমনি বিশ্বাত্মভাবনায় করেন তাকে প্রসারিত। বিশ্বের বহুরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্যের অনুভব সিদ্ধ না হলে, তুরীয়ের যোগেও অদ্বৈত-সিদ্ধি থাকবে অপূর্ণ। অতএব প্রমুক্ত-চেতনায় বিশ্বাত্মভাবের বিকিরণ সাথক হবে প্রমুক্তিরই বহুধা রূপায়ণে, একটি মুক্তজ্যোতি অগণিত নক্ষত্র-বিন্দুতে মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে দেবে বিশ্বের আকাশ জুড়ে। একটি প্রাণী যেমন বহু দেহে আপনাকে বিসৃষ্ট করে প্রজনন দ্বারা, তেমনি একজন দেবমানব বহু মুক্ত আত্মায় প্রজাত হয়ে আপনাকে করেন বিচ্ছুরিত। অতএব এ জগতে কখনও একটি জীবাত্মারও মুক্তি ঘটে যদি, তাহলে আত্মসংবিতের সেই দিব্য-সংবেগ বহু জীবে সঞ্চারিত হয়ে জাগিয়ে তোলে চিৎশক্তির একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ; কে জানে তার উদ্ধৃত তরঙ্গ পার্থিব মনুষ্যচেতনাকে আলোড়িত করে লোক-লোকান্তরেও বিসর্পিত হয় কি না! বস্তুত অধ্যাত্ম-শক্তির ব্যাপ্তিতে দাঁড়ি টানা চলে কি কোথাও? মহানির্বাণের উপান্তে পৌঁছেও বুদ্ধ পিছন ফিরে দাঁড়ালেন তার দিকে—প্রতিজ্ঞা করলেন, পৃথিবীর একটি জীবও দুঃখের অভিঘাত ও অহমিকার কবল হতে অমুক্ত থাকবে যতক্ষণ, ততক্ষণ লোকোত্তরের মহাকর্ষণ সত্ত্বেও অনাবৃত্তির পথে কিছুতেই পা বাড়াবেন না তিনি!—মহাসত্ত্বের এই বিপুল আত্মবিচ্ছুরণের সঙ্কল্প কি উপন্যাস শুধু?

কিন্তু বিশ্বব্যাপ্তির মহিমা হতে নিজকে নিরাকৃত না করেও আমরা পৌঁছাতে পারি সংবিৎ-সিদ্ধির চরমে। ব্রহ্মের দুটি বিভাবই শাশ্বত; অন্তরে তিনি মুক্ত এবং বাইরে ব্যাকৃত। যেমন আছে তাঁর বিসৃষ্টি, তেমনি আছে নির্লিপ্ত স্বাতন্ত্র্যও। আমরাও যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আমাদেরও মাঝে স্ফুরিত

হবে না কেন তাঁর দিব্য স্বধার বীর্য? সত্য-সত্যই দিব্য জীবনের অধিকার চায় যে, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির মাঝে একটা পরম সাম্যের সূত্র আবিষ্কার করতেই হবে তাকে। যাকে অতিক্রম করে মুক্তি পেয়েছি তাকে বর্জন করাই যদি হয় চরম পুরুষার্থ, তাহলে ব্রহ্ম স্বীকার করে নিলেন যাঁকে, নিবৃত্তি পথের যাত্রী হয়ে আমরা যে তাকেই করলাম নিরাকৃত। আবার প্রবৃত্তির পথে চলতে গিয়ে কর্মে তন্ময় হয়ে ক্রিয়াশক্তির সঙ্গেই নিজের অধ্যাস ঘটাই যদি, তাহলে শুধু চেতনার অবর ভূমিকে সত্য মেনে পরাসংবিৎকে করা হয় প্রত্যাখ্যান। কিন্তু ব্রহ্মে অখণ্ড সৌষম্যে সংহত যে-দুটি বিভাব, তাদের বিযুক্ত করতে কেন মানুষের এত দুরাগ্রহ? ব্রহ্মকে সম্যক পেতে হলে তাঁর অখণ্ড পরিপূর্ণতার বিকাশ ঘটানো চাই আমাদেরও মাঝে—এই কি নয় জীবের দিব্য নিয়তি?

এই যে ব্যষ্টি-অহংএর সীমার মাঝে নিজকে আমরা ফুটিয়ে তুলছি চলার পথে, তাকে ছেয়ে আছে মৃত্যু ও দুঃখ-তাপের করাল অভিশাপ। কিন্তু শাপমুক্তি ঘটাতে হলেও বহুধা-বৃত্ত অবিদ্যার ভিতর দিয়েই যে তার পথ। বহুর মাঝে এককেই সম্যক জানলে ঘটে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার সহ-বেদন; সেই সম্যক বিদ্যা দ্বারাই আমরা পাই অমৃত সম্ভোগের অখণ্ড অধিকার। নিখিল সম্ভূতির ওপারে অসম্ভূতি যিনি, তাঁকে পেয়ে আমরা মুক্ত হই জন্ম-মৃত্যুর অবর আবর্তন হতে; কিন্তু প্রমুক্ত চেতনার স্বাতন্ত্র্যে সম্ভূতিকেও দিব্য জেনে আমরা মৃত্যুকে জারিত করি অমৃতের সম্ভোগ দ্বারা। এমনি করে এই মনুষ্য-প্রকৃতিতেই সেই দিব্যরতির চিন্ময় আত্মবিকিরণের ভাস্বর বিন্দুতে আমরা নিজকে করি রূপান্তরিত।

৬

# বিশ্ব ও মানব

> জীবনের সকল ধারা ও চেতনার সকল ভূমির সমষ্টি এই যে বৃহৎ ব্রহ্মচক্র, তাতেই জীব ঘুরছে ফিরছে হংস হয়ে—যিনি এই পথের নায়ক, নিজকে তাঁর থেকে পৃথক ভেবে। অবশেষে জড়িয়ে ধরেন তিনিই তাকে ; তখন সে পায় অমৃতের অধিকার।
>
> —শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৬)

এক বৃহৎ আভাস্বর তুর্যাতীত পরমার্থ-সৎই পর্বে পর্বে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন বিশ্বরূপে ; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই জগতের সঙ্গে অদৃশ্য কত লোক-লোকান্তরের বিচিত্র বুনানিতে রচিত তাঁর আত্মরূপায়ণের উপায় ও উপাদান, নিমিত্ত ও পরিবেশ !—এমনি করে তাঁর আনন্দশতদলের দল মেলা এই বিশ্বলীলার তাৎপর্য। এ কথা তো কিছুতেই মানতে পারি না, বিশ্বের নাই কোনও অর্থ, নাই কোনও লক্ষ্য—এ শুধু অন্তহীন বিভ্রমের নিরুদ্দেশ আবর্তন অথবা যদৃচ্ছার একটা ক্ষণিক খেয়াল। যে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি জগৎপ্রপঞ্চ কোনও প্রবঞ্চক মনের চাতুরী নয় শুধু, সেই যুক্তিই আমাদের চিত্তে জাগায় তার স্বরূপ সম্পর্কে এই সুনিশ্চিত প্রত্যয় : অগণিত বিবিক্ত প্রাতিভাসিক ধর্মের একটা অন্ধ অসহায় লক্ষ্যহীন স্বয়ম্ভূ-পিণ্ড অনন্ত কালের কক্ষপথে ছুটে চলেছে সংঘাত ও সংঘর্ষের বিক্ষুব্ধ মত্ততায়—এ কখনও হতে পারে না জগতের সত্যরূপ ; অথবা এমনও বলতে পারি না, এ শুধু একটা তামসী শক্তির অপ্রমেয় স্বতঃস্ফূর্ত বিসৃষ্টি ও উচ্ছ্বাস, এর অন্তরালে নাই কোনও নিগূঢ় বিজ্ঞানের প্রবর্তনা, যা যাত্রার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সজাগ থেকে তার গতি ও পরিণামকে করবে নিয়ন্ত্রিত। বরং এই প্রত্যয়ই সত্য এবং যুক্তিসহ : স্বয়ংপ্রজ্ঞ অতএব অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট এক অখণ্ড সত্তাই আবিষ্ট এবং অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে প্রাতিভাসিক সত্তাতে ; বিশ্বের ব্যাকৃতিতে সে-ই আপনাকে করছে রূপায়িত, জীবব্যক্তির প্রচেতনায় মেলছে তার কমলদল।

এই জ্যোতির্ময় উন্মেষকেই আর্য পিতৃপুরুষেরা বন্দনা করেছেন উষা বলে। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদে চরম প্রতিষ্ঠা তার, তাকে দেখেছিলেন তাঁরা মানসের দ্যুলোকে আতত এক বিরাট প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে। এই 'বৃহৎ জ্যোতি'ই নিখিলের মর্মমূলে নিত্যজাগ্রত রয়েছেন সর্বভাসক ও সর্বনিয়ামক ঋতস্বরূপ হয়ে, বিশ্বের সাক্ষী এই অন্তর্যামীই প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছেন মানুষকে আপনপানে ; তাঁরি টানে চলেছে মানবযাত্রী—প্রথমত সচেতন মনের অগোচরে, অপরাপ্রকৃতির প্রগতিস্রোতের টানে ; তারপর প্রচেতনার পর্বে পর্বে আপনাকে প্রসারিত করে ছুটেছে সে দেবযানের উত্তরায়ণে। এই উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রা, এই তার পরম ব্রত, তার দেবতার অভীষ্ট যজ্ঞ। এ জগতে মানুষের এই একমাত্র কৃত্য, এরি জন্য মানুষ হয়ে বাঁচা তার ; নইলে জড়বিশ্বের অপ্রমেয় হতবুদ্ধিকর বৈপুল্যের বুকে এই যে একটুখানি কাদা ও জলের আঁচড়, তার মাঝে দুদিনের জন্য কিলবিল করে বেড়ায় যে-সব কীট, তাদের সগোত্র ছাড়া মানুষকে আর কিছু কি বলা চলত ?

প্রাতিভাসিক জগতের সকল বিরোধ ছাপিয়ে ফুটবে যে ঋতম্ভরা সত্তার বীর্য, ঋষিরা বলেন, অনন্ত আনন্দ ও চিন্ময় আত্মভাবই স্বরূপ তাঁর ; সর্বদেশে সর্বভূতে সর্বকালে ও কালাতীতেও সমরস তিনি ; সমস্ত প্রতিভাসের অন্তরালে নিত্যজাগ্রত তিনি, তবু তাদের প্রবলতম ক্রিয়াস্পন্দ বা বিপুলতম সংহতিতেও সবখানি প্রকাশ হয় না তাঁর বা তাঁর অপ্রমেয়তা হয় না সীমিত, কেননা স্বয়ম্ভূ বলেই যে বিভূতি হতে স্ব-তন্ত্র তিনি। বিভূতি তাঁরি প্রতিরূপ, কিন্তু তাঁর নয় নিঃশেষ পরিচয় ; স্বরূপের দিকে ইশারা তার, কিন্তু তাকে প্রকট করবার সামর্থ্য তার নাই। অরূপ নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন রূপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে। রূপের মাঝে সংবৃত ছিল যে চিৎ-সত্তা আত্মপরিণামের পর্বে পর্বে নিজকে জানে সে বোধি দিয়ে, আত্মদর্শন ও আত্মানুভব দিয়ে। সেই আত্মোপলব্ধি বিশ্বে সম্ভূতির পথ খুলে দেয় তার কাছে ; আবার আত্মসম্ভূতিদ্বারাই ঘটে তার স্বরূপের উপলব্ধি। এমনি করে অন্তরাবৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপে সমাবিষ্ট হয়েই তার বিচিত্র ব্যাকৃতি ও বিভাবে সে ঢেলে দেয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অমৃত-দ্যুতি। সচ্চিদানন্দ আপন তুরীয় স্বরূপে আছেন শাশ্বত হয়ে ; কিন্তু তাঁর অন্তহীন ব্যঞ্জনাকে দেহ প্রাণ ও মনের আধারে মূর্ত করে তোলা, বিসৃষ্টির এই তো তাৎপর্য এবং এই দিব্য রূপান্তরকে সিদ্ধ করবার জন্যই বিশ্বে জীবব্যক্তির আবির্ভাব। যে পরিপূর্ণ

তাদাত্ম্যে সচ্চিদানন্দ নিজেরই মাঝে আছেন সমাহিত হয়ে, সম্বন্ধতত্ত্বের ভিতর দিয়ে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলছেন জীবে জীবে।

অবিজ্ঞেয় সৎস্বরূপ নিজকে জানছেন সচ্চিদানন্দরূপে, এই পরম প্রত্যয়ই বেদান্তের চরমে,—আর-সব অনুভব এরি অন্তর্গত বা আশ্রিত। নেতিবাদে সমস্ত রূপের আবরণ খসিয়ে প্রতিভাসকে শূন্যেই মিলিয়ে দিই, অথবা ইতিবাদ দিয়ে নামরূপকে পর্যবসিত করি তার অধিষ্ঠান সত্যে,—সত্য দর্শনে শুধু জেগে থাকে ঐ একটি মাত্র চরম অনুভব। জীবনকে ভরিয়ে তুলি বা ছাড়িয়ে যাই, শুদ্ধচৈতন্যের বন্ধনহীন প্রশান্তবাহিতা অথবা সিদ্ধ-বীর্যের শক্তি ও আনন্দ যাই হোক্ আমাদের পুরুষার্থ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দই সেই সর্বগত পরম রহস্য—যার দুর্ণিবার আকর্ষণ অনাদি যুগ হতে জ্ঞানের দীপ্তিতে বা ভাবের বিহ্বলতায়, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে বা কর্মের তপস্যায় উতলা করেছে মানবচেতনাকে তারি ব্যাকুল এষণায়।

বিশ্ব আর জীব এই দুটি তাত্ত্বিক প্রতিভাসে অবিজ্ঞেয় সৎ আপনাকে করেছেন অবভাসিত; তাঁকে পেতে হলে এদেরই ভিভর দিয়ে যেতে হবে আমাদের, কেননা এ দুটি কোটির মাঝে আছে যত অবান্তর ব্যূহ, দুয়ের সংঘাত হতেই তাদের উৎপত্তি। পরমার্থের এই অবতরণের প্রকৃতি হল আত্ম-নিগূহন;—বিসৃষ্টিতে নেমে এসেছেন তিনি ধাপে ধাপে, আবরণের পর আবরণ দিয়ে নিগূহিত করছেন নিজকে। অতএব তাঁর আত্মবিবৃতি স্বভা-বতই ধরবে উদয়নের রূপ, আর দুয়েরই অভিব্যক্তি হবে পর্বে পর্বে। দিব্য অবতরণের প্রত্যেকটি ধাপ মানব-চেতনার দিক হতে উত্তরায়ণের এক একটি ভূমিকা; যে আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে অজানা দেবতার গহন-রহস্য, সত্য-সন্ধানী ঈশ্বর-প্রেমিকের কাছে তা-ই আবার তাঁর গুণ্ঠন-মোচনের সাধন। মূঢ় অথচ ছন্দোময় নিদ্রার ঘোরে অবচেতন জড়প্রকৃতি জানেনা—ঐ বাক্যহারা অপ্রমেয় জড়সমাধির গভীর গহনে কোন্ ভাব ও চেতনার পরিস্পন্দ দ্বারা প্রশাসিত হচ্ছে তার অন্ধশক্তির ঋতময়ী প্রবৃত্তি; কিন্তু সেই সুপ্তিকে মন্থন করে গেল স্পন্দিত প্রাণের বিচিত্র আকুল ছন্দ—আত্মসংবিতের উপান্তে এসে ঠেকেছে যার রূপায়ণের প্রবেগ। কঠিন তপস্যায় প্রাণের স্বপ্নলোক হতে বিশ্ব উত্তীর্ণ হল মনোময় চেতনায় জাগ্রতভূমিতে—একটি ভূত-সংঘাত সহসা জেগে উঠে দেখতে পেল নিজের সঙ্গে নিজের জগৎকে, আর এই জাগরণেই বিশ্বে

সঞ্চারিত হল সেই চরম উদয়নের সংবেগ, আত্মসচেতন জীবব্যক্তির স্ফুরণে যার সার্থকতা। কিন্তু এ সংবেগ মনোভূমিতে এসেই গেল না থেমে—মন আবার প্রচেতনার খাতে বইয়ে দিল তার প্রবাহকে। তীক্ষ্ণ হলেও সীমিত এই মনের দৃষ্টি, তাই তাকেও বলতে পারি না জীবনশিল্পী। প্রাণ তার কাছে এনে হাজির করে বিচিত্র উপকরণের একটা এলোমেলো সঞ্চয়; বুদ্ধিমান মজুরের মত মন তাকে সাধ্যমত ঘসে-মেজে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটুখানি অদল-বদল করে তুলে দেয় সেই পরমশিল্পীর হাতে, আমাদের দিব্য-জীবনের রূপকার যিনি। অতিমানসই সেই দেবশিল্পীর স্বধাম, কেননা অতিমানসই মূর্ত হয় অতিমানবে। অতএব মনোভূমি পার হয়েও উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের জগৎকে, উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে দিব্য প্রাণের বৈদ্যুতীতে ভরা সেই মহাভূমিতে, যেখানে বিশ্ব ও জীব উভয়েই আবিষ্ট হয় তাত্ত্বিক স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভবে,—অতএব পরস্পরের অবিকল্প আত্মপরিচয়ে সামরস্যের ঐক্যতানে মিলে যায় দুয়ের সুর।

আমাদের প্রাণ মনের বিশৃঙ্খল চলন দূর হতে পারে যদি জড়প্রকৃতির ছন্দের চেয়েও গভীর একটা ঋতময় ছন্দরহস্য হয় আয়ত্ত। প্রাণ ও মনের অবরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে জড়প্রকৃতি, তার মাঝে পরিপূর্ণ প্রশান্ত-বাহিতা আর অপ্রমেয় শক্তির বিচ্ছুরণে ঘটছে একটা সমতা, কিন্তু তবু জড় তার অন্তর্গূঢ় সত্যকে পায়নি হাতের মুঠোয়। তাই আড়ষ্ট প্রাণের কুহেলিকায়, অবচেতনার গভীর সুপ্তিতে অথবা অবরুদ্ধ চেতনার আচ্ছন্ন বিমূঢ়তায় রচিত হল যে তিমির-গুণ্ঠন, সেই হল তার প্রশান্তির রূপ। তার স্বরূপশক্তির মর্মসত্য জানে না সে, তাই তার প্রশাসনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে সেই শক্তিরই অন্ধ তাড়নায় সে ছুটে চলেছে শুধু,—ঋতময় ছন্দের আনন্দ-দোলায় জেগে ওঠার অবসর পায় নি সে এখনও।

জড়প্রকৃতির এই ন্যূনতা সম্পর্কে প্রাণ ও মন সচেতন হয়ে ওঠে অবিদ্যার ব্যাকুল এষণায়, অচরিতার্থ বাসনার বিক্ষোভে; এর ভিতর দিয়েই ফোটে তাদের আত্মসংবিৎ ও আত্মসম্পূর্তির প্রথম প্রৈতি। কিন্তু প্রাণ-মনের আত্মসম্পূর্তি ঘটে কোন্ স্বারাজ্যের অধিকারে?—বস্তুত আপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েই তারা আপনাকে পায় পুরোপুরি। প্রাণ-মনের ওপারে চেতনার দিব্য-ভূমিতে দাঁড়িয়েই আমরা আবার পাই সেই লোকোত্তর সত্যের সন্ধান, জড়প্রকৃতির সমত্বসাধনায় ফুটেছিল যার আভাস শুধু; অনুভব করি এক

বিরাট প্রশান্তি, যাকে স্পন্দহীন জড়ত্ব অথবা মূর্ছিত চেতনার অসাড়তা বলা চলে না কিছুতে—কেননা অকুণ্ঠিত শক্তি ও অবিকল্পিত আত্মসংবিৎ তার মাঝে স্তব্ধ-সমাহিত হয়ে আছে অবিচল একাগ্রতায় ; অনুভব করি এক অমেয় বীর্যের বিচ্ছুরণ, যা স্বরূপত শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দের বিদ্যুৎ-শিহরণ, কারণ তার প্রত্যেকটি স্পন্দন জাগছে অভাবের বেদনা বা অবিদ্যার ক্ষুব্ধ আয়াস হতে নয়,—কিন্তু অচলপ্রতিষ্ঠ প্রশান্তি ও স্বারাজ্যেরই স্বাতন্ত্র্য হতে। এই ভূমিতে এসেই অবিদ্যা পায় সেই দিব্যজ্যোতির পরিচয়, যার আঁধারে-ছাওয়া অপূর্ণ প্রতিবিম্ব হতে আবির্ভাব তার ; আমাদের সকল বাসনা মিলিয়ে যায় সেখানে আপ্তকামের সেই উচ্ছল ঐশ্বর্যে, অপ্রবুদ্ধ জড়ত্বের অন্ধ আকূতির মাঝেও যার পানে একদিন উদ্যত হয়েছিল তাদের স্তিমিত অভীপ্সার ম্লানশিখা।

উদয়নের পথে জীব আর বিশ্বকে চলতে হয় অন্যোন্যনির্ভর হয়ে। বস্তুত তাদের একটিকে নাহলে চলে না আর একটির, তাদের একের পুষ্টিতে হয় অপরের পুষ্টি। অনন্ত দেশে ও কালে সমষ্টিভূত দিব্য-ব্যূহের যে বিকিরণ, আমরা তাকেই বলি বিশ্ব ; আর দেশকালের সীমার মাঝে সেই ব্যূহেরই ঘনবিন্দুকে বলি জীব। বিশ্ব চায় সেই পরম দেবতারই সমষ্টিভাবের অনুভব—আনন্ত্যের প্রসারে ; সে জানে ঐ তার স্বরূপ, কিন্তু উপলব্ধির পূর্ণতাকে নিজের মধ্যে পায় না সে ; কেননা সম্প্রসারণে সত্তা শুধু বহুত্ব-ভাবনায় আপনাকে চলে পরিকীর্ণ করে, কিন্তু আদিম বা অন্তিম একত্বে পৌঁছাতে পারে না কোনরকমেই—তাই তার মূল্য হয় পৌনঃপুনিক দশমিকের ভগ্নাংশের মত, যার আদি-অন্তহীন প্রস্তার কোনদিনই গিয়ে ঠেকতে পারে না অভঙ্গের কোঠায়। বিশ্ব তাই নিজেরই মাঝে গড়ে তোলে দিব্য-ব্যূহের একটা চিদ্‌ঘন বিন্দু, যাকে আশ্রয় করে তার অভীপ্সা পায় আত্মসম্পূর্তির পথ। আত্মসচেতন জীবব্যক্তিতেই প্রকৃতির দৃষ্টি অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিবদ্ধ হয় পুরুষে,—জগৎ খোঁজে আত্মাকে। আনন্দহিন্দোলার একটি দোলনে ঈশ্বর যদি পুরোপুরিই প্রকৃতিতে হলেন পরিণত, তাহলে তার আর একটি দোলনে প্রকৃতি আবার পর্বে পর্বে ফুটতে চাইল ঈশ্বর হয়ে ; —জীবলীলার তাৎপর্য এই।

আবার আর এক দিকে, বিশ্বকে আশ্রয় করেই জীবের মধ্যে জাগে আত্মোপলব্ধির প্রেরণা। বিশ্বই জীবের প্রতিষ্ঠা পরিবেশ ও সাধন, পরম-

পুরুষের দিব্যকর্মের উপাদানও এই বিশ্ব। শুধু তাই নয়; জীবের মাঝে বিশ্বপ্রাণ ঘনীভূত হয়েছে একটা সীমার বেষ্টনীতে, অতএব তার বৈন্দবীসত্তা ব্রাহ্মী চেতনার বিজ্ঞানঘন মহাবিন্দুর মত অনিঃশেষে সঙ্কোচ ও বিশেষণের কল্পনা হতে নয় মুক্ত; সুতরাং দিব্য-পুরুষের সর্বময় ভাব তার স্বরূপসত্তা হলেও তাকে ফোটাতে নিজেকে তার ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বময়, অহং-শূন্য নৈর্ব্যক্তিকতায় খুঁজতে হয় সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ। অথচ বিশ্বচেতনার সীমাহীন ব্যাপ্তিতে আপনাকে হারাতে গিয়েও তার সত্তার তন্ত্রীতে বেজে ওঠে এক তুর্যাতীত রহস্যের অশ্রুত রাগিণী, তার আত্মভাব যার অস্ফুট মূর্ছনাকে ব্যবহারিক জগতে ফুটিয়ে তুলেছিল কুণ্ঠিত অহমিকার ছিন্নসুরে। উত্তরায়ণের পথিক অন্তহীন মহাকাশের এই ধ্রুববিন্দুটিকে হারিয়ে ফেলে যদি, তাহলে অসার্থক হবে তার সাধনা, অস্তিত্বের মহাসমস্যাকে সে পাশ কাটিয়ে যাবে শুধু,— যে দিব্যব্রতের উদ্‌যাপনে তার শরীর-স্বীকরণ তা থেকে যাবে অপূর্ণ।

জীবের কাছে বিশ্ব ধরা দেয় প্রাণ রূপে। প্রাণ শক্তির তরঙ্গ-বিচ্ছুরণ; যে রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার অন্তরালে, জীবকে আয়ত্ত করতে হবে তার সবটুকু। বহুমুখী পরিণামের সংঘর্ষে সঙ্কুল, স্ফুটনোন্মুখ বিচিত্র শক্তির সংক্ষোভে উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাণের প্রকাশ; তারি মধ্য হতে জীবকে আবিষ্কার করতে হবে একটা সম্যক ঋতের ছন্দ, অনাগত সৌষম্যের একটা ঠাট। মানুষের প্রগতির এই না তাৎপর্য। এ তো শুধু জড়প্রকৃতির বাঁধা বুলিকেই একটু ভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা নয়। মনোময়ী প্রকৃতির উঁচু পর্দায় পশু-বৃত্তির আলাপ করতে পারলেই তো মনুষ্যজীবনের আদর্শ হল না সার্থক। তাই যদি হত, তাহলে যে জীবন-ব্যবস্থায় আছে বাইরের স্বাচ্ছন্দ্য মোটামুটি বজায় রেখে খানিকটা মানসিক তৃপ্তিরও বরাদ্দ, তার কূলে এসেই ঠেকে যেত আমাদের প্রগতি। পশু খুশি হয় প্রয়োজনের আংশিক তর্পণে; দেবতার তৃপ্তি ঐশ্বর্যের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাসে। কিন্তু মানুষ তো চির বিশ্রাম চায় না পথের ধারে, যতদিন না পরম শিবের সন্ধান্ মেলে তার। জীবের মাঝে সে-ই শ্রেষ্ঠ, কেননা অনির্বাণ তার দহনজ্বালা সঙ্কোচের পীড়ন সবার চেয়ে অসহন তারি কাছে; —অনাগতসিদ্ধির দিব্যোন্মাদ বুঝি নেমে আসে তারি বুকে শুধু।

জীব-ব্যক্তির মাঝেই নিহিত হয়ে আছে চিন্ময়-প্রাণের বিপুল সম্ভাবনা যত,—তাই জীব বিশেষ করেই 'মনু' বা 'পুরুষ' তার কাছে। এক-

মাত্র মনু-পুত্রেরই আছে ঈশ্বরকে আত্মবিগ্রহে মূর্ত করবার নিরঙ্কুশ সামর্থ্য। প্রাচীন ঋষিরা মানুষকেই বলতেন 'মনু' অর্থাৎ মনন যার স্বভাব; তাঁদের ভাষায় মানুষই 'মনোময় পুরুষ' অর্থাৎ মনোময়ী প্রকৃতিতে আবির্ভূত চিৎ-জ্যোতি। প্রাণি-বিদের পরিভাষা অনুসারে শুধু স্তন্যপায়ীর উন্নত সংস্করণ মাত্র নয় সে। জড়ের মাঝে পশুকায়াকে আশ্রয় করে মনন-ধর্মী চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তারি মাঝে, এই তার সত্য রূপ। বেদান্তের ভাষায় বলা চলে, মানুষ চেতন 'নাম', রূপকে সে স্বীকার করেছে তার আবশ্যক বাহন রূপে, যাতে তার ভিতর দিয়েই 'পুরুষ' হতে পারেন প্রাকৃত উপকরণের বিধাতা। জড়প্রকৃতি হতে উন্মেষিত পাশবপ্রাণের যে প্রকাশটুকু তার মাঝে, সে তার সমগ্র সত্তার অবর-ভাগ মাত্র। তারও পরে আছে তার মাঝে ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প ও সচেতন প্রৈতিতে স্পন্দমান একটা জীবন, সবশুদ্ধ যাকে আমরা বলি মন। এই মনই জড় ও প্রাণশক্তিকে হাতের মুঠোয় এনে মনোময় পরিণামের পর্বে পর্বে তাদেরও ঘটাতে চায় রূপান্তর; এই মনোভূমিই হল মানুষের জীবসত্তার মধ্যকাণ্ড, যেখানে দাঁড়িয়ে সে ঘটিয়ে তোলে যা-কিছু তার ঘটাবার। কিন্তু তারও পরে আছে তার সত্তার উত্তর-কাণ্ড; মানুষের মনোময়ী চেতনা তাকে খুঁজে ফিরছে প্রতিনিয়ত,—বীর্যকে তার আয়ত্ত করে দৈহ্য ও মানস সত্তায় সঞ্চারিত করবে বলে। এই যে একটা-কিছু আছে তার মাঝে যা তার বর্তমানকে গেছে ছাড়িয়ে, তাকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দেওয়াই হল মর্ত্য প্রকৃতির দিব্যজীবন-সাধনার অগ্নিমন্ত্র।

স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের যে মানসিক সংস্কার, তারও চেয়ে গভীর ভাবে নিজকে জানবার প্রতিভা যখন জাগে তার মাঝে, তখন তার চিত্ত চায় সেই সাধ্যবস্তুকে ধরবার কোন একটা সূত্র, তার কোন একটা রূপের স্পষ্ট অনুভব। কিন্তু তার চেতনায় সে-রূপ ভাসে যেন দুটি অভাব-প্রত্যয়ের মাঝে তটস্থ হয়ে। বর্তমানের সীমা ছাড়িয়ে কখনও পায় সে এক স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সত্তার শক্তি জ্যোতি ও আনন্দের ছোঁয়া বা অনুভব। সেই ছোঁয়াকে সে যখন তার মানসিক সংস্কারের অনুকূলে তর্জমা করে বলে, এই তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অনন্ত অমৃত, এই তো প্রমুক্তি-প্রেম-ও-আনন্দ-স্বরূপ, এই তো ঈশ্বর,—তখনও কিন্তু তার জ্যোতির্ময় অনুভবের সৌরদীপ্তি জ্বলে ওঠে দুটি অমানিশার করালছায়ার অন্তরালেই: এক অমানিশা তার পায়ের তলে, আর

এক গাঢ়তর অমা তার অনুভবের ওপারে। অনন্তকে নিঃশেষে জানবার আকূতিতে সে দেখে, তাকে ধরতে গিয়ে হারিয়ে গেছে অনুভূতির সকল সংজ্ঞা, কোনও সংজ্ঞা দিয়ে অথবা একসঙ্গে সকল সংজ্ঞা জড়িয়েও পরিচিতের ডোরে বাঁধা যায় না সে অধরাকে! তখন লোকোত্তর অনুভবের সর্বোত্তম সংজ্ঞা যে ঈশ্বর, তাকেও প্রত্যাখ্যান করে সে ঝাঁপ দেয় মহাশূন্যে; অথবা দেখে সে, তার ঈশ্বরও বুঝি অনিরুক্ত মহিমায় ছাড়িয়ে গেলেন আপনাকে, কোনও সংজ্ঞার বাঁধন পরলেন না তিনি!—এই তো লোকোত্তরের অমানিশা। আবার বর্তমান পরিবেশের পানে তাকিয়ে মানুষ দেখে, জগৎ জুড়ে অন্তরে-বাইরে কেবলই তার প্রদীপ্ত চেতনার প্রতিবাদ। মৃত্যু এখানে চিরসঙ্গী তার, সঙ্কোচের আড়ষ্টতায় কুণ্ঠিত তার জীবন ও অনুভব; ভ্রান্তি, দৌর্বল্য, জড়ত্ব, হতচেতনতা, শোক দুঃখ অনর্থ দ্বারা নিত্যলাঞ্ছিত তার সাধনা। তাই এখানেও বলতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে, কোথায় ঈশ্বর! অথবা মনে হয় তার, পরমদেবতা বুঝি তাঁর শাশ্বত সত্য-স্বরূপের বিপরীত কোনও প্রতিভাস বা পরিণামের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রয়েছেন নাস্তি হয়ে!

কিন্তু এই নাস্তি-প্রত্যয়ের হেতু নয় লোকোত্তর নাস্তিত্বের মত অকল্পনীয় অতএব স্বভাবতই মনের অগোচর একটা অনির্বচনীয় রহস্য। বরং মানুষের মনে হয়, এর তত্ত্ব জ্ঞানগম্য, জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট একটা কিছু—অথচ তার রহস্যও পুরোপুরি ধরা পড়ে না তার কাছে। এই যে অনৃতের জঞ্জাল স্তূপাকার হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে, তারা কী, কোথা হতে এসেছে, কেনই বা আছে—কিছুই বোঝে না সে। চেতনায় ভেসে উঠে দোল দিয়ে যায় তারা—এই চলনটুকুই চোখে পড়ে শুধু, কিন্তু তাদের তত্ত্বরূপ থেকে যায় বুদ্ধির অগোচর।

হয়তো তারাও অপ্রমেয়, হয়তো বুদ্ধির কাছে কোনদিনই ধরা পড়বে না তাদের তত্ত্ব। অথবা এমনও হতে পারে, কোনও, তাত্ত্বিক রূপই নাই তাদের;—তারা শুধু বিভ্রম, শুধু শূন্য—এই তাদের সম্পর্কে চরম কথা। লোকোত্তর নাস্তিত্ব কখনও আমাদের কাছে ফোটে শূন্য হ'য়ে, অসৎ হ'য়ে; সম্ভবত এই ব্যবহারিক নাস্তিত্বের বঞ্চনাও তাই—এ-ও শূন্য, এ-ও অসৎ। কিন্তু ওপারের রহস্যকে অসৎ বলে উড়িয়ে দিয়ে তুরীয়ানুভবের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে আমরা রাজি নই যেমন, তেমনি এখানকার রহস্যকেও তো নস্যাৎ করতে পারিনা শূন্যবাদ দিয়ে। এ জগৎ সত্যের শাশ্বত দীপ্তিতে উজ্বল হয়ে প্রতিভাত হচেছ না বলে এর বাস্তবতাকেই পুরোপুরি অস্বীকার

করা অথবা একে পরিহার করে চলা সর্বনাশা বিভ্রম-জ্ঞানে—এতে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু, জীবনের সাধনাকে বরণ না করে বীরের মত। হতে পারে. এ সমস্তই অশাশ্বত ক্ষণিকের মেলা—দিব্যভাবের মূর্ত প্রতিষেধ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিপরীত প্রত্যয় এরা ; কিন্তু তবু জীবনের কাছে এরা যে বাস্তব, বিশ্বপ্রাণের এও যে একটা সত্যিকার তরঙ্গদোলা, তাও তো অনস্বীকার্য। বিশ্বে আঁধারের ছায়ানৃত্যই তো নয় শুধু , আলোও যে আছে তার বুকে—আছে কল্যাণ জ্ঞান আনন্দ সুখ বল বীর্য অভ্যুদয়, আছে প্রাণের জয়যাত্রা ;—এ সমস্ত নিয়েই তো বিশ্বপ্রাণের খেলা।

এ-ও হতে পারে, ব্যবহারিক জীবনের পদে পদে এই যে অনর্থ-প্রত্যয়, শুধু একটা অনির্বচনীয় বিভ্রমের লীলা নয় এ। সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধবৈকল্যের এ হয়তো একটা অপরিহার্য পরিণাম ; আর সে বৈকল্যের মূল নিহিত আছে বিশ্বের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার মাঝে। সেই ভ্রান্তিই আবার ব্রহ্ম ও জগৎ, জীব ও তার পরিবেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে বিকৃত। মানুষ যা হয়েছে আজ, তার সঙ্গে তার নিত্য-পরিচিত পরিবেশ অথবা আদর্শ ও নিয়তির কোনও মিলই খুঁজে পায় না সে ; তাই বিশ্বের মর্মসত্যের সঙ্গে বহির্জগতের একান্ত বিরোধ ও বিপর্যয়টাই বড় হয়ে তার চোখে পড়ে। তাহলে কিন্তু জীবধর্ম্মের কুণ্ঠা নিয়ে জগতে আসাটা আদর্শ-চ্যুতির দণ্ড নয় তার, বরং এই হল তার ভবিষ্য প্রগতির সাধন। এই নিয়েই তো তার জীবনসাধনার শুরু, এই পণেই তো তাকে জিনে নিতে হবে যাত্রাশেষের বিজয়মালা—তার এই তপস্যার রন্ধ্র-পথেই তো প্রকৃতি জড় হতে চেতনায় পেল মুক্তি ; অতএব মানুষের এই বৈকল্যই অপরাপ্রকৃতির মুক্তিপণ এবং পুঁজি একাধারে।

সত্যসম্বন্ধের এই বিকলতা হতে এবং তাকে দিয়েই আমাদের জানতে হবে সত্যকে। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা' আমরা পাব অমৃতসম্ভোগের অধিকার। বেদ তাই সান্ধ্যভাষায় বলেছেন বিশ্বের সেই গোপন শক্তিদের কথা, যারা দুষ্প্রবৃত্তিশালিনী বিপথচারিণা পতির অহিতকারিণী নারীদের মত নিজেরা অসত্য ও অসুখী হয়েও শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলে এই 'বৃহৎ সত্যকে'—আনন্দই যার স্বরূপ। তাই, মানুষ যখন আর আত্মপ্রকৃতির কলুষের উচ্ছেদ করতে চাইবে না পুণ্য-সাধনার অস্ত্রোপচারে,অথবা জীবনকে বিভীষিকা ভেবে আতঙ্কে ছিটকে পড়বে না তার থেকে ;—বরং কঠিন বীর্যের সাধনায়

যখন মৃত্যুকেই রূপান্তরিত করবে সে প্রাণের দীপ্ত মহিমায়, সঙ্কুচিত মানবতার তুচ্ছতাকে উত্তীর্ণ করবে দিব্যভাবের ভূমানন্দময় ঐশ্বর্যে, বেদনাকে দেবে চিন্ময় আনন্দের রূপ, অশিবের অন্তর হতে ফুটিয়ে তুলবে তার শিবময় সার্থকতা, প্রমাদ ও মিথ্যাকে পরিণত করবে অন্তর্গূঢ় সত্যের অনাবরণ ঋজুতায়,—তখনই তার জীবনযজ্ঞে পড়বে পূর্ণাহুতি, তার যাত্রাশেষের পরমক্ষণে দ্যুলোক আর ভূলোক সামরস্যের সুরে বাঁধা পড়ে তুর্যাতীতের আনন্দ ধারায় হবে অভিষিক্ত।

তবু প্রশ্ন জাগে, এপারে-ওপারে এই যে দারুণ বিরোধ, কী করে তাদের মেশামেশি সম্ভব তবে? কোন্ পরশমণির ছোঁয়ায় এই মর্ত্যভাবের লোহা দিব্যভাবের সোনায় হবে রূপান্তরিত?...কিন্তু কোনও বৈষম্য যদি নাই থেকে থাকে তাদের স্বরূপ সত্তায়? যদি একই পরমাথসতের বিভূতি হয়ে থাকে তারা, যদি কোনও ভেদ না থাকে তাদের ধাতু-প্রকৃতিতে? তাহলে তো মর্ত্যভাবের দিব্য-রূপান্তর অসম্ভব নয়।

পূর্বেই বলেছি, আমরা লোকোত্তর অসৎ বলি যাকে, বস্তুত তার স্বরূপ অলীক নয়; সত্তারই একটা অকল্প্য ভূমি সে, হয়তো অনির্বচনীয় আনন্দই স্বরূপ তার। এই লোকোত্তর অসতের মাঝে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস রূপ ধরেছে বৌদ্ধ নির্বাণে, মানুষের দুঃসাহসী সাধনার ইতিহাসে যার ভাস্বর মহিমা থাকবে চির অম্লান। জীবন্মুক্ত দেবমানবের চেতনায় সে নির্বাণের অনুভব ফোটে অনির্বচনীয় শান্তিতে, হ্লাদিনীর অপরূপ উল্লাসে; জীবনে তার সাথকতা দেখা দেয় অন্তরে-বাইরে অহংবৃত্তির পরিপূর্ণ নিরোধে, সকল দুঃখের আত্যন্তিক প্রলয়ে। এ অনুভবের নাই কোনও ইতি-রূপ; তবু তার সংজ্ঞা দিতে চাই যদি, বলতে পারি—এ শুধু অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য চিন্ময় আনন্দ মাত্র, যার মাঝে আত্মসত্তার অনুভবও তলিয়ে যায় কোন্ অতলে। কিন্তু নির্বাণের শান্তি এমনই নির্বিষয় ও অনুত্তরঙ্গ যে তাকে চিন্ময় আনন্দের সংজ্ঞা দিয়েও ব্যক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। অসৎ সচ্চিদানন্দেরই সেই অনুত্তর প্রলয়-ভূমি, সৎ চিৎ এবং আনন্দ বলেও আমরা ইতি করতে পারি না যার, কেননা এ ভূমিতে ঘটে সমস্ত সংজ্ঞার উচ্ছেদ, কোনও বিজ্ঞান-বৃত্তিই অবশিষ্ট থাকে না আর।

আবার একথাও বলেছি আমরা, এক অখণ্ড পরমাথ-সৎ ছাড়া আর কিছু না থেকে থাকে যদি কোথাও, তাহলে অনুভবের এই যে অবর কোটি আমাদের, যার মাঝে সচ্চিদানন্দের কোনও আভাস নাই বরং আছে বিরুদ্ধ-

প্রত্যয় শুধু, তাকেও তো আর-কিছু বলতে পারি না সচ্চিদানন্দ ছাড়া। নাস্তি প্রত্যয়ে ডুবে গিয়ে সচ্চিদানন্দকে কোথাও দেখতে পায় না যে অবর অনুভব, সেও যে সচ্চিদানন্দেরই বিভূতি, এশুধু বুদ্ধিযোগ বা অধ্যাত্মদর্শন দ্বারা নয়, এই ইন্দ্রিয়সংবেদন দ্বারাও উপলব্ধি করা চলে। আমাদের নিত্যজাগ্রত চেতনায় এই পরমসত্যের অনুভব ব্যাহত হত না কোথাও, যদি মায়া অথবা অবিদ্যার দুর্নিবার অভিনিবেশবশত একটা অনাদি অধ্যাসের করালছায়ায় আমাদের দৃষ্টি না হত অন্ধ। এই দিক দিয়ে বিশ্বসমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় হয়তো। জানি, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিকের তর্কবুদ্ধি খুশি হবে না সে সমাধানে, কেন না এবার আমরা এসে দাঁড়িয়েছি অবিজ্ঞেয়ের অতর্ক অনির্বচনীয় রহস্যের উপান্তে—তীক্ষ্ণদৃষ্টির উদ্যত আকূতি নিয়ে। কিন্তু অপ্রমেয় রহস্যের ব্যঞ্জনায় যদি না-ও থাকে তর্কবুদ্ধির সায়, তবুও দিব্যজীবন-সাধনার একটা অনুভব-গোচর সুস্পষ্ট সঙ্কেত হতে তো আমরা বঞ্চিত হব না এবার।

তারি জন্যে মনের সুপরিচিত সংস্কারের চিরাভ্যস্ত আরামটুকু ভেঙে অসীম দুঃসাহসে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আরও গভীরে, অজানার স্তব্ধ বিপুল রহস্যকে চকিত করে ডুবে যেতে হবে চেতনার দুরবগাহ অতলতায়, যা-কিছু আপাত-পরকীয় ছিল এতদিন, তাকেও করতে হবে আত্মসাৎ লোকোত্তর মহাভূমির পরিচয় নিতে। মানুষের ভাষা কতটুকু কাজে লাগে এই উদগ্র এষণায়? তবু হয়তো তারি মাঝে আমরা খুঁজে পাব অজানার দু-একটি প্রতীক, অরূপের এক আধটি রূপরেখা—আভাসে ফুটিয়ে তুলব অব্যক্তের এতটুকু ব্যঞ্জনা, যা সন্ধানী চেতনার দীপকে করবে আর-একটু উজ্জ্বল, ওপারের অনির্বচনীয় বর্ণরতির একটুখানি ছায়াসুষমা দোলাবে মনের 'পরে।

৭

# অহং এবং দ্বন্দ্ব বোধ

একই বৃক্ষে আসীন পুরুষ ডুবে আছে মুহ্যমান হয়ে—ঈশনা নাই বলে যত শোক তার, কিন্তু আবিষ্ট হয়ে যখন দেখতে পায় সে আর একটি পুরুষকে যিনি সবার ঈশ্বর এবং তাঁরও মহিমা, তখন চলে যায় তার সকল শোক।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।৭)

সমস্তই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই যদি হয় সত্য, তাহলে মৃত্যু দুঃখ অনর্থ সীমার সঙ্কোচ এরা ও বিকৃত চেতনার সৃষ্টি শুধু। ব্যবহারিক জীবনে তারা বাস্তব বলে অনুভূত হলেও তত্ত্বত তারা অসৎ। আত্মসংবিতের সর্বসমঞ্জস সম্যক-অনুভব হতে স্খলিত হয়ে চেতনা আমাদের জড়িয়ে গেছে খণ্ডিত-অনুভবের প্রমাদজালে, তাই তার মাঝে দেখা দিয়েছে বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের এই বিকৃতি। ইহুদি ধর্মশাস্ত্রের 'উৎপত্তি-প্রকরণে' কবিত্বের ভাষায় একেই বর্ণনা করা হয়েছে 'আদি-মানবের স্খলন কথা' রূপে। নিজকে এবং ঈশ্বরকে, অথবা নিজেরই মাঝে ঈশ্বরকে শুদ্ধসংবিতের পরিপূর্ণতা দিয়ে অনুভব করার অসামর্থ্য, এবং তারি ফলে বিভাজ্য-বৃত্তি চেতনার অধ্যাসে জীবন-মরণ শিব-অশিব আনন্দ-বেদনা ও পূর্ণতা-ন্যূনতার দ্বন্দ্বে বিধুর জীবনের অস্বস্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া—এই তো আদি-মানবের স্খলন। খণ্ডিতচেতনার এই পরিণামই বাইবেলের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল', যা খেয়ে পুরুষ-প্রকৃতি-রূপী আদম ও ঈভ্ স্খলিত হল নন্দনবন হতে—চিরম্লান হল পুরুষের স্বারাজ্যের মহিমা প্রকৃতির প্ররোচনায়। তারপর ব্যক্তির মাঝে বিশ্বানুভবের উন্মেষে অন্ন-ময়ী চেতনায় চিন্ময়ী-দ্যুতির স্ফুরণে ঘটল তার শাপমোচন। তখন প্রকৃতিস্থ পুরুষ আবার পেল অনন্ত প্রাণের 'স্বাদু-পিপ্পল' ভোজনের অধিকার, দিব্য-পুরুষের সাযুজ্যলাভে হল সে চিরঞ্জীব। এমনি করেই সার্থক হয় তার পার্থিবচেতনার গহনগুহায় অবতরণ—যখন সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ অর্থ-অনর্থের

সম্যক-বিজ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসে সেই পরাবিদ্যার আবেশে, যা এসব বিরুদ্ধপ্রত্যয়ের সমন্বয়ে বিশ্বচেতনার ভূমিকায় গড়ে তোলে একরস একটি প্রত্যয়, তাদের খণ্ডতাকে রূপান্তরিত করে অখণ্ড-সত্যের চিদ্‌ঘন বিগ্রহে।

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দই ছড়িয়ে আছেন এই নিখিলে সর্বসম বিশ্বাত্ম-বোধের উদারতম সামানাধিকরণ্যে ; তাই মৃত্যু দুঃখ অনর্থ বা সীমার সঙ্কোচ তাঁর কাছে জ্যোতির্ময় দিব্য ভাবনারই তির্যক বিলাস বা ছায়ানৃত্য মাত্র। আমাদের চেতনায় বেসুরা হয়ে বেজে ওঠে এরা : অখণ্ড-বোধের জায়গায় আনে খণ্ডতার পীড়া, ব্যামোহ এবং প্রমাদে আবিল করে বুদ্ধির প্রসন্ন স্বচ্ছতা ;—বৃহৎ সামের মাধুরী স্বত-উৎসারিত হয়ে উঠবে যেখানে সুরসঙ্গতির সমগ্রতায়, সেখানে বিবিক্ত সুরলীলার স্বাতন্ত্র্যকেই করতে চায় মুখরিত। একটি রাগিণীতে বাঁধা যায় যদি বিশ্বের সকল স্পন্দন,—এমন কি চেতনার স্থূল প্রকাশের অন্তরালে এবং তাকেও ছাড়িয়ে রয়েছে যে গভীরতর প্রৈতি তার সম্যক-অনুভব না পেয়েও যদি সম্ভবপর হয় একটা সমগ্রতার কল্পনা, তাহলেও সে-সমগ্রতাবোধের মাঝে থাকবে বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের সংঘর্ষকে সৌষম্যের ছন্দে ফুটিয়ে তোলারই প্রয়াস। কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপত বিশ্বোত্তীর্ণ অতএব বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের দ্বন্দ্বকে সত্য মানলেও তাঁর মাঝে তার আরোপ চলে না কিছুতেই। যা বিশ্বোত্তীর্ণ, বেদের ভাষায় তা 'সুরূপকৃত্নু', ত্বষ্টার রূপ-দক্ষতা আছে তার মাঝে ; তাই বিরোধের সমন্বয় ঘটায় না সে,—অরূপের পরশমণি ছুঁইয়ে রূপান্তরিত করে তাদের লোকোত্তরের অপরূপতায়, নিঃশেষে লুপ্ত করে বিরোধের শেষ চিহ্নটুকু।

সবার আগে, ব্যক্তির চেতনাকে বাঁধতে হবে সমগ্রতার সুরে, নইলে কিছুতেই হবে না জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের সমাধান। গোড়াতেই একটা ধারণা স্পষ্ট হওয়া চাই। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা বিশ্বের তত্ত্ব-নিরূপণ করছে যে-সংজ্ঞা দিয়ে, মানুষের ব্যবহারিক অনুভব ও প্রগতির পক্ষে তা পর্যাপ্ত হলেও, কিছুতেই বলা চলে না বিশ্বের পক্ষেও এই সংজ্ঞাই পর্যাপ্ত, কিংবা তার চরম তত্ত্বের এই হল সত্য পরিচয়। যে ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থ্য নিয়ে জগৎটাকে দেখছি এখন, তার চাইতেও সুন্দর সমগ্রদৃষ্টিতে তাকে দেখা যায় এমন নূতনতর ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যের উন্মেষ আশ্চর্য নয় কিছুই। তেমনি সমনী অথবা উন্মনী ভূমি হতেও নিখিল বিশ্বকে এমন একটা ভঙ্গিতে দেখা সম্ভব, যা আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে। এমন ভূমিও আছে চেতনার,

যেখানে মৃত্যু শুধু অমৃতজীবনে উত্তরণ, বেদনা শুধু বিশ্বের আনন্দ-জোয়ারের তীব্র উচ্ছ্বাস, সীমা শুধু অসীমের নিজের মাঝেই কুণ্ডলী রচনা, অশিব শুধু শিবেরই পরিপূর্ণ মহিমাকে ঘিরে চক্রাবর্তন। এ কেবল সামান্য-গ্রাহী-চিত্তের বিকল্প নয়; এর প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে, জাগ্রত অনুভবের নিত্য নিবিড়তায়। চেতনার এই-সব ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া যে জীবের আত্মসম্পূর্তি-সাধনার মুখ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দ্বৈতদর্শী ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ মন বিশ্বের যে ব্যবহারিক মূল্য নিরূপণ করেছে ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহায়ে, তার উপযোগিতার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে নিশ্চয়ই। সাধারণ জীবনে ব্যবহার-বুদ্ধির এই আদর্শকে মানা যায় ততদিন, যতদিন আমরা না পাই সৌষম্যের এমন একটা বৃহত্তর ভূমি যার মাঝে ব্যবহার-বুদ্ধির গোত্রান্তর ঘটলেও তার বস্তু-নিষ্ঠার ঘটে না কোনও বিপর্যয়। সাধনার ফলে শুধু ইন্দ্রিয়শক্তিরই উৎকর্ষ ঘটে যদি, অথচ চিত্ত জ্ঞানের এমন কোনও ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় যেখানে নূতন দর্শনের আলোকে পুরাতন অনুভবও ফুটে ওঠে উজ্জ্বলতর হয়ে;—তাহলে শক্তিলাভও হতে পারে নিদারুণ বিপর্যয় ও অশক্তির নিদান, বুদ্ধির সুষ্ঠু ও সংযত প্রবৃত্তিকে উদ্ভ্রান্ত করে ব্যবহারিক জীবনে আনতে পারে ক্লৈব্যের অভিশাপ। তেমনি অহং-কবলিত দ্বৈতবুদ্ধির বেষ্টনী ছাড়িয়ে মনের চেতনাও যদি অখণ্ড-চেতনার বিশিষ্ট কোনও বিভাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সৌষম্যের ছন্দ না জেনেই, তাহলে তারও ফলে বুদ্ধির বিপর্যয় এসে মানুষের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে করতে পারে কুণ্ঠিত—ব্যবহার-জগতের সাবলীল গতির যতি ভঙ্গ করে। এই জন্যই গীতায় উপদেশ, যিনি বিজ্ঞানী তাঁর উচিত নয় অজ্ঞানীর কর্ম্ম ও চিন্তার জগতে বিপ্লব এনে তার বুদ্ধিভেদ ঘটানো। কারণ, অজ্ঞানী স্বভাবতই বিজ্ঞানীর আচারের অনুকরণ করতে চাইবে তাঁর কর্ম্মযোগের রহস্য না জেনেই; তাতে তারা পরতর ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে স্বধর্ম্ম হতেই ভ্রষ্ট হবে শুধু।

অধ্যাত্মজগতে এমন বিপর্যয় ও অশক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করে নেন অনেক মহাপুরুষ—শুধু সাময়িক একটা সাধনক্রম হিসাবে; কাউকে হয়তো এই মূল্য দিয়েই পেতে হয় ব্যাপ্তি-চৈতন্যের অধিকার। কিন্তু নিখিল-মানবের প্রগতির অভিযান এ পথ ধরে নয়। তার লক্ষ্য, সত্যের সর্বসমন্বয়ী রূপটি আবিষ্কার করে তার বীর্যকে সার্থক করা বাস্তব কর্ম্মে—জীবনের নবীন ব্যঞ্জনায়। তাই ব্যাপ্তি-চৈতন্যের ঋতকে মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সত্যের অভিনব

রূপায়ণে, তার প্রবুদ্ধ চিত্তের দুর্ধর্ষ সংবেগ বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবসৃষ্টির সার্থক উপাদান রূপে—এই হবে তার সাধনা। স্থূল ইন্দ্রিয় দেখে, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে ; এই আপাত-দর্শনই এতদিন ছিল মানুষের ইন্দ্রিয়জীবনের কেন্দ্র, তাকে ভিত্তি করেই সে সাজিয়ে নিল তার চলন্ত সংসার। আসল সত্য এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কিন্তু সে সত্যের আবিষ্কার কোনও কাজেই লাগত না মানুষের, যদি তাকে কেন্দ্র করে, এমন, একটা বিজ্ঞান গড়ে না উঠত যা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত করতে পারে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিযুক্ত তথ্যের সঙ্কলনে। তেমনি মানসী চেতনা দেখে ঈশ্বর ঘুরছেন আমাদের ব্যষ্টি-অহংকে ঘিরে। অতএব তাঁর বিধি-বিধানকে আমরা বিচার করি আমাদেরই অহমিকা-দুষ্ট চেতনা বেদনা ও ভাবনা দিয়ে ; এমন-সব অর্থের আরোপ করি তাদের 'পরে, বস্তুত যা সত্যের বিকৃত ও বিপর্যস্ত রূপ, অথচ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রগতিকে কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিতে সাহায্যই করে তারা। ভাব ও কর্ম্মের একটা বিশিষ্ট জগতে আমাদের চলাফেরা যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও গলদ ধরা পড়ে না বিশ্ববিধানের এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যাতে, কেননা তার মাঝে ব্যবহারিক অনুভবকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা চলনসই রূপ দিয়েছি আমরা। কিন্তু বিশ্বের এই বস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যাতে কিছুতেই ফুটাতে পারে না মানুষের জীবন এবং উপলব্ধির চরম ও পরম রূপটি। 'সত্যের পথেই চলতে হবে, অসত্যের পথে নয়।' এ তো সত্য নয় যে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে বিশ্বজীবনের কেন্দ্র করে ঈশ্বর ঘুরছেন তার চারদিকে, অতএব দ্বন্দ্ববোধজর্জরিত অহং দিয়েই বিচার চলে তার। বরং সত্য হল এই যে পরম পুরুষই বিশ্বের কেন্দ্র ; ব্যক্তির অনুভব তার সত্যস্বরূপটি জানতে পারে তখনই যখন বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণের নিরিখে পায় সে তার পরিচয়। তবু বিজ্ঞানের ভিত্তিকে পাকা না করে হঠাৎ যদি বিশ্বাত্মবোধের ভার চাপানো যায় কাঁচা আমির 'পরে , তাতে নতুন ভাব এসে পুরানো ভাবের ঠাঁই জুড়বে বটে, কিন্তু সে আসবে মিথ্যার ছাপ নিয়ে খাপ-ছাড়া হয়ে,—কেননা এই আকস্মিকতার ধাক্কায় ঘটবে সত্যেরই বিপর্যয়, তাই ঋতের ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশই পাবে না সে। এমন বিপর্যয় হতেই অনেক সময় সূচনা হয় নূতন দর্শন ও নূতন ধর্মের, সমাজে দেখা দেয় সার্থক বিপ্লব। কিন্তু সত্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে, একটি ঋতময় ভাবকে কেন্দ্র করে ঘটাতে হবে বুদ্ধিযোগের সঙ্গে কর্ম্মযোগের এমনই উদার সামঞ্জস্য যাতে

ব্যক্তির অহংএর কাছে সকল বিত্তই তার ফিরে আসে পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে। এমনি করেই পাব আমরা সত্যের অভিনব রূপায়ণের সিদ্ধ-মন্ত্র, যা আমাদের এই মর্ত্যজীবনে স্ফুরিত করবে দিব্য-মহিমার ব্যঞ্জনা, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বৃত্তিতে ঢালবে দিব্যভাবনার সেই অমোঘ বীর্য যা বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবসৃষ্টির সার্থক উপাদানরূপে।

অখণ্ড মানবতার মাঝে এমনি করে উদ্দীপ্ত হবে প্রাণের নববীর্য, যখন মানুষ পাবে সেই মহাসত্যের অপরোক্ষ পরিচয় যা পরমপুরুষের দিব্য-প্রকৃতিকে চেতনায় ফুটিয়ে তোলে আমাদেরই ভাবধারার প্রতিরূপ করে। দিব্যভাবের এই সাধনায় অহংকে ছাড়তে হবে যত তার মিথ্যা দৃষ্টি ও মিথ্যা সংস্কারের নিরূঢ় অভিমান, ঋতঃ-সুষমার ছন্দ মেনে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে সেই অখণ্ডের মাঝে যার খণ্ডবিভূতিমাত্র সে, উত্তীর্ণ হতে হবে সেই তুরীয়ধামে যেখান হতে সে নেমে এসেছে এই মাটির বুকে। এমনি করে সকল বিকল্পনার অতীত যে সত্য ও ঋত, তারি কাছে আপনাকে অসঙ্কোচে মেলে ধরে সেই সত্যেরই মাঝে পেতে হবে নিজের চরম সিদ্ধি, সেই ঋতের ছন্দেই খুঁজতে হবে নিজের পরম মুক্তি। এ সাধনার লক্ষ্য হবে—অহংদৃষ্টির সকল বিকল্প ও সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ; দুঃখ অশিব মৃত্যু অবিদ্যা—আধারের সকল সঙ্কোচকে প্রমুক্তির উল্লাসে ছাড়িয়ে যাওয়াই হবে সাধকের পরম পুরুষার্থ।

এই পৃথিবীর বুকে সিদ্ধ হবে না কখনও ঐ উচ্ছেদ ও উত্তরণের সাধনা, যদি এখনকার মত জীবন তার জড়িয়ে থাকে অহং-দুষ্ট সংস্কারের জালে। যদি বিশ্বাস করি: বস্তুত এ জীবন বিবিক্ত ব্যক্তিচেতনার একটা প্রতিভাস মাত্র, এর মূলে নাই কোনও বিশ্বব্যাপ্ত সত্তার অধিষ্ঠান, কোনও চিন্ময় 'মহদ্-ভূতের নিঃশ্বসিতে' এ নয় সঞ্জীবিত; বিষয়-সংস্পর্শে ব্যক্তি-চেতনায় জাগে যে দ্বন্দ্ববোধের সাড়া, শুধু বাইরের সাড়াই নয় সে—সমস্ত প্রাণনের মর্মসত্য এবং নিরূঢ় ধর্মও প্রকাশ পায় ঐ সাড়াতে; দেহ-প্রাণ-মনের যে-ধাতুতে গড়া আমাদের এই আধার, সঙ্কোচবৃত্তিই অনুচ্ছেদ্য প্রকৃতি তার;-মরণে পঞ্চভূতের বিশ্লেষ—এই হল জীবনের একমাত্র পরিণাম; জীবনের যাত্রা শুরু মরণ হতে এবং তারি মাঝে অবসান তার; সমস্ত ইন্দ্রিয়সংবেদনেই আছে সুখদুঃখের অবিচ্ছেদ্য দ্বন্দ্বলীলা, সমস্ত বেদনার মাঝে হর্ষশোকের আলো-ছায়া, মানুষের সকল জিজ্ঞাসা নিত্য-আবর্তিত হয়ে চলেছে শুধু সত্য ও

প্রমাদের দুটি মেরুবিন্দুর অন্তরালে ;—এই যদি হয় আমাদের মজ্জাগত প্রত্যয়, তাহলে উত্তরণের পথ আমাদের খোলা আছে শুধু দুটি দিকে—হয় সকল সত্তার অতীত মহাশূন্যে মনুষ্যজীবনের মহাপরিনির্বাণে, নয়তো এই মাটির বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া কোনও লোকান্তরে বা বৈকুণ্ঠধামে।

অতীত-বর্তমানের সংস্কারজালে জড়িত প্রাকৃত-মনের পক্ষে একথা কল্পনা করা খুব সহজ নয় যে, এই মর্ত্য-আধারে থেকেই আমূল রূপান্তর ঘটতে পারে মানুষের—তার আড়ষ্টকঠিন পরিবেশের বন্ধন কাটিয়ে। মানুষের সম্ভাবিত পরিণামের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে আজও তার ধারণা কতকটা ডার্‌উইন-কল্পিত 'নরাদি' বানরেরই অনুরূপ। আদিম অরণ্যের শাখাবিহারী বানরের সহজ চেতনায় এ কল্পনা কোনমতেই জাগতে পারে না যে একদিন এই ধরা পৃষ্ঠেই এমন কোনও জীবের আবির্ভাব হবে, যে তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতির সকল উপকরণের 'পরে খাটাবে 'বুদ্ধি' নামক একটা নূতন বৃত্তির প্রশাসন, এবং তারি শক্তিতে সে নিয়ন্ত্রিত করবে তার চিরাভ্যস্ত সকল সংস্কার, বহির্জীবনের পরিবেশে আনবে অকল্পনীয় রূপান্তর, শাখা-সঞ্চরণ ছেড়ে হবে পাষাণহর্ম্যের অধিবাসী, প্রকৃতির গোপন ঐশ্বর্য করায়ত্ত করে সমুদ্রে জমাবে পাড়ি, আকাশে মেলবে পাখা, ধর্মসংহিতার বিধান দিয়ে গড়বে সমাজ, নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে আবিষ্কার করবে সচেতন চিত্তের সহস্র সাধনা ! বানর-চিত্তে এমন জীবের কল্পনা যদিও বা জাগে, তবু প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের অথবা অন্তর্গূঢ় সঙ্কল্পের দীর্ঘ তপস্যায় সে যে নিজেই ঐ জীবে পরিণত হবে কোনদিন, এ তার ভাবনারও অগোচর। কিন্তু মানুষের মাঝে স্ফুরিত হয়েছে বুদ্ধি, দেখা দিয়েছে বোধি ও কল্পনার অপূর্ব ঝলক। অতএব নিজের চাইতে উন্নততর জীবনের কল্পনা কঠিন নয় তার পক্ষে ; এমন কি সে যে নিজেই বর্তমানের গণ্ডি পেরিয়ে কোনদিন উত্তীর্ণ হতে পারে ঐ অনাগত জীবনের মহত্তর পরিবেশে—এমন স্বপ্ন দেখাও তো নয় তার অসঙ্গত। তাই তার মহাভূমির কল্পনায় মিলেছে এসে চিত্তের যা-কিছু অনুকূল বেদনীয়, সহজাত অভীপ্সার যা-কিছু কাম্য তার চরম : সেখানে আছে জ্ঞানের দিব্যবিভা—প্রমাদের লেশমাত্র ছায়াতে তা নয় কলঙ্কিত ; আছে অনাবিল আনন্দ, দুঃখের ছোঁয়াচ এতটুকু ম্লান করতে পারে না তাকে ; আছে নিরঙ্কুশ বীর্য, যাকে ছুঁয়েও যেতে পারে না অসামর্থ্যের লাঞ্ছন ;—এমনি করে সে জীবনে আছে শুধু নিষ্কলুষ শুভ্রতা ও অকুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের অদীন অনুভব।

—এই তো মানুষের দেবতার কল্পনা, এই তো তার স্বর্গের ছবি। কিন্তু এ ছবি মূর্ত হবে এই পৃথিবীর বুকে, রূপ ধরবে ভবিষ্য মানবের সমাজে—তার বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয় এমন কল্পনায়। বস্তুত দেবতা ও স্বর্গের স্বপ্ন নিজেরই পুরুষার্থসিদ্ধির স্বপ্ন তার; কিন্তু সে স্বপ্নকে এই বাস্তবের বুকে সফল করে তোলাই যে তার চরম নিয়তি, একথা স্বীকার করতে সে ভয় পায় সেই তার বানরগোত্র পূর্বপুরুষেরই মত—যে হয়তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না অনাগত মানবের মহতী সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তারি মাঝে। মানুষের কল্পনা ও অধ্যাত্ম-পিপাসা ঐ লোকাতীত আদর্শকে যদিও বা জাগিয়ে রাখে চিত্তের নিরালায়, তবু তার সজাগবুদ্ধির দাপটে নিমেষে মিলিয়ে যায় বোধি ও কল্পনার লোকোত্তর বিলাস। তখন গম্ভীরচিত্তে ভাবে সে, এ তার কুসংস্কারের ঝলমলানি শুধু, জড়বিশ্বের নিরেট তথ্যের সঙ্গে কোথায় এর সঙ্গতি? ...এ ধরণের কল্পনা চিত্তে তার খানিকটা প্রেরণা জোগায় তবু অসম্ভাবিতের স্বপ্নছবিরূপে; কিন্তু সে জানে, বাস্তবিক যা সম্ভব ও সাধ্য তার পক্ষে সে হল নৈমিত্তিক জ্ঞান সুখ শক্তি ও কল্যাণের একটা সীমিত ও অনিশ্চিত বরাদ্দকে হাতের মুঠোয় পাওয়া কোন রকমে।

এমনি করে প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকোত্তরের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেও, তার মর্মে মর্মে কিন্তু জড়িয়ে আছে লোকোত্তরেরই আবেশ। বুদ্ধির স্বরূপ ও লক্ষ্য হল বিদ্যার এষণা, অর্থাৎ প্রমাদরহিত সত্যের উপাসনা। সত্যের সন্ধানে প্রমাদের মাত্রাকে ক্রমে হ্রস্ব করেই যে খুশি সে, তা তো নয়; সে বিশ্বাস করে একটা নির্ভাজ সত্যের প্রাক্-সত্তাতে, যার অস্তিত্ব অবধারিত বলেই প্রমা এবং অপ্রমার দ্বন্দ্বে দুলেও আমরা এগিয়ে চলেছি তারি পানে। বুদ্ধির এ বিশ্বাসই সূচিত করে লোকোত্তরের প্রতি তার শ্রদ্ধা। মানুষের অন্যান্য অভীপ্সার প্রতি বুদ্ধির যে সহজাত শ্রদ্ধার অভাব তার কারণ, স্বত-উৎসারিত কোনও প্রাতিভ দীপ্তির আলোকে দীপ্ত নয় তারা তার ব্যবহার জগতের স্বাভাবিক চলাফেরার মত। নির্ভাজ সুখের চূড়ান্ত অনুভব কল্পনায় আসে আমাদের; কেননা সুখের আকূতি হৃদয়ের সহজধর্ম বলে সে সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা একটা নিশ্চিত প্রত্যয় আমাদের আছে, এবং কামনার যে অপরিতৃপ্তি দুঃখের আপাত-নিদান, তার উচ্ছেদও আমাদের মনের পক্ষে অভাবনীয় নয় একেবারে। কিন্তু নাড়ীচক্রের সংবেদন হতে বেদনাবোধের বিলুপ্তি, অথবা দৈহ্য-জীবন হতে মরণ-সম্ভাবনার উচ্ছেদ কল্পনা করা যায় কী করে?

অথচ বেদনাকে প্রত্যাখ্যান করা ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহজ ধর্ম; প্রাণচেতনার মর্মে নিরূঢ় হয়ে আছে মরণকে অস্বীকার করবার একটা প্রচণ্ড আকূতি।··· কিন্তু বুদ্ধি একে মনে করে শুধু মূঢ় অভীপ্সার আকুলিবিকুলি; এর সার্থক হবার এতটুকু সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করে না সে।

অথচ সব জায়গায় খাটবে একই নিয়ম, এই তো সঙ্গত। ব্যবহারিক বুদ্ধির গলদ এইখানে। চোখের সামনে ঘটছে বলে যা সদ্য-বাস্তব হয়ে ওঠে তার কাছে, শুধু তারি একান্ত অনুগত সে; কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর কোনও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে যুক্তিসিদ্ধ পরিণামের দিকে এগিয়ে দেবার মত যথেষ্ট সাহস তার নাই। অথচ আজ যা ঘটছে, সে তো প্রাক্তন কোনও সম্ভাবনারই সিদ্ধ-রূপ; এবং আজ যা সম্ভাবিত, ভবিষ্যসিদ্ধির পানেই তো ইশারা তার। বস্তুত মানুষের আকূতির মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিপুল সম্ভাবনার প্রৈতি; কেননা যে-কোনও ব্যাপারের 'কেন, কী বৃত্তান্ত,' জানতে পারলেই তাকে সে আনতে পারে হাতের মুঠোয়। অতএব যদি বুঝতে পারি, এ জগতে প্রমাদ-শোক দুঃখ মৃত্যু কেন, তাহলে তাদের উচ্ছেদের একটা উপায় আবিষ্কার তো দুরাশা নয় আমাদের পক্ষে, কেননা জ্ঞানেই না মানুষের মাঝে জেগে ওঠে বীর্য, জেগে ওঠে ঈশনা।

সত্যি বলতে আজও আমরা হাল ছেড়ে বসে নাই। বিশ্বব্যাপারে যা-কিছু অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল, সাধ্যমত তার মূলোচ্ছেদ করাকে আদর্শ সাধনা বলেই জানি আমরা। প্রমাদ ও দুঃখ-সন্তাপের নিদানকে যথাসম্ভব খর্ব করবার অবিরাম চেষ্টাও আমরা করছি। বিশ্বরহস্যকে আয়ত্তে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান দেখছে জন্মমৃত্যুকে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করে চিরায়ুষ্মান এমন কি মৃত্যুঞ্জয় হবার স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে অনর্থের অবান্তর বা গৌণ হেতুটাই শুধু; তাই আমাদের প্রতিকার-চেষ্টা অবাঞ্ছনীয়কে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কেবল, পারে না তার মূলোচ্ছেদ করতে। এই শক্তিদৈন্যের মূলে আছে সাধনার দৈন্য, কেননা ব্যবহারিক জীবনে গৌণ-প্রত্যয়ের দিকেই ঝোঁক আমাদের, মূলা-বিদ্যার দিকে নয়,—বিশ্বব্যাপারের বহিঃ-প্রবৃত্তিই আমরা চিনি, জানিনা তার স্বরূপ-তত্ত্ব। তাই জগতের বাইরের দিকটাকে অসুরবীর্যে সংক্ষুব্ধ করতে জানলেও, আজও আমরা পাইনি তার অন্তর্যামিত্বের অধিকার। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্মুখী সাধনায় সে অধিকারও যে হাতে আসবে না আমাদের, তাও তো বলা চলে না। যদি জানতে পারতাম দুঃখ মৃত্যু ও

প্রমাদের যথার্থ স্বরূপ এবং নিদান কী, তাহলে তাদের পুরোপুরি বশে আনবার প্রয়াসও আমাদের হত না ব্যর্থ। এমন কি তাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত জীবন হতে বিলুপ্ত করে দিয়ে, অকুণ্ঠ জ্ঞান আনন্দ কল্যাণ ও অমৃতত্বের নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সার্থক করে তুলতাম তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই অনির্বাণ আকূতি, যার পরিতৃপ্তিকে আমাদের অন্তরাত্মা জানে মানুষের পরম ও চরম পুরুষার্থ বলেই।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'—প্রাচীন বেদান্তের এই দুটি বাণীর সাধনায় আমরা পাই ঐ পুরুষার্থসিদ্ধির একটা অমোঘ সঙ্কেত।

বেদান্ত বলেন: জীবনের মর্মসত্য নিহিত রয়েছে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃতসত্তার পরিস্পন্দনে; সকল সংজ্ঞা ও বেদনার মর্মকথা হল এক স্বয়ম্ভূ বিশ্বাবগাহী স্বরূপানন্দের উচ্ছ্বাস; সমস্ত ভাবনার ও প্রত্যয়ের স্বরূপ হল এক সর্বগত বিশ্বসত্যের বিকিরণ; সমস্ত প্রবৃত্তির প্রৈতি নিহিত আছে এক বিশ্বাত্মিকা কল্যাণী- শক্তিরই স্বতঃপরিণামী প্রবেগে।

কিন্তু অখণ্ড-সতের স্পন্দলীলা মূর্ত হয়ে ওঠে রূপের বহুধা-বিসৃষ্টিতে, প্রবর্তনার বহুমুখী বৈচিত্র্যে, পরিকীর্ণ শক্তির অন্যোন্য-সঙ্গমে। এই বহু-ভাবনা বা বিভূতি-বিস্তরের জন্যই অখণ্ডের মাঝে দেখা দেয় ব্যষ্টি-অহংএর খণ্ডলীলা, যা সাময়িক বৈরূপ্যের লাঞ্ছনে নির্বিশেষের মাঝে জাগায় বৈশিষ্ট্যের বিক্ষোভ। অহংএর প্রকৃতি হল চেতনার একটা খণ্ড-পরিসরের মাঝে নিজকে নিবদ্ধ রাখা, তার অন্যান্য বিভাবের প্রতি স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে; —শুধু একটি রূপায়ণ, প্রবর্তনার একটি ধারা এবং শক্তিস্পন্দনের একটিমাত্র ক্ষেত্রের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশই লক্ষণ তার। অহন্তা আছে বলেই অখণ্ড-চেতনায় জাগে দুঃখ শোক অনর্থ প্রমাদ ও মৃত্যুর বেদনা; নইলে শাশ্বত সত্য শিব ও আনন্দের অদ্বৈত-চেতনায় ঋত-সুষমার ছন্দেই জাগত তারা। কিন্তু অহন্তাই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে অনৃতের বিকৃত বঞ্চনায়। ঋতের ছন্দ আবার ফিরে পেলে অহং-শাসিত এই বেদনার দ্বন্দ্বকে আমরা ছেঁটে ফেলতে পারি জীবন হতে, চেতনার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে পারি তাদের সত্য স্বরূপ। সে সাধনার মন্ত্র হবে, বিশ্বচেতনার ঐকতানে ব্যক্তিজীবনের খাঁটি সুরটিকে চিনে নেওয়া এবং বিশ্বোত্তীর্ণের গহনবীণায় কাঁপিয়ে তোলা তার নিঃশব্দ মূর্ছনা।

পরের যুগে বেদান্তের মাঝে ধীরে-ধীরে শিকড় মেলেছে এই ধারণাই যে, অহন্তার সঙ্কোচ হতে দ্বন্দ্ব বোধেরই সৃষ্টি হয়নি শুধু, বিশ্বসত্তারও ঐ হল

একান্ত নির্ভর বা পরম অয়ন। অহং হতে যদি ছেঁটে ফেলতে পারি অবিদ্যা ও তজ্জনিত সকল উপাধি, তাহলে দ্বন্দ্ববোধের উচ্ছেদ তো ঘটেই, সেই সঙ্গে বিশ্বপ্রপঞ্চে আমাদের অস্তিত্বও হয় বিলুপ্ত। তাইতে প্রমাণিত হয়, মানুষের জীবন বস্তুতই হেয় অসার ও অলীক একটা বিভ্রম, অতএব খণ্ড-বোধের জগতে থেকে পূর্ণতা লাভের প্রয়াস মোহের ছলনা শুধু। নির্ভাঁজ ভাল বলে কিছুই নাই এখানে, একটু-না-একটু মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মাঝে ; —এর বেশি কিছু এখানে প্রত্যাশা করাও মূঢ়তা।…কিন্তু অহন্তার এমন ক্লিষ্ট ধারণাই কি তার শেষ পরিচয় ? তার মাঝে নিগূঢ় ও মহত্তর একটা প্রৈতি থাকা কি একেবারেই অসম্ভব ? যদি জানি, ব্যক্তির অহং কোনও লোকোত্তর তত্ত্বেরই অবান্তর ব্যাপার মাত্র, তাহলে আর মায়াবাদের আসরে নামা যায় না তাকে ধরে। বেদান্তকে তখন জীবন-বিমুখীনতার সাধনায় না লাগিয়ে লাগানো যেতে পারে জীবনের পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের সাধনায়। ঈশ্বর অথবা পুরুষই বিশ্বসত্তার নিমিত্ত ও অধিষ্ঠান—তিনিই বিশ্ব এবং ব্যক্তি-রূপে নিজকে বিসৃষ্ট করে আবিষ্ট আছেন সবার মাঝে। ব্যক্তির সীমিত অহং শুধু চেতনার একটা অবান্তর-ব্যাপার, বিশিষ্ট বিভাবে নিজকে ফুটিয়ে তোলবার এ একটা অপরিহার্য কৌশল মাত্র। অহংপরিণামের ধারা ধরেই জীব ক্রমে পেঁ ছায় সেই স্বোত্তর-ভূমিতে, যার স্বরূপসত্যের প্রতিভূ হয়েই সে নেমে এসেছিল এই জগতে। প্রতিভূর ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না তার সেখানে গিয়েও, কিন্তু তখন আর তার প্রকাশ হয় না মূঢ় আচ্ছন্ন সঙ্কুচিত অহন্তায়। পরমপুরুষের দিব্য বিভূতি রূপে তখন সে জ্বলে ওঠে বিশ্বচিতের পরবিন্দু হয়ে,—দিব্য সামরস্যের রসায়নে ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যকে করে জারিত প্রেষিত ও রূপান্তরিত।

জড়বিশ্বে মানবজীবনের ভিত্তিরূপে আমরা পেলাম তাহলে নিখিল জড়প্রকৃতিতে স্ফুরিত চিন্ময় দিব্য-পুরুষেরই আত্মসম্ভূতির বীর্যকে। গুহাহিত সেই চিন্ময় পুরুষের যে সংবৃত শক্তি রূপায়িত হয়ে উঠছে প্রাণ মন ও অতিমানসের অকুণ্ঠিত উন্মেষণে, তার সংবেগই আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রবর্তক, কেননা দিব্যপ্রকৃতির এই ঊর্ধ্বপরিণামের আকূতিই অন্নময় আধারে ঘটিয়েছে মনোময় জীবের আবির্ভাব। এই পরিণামের ধারা ধরে একদিন স্থূলদেহেই মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সেই আনন্দচিন্ময়কে —বিশ্বেশ্বরের বিশ্বজনীন অবতরণকে করবে সিদ্ধ। অহংএর ব্যাকৃতিতে আমরা পাই চিৎশক্তির সেই বিনিগমক অবান্তর-ব্যাপারের পরিচয়,—অব্যাকৃতের নির্বিশেষ নীরূপ গহন হতে,

অবচেতনার 'হৃদ্য সমুদ্র' হতে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করে যা অখণ্ড-চিন্ময়েরই অগণিত মণিবিন্দুতে ঝলমল বহুময় রূপ। এই অহং-চেতনার প্রথম রূপায়ণে দেখা দেয় জীবন-মরণ সু-কু সত্য-অনৃত হর্ষ-শোক সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব শুধু। কারণ, বিশ্বের অখণ্ড সত্য আনন্দ কল্যাণ ও প্রাণলীলার সীমাহীন ঔদার্য হতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন-বিবিক্ত করে আপন-হাতে-গড়া একটা কৃত্রিম পরিবেশের মাঝে থেকেই যদি চায় সে একত্বের অনুভব, তাহলে দ্বন্দ্ববোধই তো হবে তার অনতিবর্তনীয় স্বাভাবিক পরিণাম। বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের কাছে জীবের অহং যদি হৃদয়টি মেলে ধরে লোকোত্তরের আকৃতি নিয়ে, তাহলে এই স্বরচিত কঞ্চুকের উন্মোচনে উত্তীর্ণ হয় সে সেই পরমা সিদ্ধির কূলে যার পানে শুরু হয়েছিল তার গোপন অভিসার এই অহন্তারই বিসৃষ্টিতে—যেমন পশুজীবনের মাঝেই দেখা দিয়েছিল চেতনার মানবজীবনে উত্তরায়ণের অস্ফুট আভাস। এই সিদ্ধির পরিচয় মেলে ব্যক্তিতে সর্বাত্মভাবের অনুভবে, যখন সঙ্কীর্ণ অহন্তা রূপান্তরিত হয় লোকোত্তর অদ্বয়ভাবের প্রমুক্তিতে। ব্যক্তির এই প্রমুক্তিতে তখন তুর্যাতীতের জ্যোতির দুয়ার হয় অপাবৃত, অখণ্ড সত্য আনন্দ ও কল্যাণের অপ্রমেয় শুদ্ধসত্তা নির্বারিত উৎসারণে ঝরে পড়ে বিশ্বের 'পরে, আমাদের যুগযুগান্তর-ব্যাপী পরিণামের ধারাকে দিব্য রূপায়ণে এগিয়ে নিয়ে চলে চরম সার্থকতার পানে। মহাভবিষ্যের এই ভ্রূণকেই বিশ্বপ্রকৃতি আজও গোপনে লালন করছে আপন গর্ভে ; সেই পরম আবির্ভাবের চির প্রত্যাশিত মুহূর্তটির তরে গভীর ব্যাকুলতায় ছেয়ে আছে তার মায়ের হৃদয়।

# ৮

# ব্রহ্মবিদ্যার সাধন

সর্বভূতে নিগূঢ় এই আত্মা অমনি প্রকাশ পান না, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান অতিসূক্ষ্ম অগ্র্যাবুদ্ধি দিয়ে কেবল সূক্ষ্মদর্শীরাই।

—কঠ উপনিষদ—( ৩।১২ )

তাহলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলায়ন কোন্ রূপ ধরে ফুটে ওঠে এ জগতে? জীবের যে-অহং আত্মবিভূতি তাঁর, তার সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটে পরিণামের কোন্ ধারা ধরে—কী করেই বা উত্তীর্ণ হয় তা সিদ্ধির চরমভূমিতে? এ প্রশ্নের একটা সমাধান আমাদের খুঁজতে হবে এখন, কেননা এই যোগাযোগ আর তার পরিণামের ধারার 'পরেই নির্ভর করছে মানুষের দিব্যজীবনের দর্শন ও সাধনা।

ইন্দ্রিয়ের দর্শনকে ছাড়িয়ে, জড়ীয় মনের আবরণ ভেদ করে, দৃষ্টিকে তারও ওপারে প্রসারিত করেই পাই আমরা অমর্ত্য দিব্য-সত্তার ধারণ; ও অনুভব। অন্নময় চেতনার আবেষ্টনে শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নিয়ে কারবার যতক্ষণ, ততক্ষণ বিশ্বে জড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুরই ধারণা বা অনুভব হওয়া সম্ভব নয় আমাদের। কিন্তু মানুষেরই মাঝে আছে এমন-সব বৃত্তি, মনকে যারা পৌঁছে দিতে পারে অতীন্দ্রিয় ধারণার দুয়ারে। অবশ্য দৃশ্য-জগতের স্থূল তথ্য হতে তর্ক অথবা কল্পনার যোজনায় তাদের অনুমান সম্ভব, কিন্তু শুধু জড়জগতের আলম্বন বা জড়ীয় অনুভবের সাহায্যে সিদ্ধ হয় না তাদের প্রামাণ্য। চিত্তের ঐ-সব বৃত্তিই অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাধন আমাদের; তাদের প্রথমটিকে আমরা জানি শুদ্ধবুদ্ধি বলে।

মনুষ্যবুদ্ধির দুটি প্রবৃত্তি—একটি ব্যামিশ্র বা পরতন্ত্র, আর একটি শুদ্ধ বা স্ব-তন্ত্র। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানুভবের আবেষ্টনে নিজকে ঘিরে রাখে যতক্ষণ, ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ধর্মকেই সে মানে চূড়ান্ত সত্য বলে; প্রাতিভাসিক তথ্যের অনুশীলনই একমাত্র কাজ তার

তখন,তাই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অন্যোন্যসম্বন্ধ প্রবৃত্তি পরিণাম ও প্রয়োজনের গবেষণা ছাড়িয়ে আর গভীরে যেতে চায় না তার দৃষ্টি। বুদ্ধির এ প্রবৃত্তি দিয়ে প্রাতিভাসিক সত্যই জানা যায় শুধু, বস্তু-সৎ বা পারমার্থিক সত্যের কোনও আভাস মেলে না তাতে; কেননা সত্তার গভীরে ডুবে যেতে পারে এতখানি গুরুত্ব তার মাঝে নাই,—সে দিতে পারে শুধু বিভূতি-রাজ্যের খবরটুকুই। অথচ এই বুদ্ধিতেই দেখা দেয় তার শুদ্ধপ্রবৃত্তি; যখন ইন্দ্রিয়ানুভবকে ভিত্তি করে' গবেষণা শুরু করেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচকে পরাভূত করে চলে যায় সে তারও ওপারে,—মনীষার স্বাতন্ত্র্য দিয়ে অধিকার করতে চায় ভাবসামান্যের সেই ধ্রুব লোক, যা প্রতিভাসের অধিষ্ঠানের সঙ্গেই আছে নিত্যযোগে যুক্ত হয়ে। শুদ্ধ-বুদ্ধি কখনও অপরোক্ষ-বৃত্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রতিভাসের মর্ম ভেদ করে একেবারে অবগাহন করে অধিষ্ঠানের সত্যে। যে ভাব তখন জাগে তার মাঝে, তাকে ইন্দ্রিয়ানুভবের পরিণাম এবং তারি আশ্রিত বলে ভুল হলেও আসলে তা বুদ্ধিরই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির বিশিষ্ট স্বধর্ম প্রকাশ পায় তখনই, যখন ইন্দ্রিয়ানুভবের আদি-বিন্দুকে একবার ছুঁয়েই তাকে পিছনে ফেলে যায় সে স্বত-উৎসারণের প্রবেগে। বুদ্ধির সে বিদ্যুৎবিসর্পী অনুভবকে মনে হয় তখন ইন্দ্রিয়শাসিত অনুভবের একান্ত বিপরীত। শুদ্ধ-বুদ্ধির এই অতীন্দ্রিয় প্রবৃত্তি স্বাভাবিক যেমন তেমনই অপরিহার্যও,—কারণ আমাদের প্রাকৃত অনুভব সামান্য অংশই জুড়ে থাকে বিশ্বব্যাপারের, এবং এই স্বল্পপরিসরের মাঝেও বাটখারার খুঁতে কেবলই হেরফের দেখা দেয় তার সত্যের ওজনে।* তাই চেতনায় সত্যের রূপকে স্পষ্ট করতে হলে ছাড়িয়ে যেতেই হয় প্রাকৃত অনুভবকে, সকল দাবি তার অগ্রাহ্য করে দিতেই হয় তাকে দূরে ঠেলে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রমাদকে বুদ্ধি দিয়ে শোধন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেই তো মানুষ হয়েছে সৃষ্টজীবের মাঝে সবার সেরা।

শুদ্ধ-বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ আমাদের নিয়ে যায় জড় হতে অবশেষে জড়াতীতের জগতে। কিন্তু পরোক্ষ-জ্ঞানের অনুশীলনে যে-পরিচয় পাই জড়াতীতের, তা আমাদের অখণ্ড-প্রকৃতির সকল পিপাসা পারে না মেটাতে। শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়তো তত্ত্বদৃষ্টির এইটুকু প্রকাশেই খুশি হয়ে ওঠে পুরোপুরি—এ তার নিখাদ সত্তার নিখুঁত সৃষ্টি বলে। কিন্তু বিশ্বের দিকে

এক জোড়া চোখ মেলে তাকানোই আমাদের স্বভাব; তাই সব-কিছুকেই আমরা যেমন দেখি ভাবরূপে, তেমনি দেখি বস্তুরূপে। এইজন্যই যে-কোনও ধারণা অনুভবে বাস্তব হয়ে না উঠছে যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের কাছে তা অপূর্ণ—এমন কি চিত্তের বিশেষভূমিতে অলীকপ্রায়। কিন্তু সত্যের যে-প্রকাশ নিয়ে আমাদের এই গবেষণা, তার এলাকা প্রাকৃত অনুভবকেও গেছে ছাড়িয়ে। সে প্রকাশ স্বভাবতই 'অতীন্দ্রিয় কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য'। তাই আমাদের প্রয়োজন, চিত্তের এমন কোনও অক্লিষ্ট-বৃত্তির অনুশীলন ও আপ্যায়ন যা পুরোপুরি মেটাতে পারে আমাদের আত্মপ্রকৃতির দাবি। সে দাবি যখন প্রসারিত অরূপলোকে, তখন তাকে মেটাতে চাই মনোময় অনুভবেরই সম্প্রসারণে।

আমাদের সকল অনুভবই মনোময় ধরতে গেলে; কারণ, ইন্দ্রিয়ের অনুভবকেও মনের ভাষায় তর্জমা না করে নিই যতক্ষণ, ততক্ষণ তার কোনও অর্থ হয় না বা মূল্য থাকে না আমাদের কাছে। এ দেশের দার্শনিকেরা মনকে বলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু সত্য বলতে একমাত্র মনই আমাদের ইন্দ্রিয়; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধগ্রাহী আর পাঁচটি ইন্দ্রিয় মন-ইন্দ্রিয়েরই বিশিষ্ট বৃত্তিমাত্র। সাধারণত বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়েই অনুভবের ইমারত গড়ে তুললেও মন তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতি-মুহূর্তেই; তা ছাড়াও তার আছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি দিয়ে একটা অ-পরোক্ষ-অনুভবের অবিমিশ্র জগৎ গড়বার সামর্থ্য। তাই বুদ্ধির মত মনোময় অনুভবেরও আছে একটা দ্বৈত-প্রবৃত্তি—কখনও তা ব্যামিশ্র ও পরতন্ত্র, কখনও বা শুদ্ধ ও স্ব-তন্ত্র। যখন বহির্জগৎকে বা বিষয়কে জানতে চায় মন, তখন প্রবৃত্তি তার ব্যামিশ্র; আবার যখন অন্তর্মুখী হয়ে নিজকে বা বিষয়ীকে অনুভব করে সে, তখন তার শুদ্ধ প্রবৃত্তি। ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিতে বহিরিন্দ্রিয়ের 'পরেই নির্ভর তার, তাদের সাক্ষ্য মেনেই সে গড়ে তোলে তার প্রত্যয়; কিন্তু শুদ্ধ প্রবৃত্তিতে কারবার তার নিজকে নিয়ে, সেখানে বিষয়ের অনুভব হয় তাদাত্ম্য-সংবিৎ দিয়ে। এমনি করেই আমরা জানি হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে; যেমন একটা চলতি অথচ খুব গভীর কথা আছে,—ক্রোধ-স্বরূপ হয়ে যাই বলেই আমরা জানি ক্রোধ কাকে বলে। নিজের সত্তাকেও অনুভব করি ঠিক এমনি করেই; তাদাত্ম্য-সংবিতের রূপ এক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। বস্তুত সকল

অনুভবেরই নিগূঢ় স্বরূপ হল তাদাত্ম্য-সংবিৎ; কিন্তু একথা ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের কাছে, কেননা ব্যাবৃত্তি-বোধ দিয়ে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি আমরা জগৎ থেকে। 'বিষয়ী'-রূপে শুধু নিজেরই অপরোক্ষ-জ্ঞান আছে আমাদের, তাই নিজের বাইরে সব-কিছুকে জানি আমরা 'বিষয়' বলে। ভেদবুদ্ধি দিয়ে নিজ হতে এমনি করে বিবিক্ত করেছি যাদের, তাদের মর্মে প্রবেশ করতে তাই আবার গড়তে হয়েছে ইন্দ্রিয়ের সাধন। এইজন্যেই তো তাদাত্ম্য-সংবিতের অপরোক্ষ-চিন্ময় অনুভবের জায়গায় এল পরোক্ষ-জ্ঞানের বৃত্তি, আপাতদৃষ্টিতে যার ভিত্তি হল স্থূলবিষয়ের সন্নিকর্ষ আর মনের সহবেদন। আসলে এ কিন্তু অহংএরই কল্পিত একটা উপাধি; একে ধরেই চলেছে সে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত—একটা গোড়ার মিথ্যাকে আরও আনুষঙ্গিক মিথ্যার অলঙ্কারে সাজিয়ে, সত্যের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে' আমাদের চেতনায়। তাই তো অহংএর মিথ্যা কল্পনাই কায়েম হয়েছে মানুষের জীবনে ব্যবহারিক-সত্যের বিচিত্র সম্বন্ধের মুখোস পরে।

মানস এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এই অভ্যস্ত ধারা হতে অনুমান হয়, জ্ঞানকে এমনি করে কঞ্চুকের আবরণে সঙ্কুচিত রাখা অপরিহার্য নয় আমাদের পক্ষে। প্রকৃতি-পরিণামের একটা পর্বে মানুষের মন জড়-বিশ্বের সঙ্গে যোগ ঘটাতে কতকগুলি শারীর-বৃত্তি এবং তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্য নিতে অভ্যস্ত; তারি ফলে জ্ঞানবৃত্তির এই সঙ্কোচ। তাই আজ ইন্দ্রিয়ের পরোক্ষ সহায়ে সত্যের একটা অপূর্ণ আদল নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয় আমাদের! তবু বলব, প্রকৃতির এ বিধান দুরতিক্রম্য অভ্যাসের গতানুগতিকতা শুধু। জড়ের শাসন মেনে নেবার চিরন্তন সংস্কার হতে কোনরকমে যদি মুক্তি দেওয়া যেত মনকে, তাহলে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অপরোক্ষ-অনুভব শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক হত তার কাছে। মনের এই শক্তিরই সন্ধান পাই সম্মোহন এবং ঐ ধরণের মানসব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়ায়। প্রাণ যেখানে একটা সমতা ঘটিয়েছে জড় ও মনের মাঝে ঊর্ধ্ব পরিণামের ধারায় চলতে গিয়ে, সেই সীমিত পরিবেশেই আবির্ভূত হয়েছে আমাদের জাগ্রত-চেতনা; তাই বিষয়ের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ অপরোক্ষ-অনুভব সাধারণত সহজ নয় তার পক্ষে। এই জন্যই এ ধরণের অনুভব সম্ভব

হয় জাগ্রত-ভূমির প্রাকৃত-মনকে ঘুম পাড়িয়ে অধিচেতন ভূমির আসল মনকে জাগিয়ে তুলে। তখন মনের মাঝে ফুটে ওঠে তার স্বরূপ-শক্তি; অদ্বিতীয় সর্বগত ইন্দ্রিয়রূপে সে তখন—ব্যামিশ্রপ্রবৃত্তির পারতন্ত্র্য দিয়ে নয়—শুদ্ধ-প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য দিয়ে অধিকার করতে পারে ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয়কে। অবশ্য জাগ্রত-চেতনাতে মনঃশক্তির এই সম্প্রসারণ একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা দুঃসাধ্য বটে; মনঃ-সমীক্ষণের একটা বিশেষ ধারা ধরে যাঁরা এগিয়ে গেছেন অনেকখানি, এ খবর তাঁদের জানা আছে।

অভ্যস্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি আমরা ইন্দ্রিয়-মানসের অকুণ্ঠ ঈশনা দিয়ে। এই যেমন, একটা-কিছু হাতে নিয়ে বাইরের সাহায্য ছাড়াই নিখুঁতভাবে তার ওজন বলে দেবার শক্তি। এখানে বস্তুর স্পর্শ আর চাপ প্রাথমিক আলম্বন শুধু, —ইন্দ্রিয়ানুভব যেমন শুদ্ধ-বুদ্ধির আলম্বন। বাস্তবিক মন এখানে *ওজনের জ্ঞান পায় স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে নয়, তার স্ব-তন্ত্র প্রতিভা দিয়েই* তাকে আবিষ্কার করে সে, স্পর্শ লাগে শুধু বিষয়ের সঙ্গে যোগসাধনের কাজে। যেমন শুদ্ধ-বুদ্ধির বেলায় তেমনি ইন্দ্রিয়-মানসের বেলাতেও, ইন্দ্রিয়ানুভব জিজ্ঞাসার আদিবিন্দু শুধু। মন সেখান হতে এমন ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে যেখানকার জ্ঞান অতীন্দ্রিয়ই নয় কেবল, ইন্দ্রিয়-প্রমাণের বিরোধীও অনেক সময়। কেবল যে বহির্জগতের উপরটা নিয়েই মানস-সম্প্রসারণের নাড়াচাড়া তা নয়। যে-কোন ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে একবার যোগ ঘটিয়ে মনের প্রাতিভ দৃষ্টি দিয়ে তার ভিতরকার সকল খবর জানাও অসম্ভব নয় কিছুই। এমনি করেই, মানুষের কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিত চালচলন বা হাবভাবে কোনও অপেক্ষা না রেখেই—এমন কি এসব অপর্যাপ্ত এবং ভ্রমোৎপাদক আলম্বনের বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য সত্ত্বেও—তার চিন্তা বা মনোভাবকে অপরোক্ষ উপায়ে গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করা চলে। তাছাড়াও আমাদের মাঝে আছে আন্তর-ইন্দ্রিয় বা বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তির একটা জগৎ; তার বহুব্যাপ্ত সামর্থ্যের একটি অংশমাত্র ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ধরেছে স্থূল ইন্দ্রিয় রূপ। সেই সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়েরই অতিসূক্ষ্ম মনোময় বৃত্তি দিয়ে চিরাভ্যস্ত জড়-ময় পরিবেশের বাইরেও রয়েছে যেসব অনুভব ও রূপায়ণ, তাদেরও

সন্ধান আমরা পেতে পারি। মানস সম্প্রসারণের এই সম্ভাবনাকে প্রাকৃত-মন দেখে দ্বিধা ও সন্দেহের চোখে, কেননা ব্যাপারটা নিতান্তই খাপছাড়া সাধারণ জীবনের অভ্যস্ত সংস্কারের কাছে। তাছাড়া মনের এই যোগৈশ্বর্যকে সচল করা যত কঠিন, তারও চেয়ে কঠিন তাকে গুছিয়ে–বাগিয়ে একটা সুষ্ঠু কার্যোপযোগী সাধনসম্পত্তির রূপ দেওয়া। তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই তবু, কেননা বিশৃঙ্খলভাবেই হোক্ অথবা সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক সাধনার ধারাতেই হোক্ , বহিশ্চর চেতনার ক্ষেত্রকে . যখনই প্রসারিত করতে যাই আমরা, তখনই এ বিভূতির প্রকাশ হয় অনিবার্য।

গীতায় যেসব গভীর সত্যকে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্', মনোভূমিতে তাদের অনুভবকে নামিয়ে আনাই হল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনাতেই সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় প্রাতিভাসিক জগৎকেই সম্প্রসারিত করে শুধু— তার পর্যবেক্ষণের সাধনগুলিকে আরও তীক্ষ্ণ করে'। কিন্তু কোনও ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাছেই ধরা দেয় না বস্তুর স্বরূপ-সত্য। অথচ 'বুদ্ধি গ্রাহ্য' কোনও তত্ত্ব কোথাও থাকলে তাকে অনুভব বা পরখ করবার কোনও-না-কোনও বাস্তব সাধন থাকবেই বুদ্ধির আধারে— বিশ্ববিধানের এ একটা মর্মচর স্বারসিক সত্য। আমাদেরই মনের মাঝে আছে অতীন্দ্রিয় সত্যকে পরখ করবার একটি সাধন—সে হচ্ছে তাদাত্ম্য-সংবিতের সেই ধারা যা আমাদের মাঝে জাগায় স্বানুভবের একটা সামান্য-প্রত্যয়। নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অল্পবিস্তর সচেতন 'হয়েই অথবা সে সম্পর্কে একটা-কিছু ধারণা হতেই আমরা জানতে পারি কী আছে আমাদের মাঝে। কিংবা সাধারণ সূত্রের আকারে বলা চলে আধারের জ্ঞানেই নিহিত আছে আধেয়ের জ্ঞান। অতএব স্বানুভবের মনোময়ী বৃত্তিকে প্রাকৃত-চেতনার বাইরে সম্প্রসারিত করে উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্মে পৌঁছাতে পারি যদি, তাহলে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বাধার ব্রহ্মে নিহিত রয়েছে যে-সব তত্ত্ব, তাদের অপরোক্ষ-অনুভবও অগোচর থাকবে না আমাদের। এই সম্ভাবনার 'পরেই এদেশের বেদান্ত-সাধনার ভিত্তি; আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়েই বেদান্তী চায় জগৎ-জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে।

কিন্তু বেদান্ত ' আমাদের একটা কথা ভুলতে দেয় না কোন-

মতেই। মনের বিশিষ্ট-অনুভব অথবা বুদ্ধির সামান্য-প্রত্যয় যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, সে কখনও নয় চরম তাদাত্ম্যের স্বয়ম্ভূ-অনুভব,- মনের মাঝে অবিবেকের আকারে মনেরই একটা প্রতিভাস মাত্র সে। মন-বুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে আমাদের। জাগ্রৎ-চেতনায় বুদ্ধির যে লীলা, অবচেতনা আর অতিচেতনার মাঝে সে যেন বাচ-খেলা শুধু। প্রকৃতির উর্ধ্ব পরিণামে, অবচেতন অখণ্ড-অব্যক্ত হতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উত্তরায়ণের প্রবেগে চলেছি আমরা অতিচেতন অখণ্ড অব্যক্তের পানে; এ দুটি মেরুর মাঝে বুদ্ধি কাজ করছে তটস্থ-শক্তি রূপে। কিন্তু অবচেতন আর অতিচেতন দুইই এক সর্বময় অখণ্ড সত্তারই দুটি বিভূতি। অবচেতনার ব্যাহৃতি হল প্রাণ, অতিচেতনার ব্যাহৃতি জ্যোতি। অবচেতনায় চিৎশক্তি স্পন্দে সমাহিত, কেননা স্পন্দই প্রাণের স্বরূপ। অতিচেতনায় সেই স্পন্দ-প্রবৃত্তিই আবার ফিরে এল জ্যোতির্লোকে; তখন বিদ্যা আর কঞ্চুকে আবৃত নয় তার মাঝে— চিন্ময় প্রাণ তখন বাঁধা পড়েছে পরাসংবিতেরই উদার আলিঙ্গনে। দুয়ের মাঝে অন্যোন্যবিনিময়ের সাধন তখন বোধি-প্রত্যয়, যার ভিত্তি বিষয় আর বিষয়ীর সামরস্যে অর্থাৎ তাদের সচেতন ও সক্রিয় তাদাত্ম্যবোধে। এটি ঘটে স্বয়ম্ভূ-সত্তার সেই নিরুপাধিক ভূমিতে যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হয়ে মিশে গেছে জ্ঞানের মাঝে। কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ কর্মস্পন্দনে, পরিণমনের প্রবেগে বা অর্থক্রিয়াকারিতায়; তাই তাদাত্ম্য-সংবিৎ সেখানে পুরোপুরি বা অল্পবিস্তর ঢাকা পড়ে যায় স্পন্দ-বৃত্তির অন্তরালে। অতিচেতনায় কিন্তু তার বিপরীত। সেখানে জ্যোতিই তত্ত্ব, জ্যোতিই ছন্দ; অতএব বোধি সেখানে ফুটে ওঠে নিজের নিরঞ্জন মহিমায় তাদাত্ম্য-সংবিৎ হতে উদ্ভিন্ন প্রত্যয়রূপে, আর তার অর্থক্রিয়াকারিতা দেখা দেয় বোধিরই স্বতঃ-পরিণামের অপরিহার্য ছন্দবিভূতি বা অনুষঙ্গরূপে--মৌল-তত্ত্বের মুখোস পরে' নয়। এই দুটি ভূমির মাঝে তটস্থ-শক্তিরূপে চলে মন ও বুদ্ধির অবান্তর-লীলা এবং তারি ফলে উর্ধ্বপরিণামের প্রৈতিতে, ক্রিয়ার আবেষ্টনে মুহ্যমান জ্ঞান ধীরে-ধীরে ফিরে পায় অকুণ্ঠ স্বারাজ্যের শাশ্বত অধিকার। স্বানুভবের মনোময়ী বৃত্তি যখন আধার এবং আধেয়কে অর্থাৎ বিষয়ী আত্মা এবং বিষয়-আত্মাকে যুগপৎ অনুবিদ্ধ করে' স্বপ্রকাশ তাদাত্ম্য-

সংবিতের জ্যোতির্মহিমায় হয় উদ্ভাসিত, তখন বুদ্ধিও রূপান্তরিত হয় বোধি-প্রত্যয়ের স্বয়ং-জ্যোতিতে। অতিমানসের আবেশে যখন প্রাকৃত-মন পায় তার চরম সার্থকতা, তখন এই সম্বোধিই হয় আমাদের বিজ্ঞানের পরমভূমি।

মনুষ্যচিত্তের এই পরিণাম-পরম্পরার 'পরেই গড়ে তোলা হয়েছিল প্রাচীনতম বেদান্তের যত সিদ্ধান্ত। এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যে-সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন ঋষিরা তাদের বিস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দিব্যজীবনের সাধনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মনে হয় সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে ঋষিদের কতকগুলি মুখ্যসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রয়োজন। কারণ, আজ আমরা যা গড়ে তুলতে চাইছি নতুন করে, ঋষিদের কোনও কোনও ভাবের 'পরেই রয়েছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রাক্তন ভিত্তি। কিন্তু সব বিজ্ঞানের বেলাতেই বলবার প্রাচীন ভঙ্গিকে খানিকটা নতুনভাবে ঢেলে সাজতেই হয় আধুনিক মনের উপযোগী করে। তাছাড়া মানব চেতনায় উষার পরে নূতন উষা জাগে যখন, তখন প্রকাশের অভিনব ঐশ্বর্যের নীরব অভিনন্দনে নবীনের বুকেই মিলিয়ে যায় পুরাতনের আলো। প্রাচীন সম্পদকে ভোলা যায় না তবু; কেননা তাকে পুঁজি করে, অন্তত তার যতটুকু সম্ভব পুনরুদ্ধার করে নতুন ব্যাবসা ফাঁদি যদি, তাহলেই চির-অচঞ্চল অথচ নিত্য-চঞ্চল সেই অশেষের কারবারে আমাদের লাভের অঙ্ক যে ফেঁপে উঠবে দিনে দিনে, এ প্রত্যাশা অসঙ্গত কি?

বিশ্বতত্ত্বের চরম বিশ্লেষণে বেদান্ত এসে পৌঁছেছে সদ্‌ব্রহ্মে—যিনি অনন্ত নিরঞ্জন নির্বিশেষ অনির্বচনীয় সৎস্বরূপ। বিশ্বের সকল স্পন্দন ও রূপায়ণ একটা প্রতিভাস মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ-সৎ তার অধিষ্ঠানরূপে,—এই হল বেদান্তের অনুভব। এ অনুভব যে ছাড়িয়ে গেছে আমাদের প্রাকৃত-চেতনা অথবা ব্যবহারিক-প্রত্যয়ের সকল সীমা এবং প্রামাণ্য, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়-মানস শুদ্ধ নির্বিশেষ-সত্তার কোনও খবর রাখে না। ইন্দ্রিয়ানুভব বলতে পারে রূপজগতের স্পন্দনের কথাই শুধু। রূপ আছে, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে নয়; ব্যামিশ্র সংসক্ত সমূঢ় ও পরতন্ত্র হয়েই প্রকাশ তার। অন্তরে ডুবি যখন, ব্যাকৃত-রূপের প্রয়োজন না থাকলেও

স্পন্দন বা পরিবর্তের হাত হতে তখনও নিস্তার নাই আমাদের। তখনও দেখি, জড়ের স্পন্দন দেশে আর পরিবর্তের স্পন্দন কালে—বিশ্বসত্তার আশ্রয় হল এই। এমন কথাও বলতে পারি, এই তো সত্তার চরম পরিচয়, কেননা স্বরূপ-সত্তা তো মনেরই একটা বিকল্প,—তার অনুপাতী তত্ত্ব-বস্তু কি খুঁজে পাওয়া যাবে কোনও কালে? স্বানুভবের মাঝে বা তার পিছনে নিদান পক্ষে নিষ্পন্দ-নির্বিকার একটা-কিছুর আভাস পাই, কদাচিৎ, যার অস্পষ্ট অনুভব বা কল্পনা আমাদের মাঝে আনে এক অনির্বচনীয়ের স্পশ—জীবন-মরণের সকল দোলার ওপারে, সকল কর্ম বিকার ও রূপায়ণের অতীতে। চেতনার এই একটি দুয়ার আছে আধারে, কখনও যা অপাবৃত হয়ে উন্মোচিত করে লোকোত্তর মহাসত্যের জ্যোতির্ময় দিগ্‌বলয়—একটি কিরণ তার ছুঁয়ে যায় আমাদের কখনও সে-দুয়ার বন্ধ হতে না হতে! অন্তরে নিষ্ঠা এবং বীর্য থাকে যদি, তাহলে ঐ বিদ্যুন্ময় ইশারাটুকুই অবিচল শ্রদ্ধায় আঁকড়ে ধরে' আবার আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি চেতনার আর-এক লোকে—ইন্দ্রিয়মানসের সীমা ছাড়িয়ে বোধিরই জ্যোতিরঙ্গন পানে।

একটুখানি তলিয়ে দেখলেই বুঝি, বোধির কাছ থেকেই আমরা নিই চেতনার প্রথম পাঠ, কেননা আমাদের সকল মানস-ব্যাপারের পিছনেই প্রচ্ছন্ন আছে বোধির লীলা। বোধিই মানুষের চেতনায় নিয়ে আসে অজানার গহন হতে বাণীর সেই বৈদ্যুতী, যা মহত্তর জ্ঞানের প্রৈতি জাগায় তার প্রাণে। তারপর বুদ্ধি আসে খতিয়ে দেখতে—ঐ আলোক-পসরার কতটুকু সে পুরতে পারবে আপন ট্যাঁকে। আমাদের সকল জানার ও সকল পরিচয়ের পিছনে এমন কি তাদেরও ছাপিয়ে রয়েছে এক দুর্গম রহস্য। তারি আকর্ষণে অবর-বুদ্ধি ও প্রাকৃত-অনুভবের উজান বেয়ে চিরকাল চলেছি আমরা নোঙর ছিঁড়ে; তারি প্রৈতিতে অরূপের অনুভবকে মনের গোচর করতে চেয়েছি অকল্পিতের রূপায়ণে —ঈশ্বর অমৃত বা বৈকুণ্ঠের বাস্তব সংজ্ঞায় দিতে চেয়েছি সংজ্ঞাতীতের পরিচয়। বোধি ঐ রহস্যের মায়াই ঘনিয়ে তোলে আমাদের মাঝে। এই রহস্যবোধের সঙ্গে বুদ্ধির যে বিরোধ, প্রাকৃত-অনুভবের যে বৈষম্য, বোধি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না তাকে, কেননা বোধি মহাপ্রকৃতির মর্ম হতে উৎসারিত বলে মহাপ্রকৃতিরই মত দুর্দমনীয় তার সংবেগ। বোধি

সৎ-স্বরূপ, তাই সতের স্বরূপ জানে সে; স্বয়ং সম্ভূত এবং সৎ হতে উদ্ভূত বলেই, সতের শুধু বিভূতি এবং প্রতিভাস যা, তার শাসন মেনে চলতে সে পারে না। বোধি কেবল নির্বিশেষ সত্তারই খবর দেয় না আমাদের, দেয় সদ্-রূপেরও খবর। কারণ, এই আধারেই রয়েছে যে বিন্দুজ্যোতির অধিষ্ঠান, আত্মসংবিতের সেই ক্বচিৎ-উন্মীলিত জ্যোতিঃ-পথের উৎস হতেই বোধির যাত্রা শুরু, তাই তার সামান্য-অনুভবের মাঝেও থাকে বিশেষের ঘনীভূত প্রত্যয়। বোধির এই পশ্যন্তী-বাণীকে প্রাচীন বেদান্তীরা প্রকাশ করেছিলেন উপনিষদের তিনটি মহাবাক্যে —'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এবং 'সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

কিন্তু মানুষের চেতনায় বোধি সাধারণত কাজ করে যবনিকার আড়াল হতে—আধারের অপ্রবুদ্ধ অনতিব্যাকৃত অংশে। সেখানে জাগ্রত-ভূমির অপরিসর আলোকে যে-সব সম্মূঢ় বৃত্তি হয় তার বাহন, তারা তার ব্যঞ্জনাকে পুরোপুরি ধরতে পারে না বলে বোধির সত্য ফুটতে পায় না সুসমঞ্জস ও সুব্যাকৃত রূপ নিয়ে। অথচ রূপের স্পষ্টতার দিকেই আমাদের স্বভাবের ঝোঁক। আধারে অপরোক্ষ জ্ঞানবৃত্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে, বোধিকে বহিশ্চেতনার সদর-মহলে আসর জমিয়ে সেইখানে তার নায়কের আসনটি নিতে হয় পাকা করে। কিন্তু বহিশ্চেতনার আসর এখন বোধির নয়,—বুদ্ধির দখলে; সে-ই আমাদের প্রত্যয় ভাবনা ও কর্মের নিয়ন্তা। তাই দেখি, প্রাচীন ঔপনিষদিক ঋষিদের বোধির যুগ পার হয়ে ক্রমে এল বুদ্ধির যুগ—শ্রুতির দিব্য ভাবাবেশের জায়গা জুড়ল দার্শনিকের তত্ত্ববিচার; অবশেষে তাকেও বেদখল করল বৈজ্ঞানিকের বস্তুসমীক্ষা। বোধির ভাবনা অতিচেতনার বার্তাবহ, তাই সে আমাদের চরম জ্ঞানবৃত্তি। তার জায়গায় এল যে শুদ্ধ-বুদ্ধি, বোধির সে প্রতিভূ শুধু, বলতে গেলে আধারের অন্তরিক্ষলোকেই তার আনাগোনা। তারপর ব্যামিশ্র-বুদ্ধির অধিকার চলল কিছুদিন; আমাদের প্রাকৃত-চেতনার নিম্ন-ভূমির অধিবাসী সে। খুব উঁচুতে সে উঠতে পারে না; জড়ীয় ইন্দ্রিয়-মনের প্রসার যতটুকু অথবা যন্ত্রযোগে যতখানি বাড়ানো যেতে পারে তাদের সীমানা, ততদূরই তার দৃষ্টি চলে, তার বেশী নয়। মনে হয়, এমনি করে জ্ঞানের অবরোহক্রমে ক্রমেই আমরা নেমে আসছি

যেন। কিন্তু বস্তুত একে বলতে পারি প্রগতিরই একটা পরিক্রমা। কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবরবৃত্তিকে উর্ধ্ববৃত্তির দান যথাসম্ভব আত্মসাৎ করেই আধারে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে-বিত্তকে, নিজের সাধন দিয়ে নিজস্ব ধরনে। কিন্তু এই প্রয়াসে অবরবৃত্তিরই অধিকার হয় প্রসারিত এবং অবশেষে উর্ধ্ববৃত্তির সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নেবার ঔদার্য ও সহজ ছন্দ আপনা হতেই ফুটে ওঠে তার মাঝে। এমনি করে মানুষের বৃত্তিগুলি বোধি হতে শুদ্ধ-বুদ্ধি, আবার শুদ্ধ-বুদ্ধি হতে ব্যবহার—এই ক্রম ধরে প্রাক্তন ভাবকে আত্মসাৎ করে আপন খুশিতে পুষ্ট না হত যদি, তাহলে তার প্রকৃতির মাঝে ঘটত সামঞ্জস্যের অভাব। হয়তো তার একটা দিক উগ্রভাবে প্রবল হয়ে অন্য দিককে দাবিয়ে রাখত অযথা শাসনের পীড়নে, অথবা পরস্পর বিযুক্ত থাকায় কোনও দিকই ফুটতে পেত না সমৃদ্ধ শ্রী নিয়ে। কিন্তু চেতনার প্রগতিতে ক্রম এবং স্বাতন্ত্র্য আছে বলে আধারে দেখা দিয়েছে একটা সমতা,—জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন বিভাবের মাঝে একটা পূর্ণতর সৌষম্যের জেগেছে সূচনা।

প্রাচীন উপনিষদে এবং পরের যুগে দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তিতেও এই ক্রমই আমাদের চোখে পড়ে। বোধির দীপ্তি এবং অধ্যাত্ম-অনুভবই একমাত্র প্রমাণ ছিল বৈদিক এবং ঔপনিষদিক ঋষিদের কাছে। উপনিষদের যুগেও যে বিচার-পরিষদের কথা তোলেন আধুনিক পণ্ডিতেরা সময়-সময়, সে তাঁদের বুঝবার ভুল শুধু। উপনিষদে বাদানুবাদের প্রসঙ্গ আছে যেখানে, সেখানেও নাই বিচার বিতর্ক বা ন্যায়ের সহায়ে সত্য-নিরূপণের কোনও প্রয়াস। শুধু বিভিন্ন ঋষির বোধি বা অনুভবের তুলনা আছে সেখানে ; তার মাঝে খণ্ডনের কোনও প্রচেষ্টা নাই—কেবল আছে জ্যোতি হতে উত্তর-জ্যোতিতে উদয়ন, বোধিরই সঙ্কীর্ণ ক্ষুণ্ণ বা গৌণ প্রত্যয় হতে উদারতর পূর্ণতর সারবত্তর প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হবার বিবরণ। একজন ঋষি প্রশ্ন করছেন আর একজনকে, 'তুমি কী জান?' বলছেন না 'তুমি কী ভাব?' বা 'যুক্তির ধারা ধরে কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছ তুমি?' উপনিষদের কোথাও যুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়নি বেদান্তের সত্যকে প্রমাণ করতে ; বোধির ন্যূনতাকে পূরণ করতে হবে বোধিরই উৎকর্ষ-সাধনায়, তর্ক-বুদ্ধির হাকিমি অচল সেখানে—মনে হয় এই ছিল প্রাচীন ঋষিদের মত।

কিন্তু মানুষী বুদ্ধি বুঝতে চায় নিজের ধরনে, নইলে তৃপ্তি হয় না তার। তাই বোধির পরে যখন দেখা দিল 'বৌদ্ধ' জল্পনার যুগ, তখন এ দেশের দার্শনিকেরা অতীত ভাবসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাকে অক্ষুণ্ন রেখেই সত্যের এষণায় করলেন একটা দ্বৈত-ধারার প্রবর্তন। শ্রুতি বা বোধিজাত প্রত্যয়ের নাম দিলেন তাঁরা আগম বা আপ্তবচন এবং তার প্রামাণ্যকে ঠাঁই দিলেন অনুমানেরও উপরে। এদিকে বুদ্ধির দাবিকেও অগ্রাহ্য করলেন না তাঁরা; কিন্তু বুদ্ধির অনুমিত তত্ত্বে শ্রুতি বা আগমের অনুকূল যা, শুধু তার প্রামাণ্যকে মেনে নিয়ে আর-সমস্তই প্রত্যাখ্যান করলেন নিষ্প্রমাণ বলে। এমনি করে তর্কসমীক্ষার যা প্রধান গলদ—অর্থাৎ শুধু শব্দজালকেই সার-সত্য ভেবে হাওয়ায়-হাওয়ায় লড়াই করা—তার জুলুম থেকে খানিকটা রেহাই পেলেন তাঁরা। বস্তুত 'বাগ্ বৈখরী শব্দ-ঝরী' দিয়ে তত্ত্ব-সমীক্ষা চলে না কখনও, কেননা শব্দ শুধু ভাবের বাহ্য প্রতীক বলে বারবার খুঁটিয়ে দেখতে হয় তার প্রয়োগকে, পদে-পদে ফিরিয়ে আনতে হয় তাকে পরিশুদ্ধ অর্থব্যঞ্জনার ভূমিতে। দার্শনিকদের বাদ আবর্তিত হত প্রথমত চরম সত্যের অপরোক্ষ-অনুভবকেই কেন্দ্র করে—বোধির প্রামাণ্যের সঙ্গে বুদ্ধির প্রামাণ্যের জুড়ি মিলিয়ে। কিন্তু বুদ্ধিতে যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তথাকথিত স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিকে, ক্রমে সে-ই হল সর্বজয়া—অবশ্য বোধির আনুগত্যের বাহানাটুকু বজায় রেখেই। এমনি করে শ্রুতিকে প্রমাণ মেনেই দেখা দিল দার্শনিকদের সম্প্রদায়ভেদ; পরস্পরকে খণ্ডন করতে শ্রুতি-বাক্যকেই তাঁরা ব্যবহার করলেন অস্ত্ররূপে। বোধির সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে এইখানেই। বোধির আছে উদার সম্যক-দৃষ্টি—সব-কিছুকে দেখে সমগ্রের মাঝে সে, কাজেই খুঁটিনাটিও তার কাছে অখণ্ড-বৃহতেরই ছটা যেন; অতএব তার স্বাভাবিক ঝোঁক সমন্বয়ের এবং এক-বিজ্ঞানের দিকে। বুদ্ধি কিন্তু বিভজ্যবাদী, সে চলে বিশ্লেষণের দিকে,—অনেক তথ্য জোড়া দিয়ে সমগ্রের ধারণা তার। স্বভাবতই সে-জোড়াতাড়ার মাঝে থাকে অনেক বিরোধ, অনেক বৈষম্য, অন্যোন্য-বিরোধী অনেক যুক্তি। আবার বুদ্ধির ধর্ম হচ্ছে তর্কের নিখুঁত ছাঁচে একটা দর্শনকে ঢালাই করা; কাজেই পরস্পরবিরোধী বহুতথ্যের মাঝে কাটছাঁট করে তার মতুয়ার সিদ্ধান্তের অনুকূল যা, তাকেই সে রাখে

বাঁচিয়ে। এমনি করে প্রাচীন ঋষিদের সম্বোধির অখণ্ডতা ক্রমে যখন টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল বুদ্ধির অভিঘাতে, তখন তার্কিকের কূট প্রতিভা আবিষ্কার করল ব্যাখ্যার নানা চাতুরী ও মীমাংসা-পরিভাষার জাল, প্রস্থান-ভেদের বিচিত্র তারতম্য—যা দিয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের মুশ্‌কিল আসান করে তত্ত্ব-বিদ্যার জল্পনাকে দেওয়া চলে স্বচ্ছন্দবিহারের অবাধ অধিকার।

তবু প্রাচীন বেদান্তের মূল ভাবগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে রইল বিভিন্ন দর্শনে এবং মাঝে-মাঝে তাদের সমন্বয়-সাধনার প্রয়াসও চলতে লাগল অখণ্ড-বোধির উদার ভূমিকায়। তাই দর্শনের নানা প্রস্থানের পটভূমিতে জেগে রইলেন উপনিষদের পুরুষ আত্মা বা সদ্‌ব্রহ্ম। বুদ্ধি তাঁকে একটা ভাব বা চিত্তভূমিতে পর্যবসিত করতে চাইলেও তাঁর অনির্বচনীয়তার কিছু আভাস আজও বেঁচে আছে নানা দর্শনে প্রাচীন ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। সম্ভূতির যে পরিস্পন্দকে আমরা বলি জগৎ, তার সঙ্গে নির্বিশেষ অখণ্ড-সত্তার কী সম্বন্ধ; জীবের অহং সে পরিস্পন্দের কার্য বা কারণ যা-ই হোক্—কী করে আবার সে ফিরে যেতে পারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মস্বরূপে, ব্রহ্মভাবে বা অধিষ্ঠানতত্ত্বে,—এই নিয়ে নানা জল্পনা ও সাধনার ভাবনাই ভারতবর্ষের চিত্তকে অধিকার করে আছে চিরকাল।

৯

# সদ্ ব্রহ্ম

এক অদ্বিতীয়—সৎ স্বরূপ।

—ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬।২।১)

অহং-সর্বস্ব ভাবনার সঙ্কীর্ণ-চঞ্চল লুব্ধতা হতে দৃষ্টিকে নির্ম্মুক্ত করে সত্যসন্ধানীর অবিক্ষুব্ধ পক্ষপাতহীন জিজ্ঞাসা নিয়ে জগতের পানে তাকাই যদি, তাহলে প্রথমেই অনুভব করি—এক মহাশক্তির অমেয় বীর্য, অনন্ত-সত্তার বৈপুল্য নিয়ে অন্তহীন স্পন্দনে অফুরন্ত প্রবৃত্তির উল্লাসে আপনাকে উৎসারিত করে চলেছে সীমাহীন দেশে, শাশ্বতকালের অবিরাম প্রবাহে। অপ্রমেয় অপ্রতর্ক্য সত্তা তার 'অয়মস্মি'র অকল্পনীয় লোকোত্তর-ভাবনায় অনন্তগুণে ছাড়িয়ে গেছে—শুধু আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই নয়,—বিশ্বের যে-কোনও বৃহৎ অহং অথবা অহং-সমষ্টিকে। তার মানদণ্ডে কোটিকল্পব্যাপী বিসৃষ্টির বিপুল ঐশ্বর্য ক্ষণিকের ধুলো-খেলা মাত্র, অনন্ত পরার্ধের অগণনীয় অঙ্কপাত করামলকের মতই নগণ্য তার কাছে! অথচ সহজ-প্রত্যয়ের মূঢ়তা নিয়ে এমনি অসঙ্কোচে আমরা বুনে চলেছি জীবনকল্পনার বিচিত্র মায়া, যেন এই বিপুল বিশ্বস্পন্দন আমাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচেছ আমারই ইষ্টানিষ্টের দায় নিয়ে, আমারই মুখ চেয়ে। আমাদের আকাঙক্ষা-উচ্ছ্বাস, ভাবনা-কল্পনা একান্তভাবে আমাদেরই জীবন-রসায়ন যেমন, তেমনি তার চরিতার্থতা-সাধনই যেন এই বিশ্বশক্তিরও একমাত্র কর্তব্য!···কিন্তু মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে এর পানে তাকাই যখন, তখন দেখি এ-শক্তির বিলাস আত্মনেপদী-পরস্মৈপদী তো নয়। এর আছে একটা স্বকীয় বিপুল লক্ষ্য, সীমাহীন বিচিত্র-ভাবনার জটিল জাল, আত্মসম্পূর্তির অপরিমেয় আকূতি এবং উল্লাস, অভাবনীয় কল্পনার অমিত বৈপুল্য যা স্নিগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের আদর্শ-জল্পনার তুচছতার পানে!···কিন্তু শক্তির এই অপ্রমেয়-

তায় বিমূঢ় হয়ে, অহমিকার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেদের অকিঞ্চিৎকরতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না ; কেননা মহাশক্তির স্বয়ম্ভূলীলার প্রতি অন্ধতাও যেমন অবিদ্যা, তেমনি জীবভাবের দৈন্যকে একান্ত করে তোলাও আর-এক ধরনের অবিদ্যা এবং তাতে বিশ্বব্যাপারের সত্যপরিচয়ে থেকে যায় অনেকখানি ফাঁক।

বিশ্বব্যাপী এই-যে সীমাহীন শক্তিস্পন্দ, সে তো আমাদের মনে করে না তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয়। মহৎ কীর্তিতে যতখানি উল্লাস তার, ততখানি অভিনিবেশ তার ক্ষুদ্রতম কর্মে—তেমনি সবদিক খুঁটিয়ে দেখা, শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ ঘটানো তারও মাঝে ; এ তো আমাদের বিজ্ঞানেরই রায়। মহাশক্তি বাস্তবিক মায়েরই মত সমদর্শন, পক্ষপাতশূন্য—গীতার ভাষায় 'সমং ব্রহ্ম' তিনি ; একটা ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন ও বিধারণে যতখানি ফোটে তাঁর স্পন্দনের সংবেগ ও তীব্রতা, ঠিক ততখানি ফোটে একটা বল্মীক-স্তূপেরও জীবন-নিয়ন্ত্রণে। আয়তন বা পরিমাণের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে মনে করি আমরা—ওটা বড়, এটি ছোট ; কিন্তু তারতম্যের বিচারে, পরিমাণের বাহুল্যকে ছেড়ে যদি মানদণ্ড করি গুণের সংবেগকে, তাহলে বলব একটা বিশাল সৌরজগতের চেয়েও বড় তার দীনতম অধিবাসী একটা পিপীলিকা এবং মানুষ ক্ষুদ্রায়তন হয়েও ছাড়িয়ে গেছে সমগ্র জড়-প্রকৃতির অপরিমেয় বৈপুল্যকে। কিন্তু এ-ও আবার গুণলীলার মায়া। বাস্তবিক পরিমাণ বা গুণ কোনটা দিয়েই পাওয়া যায় না শক্তির তত্ত্ব, কেননা উভয়ে তারা শক্তিস্পন্দেরই বিভূতিমাত্র। তাদের অন্তগূঢ় শক্তির তীব্রসংবেগ দিয়ে বিচার করি যদি, তাহলে দেখি জগতের সর্বত্র সমভাবে নিবিষ্ট এই মহদ্-ব্রহ্ম। সবার যখন সমান ঠাঁই তাঁর সত্তায়, তখন কি বলা চলে না, তাঁর শক্তিও সমবিভক্ত সবার মাঝে ?... কিন্তু এই সমবিভজনের কল্পনাও পরিমাণ-প্রত্যয়েরই মায়া। বস্তুত ব্রহ্ম অখণ্ড-স্বরূপে সবার মাঝে সন্নিবিষ্ট হলেও আমরা দেখি তাঁকে খণ্ডিত—'বিভক্তম্ ইব'। বুদ্ধির সংস্কার হতে দর্শনকে নির্মুক্ত করে যদি বোধি দ্বারা জারিত এবং তাদাত্ম্য-সংবিৎ দ্বারা ভাবিত করতে পারি তাকে, তাহলে দেখব, আমাদের মনোময়ী চেতনা হতে স্বতন্ত্র এই অনন্ত শক্তির চেতনা : নিরংশ হয়েও অংশের মাঝে এ-শক্তি সমাবিষ্ট হয় যখন, তখন নিজকে সমবিভক্ত করে না সে, কিন্তু অখণ্ড-বীর্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে যুগপৎ আবিষ্ট করে—যেমন সৌরজগতে, তেমনি একটা বল্মীকস্তূপে।

ব্রহ্মের কাছে নাই অংশ-নিরংশের কোনও ভেদ; প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মস্বরূপ—অখণ্ড ব্রহ্ম-সম্ভাব দ্বারা আবিষ্ট, প্রেষিত। ভেদ থাকতে পারে পরিমাণে এবং গুণে, কিন্তু আত্মস্বরূপ সর্বত্রই এক। বিশ্বক্রিয়ার প্রকৃতি পদ্ধতি ও পরিণামে নাই বৈচিত্র্যের অন্ত, অথচ সবারই মূলে আছে এক অনাদি শাশ্বত অন্তহীন শক্তির সমাবেশ। শক্তির যে-সংবেগ বল হয়ে ফুটেছে সবলের মাঝে, সেই সংবেগই অক্ষুণ্ন সামর্থ্যে আত্মপ্রকাশ করছে দুর্বলের দুর্বলতায়; প্রকাশে স্ফুরিত হয় শক্তির যতখানি বীর্য, ততখানি স্ফুরিত হয় নিরোধেও। এমনি করে ইতির উচ্ছ্বাসে অথবা নেতির শূন্যতায়, বাণীর মুখরতায় অথবা নৈঃশব্দ্যের স্তব্ধতায় ফুটছে একই শক্তির অখণ্ড-বিভূতি।

অতএব আমাদের প্রথম কর্তব্য: এই-যে অন্তহীন শক্তিস্পন্দন, সত্তার এই-যে অমিতবীর্য রূপায়িত হয়েছে বিশ্ব-রূপে, তার সঙ্গে হিসাবের গোলটুকু চুকিয়ে ফেলা। আমাদের চলতি হিসাবে গলদ অনেক। সর্বময়ের সর্বস্ব আমরা, অথচ তাঁর মূল্য কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে, —যদিও নিজকে জানি সবার চেয়ে বড় বলেই। এইখানে পাই সেই মূলা-অবিদ্যার আভাস, আমাদের অহঙ্কারের প্রসূতি যে; এই অবিদ্যার প্ররোচনাতেই ব্যষ্টি-অহংএর ক্ষুদ্রবিন্দু নিজকে ফাঁপিয়ে তোলে মহাসিন্ধুর বিকল্পনায়। অথচ নিজের সীমার বাইরে ততটুকুই গ্রহণ করতে পারে সে যতটুকুর সঙ্গে আছে তার মনের সায়, অথবা পরিবেশের ধাক্কায় যাকে না মেনে নিষ্কৃতি নাই তার। ব্যষ্টি-অহং দার্শনিক সাজে যখন, তখনও তার দম্ভ যায় না। তখনও জোরগলাতেই প্রচার করে সে: বিশ্বের সত্তা তারি চেতনায়, তার চিত্তকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত বিশ্বের চক্র; বিশ্বের সকল তত্ত্বের যাচাই হবে তারি চেতনার মাপকাঠিতে, তারি মনঃকল্পিত আদর্শের মানদণ্ডে; সে-গণ্ডির বাইরে যা-কিছু, সে সমস্তই মিথ্যা কিংবা অলীক।...এই মনঃসর্বস্বতার জন্যই বিশ্বের সঙ্গে হিসাব মেলে না মানুষের কোনকালে এবং তাইতে জীবন-সম্পদের পুরোপুরি ভাগও পায় না সে কোনদিন। প্রাকৃত মন ও অহংএর এই বেয়াড়া দাবির মূলে অবশ্যই আছে একটা সত্যের সমর্থন; কিন্তু সে-সত্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয় তখনই, যখন মন জানতে পারে তার জ্ঞানের সীমা, এবং সমর্পণের মাধুরীতে অহং হারিয়ে ফেলে তার বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল গুমর। যখন বুঝতে পারি: বিশ্বপরিণামের যে-ছন্দলীলাকে জীবন

বলি, সে ঐ অনন্ত স্পন্দনেরই একটা বীচিভঙ্গ; জানতে হবে সেই অনন্তকেই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে তারি মাঝে, একান্ত নিষ্ঠায় তারি সম্ভূতিকে সার্থক করতে হবে এই আধারে;—তখন হতে আমাদের সত্যি করে বাঁচার শুরু। একদিকের হিসাব হল এই। আর একদিকে আবার জানতে হবে: নিখিল শক্তিস্পন্দের সাথে অবিনাভূত আমরা আত্মস্বরূপের পরিপূর্ণ মহিমায়, তার অধীন অথবা গুণীভূত নই কোনমতেই; আমাদের জীবনে ও কর্মে, ভাবে ও ভাবনায় সে-শক্তির যে বিচিত্র লীলা, তা দিব্য-জীবনেরই পরমা সিদ্ধির অপরিহার্য সাধন।

কিন্তু এই অনন্ত সর্বশক্তিময়ী সমষ্টীভূত মহাশক্তির স্বরূপ না জানলে গরমিল থেকেই যাবে আমাদের হিসাবে। এইখানেই এক ফ্যাসাদ বাধে নতুন করে। শুদ্ধ-বুদ্ধি বলে, এবং মনে হয় বেদান্তও যেন সায় দেয় তাতে যে,—আমরা যেমন মহাশক্তির একটা পরতন্ত্র বিভূতি, তেমনি মহাশক্তিও দেশকালের অতীত অক্ষয় অব্যয় নির্বিকার এক বিবিক্ত স্থাণু-স্বরূপেরই অবর-বিভূতি। সে-স্থাণু শক্তিক্রিয়ার অধিষ্ঠান হয়েও নিষ্ক্রিয়, কেননা তিনি শক্তি-স্বরূপ নন, শুদ্ধ সৎ-স্বরূপ। বিশ্বে শক্তিরই লীলা দেখে যারা, সদ্‌ব্রহ্মের সত্তা তারা অস্বীকার করতেও পারে। হয়তো বলবে তারা: আমরা অখণ্ড অপ্রমেয় কূটস্থ-সত্তার শাশ্বত স্থাণুত্ব ভাবি যাকে, আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির একটা বিকল্প সে, ব্যবহারিক স্থাণুত্বের বিভ্রম হতে উদ্ভব তার; বস্তুত কিছুই স্থির নয় জগতে, সমস্তই নিয়ত স্পন্দমান; এই স্পন্দবৃত্তিতেই মনশ্চেতনা করে স্থাণুত্বের আরোপ, কেননা এ-বিকল্পটুকু না হলে শক্তিস্পন্দ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে একটা নিশ্চল ভিত্তির অভাবে। শক্তি-স্পন্দের মাঝেই যে দেখা দেয় এই ধরনের স্থাণুত্ব-বিভ্রম, তাও প্রমাণ করা কঠিন নয়। বাস্তবিক কিছুই তো নাই জগতে স্থাণু বলে; যাকে মনে করছি নিস্পন্দ, সেও স্পন্দনেরই ঘন-বিগ্রহ। সেখানে শক্তির ক্রিয়াই রূপায়িত হচ্ছে এমন ভাবে, যাতে আমাদেরই চেতনায় ফুটছে তার স্থাণুত্ব—যেমন পৃথিবীকে আমরা ভাবি স্থির, চলন্ত ট্রেন মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গাতে আর ছুটে পালাচ্ছে আশ-পাশের গাছপালারা।...তাহলে নিস্পন্দ নির্বিকার কোনও সত্তাই কি নাই স্পন্দনের অধিষ্ঠান ও আশ্রয় রূপে? সত্তা শুধু শক্তির বিক্ষেপ—এই কি তার ঐকান্তিক পরিচয়? না শক্তিই সত্তার বিভূতি—এই কথাই সত্য?

স্পষ্টই বুঝতে পারি, শুদ্ধ-সত্তা বলে কিছু থাকে যদি, তাহলে শক্তির মত সে-ও হবে অনন্ত। সত্তা বা শক্তি, কারও যে ইতি থাকতে পারে কোথাও, একথা যুক্তি কল্পনা বোধি বা অনুভব কিছু দিয়েই প্রমাণ করতে পারি না আমরা। আদি বা অন্তের কল্পনা যেখানে, সেইখানেই ব্যতিরেকমুখে আসে অনাদি-অনন্তের কল্পনা। বস্তুত আদি ও অন্ত এই দুটি বিন্দু দিয়ে প্রাকৃত মন একটা সীমা রচে মাত্র অসীমের মাঝে। তাই, কিছুই ছিল না এর আগে এবং এর পরে কিছুই থাকবে না—এমন উক্তি কেবল যে যুক্তিবিরুদ্ধই তা নয়, বস্তু-স্বভাবের বিরুদ্ধ একটা উৎকট কল্পনাও। সান্তের প্রতিভাসকে 'আবৃত' করে অনন্ত বিরাজিত রয়েছে তার অনপলাপ্য স্বায়ম্ভুব মহিমায়—এই হল সত্য।

কিন্তু এ-আনন্ত্যও দেশ ও কালের আনন্ত্য শুধু—তাই সীমাহীন পরিব্যাপ্তিতে, শাশ্বত প্রবহমানতায় প্রকাশ তার। তাকেও ছাড়িয়ে যায় শুদ্ধ-বুদ্ধি; দেশ ও কালের মর্মসত্যকে বর্ণরতিহীন জ্যোতিঃসম্পাতে উদ্ভাসিত করে বলে,—দেশ-কাল আমাদেরই চেতনার বিভাব মাত্র, এই দিয়েই প্রাতিভাসিক অনুভবকে আমরা করি শৃঙ্খলিত। স্বরূপ-সত্তার অপরোক্ষ-দর্শনে কোনও চিহ্নই থাকে না দেশ বা কালের। ব্যাপ্তি-বোধ যদিই-বা থাকে সেখানে, তবু সে-ব্যাপ্তি দেশের নয়, মনের; তেমনি প্রবাহ-বোধ থাকলেও তা মনেরই প্রবহমানতা, কালের নয়। কাজেই বোঝা যায়, তখনকার ব্যাপ্তি- ও প্রবাহ-বোধ, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন একটা-কিছুর প্রতীকমাত্র মনের কাছে। বস্তুত তা আনন্ত্যেরই অপরোক্ষ-ব্যঞ্জনা, যার মাঝে আমরা পাই একটি ক্ষণের অণুতে নিত্য-নবায়মান সর্বাধার কালবৃত্তির সংহতি, একটি দেশের বিন্দুতে সর্বতো-ব্যাপ্ত সর্বাধার সংস্থিতির ঘনীভূত প্রত্যয়।···বিরুদ্ধ সংজ্ঞার এমন উৎকট সমাবেশেই অনির্বচনীয় অপরোক্ষানুভবের বিবৃতি হয় নিখুঁত। এতেই বুঝি, সে-অনুভবে অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে মন এবং বাণী উত্তীর্ণ হয় এক পরমতত্ত্বে; তাদের কল্পিত সকল বিরোধের নিরূঢ় প্রত্যয় সেখানে পর্যবসিত হয় এক অনির্বচনীয় তাদাত্ম্যসংবিতে, যাকে প্রকাশ করবার জন্যই এই পঙ্গু প্রচেষ্টা তাদের!

সংশয়ী প্রশ্ন করবে তবু, অপরোক্ষ-অনুভবের এ-পরিচয় সত্য কি? এমনও কি হতে পারে 'না, শুদ্ধ-সত্তার ভাবনা বুদ্ধির একটা বিকল্পমাত্র;

আমরা কেবল ভাষার চাতুরীতে গড়ে তুলি একটা অবাস্তব শূন্যতার আভাস; তারপর একাগ্রচিত্তের ভাবনায় তাকে সত্য করতে গিয়ে মনে হয়, মহাশূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল দেশ আর কাল!...কিন্তু প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে আবার সেই স্বরূপ-সত্তার পানে তাকিয়ে বলি,—না, এ সংশয় অমূলক। কিছু আছে প্রতিভাসের অন্তরালে,—সে শুধু অনন্ত নয়, অনির্দেশ্য। প্রতিভাসের ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কোনও বিভাবকেই বলতে পারি না স্ব-তন্ত্র সত্তায় সত্তাবান। অনাদি অদ্বয় সর্বগত অসামান্য শক্তিরূপেও সমস্ত প্রতিভাসকে পর্যবসিত করি যদি, তবুও তাকে পাই একটা অনির্দেশ্য প্রতিভাসেরই আকারে। গতি বা স্পন্দের ভাবনায় অবিচ্ছেদে জড়িয়ে আছে স্থিতি বা বিরামের সম্ভাব্যতা; তাই স্পন্দকে এক নিস্পন্দ সত্তার স্বতঃপ্রবৃত্তি না ভেবে উপায় নাই। শক্তির প্রবৃত্তি আছে ভাবতে গেলেই ভাবতে হয় তার নিবৃত্তি-রূপ; সে-নিবৃত্তিরই পরাকাষ্ঠা হল স্বরূপ-সত্তার শুদ্ধ ও সহজ প্রত্যয়। আমাদের খোলা আছে দুটি পথ: বিশ্বের অধিষ্ঠানকে কল্পনা করতে পারি—হয় অনির্দেশ্য শুদ্ধ-সত্তারূপে, নয়তো অনির্দেশ্য প্রবর্তিকা-শক্তিরূপে। শেষের দর্শনই সত্য হয় যদি, অর্থাৎ শক্তির যদি না থাকে কোনও স্থাণু নিমিত্ত বা অধিষ্ঠান, তাহলে শক্তি হবে প্রবৃত্তি বা স্পন্দেরই পরিণাম ও প্রতিভাস,—কেননা স্পন্দ ছাড়া আর কিছুরই বাস্তবতা স্বীকার করিনি আমরা। তখন বিশ্বও হবে নিরাধার স্পন্দমাত্র,—তার অধিষ্ঠানরূপে কোনও স্বরূপ-সত্তার কল্পনা হবে নিরর্থক। এই হল বৌদ্ধের শূন্যবাদ, যার মতে সত্তা শাশ্বত প্রতি-ভাসেরই একটা বিভূতি—'যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকম্‌।'...কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বলে, এ-দর্শনে তৃপ্তি হয় না আমার, কেননা এ আমার মৌল অনুভবের বিরোধী, অতএব মিথ্যা। ধাপে-ধাপে এতক্ষণ চলেছিলাম উপরপানে, এইখানটায় হঠাৎ যেন ধাপ ফুরিয়ে গেছে, তাই সমস্ত সিঁড়িটাই নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে—মহাশূন্যে!

অনির্দেশ্য অনন্ত দেশ ও কালের অতীত শুদ্ধ-সৎ বলে কিছু থাকলে তার স্বরূপ হবে নির্বিশেষ,—কেননা পরিমাণ বা পরিমাণ-সমবায় দিয়ে হবে না তার ইয়ত্তা-নিরূপণ, তাকে গড়ে তোলা যাবে না গুণ বা গুণ-সমবায় দিয়ে। নিখিল রূপের সমাহার বা তাদের আধারভূত রূপধাতুও বলা চলে না তাকে। বিশ্বের রূপ গুণ পরিমাণ—সব-কিছুর তিরোধানেও

ঘটবে না শুদ্ধ-সতের বিলোপ। অমেয় নির্গুণ অরূপ-সত্তার ধারণা শুধু সম্ভব যে তা নয়—প্রতিভাসের আধাররূপে জেগে আছে এই নির্বিশেষ সত্তারই প্রত্যয়। তার রূপ গুণ বা পরিমাণ নাই এই অর্থেই যে, তাদের অতি-ষ্ঠা সে; অর্থাৎ আমাদের দেওয়া রূপ গুণ বা পরিমাণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে তারা তার মাঝে তলিয়ে গিয়ে। অথচ এই শুদ্ধ-সৎই আবার প্রতি-ষ্ঠা তাদের; অর্থাৎ তারি স্পন্দশক্তিতে বিসৃষ্ট হয় তারা রূপ গুণ ও পরিমাণের বৈচিত্র্যে। আবার এমনও বলা চলে না যে নিখিলের আধাররূপে আছে এক রূপ, এক গুণ ও এক পরিমাণ—তারি মাঝে পর্যবসিত হয় তারা চরমপ্রত্যয়ে; কেননা এ কল্পনারও নাই কোনও বাস্তব ভিত্তি। বস্তুত তাদের পর্যবসান ঘটে এমন একটা-কিছুতে যার বেলায় এসব সংজ্ঞা একেবারে অচল। অত-এব বিশ্ব-স্পন্দের যা-কিছু নিমিত্ত বা প্রতিভাস, চরমে তা লীন হয় স্বকারণভূত তৎ-স্বরূপেই। সে-প্রলয়দশাতেও অব্যক্ত-সত্তায় সত্তাবান তারা, কিন্তু তাদের অনির্বচনীয় রূপান্তরকে আর স্পন্দকালীন সংজ্ঞা দিয়ে পরিচিত করা যায় না তখন। এইজন্যই আমরা বলি, শুদ্ধ-সৎ নির্বিশেষ, তার স্বরূপ অচিন্ত্য, অবিজ্ঞেয়; অথচ নিখিল জ্ঞান-বৃত্তির অতীত পরম-তাদাত্ম্যের অপরোক্ষ-অনুভবে আমরা সমাহিত হতে পারি তার মাঝে। যা নির্বিশেষ, তা নিস্পন্দ বা স্পন্দাতীত; অতএব স্পন্দ দেখা দেবে সবিশেষের বিসৃষ্টিতে; কিন্তু সবিশেষ বললেই বুঝতে হবে তার আধার আধেয় এবং স্বরূপ সমস্তই নির্বিশেষ। অতএব স্পন্দজগতের সকল বস্তুই তত্ত্বত তৎ-স্বরূপ। নির্বিশেষ ও সবিশেষের মাঝে যে ভেদাভেদের সম্পর্ক, বেদান্ত আকাশকে করেন তার দৃষ্টান্ত: আকাশ সর্বভূতের আধার আধেয় এবং স্বরূপ; অথচ এতই স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি যে, আকাশে লীন হলে তাদের প্রাতিভাসিক সকল বৈশিষ্ট্য হয় লুপ্ত, যদিও তাদের সত্তার বিলোপ ঘটে না তাতে।

কোনও-কিছুর স্বকারণে লয় হবার কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই ব্যবহার করি কালাবচ্ছিন্ন চেতনার পরিভাষা; সুতরাং তার বিভ্রম সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নির্বিকার পরমার্থ-সৎ হতে স্পন্দের উন্মেষ একটা শাশ্বত বিভূতি, কিন্তু আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখে তাকে নিত্যপরম্পরিত কালিক-প্রবাহে বিবর্তমান।

তাই কালাতীতের শাশ্বতভাব যে অভিনবায়মান অনাদ্যন্ত ক্ষণবিন্দুতেই হতে পারে নিবিষ্ট, অতএব স্পন্দবিভূতির কালিক প্রত্যয়ও যে স্বরূপত তাই—এ-তত্ত্ব ধারণায় আসে না আমাদের। এইজন্যই বিশ্বলীলায় আমরা দেখি আদি মধ্য ও অবসানের অন্তহীন আবর্তন শুধু।

স্পন্দবাদী তবু বলতে পারেন: এসব উক্তির প্রামাণ্য ততক্ষণ, যতক্ষণ আমরা চলি শুদ্ধবুদ্ধির শাসন মেনে। কিন্তু বুদ্ধির রায়কে মানতেই হবে, এমন-কোনও বাধ্য-বাধকতা আছে কি? যা সৎ, তাই দিয়ে হবে সত্তার পরিচয়,—মনের কল্পনা দিয়ে নয়। দেখছি দুটিমাত্র বস্তু আছে—পরাক্-দৃষ্টিতে দৈশিক স্পন্দ আর প্রত্যক্-দৃষ্টিতে কালিক স্পন্দ। দেশ এবং কাল সত্য—সত্য তাদের ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ। দেশের ব্যাপ্তিকে হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারি কখনও; বলতে পারি, এ একটা মনের সংস্কার শুধু, কেননা অখণ্ডের সমগ্রতাকে একটা কল্পিত দেশে পরিকীর্ণ না করে শুদ্ধ-সত্তাকে ব্যাপারিত করা মনের সাধ্যাতীত। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন পরিণামের ধারাবাহী কালস্পন্দকে তো ছাড়িয়ে যেতে পারি না আমরা, কেননা কালস্পন্দই যে আমাদের চেতনার উপাদান। যেমন আমরা, তেমনি এই জগৎও একটা অবিরাম স্পন্দ-প্রবাহ, তার বর্তমান উপচিত হয়ে উঠছে অতীত-পরম্পরার সমাহারে এবং সেই বর্তমানই আমাদের চেতনায় ভাসছে ভবিষ্য-পরম্পরার আদিবিন্দু হয়ে। অথচ সে আদিবিন্দুও ক্ষণভঙ্গমাত্র; কেননা যাকে বলব বর্তমান, ফোটার আগেই ঝরে পড়েছে বলে সে তো অসৎ সুতরাং অনির্বচনীয়। অতএব বিশ্বে আছে শুধু অখণ্ড শাশ্বত কালবৃত্তির পরম্পরা; আর তারি প্রবাহে ভেসে চলেছে চেতনার এক নিত্যোপচিত অথচ অখণ্ড সংবেগ।* তাই কালিক-প্রবাহে স্পন্দ ও পরিবৃত্তির শাশ্বত পরম্পরাই একমাত্র পরমার্থ-তত্ত্ব। সম্ভূতিই সৎ-স্বরূপ।

বস্তুত, শুদ্ধবুদ্ধির অলীক কল্পনা এমনি করেই বাধিত হচ্ছে সত্তার অপরোক্ষ স্বরূপোপলব্ধির দ্বারা—স্পন্দবাদীর এ-দাবি অযৌক্তিক।

* সমগ্রভাবে স্পন্দবৃত্তি একটা অখণ্ড প্রবাহ। কাল বা চেতনার একটি ক্ষণকে তার প্রাক্তন এবং পরতন ক্ষণ হতে আচ্ছিন্ন করেও দেখা যায়; তেমনি শক্তির পরম্পরিত প্রবৃত্তির এক-একটি বিভাগকে একটা নূতন ঝলক বা নূতন বিসৃষ্টিও বলা চলে। কিন্তু প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা তাতেই নিরাকৃত হয় না, কেননা অবিচ্ছেদপ্রবাহ না মানলে

এক্ষেত্রে বোধির প্রত্যয়দ্বারা বুদ্ধি সত্য-সত্যই বাধিত হত যদি, তাহলে অন্তর্দৃষ্টির নিরূঢ় অনুভবকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধির একটা বিকল্পকেই সত্য বলে নিঃসঙ্কোচে দাবি করা উচিত হত না আমাদের। কিন্তু বোধির সাফাই-সাক্ষ্য এক্ষেত্রে টেকে না । নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মাঝেই বোধির সাক্ষ্যে ভুল হয় না কোনও; কিন্তু সম্যক-অনুভবের সমগ্রতাকে যখন সে দেখতে পায় না গণ্ডির মায়ায়, তখন তারও ভুল অনিবার্য। বোধি আমাদের সম্ভূতিরূপ দেখে যখন, তখন নিজকে আমরা অনুভব করি কালবৃত্তির শাশ্বত-পরম্পরার মাঝে চেতনার একটা অবিচ্ছিন্ন স্পন্দ ও পরিবৃত্তির প্রবাহরূপে। বৌদ্ধের ভাষায় আমরা তখন নদীর স্রোত বা দীপের শিখা। কিন্তু বোধির এই প্রাকৃত দর্শনেরও পরে আছে এক চরম ও পরম সম্বোধির অনুভব। সে অনুভব সরিয়ে দেয় যখন বহিশ্চেতনার মূঢ় যবনিকা, তখন দেখি এই সম্ভূতি পরিবৃত্তি ও পরম্পরা আমাদের স্বরূপসত্তারই একটা 'পর্যায়' মাত্র; অর্থাৎ আমাদের মাঝেও এমন-কিছু আছে, যা সম্ভূতি হতে স্ব-তন্ত্র এবং নির্লিপ্ত। এই 'স্থাণু অচল সনাতনের' প্রতিবোধই সম্মুগ্ধ দৃষ্টি হতে সম্ভূতির চঞ্চল ছায়া অপসারিত করে' ফুটিয়ে তোলে ধ্রুবজ্যোতির শাশ্বত আভাস। শুধু তাই নয়, সে-জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে আমরা বাস করতে পারি তারি দিব্য পরিবেষে এবং তারি ছটায় আমূল রূপান্তরিত করতে পারি আমাদের জীবন ও দৃষ্টির ধারা—বিশ্বস্পন্দে সঞ্চারিত করতে পারি আমাদের নবলব্ধ প্রবর্তনার ছন্দ। স্থাণুত্বের মাঝে এই নিত্যস্থিতিকেই শুদ্ধ-বুদ্ধি আমাদের সামনে ধরেছিল নিজের ভাষায় তর্জমা করে।' কিন্তু যুক্তিতর্কের কোনও সাহায্য না নিয়ে কিংবা পূর্বকল্পিত কোনও ধারণার অধীন না হয়েও এ-ভূমিতে পৌঁছনো যায়;—অনুভব করা যায়, এ-তত্ত্ব শুদ্ধ সন্মাত্র-স্বরূপ, শাশ্বত অনন্ত অনির্দেশ্য, কালকলনার দ্বারা অস্পৃষ্ট, দেশ-পরিব্যাপ্তির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, অরূপ অমেয় নির্গুণ, আত্মভূত ও নির্বিশেষ।

কালের ব্যাপ্তি থাকে না, চেতনার পূর্বাপর-সঙ্গতিও সিদ্ধ হয় না। একটা মানুষ যখন হেঁটে ছুটে বা লাফিয়ে চলে, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যে আলাদা, তাতে সন্দেহ নাই; তবু পদক্ষেপগুলির একজন অখণ্ড কর্তা নিশ্চয়ই আছে এবং তারি প্রযোজনাতে চলনটি হয় একটি অবিচ্ছেদ প্রবাহ—একথাও অনস্বীকার্য।

অতএব সদ্‌ব্রহ্ম একটা বাস্তব তত্ত্ব—বিকল্প নয় শুধু; বরং সকল প্রতিভাসের অধিষ্ঠান-তত্ত্ব সে-ই। কিন্তু এ-ও ভুললে চলবে না, শক্তি-স্পন্দ বা সম্ভূতিও একটা বাস্তব তত্ত্ব। সম্বোধির চরম অনুভব তার মাঝে আনতে পারে নূতন ব্যঞ্জনা, তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বা স্তব্ধ করতে পারে—কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশ ঘটাতে পারে না তার। তাই যদি হয়, তাহলে মূলে আমরা পাই দুটি তত্ত্ব—একটি শুদ্ধ-সত্তা আর-একটি জগৎ-সত্তা, একটি সন্মাত্র আর-একটি সম্ভূতি। দুটির একটিকে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন নয় কিছু। জিজ্ঞাসার সমাধান তাতে সহজ হয় নিশ্চয়ই; কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, চেতনাকে মন্থন করে তার বৃত্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ এবং তাদের অন্যোন্য-সম্বন্ধের আবিষ্কার। জ্ঞানযোগের সার্থকতা সেইখানেই।

মনে রাখতে হবে, একত্ব এবং বহুত্বের মত স্থাণুভাব ও স্পন্দবৃত্তিও অকল্পনীয় নির্বিশেষের কল্প-পরিচয় শুধু। বস্তুত ব্রহ্ম একত্ব ও বহুত্বের অতীত যেমন, তেমনি তিনি স্পন্দ-নিস্পন্দেরও বাইরে। স্পন্দহীন একত্বে শাশ্বত-প্রতিষ্ঠা তাঁর এবং সেই নাভিকে ঘিরেই বহুধা-বৈচিত্র্যের নিরন্ত স্পন্দনে তাঁর অনির্বচনীয় আবর্তনের অপ্রমত্ত লীলা। জগদ্‌ভাব যেন নটরাজের উদ্দণ্ড আনন্দ-তাণ্ডব—তার প্রতি চরণক্ষেপে শিবতনুর অনন্ত প্রতিরূপ বিচ্ছুরিত দিগ্‌বিদিকে; কিন্তু তাঁর অমিতাভ শুভ্র-সত্তার দীপ্তি তবুও অম্লান অচঞ্চল—কালত্রয়ে নির্বিকল্প নির্বিকার; আপ্তকামের কামনা চরিতার্থ শুধু ঐ তাণ্ডবেরই উল্লাসে।

নির্বিশেষের স্ব-রূপ মনোবাণীর অগোচর। স্থাণুত্ব ও স্পন্দন, একত্ব ও বহুত্বের লাঞ্ছন ছাড়া তার ধারণা আমরা করতে পারি না—করবার প্রয়োজনও দেখি না কিছু। তাই নির্বিশেষের এই ভাব-দ্বৈতকেই আমরা স্বীকার করব অসঙ্কোচে; শিব এবং কালী উভয়কে মেনেই জানতে চাইব,—দেশ ও কালের অতীত যে শুদ্ধ-সন্মাত্রকে মেয় অথবা অমেয় কিছুই বলা চলে না, তাঁর সেই অদ্বৈত স্থাণুভাবের সঙ্গে কী সম্বন্ধ দেশ ও কালের ছন্দে ছন্দিত এই অমেয় স্পন্দলীলার। শুদ্ধ-বুদ্ধি বোধি এবং প্রত্যক্ষ অনুভব কী বলে সদ্‌ব্রহ্ম সম্পর্কে, তা দেখলাম; এখন দেখতে হবে শক্তি অথবা স্পন্দ সম্পর্কে কী তাদের রায়।

গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, শক্তি কি শুধু শক্তিই, স্পন্দনের একটা মূঢ় বিক্ষেপ শুধু? না শক্তি হতেই উন্মেষিত দেখছি যে-চেতনা এই জড়ের জগতে, সেই চেতনাই মর্মরহস্য তার,—সে নয় শক্তির একটা অবান্তর পরিণাম মাত্র? বেদান্তের ভাষায় শক্তি কি শুধু প্রকৃতি—ক্রিয়া ও পরিণামের একটা স্পন্দবৃত্তি? না প্রকৃতি স্বরূপত চিৎশক্তি—স্বয়ম্ভূ-সংবিতের সৃষ্টিবীর্য? এই প্রশ্নের সমাধানের 'পরেই সব-কিছুর নির্ভর এখন।

১০

# চিৎ-শক্তি

তাঁরা দেখতে পেলেন সেই দেবতার আত্মশক্তিকে নিজেরই চিন্ময়ী গুণলীলায় নিগূঢ়। —শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৩)

এই তো তিনি, যিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে। —কঠ উপনিষদ (৫।৮)

দার্শনিকের দৃষ্টিতে নিখিল প্রাতিভাসিক জগৎ পর্যবসিত হয়েছে এক বিপুল শক্তি-স্পন্দনে; স্বানুভবের আকৃতিতে এক মহাশক্তিই নিজকে করেছে রূপায়িত স্থূল-সূক্ষ্ম নানা রূপের বৈচিত্র্যে, জড়ত্বের নানা পর্যায়ে। প্রসূতি ও ধাত্রী এই অনাদ্যন্ত মহাশক্তির একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব-রূপ দিতে প্রাচীন ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন একে, 'প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ' তমোভূত এক সমুদ্ররূপে, যার রূপবিবর্জিত স্তব্ধ বক্ষে বিক্ষোভের প্রথম শিহরণেই জেগে ওঠে রূপ-সৃষ্টির প্রৈতি এবং তা হতেই উদগত হয় বিশ্বের অঙ্কুর।

শক্তি জড়ের আকারে রূপায়িত হলেই বুদ্ধির পক্ষে তার ধারণা হয় সহজ, কেননা আমাদের বুদ্ধি গড়ে উঠেছে—জড়মস্তিষ্কের আশ্রিত মনে জড়ের সন্নিকর্ষে জেগেছে যে বিচিত্র সাড়া, তারি বুনানিতে। প্রাচীন ভারতের জড়বিজ্ঞানীরা জড়শক্তির আদিপর্বকে দেখেছিলেন আকাশরূপে, মহাশূন্যে সেই শক্তিরই শুদ্ধ-সম্প্রসারণ হল যার স্বরূপ; কম্পন তার বিশেষ গুণ, আমাদের চেতনায় ফোটে যা শব্দের আকারে। কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হতে রূপসৃষ্টি সম্ভব নয়; তার জন্য শক্তি-সমুদ্রের নির্বাধ প্রবাহে চাই একটা প্রতিঘাত, যাতে তার বুকে জাগবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংক্ষোভ, বিচিত্র-কম্পনের অন্যোন্যসঙ্গম—শক্তির সঙ্গে শক্তির অভিঘাতে ব্যবস্থিত-সম্বন্ধের উন্মেষ এবং ক্রিয়া-পরিণামের ব্যতিহার। এমনি করে জড়শক্তি আকাশ-ভূত হতে পরিণত হল যে-ভূতে,

প্রাচীনেরা তাকে বলতেন বায়ু-ভূত; শক্তির সঙ্গে শক্তির সম্প্রয়োগ তার বিশেষ গুণ। জড়জগতের সকল সম্বন্ধেরই মূলে আছে—সম্প্রয়োগ; কিন্তু তাতেও রূপসৃষ্টি হয় না, মহাশূন্যে দেখা দেয় শুধু শক্তি-বৈচিত্র্যের লীলা। এবার চাই রূপসৃষ্টির একটা আধার। আদ্যাশক্তি তাই তেজো-ভূত হয়ে পৌঁছল আত্মবিপরিণামের তৃতীয় পর্বে—আমাদের কাছে তার বিশিষ্ট রূপ ফুটল আলোকে তাপে দাহিকা-শক্তিতে। এ অবস্থায় ধর্ম ও ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে শক্তির ব্যাকৃতি দেখা দিলেও তাতে ফুটল না জড়-রূপের স্থাবর কাঠিন্য। তাই শক্তি-বিপরিণামের চতুর্থ পর্ব এল আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা সুনিয়ত আভাস নিয়ে তরলিত বিচ্ছুরণের আকারে—'অপ্' নামের মাঝে যার ছবিটি ধরে রেখেছেন প্রাচীনেরা। সবার শেষে পঞ্চম পর্বে অপের সংসক্তি হতে দেখা দিল পৃথিবী-ভূত বা কাঠিন্য-ধর্ম। এমনি করে পঞ্চভূতে সমাপ্ত হল শক্তি-বিপরিণামের লীলায়ন।

জড়ের যত রূপ জানি আমরা, এমন-কি জড়পদার্থের সূক্ষ্মতম ব্যাকৃতি পর্যন্ত সমস্তই গড়ে উঠেছে পঞ্চভূতের সমবায়ে। আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধেরও প্রতিষ্ঠা তারি 'পরে: আকাশের কম্পনকে গ্রহণ করে জাগে শব্দের বোধ; শক্তি-কম্পনের জগতে সম্প্রয়োগ হতে জাগে স্পর্শের চেতনা; আলোক তাপ ও দাহিকা-শক্তিদ্বারা স্ফুরিত ব্যাকৃত ও বিধৃত রূপের মাঝে আলোর খেলা হতে ফুটল দর্শনেন্দ্রিয়; এমনি করে চতুর্থ ভূত হতে রসনা আর পঞ্চম ভূত হতে দেখা দিল ঘ্রাণ। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের স্বরূপই হল শক্তির সঙ্গে শক্তির আকম্পিত সম্প্রয়োগের একটা সাড়া। প্রাকৃত-মনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে এমনি করে পরিতৃপ্ত করেছিলেন প্রাচীন দার্শনিকেরা শুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে চরম শক্তি-বিপরিণামের একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধের বিবৃতি দিয়ে। নইলে সাধারণ মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারত না,—যে-জগতের রূপ তার ইন্দ্রিয়ের কাছে এত নিরেট বাস্তব এবং স্থায়ী, বস্তুত তা একটা ক্ষণিক প্রতিভাস হতে পারে কী করে; অথবা যে শুদ্ধ-শক্তি ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতএব মনের কাছেও বলতে গেলে অনির্বাচ্য সুতরাং অশ্রদ্ধেয়, কী করে হবে সে বিশ্বের শাশ্বত বাস্তব তত্ত্ব।

কিন্তু চৈতন্য-সমস্যার সমাধান হয় না এ-বিবৃতিতে, কেননা শক্তি-কম্পনের সম্প্রয়োগে কী করে জাগতে পারে সচেতন ইন্দ্রিয়বোধ, তার

ব্যাখ্যা এর মাঝে নাই। বিভজ্যবাদী সাংখ্যেরা তাই পঞ্চভূতের পরেও স্থাপন করলেন মহৎ এবং অহঙ্কার নামে আর দুটি তত্ত্ব, যারা বলতে গেলে বাস্তবিক অজড়; কেননা এ-দুয়ের প্রথমটি শক্তিরই বিশ্বরূপ ছাড়া কিছু নয়, আর দ্বিতীয়টি ব্যষ্টি-অভিমানের বিসৃষ্টি শুধু। তবু সাংখ্য-মতে এ-দুটির তত্ত্ব চেতনাতে সক্রিয় হয়—শক্তির অভিযোগে নয়, কিন্তু এক বা একাধিক নিষ্ক্রিয় চেতন-পুরুষের সান্নিধ্যবশত; পুরুষে প্রতি-ফলিত হয় প্রকৃতির ক্রিয়া এবং সেই প্রতিফলনই চেতনার বর্ণরাগে হয় বিচ্ছুরিত।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশ্বরহস্যের এই সাংখ্যসম্মত ব্যাখ্যাই আধুনিক জড়বাদের খুব কাছাকাছি; বিশ্বপ্রকৃতিতে শুধু যন্ত্রারূঢ় শক্তির মূঢ় আবর্তন—এ-চিন্তার ধারা ধরে ভারতবর্ষের দার্শনিক গবেষণা এর বেশী এগোয় নি আর। এ-সিদ্ধান্তে গলদ যতই থাকুক, এর মূল ভাবটি একরকম অবিসংবাদিত বলে এদেশে তার প্রচার হয়েছে ব্যাপক। কিন্তু চিদ্-ব্যাপারের যে-ব্যাখ্যাই দিই, প্রকৃতিকে জড়-প্রবৃত্তিই বলি অথবা চিন্ময়ীই বলি, সে যে বস্তুত শক্তি-স্বরূপিণী তাতে সন্দেহ নাই কোনও। বিশ্বের সব-কিছুর মূলে কাজ করছে বিচিত্র শক্তিস্পন্দের একটা রূপায়ণী বৃত্তি; অব্যাকৃত শক্তিরাজির অন্যোন্যসঙ্গম ও সামঞ্জস্য হতেই রূপের সৃষ্টি। এমন-কি জীবের ইন্দ্রিয়চেতনা এবং কর্মপ্রবৃত্তিও বস্তুত কিছুই নয় একধরনের শক্তির অভিঘাতে আর-এক ধরনের শক্তির সাড়া ছাড়া। প্রত্যক্ষ অনুভবে জানছি, এই জগতের রূপ; অতএব এই অনুভবই হবে আমাদের এষণারও ভিত্তি।

এ-যুগের বৈজ্ঞানিকও অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন জড়কে বিশ্লেষণ করে—যদিও সংশয়ের শেষ রেশটুকু এখনও বেঁচে আছে কোথাও-কোথাও। দর্শন ও বিজ্ঞানের এই ঐকমত্যের সমর্থন মেলে বোধি এবং অপরোক্ষানুভূতিতেও। এ-সিদ্ধান্তে শুদ্ধ-বুদ্ধিও খুঁজে পায় তার স্বারসিক প্রত্যয়ের চরিতার্থতা; কেননা বিশ্বব্যাপারকে যদি স্বরূপত চৈতন্যের লীলা বলে ব্যাখ্যাও করি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে, লীলার তাৎপর্য প্রবৃত্তিতে এবং প্রবৃত্তির অর্থই হল শক্তির স্পন্দন বা বীর্যের উল্লাস। স্বগত অনুভবের সাক্ষ্যও বলে, এই তো বিশ্বের নিরূঢ় স্বভাব। আমাদের সকল কর্মপ্রবৃত্তিই এক ত্রিগুণা মহাশক্তির লীলা—প্রাচীন দার্শনিকেরা

যে-ত্রয়ীর নাম দিয়েছেন জ্ঞানা- ইচ্ছা- এবং ক্রিয়া-শক্তি ; কিন্তু স্বরূপত এরা এক আদ্যাশক্তিরই ত্রিস্রোতা। এমন-কি স্থিতি বা কর্মনিবৃত্তিও মহাশক্তির গুণলীলার সাম্যাবস্থা অথবা সদৃশ-পরিণাম মাত্র।

শক্তি-স্পন্দকেই বিশ্বের স্বরূপ-প্রকৃতি বললে ওঠে দুটি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন, শুদ্ধ-সতের বুকে কী করে জাগল এই স্পন্দলীলা ? যদি বলি, স্পন্দ একটা শাশ্বত তত্ত্ব,—শুধু তাই নয়, স্পন্দই সত্তার স্বরূপ, তাহলে অবশ্য এ-প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু স্পন্দই একমাত্র তত্ত্ব, এ-সিদ্ধান্ত অপরিহার্য নয় ; কেননা স্পন্দনের প্রৈতি হতে নির্মুক্ত এক অধিষ্ঠান-সত্তার সন্ধানও পেয়েছি আমরা। তাহলে অধিষ্ঠান-সত্তার শাশ্বতী স্থিতিকে বিক্ষুব্ধ করে কী করে এল স্পন্দদোলা—কোন্ হেতু বা সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে ? কোন্ রহস্যের সংবেগে অটল টলে পড়ল এমনি করে ?

এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা এর উত্তরে বলেছেন, শুদ্ধ-সত্তায় শক্তি আছে অবিনাভূত হয়ে। শিব এবং কালীতে, ব্রহ্মে এবং শক্তিতে অভেদসম্বন্ধ—অতএব এ-দুটিকে পৃথক করা যায় না কখনও। সত্তার অবিনাভূত শক্তি কখনও স্পন্দিত, কখনও নিস্পন্দ ; কিন্তু নিস্পন্দ দশাতেও শক্তি নিঃসত্ত্ব নিরাকৃত বা ঊনীকৃত নয়, অথবা কোনও তাত্ত্বিক বিকার ঘটেনি তার। এ-সিদ্ধান্ত এতই যুক্তিযুক্ত এবং বস্তু-স্বভাবের অনুগত যে একে স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না কোনও। শক্তি অনন্ত অদ্বয়-সত্তার বিজাতীয় কোনও তত্ত্ব—অখণ্ডের বাইরে থেকে তাতে আবিষ্ট ও আরোপিত ; অথবা শক্তি একদা ছিল অসৎ, তারপর বিশিষ্টক্ষণে ঘটেছে সৎ-রূপে তার আবির্ভাব ;—এমন কল্পনা যুক্তি-বিরুদ্ধ বলেই অসম্ভব। এমন-কি মায়াবাদীকেও মানতে হবে, যে-মায়া ব্রহ্মে আত্ম-বিভ্রমের শক্তিরূপিণী, সে-ও শাশ্বত সন্মাত্রে আছে শাশ্বতী যোগ্যতারূপেই ; অতএব প্রশ্ন ওঠে তার বিবিক্ত সত্তা নিয়ে নয়, শুধু তার উন্মেষ ও নিমেষ নিয়ে। সাংখ্যবাদীও স্বীকার করেন প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি সহভাব ; তাঁদেরও মতে প্রকৃতির গুণ-সাম্য ও গুণ-বিক্ষোভ পর্যায়ক্রমে দুই-ই সত্য।

এমনি করে শক্তি যদি হয় সত্তারই অবিনাভূত, শক্তির স্বরূপে যদি থাকে পর্যায়ক্রমে স্পন্দ ও নিস্পন্দ দুয়েরই যোগ্যতা ; অর্থাৎ আত্ম-সংহরণ ও আত্মবিচ্ছুরণ দুইই যদি হয় শক্তির স্বরূপ-প্রকৃতি ;—তাহলে কী করে সম্ভব হল আদি-স্পন্দের প্রৈতি বা প্রবেগ, এ-প্রশ্ন আদপেই

ওঠে না। কারণ, সহজেই বুঝতে পারি—শক্তির যোগ্যতা তাহলে হয় স্পন্দ ও নিস্পন্দের ছন্দ-পর্যায়ে আপনাকে ফুটিয়ে চলবে কালের তরঙ্গ-দোলায়; অথবা শাশ্বত আত্মসংহরণের সামর্থ্যে নির্বিকার সন্মাত্রে সমাহিত থেকেই মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গ-বিক্ষোভের মত শুধু জাগিয়ে রাখবে একটা বিশ্বের স্পন্দলীলা। আবার এই বহিশ্চর লীলা হতে পারে আত্মসংহরণেরই সমান্তর অতএব শাশ্বত; কিংবা কালের কলনায় অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে থাকতে পারে তার উদয়-বিলয়ের ছন্দ;—তখন আবৃত্তি-নিত্যতা থাকবে তার, কিন্তু থাকবে না প্রবাহ-নিত্যতা।···অবশ্য এসব উক্তিই অপরিস্ফুট কল্পনার ছবি আঁকা শুধু।

শুদ্ধ-সত্তায় কী করে হয় স্পন্দনের শুরু, এ-প্রশ্নকে ঠেকাতেই জাগে 'কেন'র প্রশ্ন। মহাশক্তির মাঝে স্পন্দলীলার যোগ্যতা থাকলেও সে কেন পরিণামের ছন্দে ফুটে উঠল এমনি করে? সদ্‌-ব্রহ্মের শক্তি রূপায়ণের সমস্ত বৈচিত্র্য হতে নির্মুক্ত থেকে আনন্ত্যের মহিমায় নিত্য-সংহৃত হয়ে রইল না কেন নিজেরই মাঝে? অবশ্য শুদ্ধ-সৎকে যদি বলি অচেতন এবং চৈতন্যকে যদি মনে করি জড়শক্তির সেই পরিণাম, শুধু ভুল করে যাকে অজড় ভাবি,—তাহলে কিন্তু এ-প্রশ্ন ওঠে না। কেননা পরিণামের ছন্দকে আমরা তখন স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি শক্তিরই স্বভাব বলে;—স্বভাবতই যা শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ, তার হেতু আদিম প্রৈতি বা অন্তিম লক্ষ্য খোঁজবার সঙ্গত কোনও কারণ তো নাই। শাশ্বত স্বয়ম্ভূ-সত্তার সম্পর্কে প্রশ্নই হতে পারে না যেমন—কী করে সত্তার আবির্ভাব, কেনই-বা তার সম্ভাব; তেমনি কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না সত্তার স্বরূপশক্তি এবং তার স্পন্দলীলার নিরূঢ় প্রৈতি সম্পর্কেও। হেতু-প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা তখন ব্যাপৃত থাকবে শুধু শক্তির স্বতঃস্ফুরণের ধারা, স্পন্দ ও রূপায়ণের রীতি এবং পরিণামের ছন্দ নিয়ে। সত্তা ও শক্তি দুইই যখন তমোভূত—একটি শুধু তামসী স্থিতি আর-একটি তামসী প্রবৃত্তি, এবং দুইই অচেতন ও অপ্রবুদ্ধ—তখন বিশ্ব-পরিণামের মূলে কোনও হেতু বা আকূতি এবং তার চরমে কোনও সুনিশ্চিত লক্ষ্য থাকতে পারে না কোনমতেই।

কিন্তু সৎ-স্বরূপকে যদি মানি বা জানি চিন্ময় বলে, তাহলেই জাগে হেতু-নিরূপণের সমস্যা। অবশ্য এমন চিন্ময় পুরুষের কল্পনা

অসম্ভব নয়, যিনি স্বীয়া প্রকৃতির দ্বারা শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত,—বিশ্বরূপে প্রকাশ বা শাশ্বত আত্মসংহরণে অপ্রকাশ কোনও-কিছুতেই স্বাতন্ত্র্য নাই তাঁর। এমন বিশ্বেশ্বরের কল্পনা আছে মায়াবাদে এবং কোনও-কোনও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে; তাঁদের মতে ঈশ্বর মায়া অথবা শক্তির পরতন্ত্র, পুরুষ মায়াকবলিত বা শক্তিশাসিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, আমাদের জিজ্ঞাসার শুরু যে অনন্ত পরমার্থ-সৎকে নিয়ে, তাঁর স্বরূপ ঈশ্বরের এমন কল্পনায় ফুটতে পারে না কখনও। একথা মানতেই হবে, ব্রহ্মই বিশ্বে নিজকে রূপায়িত করেছেন ঈশ্বররূপে—'আত্মমায়য়া'; সুতরাং ব্রহ্ম ন্যায়ত শক্তি বা মায়ার প্রাগ্‌ভাবী স্ব-তন্ত্র অধিষ্ঠান, তাই মায়ার ক্রিয়ানিবৃত্তিতে ব্রহ্মই আবার তাকে নিলীন করেন আপন তুরীয় সত্তায়। চিন্ময় সত্তা যদি হয় নির্বিশেষ, আত্ম-ব্যাকৃতি হতে স্ব-তন্ত্র নিজের গুণলীলা দ্বারা অনুপহিত, তাহলে স্পন্দের স্বরূপ-যোগ্যতাকে রূপে বিবর্তিত করা না-করা সম্পর্কে নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্য আছে তার,—একথা অনস্বীকার্য। ব্রহ্ম প্রকৃতি-পরতন্ত্র হলে ব্রহ্মই বলা চলে না তাঁকে; বলতে হয়, তিনি আনন্ত্যের অন্ধতামিস্র যেন, ক্রিয়া তাঁর মাঝে থেকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁকে, শক্তির সচেতন আধার হয়েও তার কর্তা নন তিনি। যদি বলি, শক্তির শাসন তাঁরি আত্মশাসন, কেননা শক্তি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি, তাহলে আমাদের প্রথম অভ্যুপগম টেকে না অতএব সিদ্ধান্তবিরোধ হয় অনিবার্য। কারণ, সত্তার স্বরূপ তখন পর্যবসিত হয় শক্তিতে—শক্তিরই নিস্পন্দ বা স্পন্দরূপে; কিন্তু তবু তাকে পরমা-শক্তিই বলা চলে—পরমার্থ-সৎ নয়।

তাহলে এখন খুঁটিয়ে দেখতে হবে শক্তি ও চৈতন্যের মাঝে কী সম্বন্ধ। কিন্তু চৈতন্য বলতে আমরা কী বুঝি? সুপ্তি মূর্ছা বা অন্য কারণে মানুষের স্থূল ও বহিশ্চর ইন্দ্রিয়-বোধের পথ রুদ্ধ না হয় যদি, তাহলে জীবনের বেশির ভাগ জুড়ে তার মনের মহলে যে জাগ্রৎ-দশাকে স্পষ্ট দেখতে পাই আমরা, তাকেই 'চৈতন্য' বলি সাধারণত। চৈতন্যের এ-সংজ্ঞা সত্য হলে তাকে বলতে হয় জড়বিশ্বের একটা ব্যতিক্রম—নিত্য-বিধান নয়, কেননা আমাদের মাঝে চৈতন্য তাহলে একটা আগন্তুক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই অগভীর প্রাকৃত ধারণাই ছড়িয়ে আছে আমাদের চিন্তায় এবং সংস্কারে; কিন্তু দার্শনিক বিচারে

এখন থেকে এ-দৃষ্টিকে বর্জন করেই চলতে হবে পুরোপুরি। আমরা জানি, সুপ্তি মূর্ছা বা নেশার ঘোরে দেহ জড়বৎ অচেতন যখন, তখনও কে যেন ভিতরে-ভিতরে জেগে থাকে আমাদের মধ্যে। শুধু তাই নয়; এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা যে বলেছেন, যে জাগ্রৎ-দশাকে আমরা জানি চৈতন্য বলে, সমগ্র চৈতন্য-সত্তার একটা ভগ্নাংশমাত্র সে—তাঁদের এ-উক্তিও মিথ্যা নয়। জাগ্রৎ-ভূমি চেতনার বহিরাবরণ মাত্র; এমন-কি মনশ্চেতনারও সবটুকু পড়ে না তার এলাকায়। জাগ্রৎ-চেতনার পিছনেও আছে অধিচেতনা বা অবচেতনার একটা বৃহত্তর ভূমি, আমাদের সত্তার অধিকাংশই তার দখলে; তার তুঙ্গশিখর অথবা অতল-গহনের পরিমাপ আজও রয়েছে মানবীয় সামর্থ্যের বাইরে। চৈতন্যের এই বিপুল প্রসারকে মেনে নিয়ে শুরু হয় যদি আমাদের এষণা, তবেই আমরা গড়তে পারব শক্তির স্বরূপ ও প্রবৃত্তির সত্য-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই স্থূলতার সঙ্কোচ হতে, প্রতিভাসের বিভ্রম হতে আমাদের দৃষ্টিকে করবে চিরনির্মুক্ত।

জড়বাদী অবশ্য বলবেন, যত প্রসারিতই হোক্ চৈতন্যের অধিকার, তবু সে জড়েরই বিকার মাত্র; কেননা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—ইন্দ্রিয় চেতনার সাধন নয়, চেতনাই ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। কিন্তু জড়বাদের এ-গোঁড়ামি ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে; তার ব্যাখ্যাকে আমরা অগভীর অপর্যাপ্ত ও কষ্টকল্পিত বলেই জানি এখন। আমাদের সমগ্র-চেতনার সামর্থ্য যে দেহযন্ত্র নাড়ী-চক্র মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়কেও ছাড়িয়ে গেছে বহুদূর, চেতনার প্রাকৃত-ভূমিতেও এই সব শারীর-যন্ত্র যে চৈতন্য-বৃত্তির অভ্যস্ত সাধন মাত্র, জনক নয়—একথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। ঊর্ধ্বায়নের আকৃতিতে চৈতন্যই মস্তিষ্ককে সৃষ্টি করেছে সাধনরূপে,—মস্তিষ্ক সৃষ্টিও করে নি, ব্যবহারও করছে না চৈতন্যকে। শারীর-যন্ত্র যে একান্ত অপরিহার্য সাধন নয় চেতনার, অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের নজির আছে তার সপক্ষে। হৃৎ-স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়াও যে অসম্ভব নয় বেঁচে থাকা, অথবা চিন্তার জন্য মস্তিষ্ককোষের পরিচালন যে অনাবশ্যক অনেক সময়—এতো আমাদের অজানা নয়। অতএব, একটা যন্ত্রের কলা-কৌশল হতে তার পরিচালক বাষ্প বা বিদ্যুতের

কোনও ব্যাখ্যা অথবা পরিচয় পাওয়া যায় না যেমন, তেমনি দেহযন্ত্র দিয়েও চৈতন্যবৃত্তির হেতু-নিরূপণ বা ব্যাখ্যা হয় না। উভয়ক্ষেত্রে শক্তিই প্রাক্তন, তার বাহন জড়যন্ত্র প্রাক্তন নয়।

এই থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুই আমরা। অসাড় নিষ্প্রাণতার মাঝেও মনশ্চেতনার সত্তা সম্ভাবিত হয় যদি, তাহলে জড়পদার্থেরও মাঝে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা বিশ্বব্যাপ্ত অবচেতন মন, কেবল উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে বাইরে স্ফুরিত হচ্ছে না তার আকৃতি বা ক্রিয়া—এ-সম্ভাবনা একেবারে অযৌক্তিক কি? জড়দশা কি চেতনার অভাব, না চেতনার সুপ্তি? বিশ্বপরিণামের দিক দিয়ে এ-সুপ্তি যদি হয় প্রবর্তনার আদিবিন্দু—তার অবান্তর-ব্যাপার না হয়ে, তাতেই-বা ক্ষতি কী? মানুষের সুপ্তিতেও দেখি, সে তো চেতনার স্তম্ভন বা অভাব নয় শুধু; সে তার অন্তঃ-সংহরণ—বহির্বিষয়ের অভিঘাতে স্থূলভাবে সাড়া না দিয়ে চেতনা নিজের মাঝেই গুটিয়ে এসেছে সেখানে। বিশ্বের যা-কিছু বহির্জগতের সঙ্গে প্রকাশ্য যোগাযোগের পথ খুঁজে পায়নি আজও, তাদের সকলেরই কি এই সুপ্তিদশা নয়? শুধু এক চিন্ময় পুরুষই 'নিত্য জেগে আছেন, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মাঝেও'—এই কি নয় বিশ্ব-প্রতিভাসের তত্ত্ব?

শুধু তাই নয়। যাকে বলি অবচেতনা, সে আমাদের বহিশ্চর মনশ্চেতনা হতে আলাদা নয় কিছু। জাগ্রতের অন্তরালে সত্তার গহনে কাজ করলেও জাগ্রতেরই মত ধরন তার,—কেবল তার অধিকার জাগ্রতের চেয়ে আরও ব্যাপ্ত, আরও গভীর। কিন্তু অধিচেতনার অধিকার অবচেতনার গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে গেছে বহুদূর। তার উৎকর্ষ এবং সামর্থ্যই যে বহুগুণিত তা নয়—আমাদের চিরপরিচিত জাগ্রৎ-মানস হতে তার ধারাই স্বতন্ত্র। অতএব এ-ধারণা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের মাঝে যেমন আছে অবচেতনা, তেমনি আছে অতিচেতনা; এই আধারেই চিন্ময়-বিগ্রহের মাঝে আছে চিৎ-বৃত্তির এমন একটা পরম্পরা, যা আমাদের পরিচিত মনোভূমির অনেক ঊর্ধ্বে। অধিচেতনা এমনি করে অতিচেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারে যদি মনের সীমানা ছাড়িয়ে, তাহলে সে কি মনেরও তলায় তলিয়ে যেতে পারে না অবচেতনার পাতালপুরে? বিশ্বজগতে, এমন-কি আমাদের এই আধারেই কি নাই

চেতনার এমন অবরভূমি যা মনেরও নীচে, যাকে আমরা বলতে পারি প্রাণ-চেতনা এবং দেহ-চেতনা? তাই যদি হয়, তাহলে চেতনার অধিকারকে আরও প্রসারিত করে উদ্ভিদ্ ও ধাতুখণ্ডে নিগূঢ় শক্তিকেও আমরা চেতনা নাম দিতে পারি না কি? অবশ্য পশু বা মানুষের মানসের সঙ্গে সাদৃশ্য নাই সে-চেতনার; কিন্তু তা বলে চৈতন্য-গুণকে তাদেরই একচেটিয়া ভাববার সঙ্গত কারণও নাই কোনও।

চেতনার এই বিশ্বময় অনুস্যূতি শুধু যে সম্ভব তা নয়, নিরপেক্ষ বিচারে একে আমরা অবধারিত বলেই জানি। আমাদেরই মাঝে দেখি, প্রাণ-চেতনার এমন-একটা লীলা চলছে দেহকোষে এবং জীবনযোনি-প্রযত্নে, যার ফলে মনের অগোচরেই আমরা সায় দিয়ে চলেছি নানা সার্থক প্রবৃত্তিতে এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র দ্বন্দ্বে। পশুর মাঝে প্রাণ-চেতনার এই লীলা আরও সুস্পষ্ট এবং সার্থক। উদ্ভিদের মাঝেও তার পরিচয় পাই বোধির প্রত্যয় দিয়ে। উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জীবনস্পন্দনের বিচিত্র রহস্য একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন; তাঁর গবেষণায় উদ্ভিদের চিত্ত-বৃত্তির কোনও সন্ধান আজ পর্যন্ত না মিললেও তার স্পন্দ যে চিৎ-স্পন্দই, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না কোনও। অতএব মানতেই হয়, স্বানুভবের ধারা অতিচেতনাতে মনশ্চেতনা হতে ভিন্ন যেমন, মনের নিদ্মহলে প্রাণচেতনাতেও ঠিক তাই —যদিও তার সাড়া দেবার ধরন গোড়াতে হুবহু মনেরই মত।

পশুরও নীচে, উদ্ভিদে দেখি প্রাণের লীলা; চৈতন্যের লীলাও কি শেষ হয়ে গেছে এখানে এসেই? তাহলে কি প্রাণ ও চেতনা জড় হতে বিজাতীয় কোনও শক্তি, পরিণামের একটা বিশিষ্ট পর্বে জড়ে এসে হয়েছে আবিষ্ট—সম্ভবত আর-কোনও জগৎ হতে?* নইলে হঠাৎ এ-শক্তি কোথা থেকে এল জড়ের মাঝে? প্রাচীন দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন, জড়াতীত এমন-সব জগৎ আছে, যারা এই জগতের প্রাণ ও চেতনাকে ধরে

* লোকান্তর হতে নয় কিন্তু গ্রহান্তর হতে প্রাণ এসেছে এই পৃথিবীতে, এমন একটা অদ্ভুত জল্পনা চলছে আজকাল। কিন্তু এ-মীমাংসা মীমাংসাই নয় চিন্তাশীল দার্শনিকের কাছে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আদপেই জড়ের মাঝে প্রাণ এল কী করে—বিশেষ-কোনও গ্রহের জড়-উপাদানে সঞ্চারিত হল কী করে, সে-প্রশ্ন নয়।

আছে অথবা ফুটিয়ে তুলছে নিজের চাপে—কিন্তু আবেশদ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করছে না কিছুই ; কেননা আগে থেকেই যা সংবৃত হয়ে নাই জড়ের মাঝে, তার বিবৃতিও সম্ভব নয় কখনও।

কিন্তু আমরা যাকে মনে করি নিছক জড়, তার সামনে এসেই প্রাণ ও চেতনার মূর্ছনা যে থমকে গেছে স্তব্ধ হয়ে, একথা মনে করবার সঙ্গত কোনও কারণ নাই। দর্শন ও বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক রায় হচ্ছে —প্রাণের নিদানকথা অস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন ; সম্ভবত ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি 'নিষ্প্রাণ' পদার্থে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা নিস্পন্দ ও নিরুদ্ধ চেতনা ; আমাদের মাঝে চেতনার যা মূল উপাদান, অন্তত তার অব্যক্ত সূচনা আছেই জড়ের মাঝে। ইতিপূর্বে যাকে বলেছি প্রাণচেতনা, উদ্ভিদে তার একটা অস্পষ্ট আভাস পাই বলেই তার কল্পনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু জড়ের চেতনা অসাড় নিস্পন্দ, তাই বোঝা কঠিন বলে তাকে কল্পনা করাও কঠিন ; আর যা বুঝি না বা ভাবতে পারি না, তা উড়িয়েও দিতে পারি—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু চেতনাকে যদি নামিয়ে আনতে পারি মনুষ্যলোক হতে উদ্ভিদ-জীবনের গভীর গহনে, তাহলে এর পরেই প্রকৃতির পরিণামে হঠাৎ দেখা দিল একটা দুস্তর ফাঁক—একথাই-বা বিশ্বাস করি কী করে ? বিশ্বব্যাপারের সর্বত্রই দেখি যদি একই ধারার সুস্পষ্ট নিদর্শন, শুধু একটি ক্ষেত্রেই দেখি—ধারা বিলুপ্ত নয়, কেবল অপরের তুলনায় চিহ্ন তার অস্পষ্ট,—তাহলে সেখানে ধারার অস্তিত্বকে অনুমান করবার অধিকারও তর্কবুদ্ধির আছে নিশ্চয়ই। এমনি করে ধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতাকে স্বীকার করি যদি, তাহলে জগতে যেখানেই দেখব শক্তির লীলা, সেখানেই নিঃসংশয়ে মানব চৈতন্যেরও অস্তিত্ব। অতএব, শক্তির সকল ব্যাকৃতিতে চেতন বা অতিচেতন পুরুষের সাক্ষাৎ অভিনিবেশ যদি না-ও থাকে, তবু চেতন শক্তির আবেশ যে আছেই তাদের মাঝে এবং তারি দ্বারা যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদের বহিরঙ্গ-ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চেতনাকে এমনি করে সর্বানুস্যূত মানতে গেলে তার অর্থকে প্রসারিত করে নিতেই হয় অনেকখানি। তখন বলা চলে না, চেতনা আর চিত্তবৃত্তি সমার্থক ; চেতনা তখন সত্তার স্বয়ম্প্রভু স্বরূপশক্তি—চিত্তবৃত্তি তার মধ্যপর্ব মাত্র। চিত্তবৃত্তির নীচে চেতনা পর্যবসিত হয়

জীবনযোনি-প্রযত্নে, এবং তার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয় অতিমানস ভূমিতে, আমাদের কাছে যা অতিচেতন। কিন্তু এক অদ্বৈত-চৈতন্যেরই বিচিত্র কায়ব্যূহ নিখিল জুড়ে। ভারতীয় দর্শনে এই হল চিতের স্বরূপ, শক্তিরূপে যা সৃষ্টি করছে অনন্তকোটি জগৎ। এমনি করে আমরা পৌঁছই যে অদ্বয়-তত্ত্বে, জড়বিজ্ঞানও তাকেই দেখেছে দৃষ্টির বিপরীত মেরু হতে,—যখন মনকে জড় হতে পৃথক শক্তি না মেনে সে বলেছে, মন শুধু জড়শক্তির ক্রমিক পরিণাম। কিন্তু অনুভবের নিবিড়তম প্রত্যয় হতে বলেছে ভারতীয় দর্শন,—মন ও জড় একই শক্তির বিভিন্ন পর্বমাত্র, তারা এক অখণ্ড-সত্তারই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তির বিভিন্ন রূপায়ণ।

তবু প্রশ্ন হবে, বিশ্বশক্তি যে যথার্থই চিন্ময়ী, কী প্রমাণ তার? চেতনা থাকলেই তো দেখা দেবে কিছু-না-কিছু বুদ্ধির ব্যাপার, একটা সাভিপ্রায় প্রবৃত্তি, খানিকটা আত্মসংবিৎ ;—আমাদের অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তির আকারে না হো'ক্, কোনও-না-কোনও আকারে দেখা তো দেবেই তারা।... কিন্তু পূর্বপক্ষের এ-শঙ্কা সর্বগত চিৎশক্তির বিরুদ্ধে না গিয়ে তাকে সমর্থনই করে বরং। তার উদাহরণ: পশুর মাঝেও মেলে লক্ষ্যানুসারী প্রবৃত্তির এমন নিখুঁত পরিচয়, বৈজ্ঞানিকের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের এমন আশ্চর্য সমাবেশ, যা তার মানসিক সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গেছে অনেকখানি,—এমন-কি মানুষ তাকে বহু সাধ্যসাধনায় আয়ত্ত করেও অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতায় ব্যবহার করতে পারে না পশুর মত। এই অতি সাধারণ একটি ব্যাপার হতেই বোঝা যায়, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গেও চলছে চিৎশক্তির এমন-একটা লীলা যা বুদ্ধির স্বচ্ছ তীক্ষ্ণতায়, সাভিপ্রায় প্রবৃত্তিতে, সাধ্য সাধন ও পরিবেশের সাকূত সচেতনতায় এমনই অনুপম যে, এ-যাবৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত মনঃশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশও হার মানে তার কাছে। তেমনি জড়প্রকৃতিরও সকল ব্যাপারে দেখি, সেই এক প্রচ্ছন্ন পরা-বুদ্ধিরই খেলা—'স্বগুণৈর্নিগূঢ়া'।

সারা বিশ্বে এমনি করে চলছে এক আকূতির লীলা,—তার মাঝে বুদ্ধির কত কসরত, কত খোঁজাখুঁজি, কত বাছাই-ছাঁটাই, কত মানিয়ে-চলা। যে চিন্ময়ী প্রৈতি আছে এর মূলে, তার বিরুদ্ধে এই আপত্তি শুধু—প্রকৃতি বুদ্ধিমতীই হবে যদি, তবে তার মাঝে বেপরোয়া অপচয়ের

প্রবৃত্তি কী করে এত প্রবল হল? কিন্তু এ-আপত্তি শুধু মনুষ্য-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা হতে প্রসূত; বিশ্বশক্তির বিপুল প্রবাহের 'পরে সে তার কুনো যুক্তির ছাপ রেখে যেতে চায় সঙ্কীর্ণ ইষ্টসিদ্ধির খাতিরে। মহা-প্রকৃতির অভিপ্রায়ের আমরা দেখি একটিমাত্র দিক; তাই তার সঙ্গে গরমিল যার, তাকেই বলি শক্তির অপচয়। কিন্তু মানুষের সমাজেও তথাকথিত অপচয়ের নাই লেখা-জোখা; অথচ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যা অপচয়; সে যে কোনও বিরাট ইষ্টসিদ্ধিরই অনুকূল, সে-বিষয়েও আমরা নিঃসংশয়। প্রকৃতির আকৃতির যেদিকটা স্পষ্ট আমাদের কাছে, তারও মাঝে দেখি—অপচয় সত্ত্বেও, এমন কি আপাত-অপচয়ের সুযোগ নিয়েই সে ঠিক হাসিল করে চলেছে তার নিজের কাজ। অতএব, প্রকৃতির যে-উদ্দেশ্যটা যবনিকার অন্তরালে, তার সাধনার ভার অসংকোচেই ছেড়ে দিতে পারি নাকি তারি হাতে?

বাস্তবিক, পশুতে উদ্ভিদে জড়ে—যেখানেই বিশ্বশক্তির লীলা অব্যাহত, সেখানেই দেখি তার লক্ষ্যনিষ্ঠার একটা সংবেগ,—আপাত-অন্ধ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে' বিলম্বেই হোক্ না সদ্য-সদ্যই হোক, ঠিক-ঠিক লক্ষ্যভেদ করবার আশ্চর্য একটা নৈপুণ্য। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরোপুরি জানা না থাকলেও এ-ব্যাপারগুলিকে তো উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলে না কিছুতেই। জড় যতদিন আনখ-শিখ জুড়ে ছিল বৈজ্ঞানিকের কল্পনা, ততদিন বুদ্ধিকেই বুদ্ধির প্রসূতি মানতে নিষ্ঠায় বাধত তার—সে-কথা না হয় বুঝি। কিন্তু এ-যুগে যদি কেউ বলে, মানুষের চেতনা বুদ্ধি সিদ্ধি সমস্তই এসেছে এক অন্ধ প্রমত্ত অপ্রবুদ্ধ অচেতনার প্রবেগ হতে, যার মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল না তাদের এতটুকু আভাস বা বীর্য,—তাহলে তার উক্তিকে কী বলব মান্ধাতাযুগের একটা হেঁয়ালি ছাড়া? দিবালোকের মতই স্পষ্ট একথা—মানুষের চেতনা মহাপ্রকৃতিরই চেতনার একটা রূপ মাত্র। এই চেতনা সংবৃত হয়ে আছে মনোলোকের তলায়, মুকুলিত হয়েছে মনের মাঝে—এখনও তার উৎকৃষ্টতর রূপায়ণ বাকী আছে মনেরও ওপারে। কারণ অনন্ত লোকের প্রসূতি যে-মহাশক্তি, তিনি চিন্ময়ী; লোকে-লোকে যে-সন্মাত্রের রূপায়ণ, তিনি চিন্ময় পুরুষ; গুহাহিত সম্ভূতি-বীর্যের পরিপূর্ণ রূপায়ণই তাঁর বিশ্বরূপের তাৎপর্য ও আকূতি—আমাদের 'প্রসন্ন-উদার বুদ্ধির এই তো প্রত্যয়।

১১

# আনন্দরূপং যদ্ বিভাতি

## ( সমস্যা )

কারণ কে-ই বা থাকত বেঁচে, কে-ই বা নিত নিঃশ্বাস—যদি এই আনন্দ আকাশ হয়ে আমাদের না থাকত ছেয়ে।

আনন্দ হতেই জন্মেছে এই-সব ভূত, জন্মে আনন্দেই আছে বেঁচে, আবার আনন্দেই যায় তারা মিলিয়ে।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ২।৭ ; ৩।৬ )

মানলাম, সদ্‌ব্রহ্মই বিশ্বের আদি অবসান ও পরায়ণ, এবং সেই ব্রহ্মসত্তারই অবিনাভূত এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসংবিৎ চিৎ-স্পন্দরূপে নিজকে বিচ্ছুরিত করে সৃষ্টি করছে অনন্ত লোক—বিচিত্র শক্তির বহুধা রূপায়ণে। তবু এ প্রশ্ন থেকেই যায় : ব্রহ্ম অনন্ত নির্বিশেষ নিরঞ্জন অপ্রয়োজন অকাম হয়েও কেন চিৎশক্তিকে বিচ্ছুরিত করলেন বিশ্বরূপের বিসৃষ্টিতে? তাঁর স্বরূপ-শক্তিই তাঁকে বাধ্য করছে সৃষ্টি করতে, স্পন্দ ও রূপায়ণের স্বরূপ-যোগ্যতা আছে বলেই রূপে স্পন্দিত না হয়ে পারেন না তিনি—সমস্যার এ সমাধান পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছি আমরা। কারণ স্বরূপ-যোগ্যতা থাকলেও তার দ্বারা তিনি সীমিত অবরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নন ; তিনি স্ব-তন্ত্র, অতএব সৃষ্টির যোগ্যতা থাকলেও তার দায় নাই তাঁর। স্পন্দবৃত্তি অথবা স্পন্দহীন নিত্যস্থিতি, সম্ভূতি অথবা আত্মনিরুদ্ধ অসম্ভূতি দুইই যদি হয় তাঁর স্বেচ্ছাধীন, তাহলে তাঁর এই স্পন্দ ও সম্ভূতি-লীলার একমাত্র কারণ হতে পারে—আনন্দের অবারণ উচ্ছ্বাস।

অনাদি পরাৎপর শাশ্বত সন্মাত্রকে বেদান্তীরা দেখেছেন কেবল সত্তা-রূপে নয়, অথবা এমন চিন্ময় সত্তারূপেও নয় যার চিৎ একটা অন্ধশক্তির সংবেগ শুধু। তাঁদের অনুভবে, ব্রহ্ম চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই তাঁর সত্তার তাৎপর্য, আনন্দই তাঁর চেতনার স্বরূপ। পরমার্থ সন্মাত্র বলি যাকে, তার

মাঝে থাকতে পারে না অসত্তা বা অচিতির অন্ধতমিস্রা অথবা শক্তির কুণ্ঠা-বশত কোনও ন্যূনতা—কেননা তাহলে আর পরমার্থ-তত্ত্ব বলা চলত না তাকে ; ঠিক সেই কারণেই বেদনাবোধ বা আনন্দের অভাবও থাকতে পারে না তার স্বভাবে। চিন্ময় সত্তার পরাকাষ্ঠা হল তারি নিরঙ্কুশ 'আনন্দ-স্বভাব' ; এখানে উদ্দেশ্য আর বিধেয়ের একই তাৎপর্য। নিরঙ্কুশতা আনন্ত্য পরা-কাষ্ঠা—সমস্তের মাঝেই আছে শুদ্ধ-আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা। এমন কি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরেও যেখানে অনুভব করি অতৃপ্তি, সেখানেই থাকে সীমার সঙ্কোচ না বাধা ; তাই অবরুদ্ধকে নির্মুক্ত করে, সীমাকে অতিক্রম করে, বাধাকে পরাভূত করেই আমাদের তৃপ্তি। কারণ আর-কিছু নয় : মানুষের অনাদি-সত্তায় আছে অকুণ্ঠ অনন্ত আত্মসংবিৎ ও আত্ম-শক্তির নিরঙ্কুশ পরাকাষ্ঠা ;—নিজকে এমনি করে পাবার অর্থই হল আত্মানন্দে বিভোর হওয়া, এবং তা-ই আমাদের স্বরূপ। ব্যবহারিক জীবনের ক্ষুণ্ণতায় এই আত্মবশ্যতার আমেজ লাগে যখন, তখনই আমরা পাই তৃপ্তির সন্ধান, পাই আনন্দের স্পর্শ।

ব্রহ্মের আত্মানন্দ কিন্তু তাঁর নির্বিশেষ আত্মসত্তার নিস্পন্দ স্থাণুতাদ্বারা খণ্ডিত হয় না কখনও। যেমন তাঁর চিৎ-শক্তির মাঝে আছে আত্ম-রূপায়ণের নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত-বিচিত্র সামর্থ্য, তেমনি তাঁর আত্মানন্দের মাঝেও আছে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রূপে অন্তহীন আত্মরূপায়ণের নিত্যচঞ্চল সমুল্লাস, অফুরন্ত স্পন্দ-বৈচিত্র্যের অপরূপ লাস্যলীলা। আত্মস্বরূপের আনন্দ-স্পন্দকে অনন্ত রূপবৈচিত্র্যের উৎসারণে সম্ভোগ করাই তাঁর বিশ্বব্যাপিনী সৃষ্টিলীলার একমাত্র তাৎপর্য।

অথবা বলা চলে, বিশ্বে যা রূপায়িত হয়েছে, তা সৎ চিৎ আনন্দের অখণ্ড ত্রয়ী ; বেদান্তীরা তাঁকেই বলেন সচ্চিদানন্দ। তাঁর চিৎ-স্বভাবে আছে বিসৃষ্টি অথবা আত্মরূপায়ণের এক দিব্য সামর্থ্য, যা তাঁর চিন্ময় স্বরূপসত্তাকে বিচ্ছুরিত করে রূপ ও প্রতিভাসের অনন্ত বৈচিত্র্যে এবং সেই বিচ্ছুরণের আনন্দকেই সম্ভোগ করে 'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। অতএব যা-কিছু আছে এ-বিশ্বে, তা অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই সত্তায় সত্তাবান, তাঁরি চেতনায় চিন্ময় এবং তাঁরি আনন্দে নন্দিত। যেমন বিশ্বের বৈচিত্র্যকে দেখেছি এক নির্বিকার-সত্তারই বিভঙ্গরূপে, এক অনন্ত-শক্তিরই খণ্ডপরিণামরূপে, তেমনি আবার দেখতে পাব এক সর্বগত একরস স্বায়ম্ভুব আনন্দই বিশ্বরূপে প্রবর্তিত করেছে তার আত্ম-

সম্ভূতির রাস-চক্র। যা-কিছু আছে এ-জগতে, তারি মাঝে চিৎ-শক্তি রয়েছে পরিনিহিত—স্বরূপের ধাত্রী ও স্বধর্মের প্রবর্তিকা হয়ে ; তেমনি যা-কিছু আছে, তার মূলে রয়েছে সত্তারই আনন্দ—তার সঞ্জীবন ও স্বভাবরূপে।

এই স্বরূপানন্দের প্রৈতিকেই দেখেছিলেন বিশ্বসৃষ্টির মূলে প্রাচীন বেদান্তীরা। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের দুটি প্রবল পূর্বপক্ষ হল, প্রথমত প্রাকৃত-মনের নিত্য-অনুভূত দুঃখ,—বেদনা ও ইন্দ্রিয়বোধের রাজ্যে, এবং দ্বিতীয়ত তার নিত্যদৃষ্ট অনর্থ ও অধর্মের সমস্যা। প্রশ্ন হবে : এ-জগৎকে বলা হয় সচ্চিদানন্দের বিভূতি ; শুধু চিন্ময়-সত্তার বিভূতি বললে আপত্তির কারণ ছিল না কোনও—কিন্তু তারও পরে বলা হয় তাকে অফুরন্ত আনন্দ-সত্তার উল্লাস ; তাই যদি সত্য হবে, তাহলে জগৎ জুড়ে কোথা হতে এল এত শোক এত দুঃখ এত ব্যথা ? এ-জগৎ যে 'দুঃখালয়' এই অনুভবই তো প্রত্যক্ষ, একে স্বরূপসত্তার আনন্দে উল্লসিত দেখছি না তো কোথাও।···কিন্তু, জগৎ দুঃখ-ময়—এটা অত্যুক্তি, এবং তার মূলে আছে দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয়। কোনও ভাবুকতার ভাঁওতায় না পড়ে, শুধু সত্য-নির্ধারণের খাতিরে জগতের দিকে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে তাকাই যদি, তাহলে দেখি, আপাতিক অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ কোথাও তীব্র হয়ে দেখা দিলেও সমগ্র বিশ্বের জীবনলীলায় দুঃখের চেয়ে সুখেরই ভাগ বেশী। বাস্তবিক সুখের দশাই প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান, সাময়িক বিপর্যয়রূপে দুঃখ তাকে স্তম্ভিত বা অভিভূত করে রাখে মাত্র। সুখ স্বাভাবিক বলেই দুঃখের পরিমাণ স্বল্প হলেও চেতনায় তা ফোটে তীব্রতর হয়ে এবং অনুভূত সুখের চেয়ে ভারি ঠেকে কল্পিত দুঃখের বোঝাটাই। সুখে অভ্যস্ত বলেই তার স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকি না আমরা ; এমন-কি উৎকট অথবা আত্মহারা উল্লাসের তীব্রতা দিয়ে চেতনার তন্ত্রীকে সবলে আঘাত না করলে সহজ সুখের দিকে ফিরেও তাকাই না অনেক সময়। সুখের এই নিখাদের সুরকেই আমরা বলি আনন্দ এবং ছুটে মরি তারি পিছনে ; জীবনের যে স্বাভাবিক স্বচ্ছ পরিতৃপ্তি বিশেষ-কোনও ঘটনা নিমিত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষা না রেখে সব-সময় জুড়ে আছে চেতনার ক্ষেত্র, তাকে মনে করি না-সুখ না-দুঃখরূপী একটা তটস্থ অবস্থা মাত্র। অথচ আনন্দের ঐ স্বচ্ছ রূপটিকে মুছেও ফেলতে পারি না ব্যবহারিক জীবন হতে, কারণ জীবনধারণের ঐ আনন্দটুকু অব্যাহত না থাকত যদি, তাহলে প্রাণিমাত্রেই দেখা দিত না আত্মরক্ষার অমন প্রবল অভিনিবেশ। সহজ

আনন্দের কাম্যতা সম্পর্কে সচেতন নই বলেই প্রাকৃত সুখ-দুঃখের হিসাবের খাতায় তাকে জমা করি না আমরা। সে-খাতায় লাভের ঘরে বসাই শুধু তীব্র-সুখের অঙ্ক, আর যত অস্বস্তি ও দুঃখকে ফেলি ক্ষতির কোঠায়। দুঃখের সামান্য অনুভূতিও তীব্র নিখাদে বেজে ওঠে চেতনায়, কেননা আধারের সহজ ছন্দ অথবা স্বাভাবিক জীবন-প্রবৃত্তির অনুকূল নয় সে। তাই আমরা তাকে অনুভব করি জীবনসত্তার অবমাননারূপে,—আমাদের স্ব-ভাব ও আকৃতির অমর্যাদা এবং তাদের 'পরে অনাহূত একটা উপদ্রবরূপে।

কিন্তু দুঃখ অস্বাভাবিক-ই হোক অথবা তার পরিমাণে থাকুক যতই ইতরবিশেষ, তাতে মূল দার্শনিক প্রশ্নের জবাব হয় না। দুঃখের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, পূর্বপক্ষী তার অস্তিত্বকেই মনে করে একটা সমস্যা। তার প্রশ্ন, সকলই যদি সচ্চিদানন্দ, তবে দুঃখতাপের অস্তিত্ব মোটেই সম্ভব হয় কী করে? আসল সমস্যা হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো, যখন তার সঙ্গে একটি অনুচিত-সিদ্ধান্ত জোড়ে সে বিশ্ব-বহির্ভূত ঈশ্বর-পুরুষের কল্পনারূপে এবং একটি উপসিদ্ধান্ত খাড়া করে অধর্ম ও অনর্থের অস্তিত্বরূপে।

তর্কটা তখন দাঁড়ায় এই : সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রষ্টা চিন্ময়-পুরুষ ; কিন্তু সেই ঈশ্বরই এমন জগৎ গড়লেন কী করে, যার মাঝে তাঁর সৃষ্ট জীবের এত দুর্গতি ঘটাচ্ছেন তিনি—দুঃখকে মঞ্জুর করে, অনর্থকে প্রশ্রয় দিয়ে? ঈশ্বর শিবময় যদি, তাহলে কে দুঃখ এবং অনর্থের স্রষ্টা? দুঃখকে জীবের অগ্নিপরীক্ষা বলে ব্যাখ্যা করলেও ধর্মের দায় চোকে না ; কেননা তাহলে ঈশ্বরকে বলতে হয় অধার্মিক অথবা ধর্মাতীত। সেক্ষেত্রে তাঁকে বাহবা দিতে পারে জগতের একজন চমৎকার কারিগর অথবা নিপুণ মনোবিদ্ বলে, কিন্তু প্রেমময় শিবময় আরাধ্যদেবতা বলে মানতে পারি না—পারি শুধু তাঁর শক্তির জুলুমকে নত হয়ে স্বীকার করতে, অথবা তাঁর খেয়ালী মেজাজকে কোনরকমে খুশী রাখতে। কারণ, পীড়নযন্ত্রে জীবকে যাচাই করবার কৌশল আবিষ্কার করতে পারে যে, হয় তার নিষ্ঠুরতা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, নয়তো ধর্মাধর্মবোধই তার নাই ; আর তার ধর্মবোধ থাকেও যদি, তাহলেও সে-বোধ তার নিজেরই সৃষ্ট জীবের স্বাভাবিক মার্জিত বোধের চেয়েও খাটো।...ধর্মাধর্মের প্রশ্ন এড়াতে বলতে পারি, দুঃখ জীবের অধর্ম-প্রবৃত্তির অপরিহার্য পরিণাম এবং স্বভাবসঙ্গত সাজা ;—কিন্তু বর্তমান জীবনের সকল বৈষম্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না এ-ব্যাখ্যায়। তার জন্য

ব্যাখ্যাতাকে আশ্রয় করতে হয় কর্ম- ও জন্মান্তরবাদ, যার মতে এ-জন্মের দুঃখভোগে জীব পায় পূর্বজন্মের পাপের সাজা।...এতেও ধর্মাধর্মসমস্যার আমূল সমাধান হয় না, গোড়ার প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : যে-অধর্মপ্রবৃত্তির দরুন দুঃখভোগের শাস্তি জীবকে নিতে হয় মাথা পেতে, সে-প্রবৃত্তিই বা এল কোথা থেকে—কে সৃষ্টি করল তাকে—কেন করল? তাছাড়া স্পষ্টই যখন দেখছি অধর্মপ্রবৃত্তি বাস্তবিক একটা মানসিক ব্যাধি বা অজ্ঞানের ফল, স্বভাবতই মনে হয় তখন,—যা শুধু মনের রোগ বা অবুঝের কাজ, তাকে দণ্ডিত করতে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া কখনও-বা এমন উৎকট আসুরিক নির্যাতনের অলঙ্ঘ্য বিধান সৃষ্টি করল কে? কর্মফলের তো একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নাই; তাই পরম-দেবতাকে পুরুষবিধ কল্পনা করলে কর্মফলের বিধানকে খাপ খাওয়ানো যায় না তাঁর সঙ্গে। এই জন্যই বুদ্ধের শাণিত যুক্তি স্ব-তন্ত্র সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরপুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি; তাঁর মতে পুরুষবিশেষ হবার অর্থই হল অবিদ্যাকবলিত এবং কর্মাধীন হওয়া।

জগদ্ব্যাপারে দুঃখ ও অনর্থের অস্তিত্ব নিয়ে যে জটিল সমস্যা, তার মূলে আছে বিশ্ববহির্ভূত একজন ঈশ্বর-পুরুষের কল্পনা। স্বয়ং বিশ্বরূপ নন তিনি; কিন্তু তাঁরি সৃষ্ট জীবের জন্যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ব্যবস্থা করে সে-ব্যবস্থায় অপরামৃষ্ট থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের ঊর্ধ্বে এবং সেখান হতে দুঃখহত আয়াসক্লিষ্ট বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ ও শাসন করছেন তাঁর অপ্রতিহত ইচ্ছার প্রশাসনে। অথবা ইচ্ছার প্রশাসন যদি না থাকে তাঁর; এ-জগদ্ব্যাপারের মূলে যদি থাকে শুধু এক অনতিবর্তনীয় নিয়তির অকরুণ তাড়না—তাকে সুসহ করবার সামর্থ্য বা নৈপুণ্য তাঁর না-ই থাকে যদি;—তাহলে মঙ্গলময় প্রেমময় তো দূরের কথা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেই-বা মানব তাঁকে কী যুক্তিতে? বাস্তবিক, ঈশ্বরের ধর্মদায় আছে অথচ তিনি বিশ্ববহির্ভূত—এ-কল্পনায় জগতের সন্তাপ ও অনর্থের সমস্যা মেটে না। সন্তাপ ও অনর্থের সৃষ্টি কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে তখন হয় আসল সমস্যাটাকে ধামাচাপা দিয়ে খাড়া করি একটা বাজে ওজর, নয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অখণ্ড ঈশ্বরসত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করি প্রতীচ্য দ্বৈধবাদীদের মত—তাঁর লীলার সাফাই বা কাজের জবাব-দিহির জন্যে। কিন্তু এমন ঈশ্বর তো বেদান্তের সচ্চিদানন্দ নন; বেদান্ত সচ্চিদানন্দ বলছে যাঁকে, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—বিশ্বের যা-কিছু সমস্তই তিনি। অতএব দুঃখ ও অনর্থ থাকে যদি, তাহলে নিজকে সৃষ্ট জীবে

রূপায়িত করে' তিনিই হবেন তার ভোক্তা। একথা মানলে সমস্ত সমস্যাটার রং যায় বদলে। তখন আর এ-প্রশ্ন ওঠে না, ঈশ্বরে সম্ভবে না যে-অনর্থ-সন্তাপ, অতএব তিনি স্বয়ং যার দ্বারা অপরামৃষ্ট, কেমন করে তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যে তা বিধান করবেন তিনি? প্রশ্নটা তখন ঘুরে দাঁড়ায় এই আকারে: অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দের মাঝে কী করে দেখা দিল নিরানন্দ, কোথা হতে এল তাঁর আত্মস্বরূপের একান্তবিরোধী এই প্রত্যয়?

এই যদি হয় প্রশ্নের ধরন, তাহলে ঈশ্বরের ধর্মদায়ের খটকা অর্ধেক যায় চুকে, সমস্যাটাকে তখন আর মনে হয় না অসমাধেয়। তখন নৈর্ঘৃণ্যের অভিযোগ আনাই চলে না ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। অপরকে আমি নিষ্ঠুর হয়ে দুঃখ দিলাম, সে-দুঃখের আঁচ গায়ে লাগল না আমার; অথবা কাল বয়ে গেলে পর করুণা বা অনুশোচনা উথলে উঠল যখন, তখন দুঃখের ভাগী হলাম তাদের —এ হল এক কথা; আর আমিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছি, কেননা কেউ নাই জগতে আমি ছাড়া,—এ হল আর-এক কথা। তবু ধর্মদায়ের কথাটা একেবারে চোকে না, সেটা মোলায়েম হয়ে দেখা দেয় এইভাবে: যিনি আনন্দময়, নিশ্চয় তিনি কল্যাণময় ও প্রেমময়; তাহলে অনর্থ-সন্তাপ কী করে থাকতে পারে তাঁর মাঝে, কেননা তিনি তো পরতন্ত্র বা যন্ত্রারূঢ় নন—তিনি স্ব-তন্ত্র এবং চিন্ময় অতএব অনর্থ ও সন্তাপকে হেয়জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবার স্বাতন্ত্র্যও তাঁর আছে নিশ্চয়ই। কথাটা এভাবে তুললেও একে অনুচিত সিদ্ধান্তই বলতে হবে, কেননা এর মাঝে একদেশী-দৃষ্টিকে ভুল করে দেওয়া হয়েছে একটা সমগ্র-দৃষ্টির আকার। আনন্দময়ের স্বরূপে যে প্রেম ও কল্যাণের কল্পনা আরোপ করেছি আমরা, তার মূল কিন্তু রয়েছে আমাদেরই দ্বৈতবোধের খণ্ড-বৃত্তিতে। প্রেম ও কল্যাণকে আমরা জানি জীবের সঙ্গে জীবের অন্যোন্যসম্পর্করূপেই; তবু সেই দ্বৈতস্পৃষ্ট সম্বন্ধকে বারবার আরোপ করছি এমন প্রসঙ্গে—অখণ্ড-অদ্বয়ের সর্বাত্মভাব যার গোড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত সমস্যাটাকে আমাদের বিচার করতে হবে একটা মূল সূত্র ধরে—ভেদাভেদের দৃষ্টি নিয়ে। গোড়ার কথাটা একবার পরিষ্কার হয়ে গেলে সমস্যার যেগুলি ডালপালা—যেমন জীবের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক—তার মীমাংসা খণ্ডবোধ ও দ্বৈতদৃষ্টি নিয়ে করলেও আটকাবে না তখন।

মানুষী দৃষ্টিতে মানুষের খটকার বিচার না করে অখণ্ড-দৃষ্টির সমগ্রতা নিয়ে দেখি যদি, তাহলে স্বীকার করতেই হয় জগদ্ব্যাপারে ধর্মাধর্মের

প্রশ্নটা নিতান্তই গৌণ। চিরকাল মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সকল বিধানে খুঁজে এসেছে তারি কল্পিত ধর্মসংহিতার অনুশাসন এবং এমনি করে স্বেচ্ছায়, শুধু জেদের বশে নিজকে করছে বিভ্রান্ত। সঙ্কীর্ণ মানবীয় সংস্কার নিয়ে নিজের মনগড়া আদর্শের মানদণ্ডে সব-কিছুকে বিচার করা, নিজের ক্ষুদ্র অহংকেই প্রতিবিম্বিত দেখা বিশ্বের সকল ব্যাপারে—এই তো হল মানুষের দুর্ভোগ; এইজন্যই তো সত্যজ্ঞান হতে বঞ্চিত সে, অখণ্ড দর্শন তার পক্ষে দুর্ঘট এত। জড়-প্রকৃতির ধর্মদায় নাই কোনও; তার মাঝে যে নিয়মের শাসন, সে শুধু চিরাচরিত অভ্যাসের একটা সমাহার,—ভাল-মন্দের প্রশ্ন ওঠেই না তার বেলায়। সেখানে শক্তির নিরঙ্কুশ লীলা শুধু: শক্তিই গড়ছে, গুছিয়ে তুলছে, জিইয়ে রাখছে সব-কিছু; আবার শক্তিই ওলট-পালট করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সব—কারও মুখের পানে না তাকিয়ে, ভালমন্দের কোনও পরোয়া না করে, শুধু তারি গুহাহিত সঙ্কল্পের বশে, নিজকে নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার একটা নীরব খেয়ালখুশির তাগিদে। তেমনি প্রাণ-প্রকৃতিরও নাই কোনও ধর্মদায়—পশুর জগতে অন্তত; তবে কিনা প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে দেখা দেয় উন্নততর জীবের ধর্মপ্রবৃত্তির নিতান্ত কাঁচা একটা বনিয়াদ। বাঘ শিকার ধরে খায় যদি, তার জন্য আমরা দুষি না তাকে, যেমন ধ্বংস-তাণ্ডবের জন্য ঝড়কে করি না দায়ী অথবা অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারলেও আগুনের বিরুদ্ধে জানাই না নালিশ; বাঘে ঝড়ে বা আগুনে গোপন রয়েছে যে চিৎশক্তি, অনথ ঘটিয়েছে বলে তারও নাই কোনও আফসোস বা ধিক্কার-বোধ। দূষণ ও ধিক্কার হতে, বিশেষত আত্মদূষণ ও আত্মধিক্কার হতেই সত্যিকার ধর্মবোধের শুরু। নিজকে রেহাই দিয়ে শুধু অপরকে দুষি যখন, তখন ধর্মবোধের নজিরে তা করি না আমরা; যা অসুখকর বা অনিষ্টকর, তার প্রতি চিত্তের বিরাগ বা জুগুপ্সার উদ্বেলনকেই ধর্মানুশাসনের পরিভাষায় ব্যক্ত করি এমনি করে।

ধর্মবোধের নিদান হলেও এই জুগুপ্সা বা বিরাগকেই বলা চলে না ধর্মবোধ। বাঘ দেখে হরিণের যে-ভয়, অথবা আততায়ীর প্রতি বলদৃপ্তের যে-আক্রোশ, জিঘাংসুর প্রতি সে শুধু ব্যক্তি-প্রাণের আনন্দ-সত্তায় উদ্বেলিত জুগুপ্সার একটা ঢেউ। মানসিক প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এই জুগুপ্সাই সংস্কৃত হয়ে ধরে উৎকট ঘৃণা বিরাগ ও অননুমোদনের রূপ। অনিষ্টের আশঙ্কা আছে যাতে, তাকে অনুমোদন করি না আমরা; আবার যা অহংকে তৃপ্ত করে,

তাকে পছন্দই করি। এই পছন্দ না-পছন্দের ব্যাপারটা ক্রমে পরিণত হয় ভাল-মন্দের ধারণায়—প্রথমত নিজের ও নিজের সমাজের সম্পর্কে, তার পর পরের ও পরের সমাজের সম্পর্কে এবং অবশেষে কল্যাণের সামান্যত অনুমোদনে এবং অকল্যাণের সামান্যত অননুমোদনে। কিন্তু একটা মূল সুর বরাবর অক্ষুণ্ণ রয়েছে পরিণামের সমগ্র-ধারার মাঝেই। মানুষ ফোটাতে চায় ফলাতে চায় নিজকে অর্থাৎ সে খোঁজে তার আধারে নিহিত চিৎশক্তির অকুণ্ঠ আপ্যায়ন; এই আনন্দের সুরে বাঁধা তার জীবনযন্ত্র। যা-কিছু আঘাত হানে এই ফুল-ফোটানো ফল-ধরানোর তপস্যায়, এই আত্ম-আপ্যায়নের পরিতৃপ্তিতে, তা-ই অনর্থ তার কাছে; এবং যা-কিছু এই আত্মরতি-সাধনার অনুকূল সমর্থক ও পোষক, যা-কিছু একে করে উপচিত ও মহিমময়, তা-ই তার কাছে কল্যাণ। কেবল এই একটা ভেদ দেখা দেয় প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে—নিজকে ফুটিয়ে তোলবার ধরনটা যায় তার বদ্‌লে;—ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে ক্রমেই নিজকে ছড়িয়ে দেয় সে অপরের মাঝে, এমন-কি নিখিল বিশ্বকেই একদিন সে বাঁধতে চায় তার উদার আলিঙ্গনে।

তাহলে কথাটা এই। ধর্মবোধ দেখা দেয় প্রকৃতি-পরিণামের একটা বিশেষ পর্বে; কিন্তু সমস্ত পর্বেরই মাঝে অনুস্যূত রয়েছে অখণ্ড সচ্চিদা-নন্দের আত্মরূপায়ণের প্রৈতি। এই প্রৈতি প্রথমত ধর্মহীন—যেমন জড়ে; তারপর ধর্মাভাসযুক্ত—যেমন ইতর প্রাণীতে; অবশেষে বুদ্ধিমান জীবে কখনও-বা ধর্মবিরোধী—যেমন, নিজে যে-দুঃখ আমরা সইতে নারাজ, অপরকে সে-দুঃখ দেওয়া মঞ্জুর করি যখন। মানুষী ভূমির নীচে যা-কিছু ঘটছে, তা যেমন ধর্মাভাসযুক্ত, তেমনি তার উর্ধ্বে এমন ভূমিও আছে যা ধর্মাতীত,—অর্থাৎ ধর্মের অনুশাসন নিষ্প্রয়োজন সেখানে; একদিন এই ভূমিতেই পৌঁছব আমরা। মনুষ্যত্বের সাধনায় ধর্মবুদ্ধি ও ধর্মপ্রকৃতির একটা বিশেষ স্থান থাকলেও উত্তরায়ণের পথে এ একটা তটস্থা বৃত্তিমাত্র। অচিতির যে সর্বগত অবর-সৌষম্য প্রাণের অভিঘাতে ব্যক্তিগত বৈষম্যে হয়েছে পরিকীর্ণ, তার দ্বন্দ্ব হতে মনুষ্যত্বকে নির্মুক্ত করে সর্বাত্মভাবের সর্বগত উদার সৌষম্যে উত্তীর্ণ করবার সাধনরূপেই ধর্মবোধের যা-কিছু সার্থকতা। কিন্তু ঐ উদারভূমিতে এসে পৌঁছেছে যে, তার পক্ষে এ-সাধনকে মর্যাদা দেওয়া অনাবশ্যক—এমন-কি অসম্ভব; কারণ যেসব গুণের অনুশীলন ও যেসব দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত আশ্রয় এর, পরম-সামরস্যের ছন্দ-সুষমায় সহজেই তারা আপনাকে ফেলে হারিয়ে।

অতএব ধর্মাধর্মবোধের যত গৌরবই থাকুক, সে যদি হয় বিশ্বভাবনার এক পর্যায় হতে আর-এক পর্যায়ে চেতনাকে উত্তীর্ণ করবার সাময়িক সাধন মাত্র, তাহলে বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান হতে পারে না তাকে দিয়ে, তাকে গণ্য করা চলে শুধু সমাধানের অন্যতম উপকরণরূপেই। তা যদি না করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল তথ্য বিকৃত হয়ে দেখা দেবে মিথ্যার ছায়াপাতে, পূর্বাপর বিশ্বপরিণামের সকল তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হবে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ক্লিষ্ট বিচারে, বিশ্বব্যবস্থার মূল্যনিরূপণ করতে গিয়ে সীমিত কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন একটা অর্ধপক্ক দর্শনকেই দেওয়া হবে প্রাধান্য। জগতের তিনটি স্তর—অ-ধর্ম্য বা ধর্মাভাসিত, ধর্ম্য এবং ধর্মাতীত। এই তিনটি বিভাবের মাঝে অধিষ্ঠানরূপে অনুস্যূত রয়েছে যে-ভাব, শুধু তাকে দিয়েই হতে পারে বিশ্বসমস্যার সম্যক সমাধান।

দেখেছি, তিনটি ভূমিতেই অনুস্যূত এই এক ভাব: নিখিল সত্তার অবিনাভূত চিৎশক্তিতে রয়েছে আত্মরূপায়ণের আকূতি এবং তার চরিতার্থতাতেই তার আনন্দ। স্বয়ম্ভূ-সত্তার আনন্দ-স্বভাবেই ফুটল চিৎশক্তির আদি প্রবর্তনা, কেননা এই তার স্বরূপ আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। কিন্তু যে নবরূপায়ণের আকূতি রয়েছে তার মাঝে, উত্তরায়ণের পথে তাকে সার্থক করবার প্রচেষ্টাতে দেখা দেয় দুঃখ-তাপের প্রতিভাস,—যাকে মনে হয় চিৎশক্তির স্বারসিকী বৃত্তির বিরোধী যেন। সমস্যার মূল এইখানেই।

কী করে সমাধান হবে এর? বলব কি: সচ্চিদানন্দ নয় বিশ্বের আদি ও অবসান—এক মহাশূন্য জুড়ে আছে তার দুটি অন্ত; সে-শূন্যতা স্বয়ং অসৎ হয়েও অপক্ষপাতে আপন নাস্তিত্বের গহন গুহায় বহন করছে সত্তা ও অসত্তা, চেতনা ও অচেতনা, আনন্দ ও অনানন্দের সম্ভাবনা।... ইচ্ছা করলে আমরা সায় দিতে পারি এ-সিদ্ধান্তে। কিন্তু শূন্যবাদ দিয়ে সব-কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আসলে আমরা ব্যাখ্যা করিনি কিছুই, সবাইকে ঘিরে এঁকে রেখেছি শুধু একটা বৃত্ত। যা অভাবমাত্র, সে-ই হল সর্বভাবের প্রসূতি—এ-উক্তিতে পাই বাস্তব বা কাল্পনিক স্বতোবিরোধের চূড়ান্ত পরিচয়। অতএব এ-ব্যাখ্যাতে বৃহৎ বিরোধ দিয়ে ক্ষুদ্র বিরোধকে ঠেকিয়ে রাখা হয় শুধু, তাতে তত্ত্বমীমাংসা না হয়ে স্বতোবিরোধটাই এসে ঠেকে চরমে। যা সর্বশূন্য, তা ফাঁকা অনস্তিত্বমাত্র, কোনও-কিছুর স্বরূপযোগ্যতা থাকাও সম্ভব নয় তার মাঝে; আর সর্ববিধ স্বরূপযোগ্যতার প্রতি অপক্ষ-

পাত রয়েছে যে-নির্বিশেষের, তাকে বলি অব্যাকৃত। অসৎ-বাদে আমরা শূন্যের মাঝে অব্যাকৃতকে স্থাপন করি মাত্র, কিন্তু সেখানে তার ঠাঁই হয় কী করে তার ব্যাখ্যা দিই না কোনও। তাই শুদ্ধবুদ্ধি কিছুতেই সায় দিতে পারে না এ-দর্শনে, কেননা সর্বনিষেধের দ্বারা এক মহানিষেধে পৌঁছনো বস্তুত অতত্ত্বেরই উপাসনা। এ-উপাসনা বুদ্ধির একটা সাময়িক প্রয়োজন হলেও তার স্বভাবের গতি এদিকে নয় কখনও। অতএব অসৎ-বাদকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা ফিরে যাব অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বীকৃতিতে এবং দেখব তাঁকে ভিত্তি করে বিশ্বসমস্যার পূর্ণতর সমাধান খুঁজে পাই কি না।

একটা ধারণা পরিষ্কার করে নিতে হবে গোড়াতেই। বিশ্বচেতনার কথা বলেছি যখন, তখন সে যে প্রাকৃত মানুষের মনোময় জাগ্রৎ-চেতনা হতে স্বতন্ত্র, তারও চেয়ে গভীর এবং উদার, এ-সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না আমাদের। তেমনি যখন বলি শুদ্ধ-সত্তার সর্বগত আনন্দের কথা, তখন ব্যক্তি-চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস বা ইন্দ্রিয়তর্পণে যে প্রাকৃত সুখ, তা হতে স্বতন্ত্র, তারও চেয়ে গভীর উদার ও স্বরূপানুগত একটা-কিছুর ইঙ্গিতই করি আমরা। সুখ হর্ষ আনন্দ প্রভৃতির পরিচিত সংজ্ঞা মানুষের চেতনায় একটা সঙ্কীর্ণ ও নৈমিত্তিক স্পন্দনমাত্র। তাদের আশ্রয় ও নিদান হল চিরাভ্যস্ত কতগুলি সংস্কার এবং একটা বিজাতীয় অধিষ্ঠান হতেই তাদের উদ্ভব। দুঃখ-শোক এর বিপরীত-বৃত্তি হলেও তাদেরও এই ধর্ম। কিন্তু সন্মাত্রের আনন্দ সর্বগত অপরিমেয় এবং স্বয়ম্ভূ, কোনও বিশেষ নিমিত্তের 'পরে নাই তার নির্ভর ; সকল অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান সে, যাকে আশ্রয় করেই চেতনায় ফোটে সুখ দুঃখ এবং তারও চেয়ে লঘু কত তটস্থবৃত্তির অনুভব। এই সন্মাত্রের আনন্দ যখন রূপায়িত হতে চায় সম্ভূতির আনন্দে, তখন শক্তিস্পন্দে সে হয় স্পন্দিত এবং তার বিচিত্র স্পন্দনে ঝঙ্কৃত হয় সুখ ও দুঃখের বাদী ও বিবাদী দুটি সুর। জড়ে এ-আনন্দ অবচেতন, উন্মনীতে অতিচেতন ; শুধু মন ও প্রাণের মাঝে নিজকে এ চায় ফুটিয়ে তুলতে সম্ভূতির লীলায়নে, স্পন্দবৃত্তির উপচীয়মান আত্মসচেতনতায়। প্রথমে তার মাঝে দেখা দেয় একটা অবিশুদ্ধ দ্বন্দ্ববিধুর প্রবৃত্তি—সুখদুঃখের দুটি মেরুর মাঝে ঢেউয়ের একটা দোলা ; কিন্তু তার চরম লক্ষ্য হল নিজকে উদ্ভাসিত করে তোলা শুদ্ধ-সত্তার স্বয়ম্ভূ নির্বিষয় অহেতুক পরমানন্দের দিব্যজ্যোতিতে। নরের মাঝে থেকেই চলেছে যেমন সচ্চিদানন্দের উদগম বৈশ্বাময়-অনুভবের অভিমুখে, দেহমনের

রূপায়ণেই যেমন অভিযান তাঁর অরূপ চেতনার লোকোত্তর ভূমিতে,—তেমনি বিষয়-বিষয়ীর এই বিচিত্র চঞ্চল বর্ণরতির ভিতর দিয়েই আবার চলেছেন তিনি সর্বগত নির্বিষয় স্বয়ম্ভূ দিব্যরতির অনির্বচনীয় আস্বাদনের পানে। আজ বিষয়কে খুঁজছি আমরা ক্ষণিক তৃপ্তি ও সুখের উৎসরূপে; কিন্তু স্ব-তন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ হব যখন, তখন আর বাইরে না খুঁজে নিজের মাঝেই দেখতে পাব তাদের—শাশ্বত আনন্দের নিদানরূপে নয়, দর্পণরূপে।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানুষের মাঝে চেতনা ফুটেছে মনোময় পুরুষরূপে জড়ের তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে। শুদ্ধ-সত্তার আনন্দ তটস্থ, অর্ধ-স্ফুট, অবচেতনার ছায়ালোকে দুর্লক্ষ্য তার কাছে। সে-আনন্দের উর্বর ক্ষেত্র তার মাঝে ছেয়ে গেছে বাসনার বিষাক্ত আগাছায়—কী উচ্ছ্বসিত তার সমা-রোহ। সুখ-দুঃখের অভিঘাতে বিষ-বল্লরীর মঞ্জরীতে সে কী বর্ণচ্ছটা অহং-বিধুর চেতনায়। চিৎশক্তির নিগূঢ় বীর্য নির্মূল করবে যখন বাসনার এই প্রমত্ত উপচয়,—ঋগ্বেদের ভাষায়, অগ্নিদেব নিঃশেষে দগ্ধ করবেন পৃথিবীর বুকে উদ্ভিন্ন কামনার বন,—তখন এই সুখদুঃখের মর্মমূলে নিহিত ছিল যে-প্রাণরস আনন্দের গোপন সঞ্চয়রূপে, তা উৎসারিত হবে—বাসনার নবরূপায়ণে নয়, স্বয়ম্ভূ-সত্তার স্বারসিকী তৃপ্তিরূপে। মর্ত্য সুখের পেয়ালা তখন রূপান্তরিত হবে অমরের সুধাপাত্রে। আর এ-রূপান্তরও নয় অসম্ভব; কেননা, মানুষের চেতনা-বেদনায় সুখদুঃখের এই-যে উদ্বোধন, বস্তুত এ তো সেই আনন্দসত্তারই গভীর দোলা। হোক্ সুখ, হোক্ দুঃখ—সেই মহাসিন্ধুর বাণীকেই তারা দিতে চায় রূপ—কিন্তু কুণ্ঠাহত হয়ে ফিরে যায় তারা অহমিকা খণ্ডবোধ ও আত্ম-অবিদ্যার কুটিল অভিঘাতে।

১২

# আনন্দরূপং যদ্ বিভাতি

## ( সমাধান )

সে-বস্তুর আনন্দ হল নাম ; তাকে আনন্দ জেনেই আমরা করব তার উপাসনা—খুঁজব তাকে।

—কেন উপনিষদ ( ৪।৬ )

যদি বুঝতে পারি, ব্রহ্মসত্তার সর্বানুস্যূত অব্যভিচারী আনন্দের অতল পারাবারই বহিশ্চর প্রাকৃত-চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে অনুকূল প্রতিকূল বা তটস্থ সংবেদনের ফেনিল বিক্ষোভে, তাহলে সেই সর্বগত আনন্দ-ভাবনার মাঝেই খুঁজে পাই আমাদের কল্পিত সমস্যার সুচারু সমাধান। এক অনন্ত অবিভাজ্য সত্তাই বিশ্বের সকল বস্তুর আত্মস্বরূপ ; সেই সত্তার স্বরূপশক্তি স্ফুরিত হয় তার বিচিত্র স্বয়ং-প্রজ্ঞ স্বভাবের ক্ষয়হীন নিরন্ত সংবেগে ; আবার সেই স্বয়ং-প্রজ্ঞার স্বরূপ ফোটে অব্যভিচারী আনন্দস্বভাবের অনন্ত সমুল্লাসে। রূপে-অরূপে, অখণ্ড আনন্ত্যের শাশ্বত সংবিতে অথবা সান্ত খণ্ডতার বহুরূপী প্রতিভাসে এই আত্মারাম স্বয়ম্ভূসত্তার স্বরূপানন্দ রয়েছে নিত্য নিরঙ্কুশ। আমাদের চেতনা যখন বহির্বৃত্ত সংস্কারের দাসত্ব এবং স্বানুভবের বিশিষ্ট 'পর্যায়ের' সঙ্কীর্ণ বন্ধন কাটিয়ে ওঠে, তখন আপাত-অচেতন জড়ের মাঝেও সে যেমন আবিষ্কার করে অটল-অচল অনন্ত চিৎশক্তির নিরূঢ় আবেশ, তেমনি জড়ের আপাত-অসাড়তার মাঝেও দেখতে পায়—তারি স্বভাবের সুরে বাঁধা এক অনন্ত চিন্ময় আনন্দের অক্ষোভ্য উল্লাস ছেয়ে আছে বিশ্ব চরাচর। এই আনন্দ আত্মারামেরই আনন্দ, এই স্বরূপজ্যোতি সর্বগত আত্মস্বরূপেরই জ্যোতি ; কিন্তু আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃত-চেতনায় বস্তু-স্বভাবের যে-রূপ জাগে, তার কাছে এই স্বরূপানন্দ নিগূঢ় গুহাহিত অবচেতন। এ-আনন্দ যেমন অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে সকল আধারে, তেমনি নিবিড় হয়ে আছে

সুখময় দুঃখময় বা উদাসীন সকল অনুভবে। ঘটে-ঘটে এমনি নিগূঢ় গুহা-হিত ও অবচেতন থেকেই সে তার আত্মবীর্যে সবার আত্মভাবকে রেখেছে অপ্রচ্যুত। এই আনন্দই তো বিশ্বের অণুতে-অণুতে ফুটিয়ে তুলছে আত্ম-ভাবের প্রতি সেই সর্বাতিভাবী অভিনিবেশ, নিজকে টিকিয়ে রাখবার সেই অদম্য আকূতি,—যা প্রাণের মাঝে দেখা দিয়েছে আত্মরক্ষার নিসর্গবৃত্তিরূপে, স্থূলে ফুটেছে জড়ের অবিনশ্বর স্বভাবে; আবার মনের মাঝে সে-ই জাগিয়েছে অমরত্বের বেদন, ঘটে-ঘটে অবিচ্ছেদ্য হয়ে যা জড়িয়ে আছে আত্মপরিণামের সকল পর্বে। এমন-কি আত্মহত্যার সাময়িক প্রবৃত্তিও অমৃতপিপাসারই একটা তির্যক প্রকাশমাত্র; কেননা সেখানেও জীব চায় না সত্তার বিলোপ,—সত্তার রূপান্তরই কাম্য বলে বর্তমান সত্তার প্রতি তার ঐ জুগুপ্সা। অতএব আনন্দই আত্মভাব, আনন্দই সৃষ্টির রহস্য, আনন্দই ভবের প্রবর্তক, আনন্দই আত্মভাবের বিধৃতি, আনন্দেই ভবের নিবৃত্তি—সৃষ্টির প্রলয়। তাই উপ-নিষদ বলেন, 'আনন্দ হতেই জন্ম নেয় সকল ভূত, আনন্দেই বেঁচে থেকে বেড়ে চলে তারা, আবার আনন্দেরই পানে তাদের মহাপ্রয়াণ।'

সৎ চিৎ আনন্দ—ব্রহ্মস্বরূপের এই পরিচয় বস্তুত একটি অখণ্ড মহাভাব-মাত্র; কিন্তু মনের কাছে সে ত্রয়ী, প্রাতিভাসিক জগতে অথবা খণ্ডিত-চেতনার প্রবৃত্তিতে সে 'বিভক্তবৎ'। তাই তত্ত্বদর্শনের পরেও খণ্ডবুদ্ধির সংস্কার বশে দেখা দেয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান এবং আবহমানকাল চলে তাদের কত খণ্ডন-মণ্ডন। কিন্তু সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের কাছে অখণ্ডের সকল বিভাবই আনে এক তুরীয় মহা-ভাবের ব্যঞ্জনা, অতএব দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেজে ওঠে একই রাগিণী। অখণ্ড অদ্বয় সচ্চিদানন্দের অপরোক্ষ-অনুভবই জগৎ সম্পর্কে এদেশে সৃষ্টি করেছে মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও লীলাবাদ। তিনটি বিভিন্ন বাদ আপাতদৃষ্টিতে; কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে তারা অভিন্ন, কেননা বস্তুত তারা একই অখণ্ড ভাবের তিনটি বিভাব মাত্র। জগৎসত্তাকে যখন জানি প্রতিভাসরূপে, অর্থাৎ অখণ্ড অনন্ত নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম-সত্তার প্রতিযোগী রূপে শুধু, তখন যদি তাকে দেখি বলি বা অনুভবও করি মায়া বলে, সে কি অসঙ্গত? কিন্তু মায়ার প্রাচীন অর্থ ছিল সর্বাধার প্রজ্ঞা বা সম্ভূতি-সংবিৎ,—যা জড়িয়ে থেকেই মিত, সীমিত করছে সকল-কিছু, অতএব যার মাঝে আছে কৃতি-শক্তিরও পরিচয়। মায়া রচে আকৃতি, রচে পরিমাণ,—অরূপের সে রূপকৃৎ; চিত্তের বিভাবনায় অবিজ্ঞেয়কে যেন সে করে জ্ঞানগম্য, দেশের

বিভাবনায় অমেয়কে যেন করে সে মেয়। অর্থের অপকর্ষে ক্রমে মায়া প্রজ্ঞাদক্ষতা ও বুদ্ধি না বুঝিয়ে বোঝাতে লাগল চাতুরী বঞ্চনা বা বিভ্রম। আধুনিক দর্শনে মায়ার এই বিভ্রম বা ইন্দ্রজালের অর্থই চলছে।

এ-জগৎ মায়া। কিন্তু জগতের সত্তাই নাই কোনও, এ-অর্থে জগৎ মায়া নয়, মিথ্যা নয়। কারণ, জগৎ ব্রহ্মের স্বপ্নও হয় যদি, তবু স্বপ্নরূপেই তাঁর মাঝে থাকবে তার সত্তা,—চরমে মিথ্যা হলেও আপাতত তাঁর স্বপ্ন তো সত্যই তাঁর কাছে।·· আবার একথাও বলা চলে না, জগৎ মিথ্যা কেননা তার কোনও শাশ্বত সত্তা নাই। সত্য বটে, বিশেষ-কোনও জগৎ এবং বিশেষ-কোনও রূপের প্রলয় ঘটতে পারে বা ঘটেও স্থূলত, মনোময় চেতনায় ব্যক্তদশা হতে অব্যক্তদশায় লীনও হতে পারে তারা ;—কিন্তু তাহলেও তত্ত্বের দিক দিয়ে রূপ বা জগৎ তো শাশ্বতই। ব্যক্ত হতে অব্যক্তে লীন হয়েও আবার তারা ব্যক্তদশায় ফিরে আসে ; শাশ্বত সদ্ভাব না থাকলেও শাশ্বত আবৃত্তি তাদের আছেই। ব্যষ্টি বিভাব এবং প্রতিভাসের দিক দিয়ে তাদের শাশ্বত বিপরিণাম যেমন, তেমনি সমষ্টিভাব এবং প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে শাশ্বত অপরিণামী তারা। এমন কথা নিশ্চয় করে বলতেও পারি না যে, শাশ্বত-চিন্ময় সন্মাত্রে বিশ্বের কোনও রূপ কি স্বভাবের কোনও লীলা স্বানুভবগোচর ছিল না বা থাকবে না—এমন কালও সম্ভব। বরং আমাদের সহজ বুদ্ধি এই কথাই বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ তৎ-স্বরূপ হতে আবির্ভূত হয়ে আবার তাতেই হয় লীন, —অনন্তকাল ধরেই চলছে এই লীলা।

তবু জগৎ মায়ামাত্র, কেননা অনন্তসত্তার এই তো নয় স্বরূপসত্য ; এ শুধু চিদাত্ম-স্বভাবের একটা বিসৃষ্টি। অবশ্য সে-বিসৃষ্টি অসতের ভূমিকায় অসৎ হতে অসতের বিসৃষ্টি নয়—স্বাত্মভাবের শাশ্বত সত্য হতে শাশ্বত সত্যের ভূমিকাতেই রূপায়ণ তার। সদ্‌ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্বই এ-জগতের আধার যোনি এবং উপাদান ; এর রূপ-বৈচিত্র্য তৎ-স্বরূপেরই চিন্ময়ী সিসৃক্ষার অনুগত আত্মরূপায়ণের বিভঙ্গ—তাঁরি স্বানুভবের ভূমিকায়। অবন্ধন সে রূপায়ণের লীলা,—কেননা সে-রূপ ফুটতে পারে, না ফুটতে পারে, খেয়ালখুশিতে আর-কিছু হয়েও ফুটতে পারে। তাই এ-রূপের মেলাকে বলতেও পারি বটে অনন্ত চেতনার ভ্রান্তি-বিলাস ; কিন্তু সে হবে শুধু আমাদের অসহায় পঙ্গু-মনের বিভ্রান্ত ছায়াকে স্পর্ধাভরে বিসর্পিত করা তারি 'পরে—যা মনেরও বাড়া বলে অসত্য বা বিভ্রমের লেশমাত্র নাই যার মাঝে। অতএব, শুদ্ধসত্তার

স্বরূপ-ধাতু যখন অনুতস্পৃষ্ট হতে পারে না কখনও, আমাদের খণ্ডিত চেতনার সকল ভ্রান্তি ও বিকৃতির মাঝেও যখন ফুটে ওঠে অখণ্ড-চিন্ময় সন্মাত্রের সত্যবিভূতির কিছু-না-কিছু আভাস, তখন জগৎ সম্পর্কে আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি,—জগৎ তৎ-পদার্থের স্বরূপসত্য না হলেও তার মাঝে আছে তাঁর নিরঙ্কুশ বহু-ভাবনা ও অন্তহীন আপাত-বিপরিণামের প্রাতিভাসিক সত্য ; তাঁর স্বরূপগত অপরিণামী অদ্বয়ভাবের সত্য জগতে প্রকট নয় বলেই জগৎ মায়া।

এই গেল সদ্‌-ব্রহ্মের প্রতিযোগীরূপে জগৎ-সত্তার বিচার। কিন্তু জগৎ-সত্তাকে আমরা আবার দেখতে পারি চৈতন্য ও চিৎশক্তির প্রতিযোগীরূপে। তখন আমাদের দৃষ্টি অনুভব ও বিবৃতিতে জগৎ হবে একটা শক্তি-স্পন্দ—যার মূলে আছে কোনও নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রশাসন, অথবা অধিষ্ঠান বা সাক্ষি-চৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু কোনও দুর্জ্ঞেয় নিয়তির প্রবর্তনা। তখন জগৎকে বলি প্রকৃতির খেলা—লক্ষ্য তার দ্রষ্টা ও ভোক্তা পুরুষের তৃপ্তিসাধন ; অথবা পুরুষেরই খেলা সে—শক্তির স্পন্দলীলায় নিজকে উপরক্ত করে অবিবেকদ্বারা তার আস্বাদনই সে-খেলার সাধন। অর্থাৎ এ-জগৎ নিখিল-জননী মহাপ্রকৃতির লীলা ;—অনন্তরূপে আপনাকে রূপায়িত করে, অফুরন্ত রসাস্বাদের আকূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছেন তিনি কে জানে কার নিগূঢ় প্রবর্তনায় !

আবার জগৎ-সত্তাকে জানি যদি শাশ্বত-সন্মাত্রের স্বরূপানন্দের ভূমিকায় রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লীলা বলে। নিখিলের 'বন্ধুরাত্মা' যে-চিরকিশোর, এ-বিশ্বলীলায় তিনিই 'শিশু ভোলানাথ', তিনিই নটরাজ, তিনিই কবি, তিনিই স্বষ্টা—তাঁরি অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হিল্লোলিত হয়ে চলেছে রূপে-রূপে। আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজেরই মাঝে নিজকে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি অক্লান্ত ছন্দলীলায় ;—এ-আনন্দমেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ !

এমনি করে অচল-অটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শাশ্বত ভূমিকায় দেখলাম বিশ্বলীলার তিনটি সামান্য-রূপ—এদেশে যারা মায়াবাদ প্রকৃতিবাদ ও লীলা-বাদের অন্যোন্যবিরোধী দর্শনে হয়েছে পরিণত। কিন্তু বস্তুত তাদের পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি নাই কোনও, কেননা সমগ্রভাবে দেখলে তারা পরস্পরের আপূরক এবং জীবন ও জগতের সম্যক-দৃষ্টির পক্ষে তুল্য-প্রয়োজন।

যে-জগতের অঙ্গীভূত আমরা, আপাতদৃষ্টিতে দেখছি তাকে শক্তিস্পন্দরূপে। কিন্তু সেই শক্তির প্রতিভাসকে ভেদ করে দৃষ্টি যদি অনুবিদ্ধ হয় তার মর্মমূলে, তখন দেখি সেখানে এক চিন্ময়ী সিসৃক্ষার ধ্রুব অথচ নিত্য-বিপরিণামী ছন্দ-দোলা। সে-চিন্ময়ী নিজেরই মাঝে উৎক্ষিপ্ত প্রসর্পিত করে চলেছে তার অনন্ত শাশ্বত আত্মভাবের ঋতময় প্রতিভাস; আর এই ছন্দদোলার আদিতে অবসানে, তার মর্মে-মর্মে আলুলিত সেই আত্মভাবেরই অফুরন্ত আনন্দলীলা—অন্তহীন রূপায়ণের নির্বারিত উল্লাসে চঞ্চল।···অতএব বিশ্বকে বুঝতে হলে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের এই দিব্য-ত্রিপুটিকেই করতে হবে আমাদের এষণার আদিবিন্দু।

শুদ্ধ-সত্তার অবিপরিণামী শাশ্বত আনন্দই স্পন্দিত হচ্ছে সম্ভূতির অনন্ত বিচিত্র আনন্দব্যঞ্জনায়—এই যদি হয় তত্ত্বদর্শনের মর্মকথা, তাহলে আমাদেরও সমস্ত অনুভবের অধিষ্ঠানরূপে জানতে হবে এক অখণ্ড-চিন্ময় সত্তাকে,—যার স্বারসিক আনন্দের নিত্যযোগে বিধৃত ও সঞ্জীবিত তারা এবং যার স্পন্দ-লীলায় ইন্দ্রিয়বোধের জগতে দেখা দেয় সুখ দুঃখ ও ঔদাসীন্যের বিচিত্র অভিঘাত। ঐ অক্ষোভ্য আনন্দসত্তাই যথার্থ স্বরূপ আমাদের; সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার তাড়নে ঝঙ্কৃত মনোময়-চেতনা তার প্রতিভূমাত্র। ব্যবহারিক জীবনে মনকেই করা হয়েছে পুরোধা—বিশ্বের বহু-বিচিত্র অভিঘাতে খণ্ডিত-চেতনার যে সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া, তাকে ইন্দ্রিয়-বোধের আদিম ছন্দরূপে ধরে রাখবে সে—এই অভিপ্রায়ে। নিখুঁত নয় তার সাড়া, ব্যামিশ্র বৈষম্যে পদে-পদে ঘটছে তার ছন্দঃপতন,—যদিও তারি মাঝে রয়েছে গুহাহিত চিন্ময়-সত্তার পরিপূর্ণ ছন্দসুষমার আয়োজন ও আভাস।···কিন্তু এও জানি অখণ্ড-অদ্বৈতের বিচিত্র লীলায়ন সামরস্যের বেদনে একবার যদি ঝঙ্কার তোলে প্রাণের তন্ত্রীতে, তাঁর তুর্যাতীত সুরসপ্তকের বিশ্বব্যাপিনী মূর্ছনা একবার যদি অনুরণিত হয়ে ওঠে এই জীবনে, তখন বৃহৎ-সামের যে ঋতময় অখণ্ড পরিচয় পাব আমরা, মনোময় চেতনায় কখনও কি তার আভাস মেলে?

সত্যদর্শনের এই ভূমিকা হতেই এসে পড়ে অনস্বীকার্য কতগুলি সিদ্ধান্ত। প্রথম কথা: সত্তার গভীর-গহনে আমরা সেই অদ্বয়স্বরূপই হই যদি, অখণ্ড সর্ব-চিৎ বলেই নিত্যস্ফূর্ত সর্বানন্দ আমরা, এই যদি হয় আমাদের মর্মসত্য,—তাহলে 'সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে ইন্দ্রিয়সংবেদনের যে

সুরকম্পন, সে শুধু আমাদের জাগ্রৎ-চেতনায় স্ফুরিত খণ্ডিত-সত্তার একটা বহিরঙ্গ লীলা। এর পিছনে আমাদেরই মাঝে গুহাহিত হয়ে আছে এমন এক 'মধ্বদ' সত্তা,—জাগ্রৎ-চেতনার চেয়েও যে সত্য বৃহৎ এবং গভীর, জীবনের প্রতি অনুভবে পান করে যে তার মাধুরী। এই মধুর রসটুকুই মনোময়ী প্রাকৃত-চেতনাকে গোপনে-গোপনে রেখেছে সঞ্জীবিত, তাই সম্ভূতির বিক্ষুব্ধ স্পন্দনে জীবনব্যাপী আয়াস সন্তাপ ও কৃচ্ছ্রতার অভিঘাতেও আপন লক্ষ্যের পানে সে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা 'আমি' বলি যাকে, গহন সমুদ্রের বুকে সে শুধু আলোর ঝিকিমিকিটুকু। তারও গভীরে রয়েছে অবচেতনা ও অতিচেতনার পরাবর বৈপুল্য, যা প্রাকৃত-চেতনাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে বিশ্বের অভিঘাতে স্পর্শাতুর নিজেরই একটা বহিরাবরণরূপে এবং সে-চেতনার বিচিত্র বেদনাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করছে নিগূঢ় কোনও ইষ্টসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই পরাবর চেতনা সত্তার গভীরে স্বয়ং গুহাহিত থেকে বাইরের মাত্রাস্পর্শকে গ্রহণ করে রসায়িত করছে এক সত্যতর গভীরতর অনুভবের স্বজন-বীর্যরূপে; আবার সেই গভীর হতেই উৎসারিত করছে তাকে বহিশ্চর চেতনায়—জ্ঞান বল ও চারিত্র্যের সংবেগে। কোন্ রহস্যলোক হতে ফোটে মনের এই ঐশ্বর্য, মন তা জানে না; কারণ সে তো সত্তার সমীরণ-চঞ্চল বীচিভঙ্গ-মাত্র, নিজকে সংহত করে গভীরশায়ী হবার কৌশল তো শেখেনি সে আজও।

ব্যবহারিক জীবনে এ-তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আমাদের কাছে। কদাচ-কখনও পাই তার চকিত আভাস, তার সম্পর্কে গড়ে তুলি একটা বৃত্তি বা সংস্কার; কিন্তু গুহাশায়ী হতে শিখি যখন, পরাবরের এই গভীরতা নিত্যজাগ্রত থাকে তখন আমাদের চেতনায়। অনুভব করি, আত্মস্বরূপের এই তো সত্যতর পরিচয়—এই প্রশান্ত প্রসন্ন গভীর বীর্যময় যোগযুক্ত চেতনা তো নয় জগতের কবলিত; এ যদি 'মহান্ত বিভু'র স্বরূপ-খ্যাতি না-ও হয়, তবু এ-যে সেই অন্তর্যামীরই তনু-ভা। অনুভব করি তাঁকে অন্তরাত্মারূপে: আমাদের প্রাতিভাসিক বহিরাত্মার আধার ও নিয়ন্তা তিনি; শিশুর প্রমাদে ও বিক্ষোভে পিতা যেমন স্নেহে হাসেন, তেমনি আমাদের সুখদুঃখের চাঞ্চল্যের পানে চেয়ে থাকেন তিনি স্নিগ্ধ কৌতুকে।....প্রাকৃত গুণবিক্ষোভের সঙ্গে আমাদের যে-অবিবেক, তাকে নির্জিত করে' অন্তরাবৃত্ত হয়ে দিব্য-পুরুষের জ্যোতিরুদ্ভাসিত ছায়াতপের সুষমায় সমাহিত হতে পারি যদি,—তাহলে সেই

সমাধি-সংস্কারকে আমরা বহন করে আনতে পারি মাত্রাস্পর্শের জগতেও। তখন অখণ্ড-চৈতন্যে গুহাহিত থেকে, দেহ-প্রাণ-মনের সুখদুঃখ হতে বিবিক্ত হয়ে তাদের গ্রহণ করতে পারি চেতনারই বহিরঙ্গ বৃত্তিরূপে; স্বভাবতই বহির্বৃত্ত বলে তাদের স্পর্শ বা প্রভাব স্বরূপসত্তার অন্তস্তলে আর পৌঁছয় না তখন। শাস্ত্রের অন্বর্থ সংজ্ঞায় আছে তাই 'মনোময়' পুরুষেরও পরে 'আনন্দময়' পুরুষের কথা। এই আনন্দময় পুরুষই 'বৃহৎ জ্যোতি'—সঙ্কুচিত মনোময় পুরুষ তাঁর অস্পষ্ট ছায়া এবং ক্ষুব্ধ প্রতিবিম্বমাত্র। অতএব অন্তরেই খুঁজতে হবে আমাদের স্বরূপসত্য—বাইরে নয়।

দ্বিতীয় কথা : সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে যে-ঝঙ্কার উঠছে প্রতি-নিয়ত, সে তো শুধু বাইরের একটা ব্যাপার, আমাদের অসমাপ্ত-পরিণামজনিত অসম্যক একটা ব্যবস্থা মাত্র; অতএব একেই সংবেদনের পরমা নিয়তি বলে মানতে বাধ্য নই আমরা। বাস্তবিক বিশিষ্ট বিষয়ের সন্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষাও যে বিশেষরূপে ব্যবস্থিত, একথা সত্য নয়; এক্ষেত্রে ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অভ্যাসে। সন্নিকর্ষ-বিশেষে সুখ অথবা দুঃখ পাই আমরা,—যেহেতু আমাদের প্রকৃতি তাতে অভ্যস্ত, যেহেতু অনুশীলনের ফলে দাঁড়িয়ে গেছে গ্রাহ্যের সঙ্গে গ্রহীতার এই সম্বন্ধ। কিন্তু ইচ্ছামত ব্যবস্থিত সাড়ার বিপরীত সাড়া দেবার যোগ্যতাও আছে আমাদের; যেখানে দুঃখ পাওয়াই রীতি সেখানে সুখ পাওয়া, অথবা সুখের জায়গায় দুঃখ পাওয়া অসাধ্য নয় আমাদের পক্ষে। এমন-কি যে-বহিশ্চেতনা যন্ত্রের মত সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার সাড়া দিয়ে এসেছে এতকাল, তাকে প্রত্যেক মাত্রাস্পর্শে নিত্যস্ফূর্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ সাড়া দিতেও অভ্যস্ত করতে পারি আমরা,—সঞ্চারিত করতে পারি তার মাঝে গুহাশায়ী আনন্দময় পুরুষের সত্য ও বৃহৎ অনুভবের হ্লাদিনী দীপ্তি। ব্যবহারিক জীবনের অভ্যস্ত সাড়ার গভীরে প্রসন্ন ও বিবিক্ত আনন্দ-সংবেদন একটা বৃহৎ সিদ্ধি হলেও, যোগযুক্ত চেতনার স্বচ্ছন্দ অনুভব তারও চেয়ে বৃহৎ গভীর এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমায় পূর্ণতর। কারণ, তার মাঝে যে আছে শুধু অটল থেকে গ্রহণ করা, আত্মস্থ থেকে অনুভবের অপূর্ণতাকে কেবল মেনে নেওয়া, তা নয়; অপূর্ণকে পূর্ণে, অনৃতকে ঋতে রূপান্তরিত করবার বীর্যও আছে তার মাঝে। তাই সেখানে মনোময় পুরুষের দ্বন্দ্ববিধুর অনুভবের জায়গায় ফুটে ওঠে চিন্ময় রসিকেরই বিশ্ব-রতির শাশ্বত ও নিরঙ্কুশ উন্মাদনা।

সুখ-দুঃখের সাড়া যে নিতান্ত আপেক্ষিক এবং অভ্যাসপ্রসূত—মানসিক ব্যাপারে তা ধরা পড়ে খুবই সহজে। কিন্তু আমাদের নাড়ীচক্র নিয়মিত ব্যবস্থাতেই কতকটা অভ্যস্ত ; এমন-কি এক্ষেত্রে অভ্যাসের রায়ই যে চরম, এমন ভ্রান্ত সংস্কারও তার আছে। তাই তার কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি জয় বা মান বস্তুতই সুখকর,—চিনি যেমন মিষ্টি, এরাও তেমনি নির্ঘাত মিষ্টি ; আবার তেমনি অসিদ্ধি দুর্দৈব পরাজয় বা অপমান বস্তুতই দুঃখকর তার কাছে,—নিম যেমন তেতো, এরাও তেমনি নির্ঘাত তেতো। এগুলোর স্বাদ বদলে দেওয়া কল্পনাও করতে পারে না সে—কেননা তার কাছে সে হবে একটা দৃষ্ট-বিরোধ, অনৈসর্গিক একটা রুচি-বিকার। এমনি করে 'নাড়ীময় পুরুষ' আমাদের মাঝে পঙ্গু হয়ে আছে অভ্যাসের দাসত্বে ; একই ধরনের সাড়া ও অনুভবের ছককাটা জীবন-ব্যবস্থার কোথাও বিপর্যয় না ঘটে মানুষের, তারি জন্যে সে প্রকৃতির হাতে-গড়া একটা সাধনমাত্র। কিন্তু মনোময় পুরুষ স্বাধীন তার চেয়ে, কেননা প্রকৃতি গড়েছে তাকে সাবলীল বৈচিত্র্যের আধার করে'—পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সে এগিয়ে যাবে বলে। পরবশতা তার ইচ্ছাধীন ; যতদিন বিশেষ-একটা মানসিক অভ্যাসকে সে আঁকড়ে আছে অথবা নাড়ীতন্ত্রের শাসনকে স্বীকার করছে স্বেচ্ছায়, ততদিনই সে পরবশ। অতএব অপমানে ক্ষতিতে পরাজয়ে শোকাচ্ছন্ন হতে বাধ্য নয় সে : এদের সে দেখতে পারে পুরোপুরি উপেক্ষার দৃষ্টিতে—এমন-কি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সঙ্গেই এদের সে বরণ করে নিতে পারে জীবনের আর যত-কিছুর সাথে। তাই চেতনার উন্মেষের সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করেছে এই সত্য : দেহ ও নাড়ী-চক্রের শাসনকে যতই সে করে অস্বীকার, অন্নময় ও প্রাণময় কোশের ষড়যন্ত্র হতে যতই নিজকে করে নির্মুক্ত, ততই অসঙ্কুচিত হয় তার স্বাতন্ত্র্যের মহিমা ;—মাত্রাস্পর্শের সে আর দাস নয় তখন, সংবেদনের স্বাতন্ত্র্যে সে তখন স্বরাট্।

কিন্তু শারীরিক সুখ-দুঃখের বেলায় স্বারাজ্যের এই সহজ মহিমাকে অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা আমরা তখন থাকি দেহ ও নাড়ী-চক্রের খাস-মহলে ; সেখানকার কর্তা যে, তার স্বভাবই হল বাইরের চাপ ও বাইরের অভিঘাতের শাসন মেনে চলা। তবু স্বারাজ্যের একটুখানি আভাস সেখানেও পাই আমরা। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় : একই স্থূল সন্নিকর্ষ সুখের অথবা দুঃখের হতে পারে অভ্যাসের ফলে—শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির

কাছেই নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তার বাড়তির বিভিন্ন পর্বে। কতবার দেখা গেছে, তীব্র উত্তেজনা অথবা উচ্ছ্বসিত উল্লাসের সময় মানুষ অসাড় বা উদাসীন হয়ে যায় দেহের বেদনাবোধ সম্পর্কে, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সেই বেদনাই হয়ত হত তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ। অনেক সময় বেদনা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে আসে তখনই, অসাড় নাড়ীচক্র আবার যখন সজাগ হয়ে মনকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার অভ্যস্ত বেদনাবোধের দায়। কিন্তু মনের এ-দায় তো অনতিক্রমণীয় নয়—এ তার অভ্যাস শুধু। সম্মোহন-দশায় সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে বা ছুরি চালিয়ে তাকে ব্যথা পেতে নিষেধ করা হয় যদি, তাহলে শুধু-যে তখনই ব্যথা পায় না সে তা নয়, জেগে ওঠার পরও ব্যথা পাবার অভ্যস্ত সংস্কারকে তার দাবিয়ে রাখা চলে স্বচ্ছন্দে। ব্যাপারটা রহস্যময় নয় মোটেই : মানুষের জাগ্রৎ-চেতনাই অভ্যস্ত হয়েছে নাড়ীচক্রের সংস্কারে ; সম্মোহন-দশায় জাগ্রতের ক্রিয়াকে স্তম্ভিত করে সম্মোহক ফুটিয়ে তোলে অধিচেতনার গুহাশায়ী মনোময় পুরুষকে, যিনি ইচ্ছা করলেই দেহ ও নাড়ীচক্রের নিয়ন্ত্রণকে আনতে পারেন নিজের বশে। সম্মোহনদ্বারা এমনি করে মেলে স্বারাজ্যের যে-অধিকার, তা কিন্তু বস্তুত অস্বাভাবিক পরতন্ত্র ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সত্যিকার স্বারাজ্য বলা চলে না তাকে। কিন্তু এই সাধনাই করা চলে স্বেচ্ছায়, স্বভাবের বশে, পর্বে-পর্বে—যার ফলে আধারে হয় সত্যিকার স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠা, নাড়ীতন্ত্রের অভ্যস্ত সংস্কারের 'পরে সংক্রামিত হয় মনোময় পুরুষের আংশিক বা পরিপূর্ণ প্রশাসন।

দেহ-মনের পীড়াবোধ প্রকৃতির একটা কৌশলমাত্র ; ঊর্ধ্ব-পরিণামের এক পর্বসন্ধিতে বিশেষ-কোনও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যই শক্তির এই লীলা। কথাটা এই : ব্যক্তি-চেতনার কাছে এ-জগৎ বহুমুখী শক্তিরাজির বিচিত্র জটিল একটা সংঘাত। এই জটিল আবর্তের মাঝে জীব দাঁড়িয়ে আছে একটা সীমিত পিণ্ডরূপে ; আধারশক্তির সঞ্চয় তার সীমিত, অথচ তারি 'পরে প্রতি-নিয়ত পড়ছে এসে অগণিত অভিঘাত—যা তার পিণ্ড-জগৎকে ক্ষত-বিক্ষত চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। বিষয়-সন্নিকর্ষে বিপদ বা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে যেখানে, জীবের দেহ এবং নাড়ীচক্র সেখান হতেই আঁৎকে পিছিয়ে-আসে ; এই পিছিয়ে-আসাটাই চেতনায় ফোটে পীড়াবোধ হয়ে। উপনিষদে যায় নাম 'জুগুপ্সা', এ তারি অঙ্গীভূত।

পিণ্ড-চেতনা যাকে মনে করে অনাত্মা প্রতিকূল বা অনাত্মীয়, তা হতে নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল জুগুপ্সার স্বরূপ। জুগুপ্সাই দেখা দেয় পীড়ার আকারে; অতএব, কাকে এড়াতে হবে অথবা এড়াতে না পারলেও ঠেকিয়ে রাখতে হবে, এ যেন তারি পানে প্রকৃতির ইশারা। তাই জড়জগতে প্রাণ না দেখা দিয়েছে যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও নিশানা মেলে না পীড়াবোধের, কেননা ততদিন প্রকৃতির ইষ্টসিদ্ধির জন্য যান্ত্রিক প্রবৃত্তিই যথেষ্ট। কিন্তু যখনই জগতের বুকে দেখা দিল প্রাণের সুকুমার লীলা এবং জড়ের 'পরে তার শিথিল মুষ্টিবন্ধন, তখন হতেই বেদনাবোধের আবির্ভাব; আর সে-বেদনা বেড়ে চলল প্রাণের মাঝে মনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। তাই যতক্ষণ দেহ আর প্রাণকে মন জড়িয়ে আছে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধনরূপে, ততক্ষণ বেদনাবোধ তার নিত্যসঙ্গী। মনকে তখন মেনে চলতেই হয় দেহ আর প্রাণের ক্লিষ্ট বৃত্তি এবং সেইজন্যই অপূর্ণ অহন্তার সংবেগ ও আকৃতিকে করতে হয় তার দিশারী; অতএব বেদনাবোধকেও প্রত্যাখ্যান করবার উপায় থাকে না তার। কিন্তু মন যদি হয় স্ববশ, অহং-নির্মুক্ত, সর্বভূত এবং বিশ্বগত শক্তিলীলার সঙ্গে যোগযুক্ত, তাহলে দুঃখ-বোধের প্রয়োজনও তার কমে আসে এবং অবশেষে দুঃখসত্তার কোনও হেতুই থাকে না অবশিষ্ট। তখনও চেতনায় তার সংস্কারশেষ থাকে যদি, তাহলে অতীতের অনিয়ত ও অনিমিত্ত উৎপাতরূপেই থাকবে সে; অর্থাৎ দঃখবোধ তখন অভ্যাসের অনাবশ্যক পরিশেষ। ঊর্ধ্বচেতনা পুরোপুরি দানা বাঁধেনি বলেই তার 'পরে অবর-সংস্কারের এই জুলুম। কিন্তু এ-জুলুমের পথও রুদ্ধ করে' সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে হবে তার, তবেই জড়ের বশ্যতা ও অহন্তার সঙ্কোচ হতে চেতনার নির্মুক্তিতে তার স্বারাজ্য-সিদ্ধির দিব্য নিয়তি হবে সার্থক।

দুঃখবোধের বিলোপসাধন অসম্ভব নয় কিছুই, কেননা সুখ দুঃখ দুইই শুদ্ধ-সত্তার আনন্দস্বভাবেরই দুটি ধারা—একটি ধারা স্তিমিত, আর-একটি প্রতীপ। এ-বৈকল্যের কারণ: অখণ্ড-চেতনা জীবের মাঝে নিজেই নিজকে করেছে খণ্ডিত—মায়ার পরিমিতিতে; তাই বিশ্বের স্পর্শে জীবের মাঝে জাগে না সার্বভৌম রসোল্লাস, বিশ্বকে খণ্ড-খণ্ড করে আস্বাদন করে সে অহন্তার ক্লিষ্ট বৃত্তি দিয়ে। বিশ্বাত্মার কাছে নাই মাত্রাস্পর্শ, কেননা সকল স্পর্শই দেয় তাঁকে আনন্দ-কন্দের অনুভব,—অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'রস'

অর্থাৎ যা বস্তুর সার এবং স্বাদ দুইই। বিষয়ের সংস্পর্শে তার সারটুকু খুঁজি না আমরা—শুধু দেখি কী ভাবে আলোড়িত করে সে আমাদের কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বিরাগকে। তাই বিষয়ের রস আমাদের চেতনায় বিবর্তিত হয় দুঃখে শোকে উপেক্ষায় বা অপূর্ণ আনন্দের ক্ষণিকায়, অর্থাৎ সারগ্রাহিতার সামর্থ্য থাকে না তার মাঝে। হৃদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয় যদি এবং সেই অনাসক্তির বীর্য নাড়ীচক্রেও হয় সংক্রামিত, তাহলে রসের এই অপূর্ণ তির্যক-প্রকাশকে ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত করে শুদ্ধ-সত্তার অব্যভিচারী আনন্দের বিচিত্র উল্লাসকে তারি স্বারসিক সত্যস্বরূপে আস্বাদন করা অসম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে। বিশ্বোল্লাসের চিত্রধারা পান করবার সামর্থ্য কিছু-কিছু দেখা দেয়, যখন কাব্য ও কলার বিষয়বস্তুকে আমরা গ্রহণ করি সামাজিকের সহৃদয়তা নিয়ে। শোক ভয় ও জুগুপ্সার বিষয়েও আমরা পাই এক অন্তর্গূঢ় রসরূপের আস্বাদন; তার কারণ, আমরা তখন অনাসক্ত, নির্লিপ্ত,—ভাবি না নিজের কথা বা আত্মসংহরণের উপায়, শুধু ভাবি বিষয়বস্তু ও তার রসের কথা। সামাজিকের এই রসবোধ অবশ্য বিশুদ্ধ আনন্দসত্তার অবিকল প্রতিরূপ হতে পারে না কখনও, কেননা ব্রহ্মানন্দ কাব্যরসোত্তীর্ণ অতিমানস অনুভব। ব্রহ্মানন্দে শোক ভয় জুগুপ্সা বিলুপ্ত হয় আলম্বনসুদ্ধ, কিন্তু কাব্যরসে আলম্বন থাকে অক্ষুণ্ণ। তবু বিশ্বাত্মার আত্মরূপায়ণে যে-আনন্দ উপচিত হয়ে উঠেছে কলায়-কলায়, তারি একটি ভূমির আংশিক ও অপূর্ণ পরিচয় পাই আমরা শিল্পরসেরও আস্বাদনে। এ আমাদের আত্মপ্রকৃতির অন্তত একটা দিক উন্মুক্ত করে দেয় অহন্তা-নির্মুক্ত সেই বিশ্বাত্মভাবের প্রতি, যা দিয়ে অখিলাত্মা আস্বাদন করেন মানুষের খণ্ডিত-চেতনায় কল্পিত বৈষম্য ও বিপর্যয়ের মাঝেই সৌষম্যের মাধুরী। তবু প্রমুক্ত চেতনার এ শুধু পূর্বাভাস। পরিপূর্ণ প্রমুক্তি আসবে তখনই, যখন মুক্তধারার অবাধ প্লাবনে আধারের সব দিক খুলে যাবে আলোর পানে—আমাদের হৃদয়ের নাড়ীতে-নাড়ীতে উল্লসিত হয়ে উঠবে এক সর্বতঃসঞ্চারী রসবোধ, এক সার্বভৌম প্রজ্ঞাদৃষ্টি, বিশ্বের সম্পর্কে অনাসক্ত অথচ যোগযুক্ত একটা গভীর চেতনা।

আমরা দেখেছি, চিৎশক্তি যখন পরাহত সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে বিশ্বের অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে না পেরে, তখনই আমাদের মাঝে জাগে বেদনাবোধ। তারও মূলে রয়েছে আমাদের অবিদ্যা: সৎ-চিৎ-আনন্দই যে আমাদের আত্মার স্বরূপ একথা ভুলে ক্ষুদ্র অহমিকার দীনতা

দিয়ে নিজেকে যখন করি সঙ্কুচিত, তখনই বিশ্বকে গ্রহণ করবার, সম্ভোগ করবার যথোচিত সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলি আমরা। তাই দুঃখবোধের উচ্ছেদ করতে আমাদের প্রথম সাধনাই হবে জুগুপ্সার জায়গায় তিতিক্ষার প্রবর্তনা। জুগুপ্সায় আমরা প্রতিকূল সন্নিকর্ষ হতে ঘা খেয়ে পিছু হটেই এসেছি এতকাল, এইবার তিতিক্ষার বীর্য নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, জয় করতে হবে তাদের। তিতিক্ষার অনুশীলনে আমরা প্রথমে পৌঁছব একটা সমত্ববোধের ভূমিতে, অর্থাৎ সকল সন্নিকর্ষের প্রতিই জাগবে আমাদের সমান উপেক্ষা অথবা সমান প্রসন্নতা। তারপর এই সমত্ববোধকে দৃঢ়মূল করতে হবে আধারে, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিকল অহং-চেতনার আসনে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরমানন্দময় চেতনার প্রতিষ্ঠাদ্বারা। এই ব্রাহ্মী-চেতনা হতে পারে বিশ্ব হতে বিবিক্ত হয়েই বিশ্বোত্তীর্ণ; তখন তার প্রশান্ত-সুদূর আনন্দধামে পৌঁছতে হলে চাই সব-কিছুতে সমান উপেক্ষা। তাই হল বৈরাগীর পথ। কিন্তু ব্রাহ্মী-চেতনা আবার হতে পারে বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক; তখন তার সর্বানুস্যূত নিত্যসন্নিহিত আনন্দের অনুভব মেলে পূর্ণাহন্তার মাঝে ক্ষুদ্র-অহন্তার নিঃশেষ আত্মসমর্পণে—এক সর্বগত সমরস প্রসাদের অধিগমে। প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের ছিল এই পথ। কিন্তু সুখের স্তিমিত 'বেদনা' ও দুঃখের প্রতীপ সংস্পর্শে উদাসীন থাকাই স্বভাবত অধ্যাত্মসাধনার আদিপর্ব; সাধারণত আরও এগিয়ে গেলে আসে সমরস প্রসাদের ভাব। কিন্তু সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার তিনটি তারকে সদ্য-সদ্যই বাজিয়ে তোলা আনন্দের সুরে,—অসম্ভব না হলেও খুব সহজ নয় মানুষের পক্ষে।

বেদান্তীর সম্যক-দর্শন জগৎকে তাহলে দেখে এই দৃষ্টিতে: বিশ্বের মূলে আছে এক অখণ্ড অনন্ত সন্মাত্র—নিরঞ্জন আত্মসংবিতের উল্লাসে পরমানন্দময়; সেই শুদ্ধ-সত্তাই আত্মস্বরূপে অবিচ্যুত থেকে স্পন্দিত হল চিন্ময়ী মহাশক্তির লীলায়নে—মায়ার খেলায় জাগল প্রকৃতির পরিস্পন্দ। শুদ্ধ-সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রথমত সমাহিত আত্মসংহৃত—জড়বিশ্বের ভূমিকারূপে অবচেতন। তারপর সে-আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এক সমরস পরিস্পন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে—তাকে ইন্দ্রিয়সংবেদন বলতে পারি না তখনও। তারও পরে, মন ও অহং-এর উন্মেষ এবং উপচয়ে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে বেজে উঠল সে আনন্দ-ঝঙ্কার, যখন ঘটে-ঘটে সঙ্কুচিত চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে অনাত্মীয় ও নিজের সীমিত সাধনার প্রতিকূল ভেবে শিউরে উঠল তার অভিঘাতে।

অবশেষে ঘটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নিত্যচেতন আবির্ভাব তাঁর আত্মবিভূতিতে —সর্বাত্মভাবের সংবেদনে, সামরস্যের সম্ভোগে, স্বপ্রতিষ্ঠার মহিমায়, স্বীয়া প্রকৃতির অবষ্টম্ভে। এই হল জগৎ-পরিণামের ধারা।

যদি প্রশ্ন হয়, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সৎস্বরূপ, এই বিশ্ব-পরিণামে তাঁর আনন্দ কেন? তার উত্তরে বেদান্তী বলবেন, আনন্ত্যই যাঁর স্বরূপ, তার মাঝে তো সমস্তই সম্ভাবিত। আর সম্ভূতির বিপরিণামেই হোক্ অথবা অসম্ভূতির অপরিণামেই হোক্, তাঁর সদ্ভাবের যে-আনন্দ, সে তো সার্থক হবে নিখিল সম্ভাবনার চরিতার্থতাতেই। সে বিচিত্র সম্ভাবনার একটি রূপ ফুটেছে এই বিশ্বে; আমরা যার অঙ্গীভূত। এখানে সচ্চিদানন্দ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন যা নন তিনি তারি মাঝে এবং সেই বৈপরীত্যের গহনে চলছে তাঁর নিজকে ফিরে পাবার এষণা। অনন্ত সৎ-স্বরূপ যিনি, অসতের কুহেলিকায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার তিনি ফুটে উঠলেন সান্ত জীবের প্রতিভাসে; তাঁর অনন্তচৈতন্য লুপ্ত হল অব্যাকৃত অচিতির বিপুল আঁধারে, আবার বহিশ্চর চেতনার সঙ্কীর্ণ পরিসরে উঠল তা ঝিলমিলিয়ে; তাঁর অনন্ত শক্তির স্বধা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পরমাণুর নির্ঝত ঘূর্ণাবর্তে, আবার তা জেগে উঠল ব্রহ্মাণ্ডের টলমল মূর্তিতে; তাঁর অনন্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল জড়ত্বের স্তিমিত অসাড়তায়, আবার তা বেজে উঠল সুখ-দুঃখ-মোহ রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষার সুর-সুষমাহীন বিচিত্র ঝঙ্কারে; তাঁর নিরবশেষ অখণ্ডতা খণ্ড-বৈচিত্র্যের বিপর্যয়ে গেল হারিয়ে, আবার তা দেখা দিল বিচিত্র শক্তি ও সত্তার সংঘর্ষে—যার মাঝে পরস্পরকে কবলিত করে, গ্রাস করে, জীর্ণ করে চলল সেই অখণ্ডভাবকেই ফিরে পাবার সাধনা। এমনি করে এই সৃষ্টির বুকেই একদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ফুটে উঠবেন তাঁর নিরাবরণ মহিমায়। জীবব্যক্তি হয়েও মানুষ এই জীবনেই রূপান্তরিত হবে বৈশ্বানর বিরাট পুরুষে; তার সঙ্কীর্ণ মনশ্চেতনা সম্প্রসারিত হবে অতিচেতনার অদ্বৈত সমাহারে, যার মাঝে সবাই পাবে ঠাঁই—নির্বিচারে; তার সঙ্কীর্ণ হৃদয় উদার হয়ে বিশ্বকে বাঁধবে অফুরন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে, ক্ষুব্ধ বাসনার লোলুপতা বিশ্বরতির রসে হবে রসায়িত; তার সঙ্কুচিত প্রাণ-চেতনা বিস্ফারিত হয়ে বিশ্বের সমগ্র অভিঘাতকেই তুলে নেবে আপন বুকে, বিশ্বের আনন্দলীলার পাবে পরিপূর্ণ আস্বাদন; এমন-কি তার জড়দেহও আর নিজেকে ভাববে না বিশ্ব হতে বিযুক্ত—অখণ্ড সর্বগত মহাশক্তির বিপুল প্রবাহকে ধারণ করবে সে নিজেরই

মাঝে এক হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে। এমনি করে ব্যক্তি-আধারেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সর্বানুস্যূত অদ্বয়-সুষমা পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে উঠবে তার স্বীয়া প্রকৃতির ছন্দে।

বিশ্বলীলার মর্মমূলে নিহিত রয়েছে যে পরম সত্য, শুদ্ধ-সত্তার অখণ্ড সমরস আনন্দই তার স্বরূপ। সে-আনন্দের সামরস্য ফুটেছে প্রকৃতির অব-চেতন সুপ্তিতেও—যখন তার মাঝে ছিল না ব্যক্তি-চেতনার সূচনা। তারপর জীবকে কেন্দ্র করে অর্ধচেতন স্বপ্নের ধাঁধায় নিজকে খুঁজেছে সে এষণার বিচিত্র ছন্দে—তার মাঝে কত বিকৃতি, কত রূপান্তর, কত বিপর্যয় ;—কিন্তু সে-এষণাতেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেই সামরস্যের আনন্দ। ঐ আনন্দেরই অবিকল্পিত অনুভব দেখি আবার শাশ্বত অতিচেতনার স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায়—একদিন যার মাঝে প্রবুদ্ধ জীবচেতনা একাকার হয়ে যাবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরম সাযুজ্যে। ভাবের চোখে জড়বিশ্বের পানে তাকাই যখন সংস্কার-বিমুক্ত বিজ্ঞানের প্রাতিভ-দীপ্তি নিয়ে, তখন দেখি জগৎ জুড়ে এই তো অখণ্ডের আনন্দলীলা ; এ-লীলায় তিনিই নট, তিনিই সূত্রধার—তাঁর সর্বৈশ্বর্যের আনন্দচ্ছটায় ফুটেছে বিশ্বের এই শতদল।

## ১৩

# দেব-মায়া

. তাইতো আজও তারা এই বীর্যবর্ষী দেবতা আর ধেনুরূপিণীর নাম দিয়ে দিকে-দিকে রূপায়িত করে চলেছে আলোকজননীর নিরূঢ় শক্তিকে; সে-শক্তির বিচিত্র বীর্যে ঢেকেছে তারা আপন তনু—এমনি করে মায়ীরা ফুটিয়ে তুলেছে রূপের মায়া এই সতের মাঝে।

রূপ দিলেন সবাইকে এঁরই মায়ায় মায়াবীরা; বীর্যদীপ্ত দৃষ্টি যে-পিতাদের, ভ্রূণের মত এঁকেই তাঁরা নিহিত করলেন সবার মাঝে।

—ঋগ্বেদ ( ৩।৩৮।৭ ; ৯।৮৩।৩ )

যে-সন্মাত্রের মাঝে স্বয়ম্ভূবীর্যের সংবেগে চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ আনন্দে জাগে বিসৃষ্টির প্রবর্তনা, তিনিই আমাদের স্বরূপসত্য; আমাদের সকল ভাব ও ভঙ্গির অন্তর্যামী আত্মা তিনি,—আমাদের সকল কৃতি সৃষ্টি ও সম্ভূতির তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। কবি শিল্পী অথবা সঙ্গীতকার কলারূপের সৃষ্টি করে যখন, তখন যেমন আত্মসত্তার কোনও অন্তর্গূঢ় বীজভাবকেই রূপায়িত করে তারা; অথবা কারু, মনীষী বা রাজনীতিবিদ যেমন অন্তর্নিহিত ভাবকেই দেয় বস্তু-রূপের আকার, অথচ এই ব্যাকৃতিতে কোনও স্বরূপচ্যুতি ঘটে না তাদের; তেমনি এই বিশ্বসম্ভূতিও সেই শাশ্বত বিশ্বকবিরই আনন্দচিন্ময় আত্মরূপায়ণ। বাস্তবিক, সমস্ত বিসৃষ্টি বা সম্ভূতির তত্ত্বই তাই: বীজ হতে যা অঙ্কুরিত হল, বীজেই ছিল তা নিহিত—বীজ-সত্তায় ছিল তার প্রাক্-সত্তা, পূর্বসিদ্ধ ছিল তার আত্ম-বিভাবনার সংবেগ, সম্ভূতির আনন্দেই সঙ্কল্পিত ছিল তার ছন্দ। প্রাণ-পঙ্কের আদি-কণিকাতেই সত্তার গূঢ় সংবেগে প্রচ্ছন্ন ছিল জীবপিণ্ডের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বস্তুত, অন্তঃসংজ্ঞা অন্তর্বর্ত্নী বীজশক্তিই সর্বত্র বহন করে নিজেরই অন্তর্গূঢ় 'সরূপকে' ফুটিয়ে তোলবার অদম্য আকূতি। কেবল জীব আত্মবিসৃষ্টির কর্তা যেখানে, সেইখানেই সে নিজের সঙ্গে কল্পনা করে

সৃষ্টি-শক্তির ও সৃষ্টির উপাদানের একটা প্রভেদ। বস্তুত শক্তির সঙ্গে তার স্বরূপের পার্থক্য নাই কোনও; শক্তির সাধনরূপে কল্পিত ব্যক্তি-চেতনাও যেমন সে নিজে, তেমনি সৃষ্টির উপাদান ও পরিণাম হতেও অভিন্ন সে। অর্থাৎ বিসৃষ্টির আপাতভিন্ন পর্বে-পর্বে আছে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দের লীলা বিভিন্ন পর্যায়ে ঘনীভূত হয়ে। প্রত্যেক পর্যায়েই তার বিবিক্ত অহং নিজকে ঘোষণা করছে 'এই তো আমি' বলে, কিন্তু সর্বত্র তার আত্মশক্তিরই বিচিত্র গুণলীলা আত্মরূপায়ণের বিচিত্র উল্লাসে নিজেকে করছে মুঞ্জরিত।

সন্মাত্রের বিভূতিও তো আর-কিছুই হতে পারে না তার আত্মস্বরূপ ছাড়া; এ তার লীলা, তার ছন্দ,—তার আত্মসত্তা চিৎশক্তি ও আনন্দ-স্বভাবেরই স্ফূর্তি। তাইতো যা-কিছু ফোটে জগতে, সে-ই বহন করে সত্তার আকূতি; সে চায় সঙ্কল্পিত রূপের স্ফুরণ, তারি মাঝে আত্মভাবের উপচয়; যে চেতনা ও শক্তি অন্তর্নিহিত তার, তাকে সে চায় পুষ্ট স্ফুরিত উপচিত ও অনন্তগুণে বর্ধিত করতে। বিশ্বের ঘটে-ঘটে রয়েছে আনন্দের প্রৈতি—অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হওয়ায় আনন্দ, রূপায়ণে আনন্দ, চেতনার ছন্দ-দোলায় আনন্দ, শক্তির মুক্তধারায় আনন্দ। সেই আনন্দকে বাড়িয়ে উপচে তোলা—যেদিক পানেই হোক্, যেমন করেই হোক্; অন্তরের যে-ভাবই হোক্ অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহের নিগূঢ় বাণীর বাহন, তাকেই সার্থক করে তোলা আনন্দ-রসায়নে—এই তো সর্বভূতের একমাত্র আকূতি।

বিশ্বের কোনও লক্ষ্য থাকে যদি, পূর্ণতার কোনও এষণা যদি নিহিত থাকে তার মাঝে, তাহলে কি ব্যষ্টিতে কি সমষ্টিতে তার রূপ হবে—আত্ম-সত্তাকে, অন্তর্গূঢ় শক্তি ও চেতনাকে, নিরূঢ় আনন্দস্বভাবকেই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু ব্যক্তি-চেতনা ব্যক্তি-রূপের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীতেই বাঁধা পড়ে যদি, তাহলে কিছুতেই ফুটবে না তার পূর্ণরূপ। সান্ত যে, তার মাঝে অখণ্ড পূর্ণতা কখনও ফোটে না এইজন্য যে, সান্তেরই তা স্বরূপ-কল্পনার প্রতিকূল। অতএব সান্তভাব ঘুচে অনন্তচেতনার উন্মেষেই ব্যক্তির একমাত্র সার্থকতা। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় আনন্ত্যের অভিব্যক্তি ঘটে যদি, তবেই সে ফিরে পাবে তার স্বরূপ-সত্য। যিনি অনন্ত সত্তা অনন্ত চেতনা ও অনন্ত আনন্দ, তিনি যে তারি আত্মস্বরূপ, তার সান্তভাব যে তাঁরি পরমার্থসত্তার চিত্র-বিভূতির লীলাকঞ্চুক মাত্র,—এই পরমসত্যের অনুভবে তখন চরিতার্থ হবে তার এষণা।

## দৈব-মায়া

অন্তহীন দেশ ও কালরূপে প্রসারিত তাঁর অমেয়-সত্তার বিপুল পট-ভূমিকায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এই-যে বিশ্বলীলার কল্পনা, তার রহস্য বুঝতে হলে তার তত্ত্বরূপেরই অনুধ্যান করতে হবে আমাদের। সে-রূপকে এইভাবে তরঙ্গায়িত দেখি আমরা প্রচেতনার পর্বে-পর্বে : প্রথম পর্বে চিৎসত্তা সংবৃত ও আত্মসমাহিত হয়ে নিলীন হল স্বরূপধাতুরই ঘনীভাবে—অনন্ত বিভজনের সম্ভাবনা নিয়ে, কেননা তা না হলে অখণ্ড-ভাবের মাঝে সম্ভব হত না খণ্ডতার লীলা ; দ্বিতীয় পর্বে, স্বতোনিরুদ্ধ চিৎশক্তি ফুটে উঠল রূপময় প্রাণময় ও মনোময় বিগ্রহরূপে ; এবং শেষ পর্বে মনোময় বিগ্রহ মুক্তি পেল স্বরূপোপলব্ধির নির্বারিত স্বাতন্ত্র্যে—নিজেকে সে জানল বিশ্বলীলার অখণ্ড-অনন্ত সূত্রধাররূপে এবং সেই প্রমুক্তির উল্লাসে আবার সে ফিরে পেল সীমাহীন সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপ-প্রত্যয়, গূঢ় দশাতেও যা ছিল তার আত্মসত্তার গুহাচর চিরন্তন সত্য। শক্তিস্পন্দের এই তিনটি ছন্দের জ্ঞানই বিশ্ব-রহস্যের একমাত্র কুঞ্চিকা।

বিশ্বপরিণামের এই ছন্দকেই আমরা রূপায়িত দেখি প্রাচীন বেদান্তের শাশ্বত অনুভবে এবং সেই দর্শনের আলোকেই পাই এ-যুগের প্রাতিভাসিক পরিণামবাদের সত্য পরিচয়। কালের কলনায় বিশ্বপরিণামের যে-লীলা দেখেছিলেন প্রাচীন ঋষি, আজ বৈজ্ঞানিকও শক্তি ও জড়ের তত্ত্বালোচনায় পেয়েছেন তারি অনচ্ছ পরিচয় ; সে-পরিচয়কে সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণ করতে হলে আবার তাকে উদ্ভাসিত করতে হবে আমাদেরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত বেদান্তের পুরাণ ও শাশ্বত সত্যের জ্যোতিতে। এমনি করে প্রাচ্যের পুরাণ-জ্ঞান আর প্রতীচ্যের নবীন জ্ঞানের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটবে তাদের পরস্পরের দীপ্ত পরিচয় ; আজ জগতের ভাবধারা চলেছে যেন সেই যুক্তবেণীরই অভিমুখে।

তবু, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শুধু এই তত্ত্বের আবিষ্কারেই সকল সমস্যার সমাধান হয় না। বিশ্বমূল পরমার্থতত্ত্বকে চিনেছি আমরা, কিন্তু কী করে তিনি পরিণত হলেন এই প্রতিভাসে, তার ইতিহাস জানিনা এখনও। সমাধানের চাবিকাঠিটি পেয়েছি, কিন্তু কোন্ তালায় ঘোরাতে হবে তাকে তা তো বলতে পারি না। পরমার্থতত্ত্বকেই শুধু জানলে হবে না, জানা চাই তার পরিণামের ধারাকেও ; কারণ, ধারা যে আছে, 'যাথাতথ্যতঃ' অর্থের বিধান যে আছে জগতে, সে তো স্পষ্টই দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তি অব্যবহিত হয়ে কাজ করছে না বিশ্বে, কেননা তিনি তো ঐন্দ্রজালিকের

মত খেয়ালখুশির চূড়ান্তলীলায় লোক-বিসৃষ্টি করে চলেননি শুধু ব্যাহৃতির মন্ত্র আউড়িয়ে।

সত্য বটে, বিশ্ব-বিধানের বিশ্লেষণে দেখি শুধু বিক্ষিপ্ত শক্তিলীলার একটা সমতা এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতে সে-লীলার প্রবহণ—কোনও ঋতের ছন্দে নয়, কেবল শক্তির যদৃচ্ছা প্রবৃত্তিতে অথবা অভ্যস্ত শক্তি-পরিণামের গতানুগতিক ধারা ধরে। বিশ্বে নিয়মের তাৎপর্য এই। কিন্তু শক্তিকে কেবল শক্তিরূপে দেখলেই তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই রায়কে চূড়ান্ত বলে মানা চলে, নইলে এ শুধু একটা গৌণ আপাত-পরিচয় তার। শক্তিকে সত্তার আত্মসম্ভূতি বলে জানি যখন, তখন শক্তিপ্রবাহের নির্দিষ্ট ধারাকে সত্তারই স্বরূপ-সত্যের একটা প্রতিরূপ ছাড়া আর-কিছু বলতে পারি না; তখন মানতেই হয়, সন্মাত্রেরই ঋতময় প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রবাহের নিরূপিত চলন এবং লক্ষ্য। আবার, চৈতন্যই যখন অনাদি-সন্মাত্রের স্বভাব এবং তার শক্তিরও বীর্য, তখন সন্মাত্রের সত্যবিভূতিতেও আছে চিৎ-সত্তারই স্বরূপ-প্রত্যয়। অতএব শক্তিপ্রবাহের ধারা নিরূপিত হচ্ছে চৈতন্যে নিরূঢ় বিজ্ঞানশক্তির স্বতোদেশনায়, যা চিৎ-সত্তার স্বরূপ-প্রত্যয়ের প্রৈতি দ্বারা অনতিবর্তনীয় ঋতের পথেই শক্তিকে করবে পরিচালিত। সুতরাং বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে রয়েছে যে-প্রবর্তনা, তা বিশ্বচেতনারই স্বতোদেশনার বীর্য, অথবা আনন্ত্যের আত্মসংবিতের সেই দিব্য সামর্থ্য যা নিজের কোনও সত্যবিভূতিকে প্রত্যক্ষ করে তারি রূপায়ণের নিত্যধারার পথে সঞ্চারিত করতে পারে সিসৃক্ষার প্রবেগ।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, অনন্ত-চিন্মাত্র এবং তার লীলা-পরিণামের মাঝে একটা বিশেষ শক্তি বা বৃত্তির খেলাকে আমরা মানতে যাই কেন? যাকে বলি আনন্ত্যের আত্মসংবিৎ, সে কি কামচারবশে সৃষ্টি করতে পারে না এই রূপের মেলা—যার ততদিনই আয়ু যতদিন না মিলিয়ে যায় সে প্রলয়মন্ত্রে? সেমিটিক শাস্ত্রেও তো আছে এমন কামচারের কথা: 'ঈশ্বর বললেন, ফুটুক আলো, আর অমনি আলো ফুটল'। কিন্তু 'ঈশ্বর বললেন আলো হোক'—একথা বলি যখন, তখন ধরেই নিই, চিৎশক্তির আছে এমন-একটা বৃত্তি যা আলোকে বেছে নেয় আলো-নয়-যা তার থেকে। আবার যখন বলি, 'অমনি আলো হল' তখনও তার পিছনে থাকে চিৎশক্তিরই একটা দেশনা ও ক্রিয়ার কল্পন যা তার জ্ঞানা-শক্তির প্রতিরূপ; সেই ক্রিয়া-শক্তিই করে আলোর

বিসৃষ্টি জ্ঞানা-শক্তির অনুধ্যানের ছন্দে এবং আলো-নয়-যা তার মারণ-শক্তির হাজারো ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জিইয়ে রাখে তাকে। অনন্তচেতনার ক্রিয়া অনন্ত, অতএব তার শক্তি-পরিণামও অনন্ত : তাই সম্ভূতির সেই নির্বিশেষ আনন্ত্যের মাঝে সত্য-বিভূতির একটি সবিশেষ কলাকে আবিষ্কার করে' তারি ঋতের ছন্দে জগৎ গড়ে তোলা—তার জন্য চাই বিদ্যাশক্তির এমন-একটা 'ব্রত' বা নির্বাচনী বৃত্তি যা পরমার্থ-সতের আনন্ত্য হতে গড়ে তুলবে সান্তের প্রতিভাস।

বৈদিক ঋষিরা এই শক্তিকে বলতেন 'মায়া'। তাঁদের কাছে মায়া পরা-সংবিতেরই সম্প্রজ্ঞানের বীর্য, যা অনন্ত-সন্মাত্রের অসীম বিশাল সত্য হতে সীমার রেখায় 'মিত' করে' নিজের মাঝে ফুটিয়ে তোলে নাম আর রূপের খেলা। এই মায়াতেই স্বরূপ-সত্তার অটল সত্য দুলে ওঠে ক্রিয়া-সত্তার ঋতের ছন্দে। অর্থাৎ দার্শনিকের ভাষায় বলতে গেলে, যে পরমার্থ-সতের মাঝে বিবিক্ত-সঙ্কুচিত না হয়ে সমষ্টি আছে সমষ্টিরই রূপে, এই মায়াতে সে ফুটে ওঠে প্রাতিভাসিক সত্তা হয়ে : তার মাঝে সমষ্টি থাকে ব্যষ্টিতে এবং ব্যষ্টি থাকে সমষ্টিতে—সত্তার সঙ্গে সত্তার, চেতনার সঙ্গে চেতনার, শক্তির সঙ্গে শক্তির এবং আনন্দের সঙ্গে আনন্দের লীলার দোলায়। প্রথমত ব্যষ্টির মাঝে সমষ্টি এবং সমষ্টির মাঝে ব্যষ্টির এই লীলাকে আড়াল করে রাখে আমাদেরই মনের লীলা বা মায়ার বিভ্রম : ব্যষ্টি তখন ভাবে, সমষ্টিতে সে থাকলেও সমষ্টি তো নাই তার মাঝে ; আর সমষ্টিতেও আছে সে বিবিক্ত হয়ে—সবার সঙ্গে একাকার হয়ে তো নয়। মনোলীলার এই প্রমাদ হতে দীর্ঘ সাধনায় যখন জাগি অতি-মানসের লীলায় বা মায়ার সত্যে, তখন দেখি ব্যষ্টি আর সমষ্টি এক হয়ে জড়িয়ে আছে এক-সত্য আর বহু-প্রতিরূপের অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে। মনের এই-যে অবর মায়ার বঞ্চনা এখন ঘিরে আছে আমাদের, তাকে মেনেই আমরা তাকে ছাড়িয়ে যাব ; কেননা আঁধার সঙ্কোচ আর খণ্ডতা নিয়ে, বাসনা সংঘর্ষ ও দুঃখতাপের বিক্ষুব্ধ বেদনায়, এও তো সেই পরম-দেবতারই লীলা ; এ-লীলায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তিনি তাঁরি আত্মজা শক্তির কাছে, তাই তার অন্ধতার গুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করতে কুণ্ঠা নাই তাঁর। কিন্তু আর-একটি মায়া আছে এই মনের মায়ার আড়ালে—তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে আমাদের ; কেননা এ-মায়া যে পরম-দেবতার লোকোত্তর লীলা—সত্তার অন্তহীন বিলাসে, প্রজ্ঞার ভাস্বর দীপ্তিতে, অবষ্টব্ধ শক্তির বিপুল ঐশ্বর্যে, অফুরন্ত প্রেমের উচ্ছ্বসিত উল্লাসে। এ-লীলায় শক্তির কবল হতে মুক্ত হয়ে তাকে জড়িয়ে

ধরেন তিনি আত্মারামরূপে—তার জ্যোতিরুদ্ভাসিত সত্তায় সার্থক করেন তারি সেই আকৃতি, যার আবেগ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তাকে গোড়ার দিকে।

পর এবং অবর মায়ার মাঝে এই সূক্ষ্ম দ্বৈতলীলার সমর্থন আছে ব্যক্তির ভাবে এবং বিশ্বের তত্ত্বেও ; কিন্তু এদেশের দুঃখবাদী ও মায়াবাদী দার্শনিকেরা তা জানতে অথবা মানতে চান না। তাঁদের মতে মনোময়ী মায়াই (সম্ভবত তা অধিমানসেরই নামান্তর) করেছে জগৎ সৃষ্টি ; তাই তার সৃষ্ট জগৎ হবে একটা অনির্বচনীয় প্রহেলিকা—চিৎসত্তার একটা স্থাবর অথচ জঙ্গম স্বপ্ন-বিকার, যাকে প্রতিভাস বা পরমার্থ কোনও কোঠাতেই ফেলা যায় না নিশ্চয় করে। কিন্তু মনকে স্রষ্টার আসন দেওয়া সম্যক দৃষ্টির পরিচয় নয়। অন্তর্যামিণী সৃজন-প্রজ্ঞা আর সৃষ্টির জালে জড়িত প্রাকৃত-চেতনা, দুয়ের মাঝে মন একটা তটস্থা বৃত্তিমাত্র। সচ্চিদানন্দই অবর স্পন্দলীলায় নিজকে সংবৃত করেছেন মহাশক্তির আপনভোলা জড়-সমাধিতে—যেখানে নিজেরই খেলার মাঝে আত্মহারা সে ; আবার সেই আত্মবিস্মৃতির আঁধার হতে ফিরে চলেছেন তিনি স্বরূপের জ্যোতির্লোকে ; এই অবতরণ আর উত্তরণের লীলায় মন তাঁর অন্যতম করণমাত্র। সৃষ্টির অবরোহক্রমে মন একটা সাধন শুধু, সৃষ্টির নিগূঢ় প্রবর্তনা নয় সে ; তেমনি আরোহক্রমেও সে একটা সংক্রান্তি-দশামাত্র—আমাদের স্বরূপের গঙ্গোত্রী বা বিশ্বসত্তার পরম আশ্রয় নয়।

যে-দার্শনিকেরা মনকেই জগতের স্রষ্টা বলে কল্পনা করেন, অথবা তাকে মানেন বিশ্ব-রূপ ও বিশ্বাতীতের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থ বলে, তাঁদের মধ্যে দুটি পক্ষ ; কেউ তাঁরা নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদী, কেউ বা বিজ্ঞানবাদী। নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদীদের মতে জগৎ কেবল মন, ভাব বা বিজ্ঞানের খেলা : তবে সে-বিজ্ঞানও অবাস্তব খেয়ালের ঢেউ শুধু, কোনও তাত্ত্বিক সত্তার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই তার ; এমন-কি কোনও তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও তা নির্বিশেষ, অব্যবহার্য—প্রপঞ্চের সঙ্গে কোনও সাম্যই তার সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা অধিষ্ঠান-সত্য আর কল্পিত-প্রতিভাসের মাঝে একটা সম্বন্ধ আছে স্বীকার করেন ; তাঁদের মতে সে-সম্বন্ধ শুধু বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির সম্বন্ধই নয়। এখানে আমি যে-দৃষ্টির কথা বলছি, সে কিন্তু আরও এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানবাদেরই ধারা ধরে। এ-দৃষ্টিতে স্রষ্টা-বিজ্ঞান বস্তুত সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অর্থাৎ তা চিৎ-শক্তির সেই দিব্য সামর্থ্য যা তত্ত্বের দ্যোতক, তত্ত্ব হতে জাত

এবং তত্ত্ব-ধর্মী—যা শূন্য কি অতত্ত্বের বিজৃম্ভণ নয়, বা অবস্তুর জাল বুনে চলেনি অসতের মাঝে। এ এক চিন্ময় পরমার্থতত্ত্ব, যা নিজের অক্ষয় অক্ষোভ্য স্বরূপ-ধাতুকেই বিচ্ছুরিত করছে বিচিত্র বিপরিণামে। অতএব এ-জগৎ বিশ্বমনের একটা বিকল্প নয় শুধু; যা মনের অতীত, এ তারি আত্মরূপায়ণ। চিৎ-সত্তারই ঋতের প্রকাশ এই রূপায়ণে, তাই হল তার প্রতিষ্ঠা; এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার ঈশনাই ফুটেছে অতিমানসের 'ঋত-চিৎ'রূপে* যা লোকোত্তর ভূমিতে সদ্‌ভূত বিজ্ঞানরাজিকে বৃহৎসামের সুরসুষমায় গেঁথে নিচ্ছে—মন-প্রাণ-জড়ের ছাঁচে ঢালবার আগে।

চেতনার উত্তরায়ণের বেলায় দেখি, সদ্‌ভূত পরমার্থই আছে সকল সত্তার পিছনে অধিষ্ঠানরূপে—পরমপদে; মধ্যভূমিতে নিজকে সে ফুটিয়ে তুলছে বিজ্ঞানময় সম্ভূতির আকারে, যার মাঝে আছে তার স্বরূপ-সত্যের ছন্দ-সুষমা; সেই বিজ্ঞানই আবার অবরভূমিতে বিচ্ছুরিত করছে নিজকে চিৎ-সত্তার বিচিত্র ছন্দলীলায়—স্বরূপ-সত্তার প্রতিভাসরূপে। কিন্তু এই চিৎ-প্রতিভাসের মাঝে নিগূঢ় রয়েছে এক অদম্য আকর্ষণ তার স্বরূপ-সত্তার প্রতি; তাকে সে ফিরে পেতে চায় অখণ্ডরূপে,—কখনও প্রচণ্ড এক উল্লম্ফনে, কখনও-বা সহজ-ধারায়—বিজ্ঞানময় মধ্যভূমির সোপান বেয়ে। এই আকূতি আছে বলেই মানুষের মনে জীবনের রূপ ফুটেছে পূর্ণতাহীন ছায়ার মায়া হয়ে, মনোময় পুরুষের মাঝে উত্তাল হয়ে উঠেছে এক লোকোত্তর পূর্ণতাসিদ্ধির নিরূঢ় অভীপ্সা—যে শুধু প্রতিভাসের মূলে বিজ্ঞানময় সৌষম্যকে আবিষ্কার করেই তৃপ্ত নয়, তাকেও ছাড়িয়ে ছুটেছে যে আকুল হয়ে বিশ্বোত্তীর্ণের অকূল পানে। পরমার্থ—বিজ্ঞান—প্রতিভাস, এই ত্রয়ীর ছন্দ আমাদের চেতনার সকল বৃত্তি, সমগ্র প্রকৃতি ও পরম নিয়তিতে; তাই একথা কিছুতেই বলা চলে না যে নিখাদ নির্বিশেষের সঙ্গে নিছক সবিশেষের একান্ত বিরোধই বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব।

শুধু মনের তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায় না বিশ্ব-সত্তার সকল রহস্য। একটা কথা খুবই স্পষ্ট: চৈতন্য অনন্ত হয় যদি, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রকাশ হবে অসীম জ্ঞান-বৃত্তিতে—আমরা যাকে বলি 'সর্বজ্ঞতা'। কিন্তু মনকে তো বলা চলে না জ্ঞানের বৃত্তি বা সর্বজ্ঞতার সাধন। মন হচ্ছে 'জিজ্ঞাসার' বৃত্তি;

---

* 'ঋত-চিৎ' কথাটি নিয়েছি বেদ থেকে; তার অর্থ 'বৃহৎ' বা আত্মসংবিতের অব্যাহত বৈপুল্যের মাঝে স্বরূপ-সত্তার 'সত্য' এবং ক্রিয়া-সত্তার 'ঋতের' অকুণ্ঠ অনুভব।

সবিকল্প মননের বিশেষ কতগুলি ধারা ধরে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করতে পারে সে, তাকে প্রবৃত্তি-সামর্থ্যের অনুকূলে ব্যবহার করাই ধর্ম তার। আহৃত জ্ঞানের সবটুকু থাকে না তার দখলে ; স্মৃতির ভাণ্ডারে পুঁজি করে রাখে সে —সত্যকে নয়, সত্যের বিনিময়ে কতগুলি চলতি কড়ি ; দিনের বেসাতিতে সেই পুঁজিটুকু নিয়েই তার নাড়াচাড়া। বাস্তবিক, মন 'জানে' একথা বলা চলে না ; সে জানতে চায় মাত্র এবং কিছুই জানতে পারে না শুধু ছায়ার মায়া ছাড়া। বিশ্বের স্বরূপতত্ত্বকে নিজের ভূমিতে নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে ভাঙিয়ে নেওয়া, এই তার শক্তির সীমা। কিন্তু অন্তর্যামীরূপে যে-শক্তি বিশ্বকে জানে, মন সে-শক্তি নয় ; অতএব বিশ্বের প্রকাশ বা বিসৃষ্টির মূলে আছে মনেরও অতীত আর-কোনও শক্তির লীলা।

যদি বলি, ব্যক্তি-মনের সঙ্কীর্ণ উপাধি হতে নির্মুক্ত এক অনন্ত মনকে তো কল্পনা করা যায় বিশ্বের স্রষ্টারূপে ?···তাহলে মনের যে-সংজ্ঞা দিই আমরা, অনন্ত মনে কিন্তু আরোপ চলবে না তার। উপাধি-নির্মুক্ত মন হল উন্মনী-লোকের তত্ত্ব, তাকে বলা যায় অতিমানসের সত্য। প্রাকৃত-মনের ধর্মকেই অনন্তগুণিত করে অনন্ত-মনের কল্পনা করি যদি, তাহলে সে-মন সৃষ্টি করবে এক অন্তহীনা 'নির্ঋতি',—যার মাঝে শুধু যদৃচ্ছা অনিয়ম ও অন্ধ বিপরিণামের অকূল উত্তালতা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলবে এক অনুপাখ্য পরিণামের পানে ; এবং তারি মাঝে সে অনন্ত-মন হাতড়ে বেড়াবে শুধু একটা অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে। যে-মন অনন্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর, সে তো মন নয়,—সে হল অতিমানসী সংবিৎ।

প্রাকৃত-মন যেন আয়নার মত ; তার মাঝে ভাসে প্রাক্তন তত্ত্ব বা তথ্যের রূপ কি ছায়া ; তারা আসে বাইরে থেকে, অন্তত মনের চেয়েও বৃহৎ তারা। বাইরে আছে বা ছিল যে-প্রতিভাস, পলে-পলে তার মূর্তি গড়ে মন নিজের মাঝে ; তাছাড়া তার আছে বাস্তবেরও বাইরে সম্ভাবিতের কল্পরূপ গড়বার সামর্থ্য ; অর্থাৎ প্রতিভাসে আজও ফোটেনি যা কিন্তু ফুটতে পারে একদিন, তারও কল্পনা জাগে তার মাঝে। কিন্তু লক্ষণীয়, যা ঘটবে তা যদি অতীত ও বর্তমানের নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহলে তার ভবিষ্য-রূপকে কল্পনায় ঠিকমত ফোটাতে পারে না সে। তবে যা হয়েছে আর যা হতে পারে, এ-দুয়ের সমাহারে একটা অভিনব রূপায়ণের আভাস দেওয়া—এ-সামর্থ্যও মনের আছে। কিন্তু এমনি করে সম্ভাবিতের সিদ্ধ আর অসিদ্ধ রূপের জুড়ি মেলাতে গিয়ে

প্রচেষ্টা তার কম-বেশী সার্থক হয় কখনও, কখনও-বা হয় একেবারেই ব্যর্থ; এমনও দেখা যায়, কল্পনায় যা গড়েছিল সে, বাস্তবে তা ফুটল অন্যরূপে, তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে না গিয়ে চলল তা আর-এক দিকে।

অনন্তমনেরও এই ধর্ম হয় যদি, তাহলে তার সৃষ্টি হবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার সংঘাতে ক্ষুব্ধ একটা অনিয়ত জগৎ। সে-জগৎ কেবলই যাবে সরে-সরে, কেবলই ভেঙে-ভেঙে পড়বে—স্রোতের টানে চলার মাঝে কোথাও থাকবে না তার নিশ্চয়তার আভাস;—যেন সে সৎও নয় অসৎও নয়; কোনও নির্দিষ্ট নিয়তি বা ধ্রুব লক্ষ্য নাই তার, আছে শুধু ক্ষণিক-লক্ষ্যের অন্তহীন পরম্পরা যার পর্যবসান বিদ্যার ঈশনা- বা দেশনা-হীন নির্লক্ষ্যের কোন্ অকূল পাথারে। এও একধরনের নির্বিশেষ-অধিষ্ঠান-বাদ; এর স্বাভাবিক পরিণতি শূন্যবাদ মায়াবাদ কিংবা তারি সগোত্র কোনও দর্শনে। এ-দর্শনে বিশ্ব কোনও তত্ত্ববস্তু নয়, বিজাতীয় একটা-কিছুর আভাস বা প্রতিবিম্ব সে; আবার তাও আগাগোড়া একটা মিথ্যা আভাস, একটা বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র। বিশ্ব-ব্যাপারে ফুটছে শুধু মনের একটা ব্যাকুল প্রয়াস: নিজের কল্পনাকে রূপ দিতে চাইছে সে নিখুঁত করে কিন্তু পারছে না, কারণ তার কল্পনার মূলে নাই স্বরূপসত্যের অকুণ্ঠ প্রৈতি; তাই তারি অতীত-শক্তির মূঢ় প্রবাহ অসহায় বর্তমানকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে পরিণামহীন অব্যক্তের অকূল পারাবারে; এ নিরন্ত অভিযানে কূল পাবে সে—হয় আত্মঘাতে, নয়তো শাশ্বত নৈঃশব্দ্যের অতল গহনে।...এই তো শূন্যবাদ এবং মায়াবাদের স্বরূপ-কথা। যদি ধরে নিই, প্রাকৃত-মন অথবা তার সগোত্র কোনও তত্ত্বই বিশ্বের পরমা-শক্তি এবং বিশ্বকল্পনার আধার, তাহলে অবশ্য মায়াবাদ বা শূন্যবাদই হবে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের চরম পরিচয়।

কিন্তু অনাদি বিদ্যাশক্তিকে যখন জানি প্রাকৃত মনঃশক্তির চেয়েও একটা বড় শক্তি বলে, তখন দেখি বিশ্বতত্ত্বের এ-ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ অতএব অপ্রমাণ। দর্শনের একটা ধারারূপে সত্য হলেও এ সমগ্র সত্য নয় কখনও। প্রাকৃত-বুদ্ধির বিচারে বিশ্ব-প্রতিভাসের রীতি হয়তো এই, কিন্তু এ তো নয় তার স্বরূপ-সত্য বা চরম-তত্ত্বের নিরূঢ় বিধান। কারণ দেহ-প্রাণ-মনের বিশ্বজোড়া খেলার পিছনেও পাই এমন-কিছুর আভাস, যা বাঁধা পড়েনি শক্তি-প্রবাহের আলিঙ্গনে বরং শক্তিকেই যে জড়িয়ে আছে শাস্তা হয়ে। অস্তিত্বের চক্রতলে বাঁধা পড়ে' তার অর্থ খুঁজে মরা—এই তো নিয়তি

নয় তার ; তারি আপন ধাতুতে গড়া এ-জগৎ, অতএব সে খুঁটিয়ে জানে তার সকল তত্ত্ব। তাই নিজের ভিতর থেকে একটা-কিছুকে রূপ দেবার নিরন্ত প্রয়াসে অসহায়ভাবে ভেসে চলে না সে অতীত সংস্কারের দুর্নিবার বানের টানে ; স্বরূপের যে পূর্ণ ছবি ফুটে আছে তার চেতনায়, এইখানেই তার রূপায়ণ সিদ্ধ করে তোলে সে তিলে-তিলে !...বস্তুত জগৎ একটা সিদ্ধ-সত্যের প্রকাশ ; এক দিব্য ক্রতুর প্রশাসনদ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, এক অনাদি স্বরূপ-দৃষ্টির সত্যবীর্যকেই সে ফুটিয়ে তুলছে রূপের ছন্দে। তাই ভাবকের চোখে এ-জগৎ এক দেবশিল্পীর অন্তবিহীন রূপোল্লাসের তিলোত্তমা !

যতক্ষণ প্রতিভাসের জগতে বাঁধা আছি মনের খেয়ালে, ততক্ষণ এই সর্বাতীত সর্বাধার অথচ নিত্য-অনুস্যূত অপরূপকে আমরা জানি শুধু অনুমানে—কখনও-বা আভাসে পাই তার আবেশের অনুভব। প্রকৃতির মাঝে দেখছি প্রগতির কম্বুরেখা ; তা হতে অনুমান করছি, একটা অপ্রমেয় সিদ্ধ-সত্যই পলে-পলে উপচে উঠছে পূর্ণতার ছন্দে। কারণ সর্বত্রই দেখি, ঋতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপের সত্যে ; অভিনিবিষ্ট হয়ে যখন আবিষ্কার করি তার প্রবৃত্তির নিদান, তখন দেখি ঋত বা বিশ্ববিধান এক অন্তরঙ্গ প্রজ্ঞারই বিভূতি। সে-প্রজ্ঞা স্ফুরণোন্মুখ সত্তার মাঝে ছিল নিরূঢ় এবং সত্তার স্বপ্রকাশের বীর্যে ছিল তার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। এমনি করে প্রজ্ঞাই যদি ঋতের মাঝে আনে প্রগতির প্রবর্তনা, তাহলে দিব্যদৃষ্টির অমোঘ নির্দেশকে অনুসরণ করেই যে সে-ঋতের প্রগতি, সেবিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। আরও দেখি : আমাদের বুদ্ধি চায় না প্রাকৃত-মনের খেয়ালে অসহায়ভাবে ভেসে যেতে—সে চায় মনের প্রশাসন। কিন্তু বুদ্ধিও তো চরমতত্ত্ব নয়—সে-ও এক বৃহত্তর চেতনার ছায়া প্রতিভূ বা বার্তাবহ মাত্র। অথচ সে-চেতনায় নাই বুদ্ধির কোনও খেলা ; কেননা সে-চেতনা সর্বময়—অতএব সব জানে বলে নিজকেও জানে সে। এই হতেই অনুমানে বুঝি, আমাদের বুদ্ধির উৎস যা, তাই এ-জগতে লীলায়িত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে। অকুণ্ঠ প্রশাসনে এই প্রজ্ঞা নিজেই নিরূপিত করে তার ঋতের ছন্দ, কেননা সে জানে কী ছিল, কী আছে এবং কী হবে—তার সকল তত্ত্ব। আর এ-জানাও তার স্বভাব, কারণ এ তার শাশ্বত অনন্ত আত্মসংবিতেরই একটা ভঙ্গি। যে-সন্মাত্র অনন্তচৈতন্য-স্বরূপ, এবং যে-অনন্তচৈতন্য অকুণ্ঠ শক্তিস্বরূপ, সে যখন জগৎ সৃষ্টি করে অথাৎ নিজকেই প্রকট করে ছন্দ-সুষমায়, তখন তারি

চেতনার বিষয়কে আমাদের মনন দিয়ে জানি স্বয়ম্ভূ জগৎ-সত্তা-রূপে--যে-সত্তা তার স্বরূপের সত্যকে জেনেই তাকে ফুটিয়ে তোলে রূপের ফুলে।

কিন্তু যখন বুদ্ধিকেও শুদ্ধ করে তলিয়ে যাই নিজের মাঝে—নিজের সেই গহনগুহায় যেখানে নিথর হয়ে গেছে মনের দোলন, তখনই ঐ পরা-সংবিৎ ঝিলিক হানে এই চেতনায় ;--হয়তো মনের চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ আর সংস্কারের বাধায় সে ফুটতে পায় না পুরোপুরি। তবু একবার ঐ প্রকাশের ছোঁয়াচ পেলেই আমাদের সামনে খুলে যায় জ্যোতির দুয়ার একে-একে ; তখন বুঝতে পারি, বুদ্ধির চঞ্চল ক্ষীণ দীপালোকে ছিল এই বৃহৎ জ্যোতিরই চপল ছায়া। তখন দেখি, মনের ওপারে, তর্কবুদ্ধিরও এলাকা পেরিয়ে অতর্ক্য অপ্রমেয় আত্মজ্যোতির বিদ্যুতাসনে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা আছে সমাসীনা।

# ১৪

# অতিমানস—স্রষ্টারূপে

এসব দিব্যজ্ঞানেরই নিজরূপ।

—বিষ্ণুপুরাণ ( ২।১২।৩৯ )

অতএব মনেরও ওপারে আছে এক দিব্যক্রতুময় চিন্ময় তত্ত্ব—অনন্তলোক যার বিসৃষ্টি; ঐ স্বপ্রতিষ্ঠ অদ্বয়তত্ত্ব আর এই লীলাচঞ্চল বহুত্বের মাঝে আসন তার 'মধ্যমা বাক্' বা মধ্যস্থিতি রূপে। অমনীভাবের তত্ত্ব হলেও এ আমাদের অনাত্মীয় নয় একেবারে; আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোনও সত্তার অনধিগম্য ঐকান্তিক ধর্ম নয় এ; অথবা এ নয় এমন-কোনও অগমদশা, যেখান হতে প্রকৃতির দুর্বোধ ষড়যন্ত্রে এই ভব-সন্তানে আমরা পড়েছি জড়িয়ে—আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় বা সামর্থ্য আমাদের নাই। প্রাকৃত-চেতনার বহু ঊর্ধ্বে এ-তত্ত্বের আসন, কিন্তু তবু সে-তুঙ্গশিখর আমাদেরই স্বরূপের গঙ্গোত্রী এবং দুরারোহও তা নয়। শুধু অনুমানে বা আভাসেই তার সত্যকে জানি না, তাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার সামর্থ্যও আছে আমাদের। ক্রমিক আত্ম-প্রসারণে অথবা তুরীয় চেতনার অতর্কিত বিজলী-ঝলকে কখনও-কখনও আমরা উত্তীর্ণ হই ঐ লোকোত্তর ভূমিতে—তারপর হতে তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকে জীবনে; আবার কখনও-বা প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন আমাদের কেটে যায় ঐ অতিমানুষ অনুভবের জ্যোতির্লোকে। ফিরে যখন নেমে আসি, তখন ওপারের জ্যোতির দুয়ার হয়তো খোলাই থাকে, অথবা রুদ্ধ দুয়ার খোলবার সঙ্কেতটুকু আমরা বয়ে আনি মর্ত্যের উপকূলে। কিন্তু চিরদিনের আসন পাতা ঐ ভূমিতে, যেখানে আছে সৃষ্ট জীব আর স্রষ্টা শিবের চরম ও পরম ধাম,—সেই তো হবে মানুষের চিৎ-পরিণামের পরাকাষ্ঠা, যদি সে খোঁজে আত্মসম্পূর্তিরই পথ, আত্মবিলোপের নয়। কারণ, নিঃসংশয়ে বুঝেছি এবার, এই লোকোত্তর প্রতিষ্ঠাই হল সেই অনাদি পরম-বিজ্ঞান, বৃহৎসামের সেই পরম সৌষম্য, সত্যের সেই চরম প্রকাশ, যার ছন্দে বাঁধা আছে এ-জগতে আমাদের দল-মেলার সাধনা এবং যার সিদ্ধি মনুষ্যপ্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়তি।

তবু সন্দেহ জাগে, এ কি কস্মিন্ কালে সম্ভব যে ঐ ভূমির খবর মানুষের বুদ্ধির দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে কেউ, অথবা মানুষের বোধ- এবং সাধন-গম্য কোনও উপায়ে ঐ দেববীর্যকে জ্ঞানে ও কর্মে সঞ্চারিত করে সংসারটাকে টেনে তোলা যায় উপরপানে? অবশ্য সন্দেহেরও হেতু আছে: যতদূর জানা যায়, মানুষের মাঝে ঐ দিব্যভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে—এমন ব্যাপার শুধু-যে বিরল ও সংশয়িত তাই নয়; প্রাকৃত মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের যাচাই চললেও, তার সঙ্গে দিব্য ভাবের এতই ব্যবধান যে তাকে যাচাই করাও সম্ভব নয় কখনও। তাছাড়া মানবমানস আর দিব্য অতিমানসের স্বরূপে ও প্রবৃত্তিতে আপাতবিরোধ এতই দুরপনেয় যে, দুয়ের মাঝে কোনও যোগাযোগ কল্পনা করা বাস্তবিকই দুঃসাহসের কথা।

বস্তুত অতিমানসী চেতনার যদি কোনও যোগ না থাকত মনের সঙ্গে, কিংবা মনোময় পুরুষের সঙ্গে কোথাও তার সাযুজ্য না থাকত, তাহলে অসম্ভব হত মানুষের কাছে তার কোনও বিবৃতি দেওয়া। অথবা অতিমানস যদি প্রজ্ঞা-বীর্য না হয়ে প্রজ্ঞা-দৃষ্টি হত শুধু, তাহলে তার স্পর্শে আমাদের মাঝে ফুটত কেবল উদ্ভাস্বর চিত্তের দিব্য অনুভব, কিন্তু জাগত না বিশ্বকর্মে তাকে সার্থক করবার জ্যোতির্ময় সামর্থ্য। অথচ অতিমানসী চেতনাকে আমরা জানি বিশ্বপ্রসবিনী বলে; অতএব সে শুধু প্রজ্ঞার স্থিতি নয়, তার শক্তিও বটে; শুধু জ্যোতির্ময় উন্মেষের দিব্যক্রতুই যে আছে তার তা নয়, বীর্য ও কৃতির পানেও আছে সে-ক্রতুর প্রবণতা। আবার মন অতিমানসেরই বিসৃষ্টি যখন, তখন এই আদ্যা-শক্তির—পরা-সংবিতের এই 'ধর্মধুক্ মধস্মা-বাকেরই' ক্রমিক সঙ্কোচ হতে উৎপত্তি তার; অতএব আত্মপ্রসারণরূপী প্রতিলোম-প্রবৃত্তির দ্বারা আবার সে ফিরে যেতে পারে তার পরম ধামে। কারণ অতিমানসের সঙ্গে মনের আছে একটা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, অতএব অতি-মানসের স্বরূপ-যোগ্যতাও প্রচ্ছন্ন আছে তার মাঝে, যদিও ব্যবহারিক ভূমিতে সংস্কারাচ্ছন্ন মনের বৃত্তি হয়েছে অতিমানস হতে বিভিন্ন—এমন-কি বিপরীত। তাই বুদ্ধির ভূমিতে থেকে তারি পরিভাষায় অতিমানসের একটা ধারণা করে নেওয়া সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যের আলোচনাদ্বারা—এ-চেষ্টাও নিতান্ত অযৌক্তিক বা নিরর্থক হবে না। যে ভাব ও ভাষায় এ-বিবৃতি দিতে চাইব, তা পর্যাপ্ত হবে না নিশ্চয়ই; কিন্তু তবু তাদের জ্যোতির্ময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে দূরের পথ খানিকটা যে দীপ্ত হবে, তাতে সংশয় নাই। তাছাড়া নিজের গণ্ডি পেরিয়ে

মন কখনও উঠতেও পারে চেতনার এমন উত্তরভূমিতে, যেখানে অতিমানসের দীপ্তি বা শক্তির বিভূতি আছে ছন্ন হয়ে; সেইখানে চিৎ-প্রভাস বোধি অথবা অপরোক্ষ-অনুভব দ্বারা মন পেতেও পারে অতিমানসের আভাস। কিন্তু একথাও মানতে হবে, অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার দীপ্তি ও শক্তি নিয়ে কাজ করবার পরমা সিদ্ধি আজও রয়েছে মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এইখানে দাঁড়িয়ে, অতীতের কোনও আলোর ইশারা কি উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না ঐ অজানা রাজ্যের দুর্গম রহস্য? অন্তত একটা সংজ্ঞা, এষণার একটা আদিবিন্দু—এও কি খুঁজে পাব না আমরা?...চেতনার লোকোত্তর দিব্যবিভাকে আমরা নাম দিয়েছি অতি-মানস। কিন্তু নামটি দ্ব্যর্থক; কেননা মনে হতে পারে অতিমানস বুঝি প্রাকৃত মনেরই একটা উন্নত সংস্করণ—সাধারণভূমি ছাড়িয়ে মন সেখানে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে, কিন্তু আমূল রূপান্তর ঘটেনি তার। অথবা এমনও মনে হতে পারে, যা-কিছু মনের ওপারে, তা-ই অতিমানস; তখন অর্থের অতিব্যাপ্তিতে অপ্রমেয় তত্ত্বও এসে পড়বে তার এলাকায়। তাই অতিমানসের সংজ্ঞাকে নিখুঁত করে বোঝাবার জন্য গৌণ ও আনুষঙ্গিক হলেও তার একটা বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

এইখানে রহস্যময় বেদমন্ত্র হয় আমাদের সহায়; কারণ বেদের মন্ত্রে প্রচ্ছন্ন আছে অমৃত জ্যোতির্ময় অতিমানসেরই দীপনী—পশ্যন্তীর আলো ঝলক হানে তার মাঝে বৈখরীর আড়াল হতে। সে-বাণীতে পাই অতিমানসের এই পরিচয়: অতিমানসী চেতনা চিদাকাশের সেই লোকাতীত বৃহৎ প্রসার, যেখানে সত্যের জ্যোতিতে অবিনাভূত হয়ে জড়িয়ে আছে ঋতের বিভূতি; সত্যেরই দিব্যদর্শন রূপায়ণ ছন্দ বাণী ক্রিয়া ও পরিস্পন্দ জ্বলে ওঠে সেখানে অকুণ্ঠ প্রত্যয়ের অনির্বাণ দীপ্তিতে এবং তাই আবার ঝরে পড়ে স্পন্দ ক্রিয়া ও বিভূতির ঋতময় পরিণামে—দেবতার 'অদব্ধ ব্রতের' লীলায়নে। সম্ভূতি-সংবিতের বৃহৎ জ্যোতি এবং তারি মাঝে সত্তার সত্য ও সৌষম্যের বিপুল দীপ্তি—নির্ঋতি বা অব্যাকৃতের তমোঘন সুপ্তি নয়; সত্যের ঋতময় ক্রতুময় বিভূতিতে সত্তারই সৌষম্যের অভিব্যক্তি—অতিমানসের বৈদিক বিবৃতির এই মনে হয় তাৎপর্য। দেবতারা স্বরূপত এই অতিমানসেরই বীর্য, এই অদিতি হতেই তাঁরা জাত, এই 'স্বে দমে' বা স্বধামেই তাঁরা নিষণ্ণ; প্রজ্ঞায় তাঁরা 'ঋতচিন্ময়', কর্মে তাঁরা 'কবি-ক্রতু'। কৃতি এবং বিসৃষ্টিতে উৎসারিত তাঁদের চিৎ-শক্তি

বিধৃত আছে পূর্ণ-প্রজ্ঞার অপরোক্ষ প্রশাসনে—যা জানে কৃত্যের স্বরূপ, বীর্য এবং ধর্ম ; অতএব দেবতার অবন্ধ্য ক্রতু সার্থক হয় সে-প্রজ্ঞার শাসনে, অব্যাহত সিদ্ধির আয়োজনে কোথাও ছন্দোভঙ্গ হয় না তার, দিব্যদর্শনে যে-রূপ ফোটে তাকে কর্মে মূর্ত করে তোলে সে অমোঘ এবং অনায়াস রূপায়ণের লীলায়। এই অতিমানসের মাঝে জ্যোতি আর শক্তি, প্রজ্ঞার স্ফুরণ আর সঙ্কল্পের ছন্দ আছে অবিনাভূত হয়ে এবং ধ্রুবসিদ্ধির নৈশ্চিত্যে তারা মিলেছে এসে সুষম হয়ে—বিমূঢ় এষণা বা আয়াসের কোনও অপেক্ষা না রেখে। বস্তুত অতিমানসী দিব্য-প্রকৃতির শক্তিতে আছে দুটি ছন্দ : তার বিসৃষ্টির মাঝে আপনা হতে দেখা দেয় নিজকে ফুটিয়ে তোলবার এবং গুছিয়ে নেবার একটা সহজ নৈপুণ্য—যা উৎসারিত হয় তার স্বরূপের মর্মসত্য হতে ; আবার সেই বিসৃষ্টিতেই অন্তর্গূঢ় থাকে এক দিব্যজ্যোতিরই স্বরূপশক্তি, যা সঞ্চারিত করে তার মাঝে অনায়াস অথচ অকুণ্ঠিত আত্ম-ঋতায়নের প্রেরণা।

এরই অনুষঙ্গে আরও-কিছু খুঁটিয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় বেদের মাঝে, তাদেরও মূল্য কম নয়। ঋতচিন্ময় চেতনার দুটি মুখ্যবৃত্তির বর্ণনা করেছেন ঋষিরা ; তার একটি 'চক্ষঃ' আর একটি 'শ্রবঃ'। অতিমানসী চেতনায় নিরূঢ় প্রজ্ঞাশক্তির অপরোক্ষ-বৃত্তি তারা—যাদের নাম দেওয়া যায় দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রুতি ; মানুষের মনে প্রাতিভ-চেতনা আর অনুপ্রাণনায় পড়ে তাদেরই সুদূরবিসৃপ্ত ছায়া। তাছাড়া অতিমানসের আরও দুটি বৃত্তিকে দেখেছেন তাঁরা পৃথক করে : একটি সম্ভূতি-সংবিৎ বা সর্বগ্রাহী এবং সর্বগত চেতনা, যা প্রত্যক্-বৃত্ত তাদাত্ম্য-সংবিতেরই কাছাকাছি ; আর-একটি বিভূতি-সংবিৎ, যার বৃত্তি বিসৃষ্টির অভিমুখে এবং যা হতে পরাক্-দৃষ্টির সূচনা। বেদের ইশারা এই পর্যন্ত। প্রাচীন ঋষিদের আম্নায় হতে 'ঋত-চিৎ' শব্দটি আমরা নিতে পারি তাহলে অতিমানসের বিকল্পে, তার অতিব্যাপ্তি বারণ করবার জন্য।

ঋষিদের বিবৃতি হতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অতিমানস চেতনা পরাবর দুটি ভূমির মাঝে যেন উত্তরণ ও অবতরণের সেতুস্বরূপ একটা মধ্যভূমি। অতিমানসকে ধরেই অবরবিভূতির বিসৃষ্টি হয়েছে পরতত্ত্ব হতে, অতএব তাকে ধরেই আবার সম্ভব হবে পরের মাঝে অবরের উত্তরায়ণ। অতিমানসের ঊর্ধ্বে আছে বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অখণ্ড-অদ্বয় চেতনা, বিবিক্তভাবের এতটুকু আভাস নাই যার মধ্যে। আর তার নীচে আছে মনের বিভজ্য-বৃত্তি সখণ্ড চেতনা, বিবিক্তভাবই যার জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; একত্ব এবং আনন্ত্যের

একটা অস্পষ্ট গৌণ অনুভবমাত্র তার পুঁজি, কেননা খণ্ডকে জোড়া দিয়েও কখনও পায় না সে সত্যিকার অখণ্ডের অভঙ্গ অনুভব। দুয়ের মাঝে আছে অতিমানসের প্রপঞ্চোল্লাসময় সম্ভূতি-সংবিৎ—সর্বগ্রাহী সর্বাবগাহী বিজ্ঞানের বীর্যে একদিকে যেমন সে ব্রাহ্মী-স্থিতিরূপী তাদাত্ম্য-সংবিতেরই আত্মজা, আর-এক দিকে তেমনি বিসৃষ্ট্যভিমুখী বিভূতি-সংবিতের উল্লাসে মনোময় জগতের 'নানা' দর্শনের বা বিবিক্তবোধের জননী।

এমনি করে, উর্ধ্বে রয়েছে শাশ্বত অচল অব্যয় অদ্বয় তত্ত্ব; নিম্নে আছে বহুর বিসৃষ্টি—শাশ্বত যার বিপরিণাম, ক্ষণিকের মেলায় একটা অপরিণামী ধ্রুববিন্দুর ব্যর্থ এষণায় যে চঞ্চল। আর দুয়ের মাঝে আছে সকল ত্রিপুটীর আধার, সকল দ্বিদলের নিলয়, সৃজন-প্রলয়ের এক 'অক্ষমালা'—যার মাঝে একেরই বহুধা-ব্যঞ্জনা ফোটে বহুত্বের অদ্বৈত-সম্পুটে; কেননা একেরই মাঝে যে আহিত রয়েছে বহুর বীর্য—বিশ্বের এই তো পরমতত্ত্ব। ব্রাহ্মী-স্থিতি আর বিশ্ব-গতির মধ্যে এই তটস্থা ভূমিই সকল বিসৃষ্টি এবং ঋতায়নের আদি ও অন্ত—'আদিক্ষান্ত' মাতৃকার মালা, নিখিল ভেদবুদ্ধির আদিবিন্দু, আবার ঐক্যবুদ্ধিরও পরম সাধন,—ভূত এবং ভব্য সকল সৌষম্যের উৎস- কৃতি- ও সিদ্ধি-স্বরূপ। এই মহাবিদ্যার মাঝে আছে যে এক-বিজ্ঞান, তারি কুক্ষি হতে করে সে নিগূঢ় বহু-বিভূতির বিকর্ষণ; আবার বহুর নিরঙ্কুশ বিসৃষ্টিতেও আত্মহারা হয়ে হারায় না সে পরম-সাম্যের অদ্বৈতরাগিণী। মধ্যমা বাক্-রূপিণী এই 'গৌরী'ই কি জাগায় না আমাদের মাঝে অনিরুক্ত অদ্বৈতের চরম অনুভবেরও ওপারে এক নিরুপাখ্য-সতের আভাস, মন কোনও আখ্যা দিতে পারে না যার;—শুধু অখণ্ড-অদ্বয় বলে নয়, মনঃকল্পিত নির্বিশেষ বিশেষণেরও বিশেষ্য নয় বলেই যে-বস্তু দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত, একত্ব-বহুত্বের দ্বন্দ্বও নাই যার মাঝে? ঐ তো সেই পরমার্থ-সতের পরম-নির্বিশেষ প্রত্যয়, যাকে আশ্রয় করেই আমাদের চেতনায় ফোটে ঈশ্বরের অনুভব, ফোটে বিশ্বের বিজ্ঞান।

কিন্তু এসব কথার বিপুল ব্যঞ্জনাকে ধারণা করা বড় কঠিন; তাই আরও স্পষ্ট করেই বলছি। অদ্বৈততত্ত্বকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ; কিন্তু এই সংজ্ঞার মাঝে আছে তিনটি বিভাব, তাদের মিলিয়ে পাই একটা ত্রয়ী বা দিব্য-ত্রিপুটী। আমরা বলি—সৎ, চিৎ, আনন্দ; তারপর বলি এ তিনটিই এক। এ হল মনের ধরন। কিন্তু এমন বিশ্লেষণ তো চলবে না অদ্বৈত চেতনায়। সেখানে সত্তাই চৈতন্য, দুয়ে ভেদ নাই কোনও; তেমনি

চৈতন্যই আনন্দ, তাদের মাঝেও নাই ভেদ।···স্বগত-ভেদটুকুও নাই যেখানে, সেখানে জগৎও থাকতে পারে না। অতএব অখণ্ড সচ্চিদানন্দই যদি হয় পরমার্থ-সৎ, তাহলে জগৎ অসৎ,—সে ছিলও না কোনকালে, তার কল্পনাও সম্ভব হয়নি কখনও। কারণ যে-চৈতন্য স্বরূপত অখণ্ড, তার খণ্ডন-সামর্থ্যও নাই, কাজেই ভেদ ও খণ্ডতার সৃষ্টি সম্ভব নয় তাকে দিয়ে। একেই বলে 'অজাতি-বাদ',—কিন্তু একে অসম্ভব-বাদও বলা চলে; অভাবনীয় বিরুদ্ধ-ভাষণ অথবা পক্ষ-প্রতিপক্ষের অসমাধেয় বিরোধই সকল যুক্তির পরিণাম—একথা না মানলে এমন বাদে সায় দেওয়া চলে না নিশ্চয়ই।

আবার বিষয়ের খণ্ড-পরিণামকে সত্য বলে ধরে নিতে কোনও বেগই পেতে হয় না মনকে। সমষ্টির একটা পিণ্ডবোধ অথবা সান্তের অনন্ত প্রসা-রের কল্পনা—এ কিছুই অসম্ভব নয় তার কাছে; খণ্ডিত পদার্থের সমাহার এবং তার আধাররূপে সাদৃশ্যের বোধ, এ-ও তার আসে। কিন্তু চরম একত্ব অথবা পরম আনন্ত্য তার ধারণায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা বিকল্পবৃত্তিমাত্র; ও তো আঁকড়ে ধরার মত তত্ত্ববস্তুই নয় তার কাছে—ও-ই একমাত্র তত্ত্ব সে যে আরও দূরের কথা। অতএব মনের লীলাতে পাই অখণ্ড চেতনার সম্পূর্ণ বিপর্যয়। দেখি, অখণ্ড-অদ্বৈতের সত্যকে রুখে দাঁড়িয়ে সখণ্ড-বহুত্বের সত্য—অখণ্ডের মাঝে সখণ্ড কিছুতেই পৌঁছুতে পারে না নিজের প্রলয় না ঘটিয়ে; সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হয় তাকে, সত্যিকার কোনও অস্তিত্বই ছিল না তার কোনও কালে। অথচ অস্তিত্ব তার ছিল; নইলে অখণ্ডকে জানল কে, প্রলয় হল কার? ···আবার এসে পৌঁছলাম একটা অসম্ভব-বাদে; আবার দেখা দিল বিরুদ্ধ-ভাষণের একটা উৎকট জুলুম, যা মনের মাঝে বোধ জাগাতে চায় মনকে মূর্ছা-হত করে। পক্ষ-প্রতিপক্ষের অনপনেয় বিরোধ তাই অনপনীতই রয়ে গেল এতদূরে এসেও।

অবরভূমির এ-সমস্যা মেটে, যদি মানি মন আছে চেতনার উদ্যোগ-পর্বে শুধু। মন বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের সাধনমাত্র,—তত্ত্বদর্শনের নয়। যে-অবিজ্ঞেয়ের আভাস সে পায় নিজের মাঝে, তার অনিশ্চিত একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে সেই ছেঁড়াটাকেই পুরো বলা এবং সেই পুরোকে আবার টুকরো করে আলাদা-আলাদা চিন্তার খোপে ভরে নেওয়া—এই হল তার কাজ। অতএব মন কেবল বস্তুর অংশ আর উপাধিকেই দেখে স্পষ্ট করে এবং তাদের তত্ত্বই জানে শুধু। অবশ্য সে-জানার ধরনও নিজস্ব তার। অখণ্ড, কতগুলি

খণ্ডের সমবায় অথবা কতগুলি ধর্ম এবং উপাধির সমষ্টি—এই হল তার অখণ্ডের স্পষ্টতম ধারণা। অখণ্ডকে জানা—অপর কারও খণ্ড বলে নয়, অথবা তার নিজেরও খণ্ড উপাধি বা ধর্মের সমাহার বলে নয়,—মনের কাছে এ-অনুভব নিতান্তই আবছা। অখণ্ডকে ভেঙে আলাদা-বস্তুর কোঠায় সে ফেলে যখন একটা বৃহৎ-পিণ্ডের মাঝে ক্ষুদ্র-পিণ্ডের আকারে, মন তখনই বলে ওঠে খুশী হয়ে, 'এবার এর তত্ত্ব পেলাম।' অথচ কোনও তত্ত্বই পায়নি সে। যা পেয়েছে, সে তার নিজেরই বিশ্লেষণের খবর ; বস্তুর খণ্ডভাগ আর খণ্ডধর্মই দেখেছে সে—অখণ্ডের তত্ত্ব পেয়েছে তাদের জুড়েই। মনের দৌড় এই পর্যন্ত, এর পরের খবর অস্পষ্ট তার কাছে। এরও চেয়ে সত্য বৃহৎ ও গভীর জ্ঞান যদি চাই ( জ্ঞানই চাই,—মনের অব্যক্ত গহনে একটা তীব্র অথচ আকার-প্রকারহীন ভাবাবেশের সাময়িক আলোড়নে খুশী থাকতে না চাই যদি ), তাহলে পথ ছেড়ে দিতে হবে আর-একটা চেতনার জন্য—যা মনকে পেরিয়ে গিয়েই ভরে তুলবে তাকে, অথবা হঠাৎ ডিঙিয়ে গিয়ে নতুন করে গড়বে তাকে, আগাগোড়া সব পালটে দিয়ে। মনের সবার চাইতে উপরের থাক্ হল এই দিব্য বিপর্যয়ের ভিত্তি-ভূমি। তার পূর্ব পর্যন্ত মনের চরম সাধনা হল : জড়ের অন্ধ কারা হতে মুক্তি পেয়েছে যে-চেতনা তার আবছায়াকে স্পষ্ট করা তালিম দিয়ে, প্রবৃত্তির মূঢ় আবেগের 'পরে আলো ঢালা, বোধির চকিত আভাস এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে প্রদীপ্ত করে তোলা—যাতে উত্তরায়ণের জ্যোতিঃ-পথে সহজ হয় নবচেতনার অভিযান।...এমনি করে চলতি পথেরই মাঝখানে রয়েছে যে-মন, কোথায় পাবে সে যাত্রাশেষের খবর ?

আরও একটা কথা। অদ্বৈত চেতনা বা অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্ব তো এমন অসম্ভব একটা-কিছু নয়, যার সর্বশূন্য সর্বনাশা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে সব-কিছুই আবার তলিয়ে যায় ঐ অতল শূন্যতার মাঝে। বরং একটা অনাদি আত্মসংহরণের শাশ্বতী স্থিতি সে, যার মাঝে নিহিত আছে সব-কিছুই, কিন্তু দেশে ও কালে প্রকাশ নাই তাদের এখানকার মত। আত্মসংহরণের এই মহাবিন্দু সর্বতোভাবে অচিন্ত্য অপ্রমেয় পরমার্থসৎ-স্বরূপ,—শূন্যবাদীর মন যাকে কল্পনা করে আত্মভাব ও বিজ্ঞানের চরম প্রতিষেধরূপে ; আবার তুরীয়বাদী তাকেই কল্পনা করতে পারে সর্বাধাররূপে—তখন আমাদের সকল ভাব ও জ্ঞানের অব্যাকৃত পরম অয়ন সে। 'অগ্রে ছিলেন এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ'—বেদান্ত বলছে ; কিন্তু ঐ অগ্রবিন্দুর আগে ও পরে—এই মুহূর্তে—

## অতিমানস—স্রষ্টারূপে

শাশ্বতকাল ধরে—কালেরও ওপারে আছে সেই নিরুপাখ্য-সৎ, অদ্বৈত-স্বরূপও বলতে পারি না যাকে, অথচ বলি শুধু সে-ই আছে—আর-কিছুই নাই কোথাও। নির্বিকল্প চেতনায় প্রথমত জাগে তার সর্বাধার মহাবিন্দুঘন স্বরূপ, আমরা যাকে ধরতে চাই অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্বরূপে। দ্বিতীয়ত অনুভব করি তার বিচ্ছুরণের লীলা—যেন যা-কিছু সংহৃত ছিল সে-বিন্দুতে, পরিকীর্ণ চূর্ণালোকে ছড়িয়ে পড়ছে তা মনোগোচর বিশ্ব হয়ে। তৃতীয়ত দেখি, ঋত-চিৎ রূপে তার অবিচ্যুত আত্মপ্রসারণের পরম ঐশ্বর্য, যা বিশ্ববিচ্ছুরণের আধার ও আশ্রয়রূপে চূর্ণভাবকে পর্যবসিত হতে দেয় না বাস্তব খণ্ডতায়; অন্তহীন বৈচিত্র্যকেও সংহত রাখে সে একের বৃন্তে, ক্ষণভঙ্গের চটুলতম নৃত্যের তরে রচে অচল আসন, বিশ্বব্যাপী আপাত-সংঘাত ও সংঘর্ষের মাঝেও জিইয়ে রাখে ছন্দের সুষমা। এমনি করেই সে সহজ মহিমায় ফুটিয়ে তোলে বিশ্বের সহস্রদল কমল—মনের সৃষ্টি-প্রয়াস যে-ক্ষেত্রে নির্ঋতির অসার্থক আবর্তে পাক খেয়ে মরত শুধু। একেই বলি অতিমানস, ঋত-চিৎ বা সদ্ভূত-বিজ্ঞান, যা নিজের স্বরূপ ও বিভূতি সম্পর্কে নিত্য সচেতন।

বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর ব্রহ্মসত্তার বিপুল আত্মপ্রসারণই অতিমানস। সদ্-ভূত বিজ্ঞান দ্বারা পরম অদ্বয়তত্ত্ব হতে আবিষ্কার করে সে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহাত্রিপুটী। মহাভাবের মাঝে এমনি করে বিভাব ফোটায় সে—কিন্তু বিভেদ জাগায় না। তার ত্রয়ীর প্রতিষ্ঠা,—তিন হতে একের সমাহারে নয় মনের লীলায়; কিন্তু এক হতেই তিনকে ফুটিয়ে তোলে সে—কেননা বীজ হতে অর্থকে পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তোলাই স্বভাব তার। অথচ ফোটাতে গিয়েও তিনকে সে ধরে রাখে একেরই মাঝে—কেননা প্রকাশেরও চিন্ময় আধার সে-ই। তিনটি বিভাবের একটিকে প্রধান করে কোনও দিব্যভাবের সার্থক ব্যঞ্জনা সে ঘটায় যখন, তখন আর-দুটি ভাব সংবৃত বা বিবৃত হয়ে থাকে সেই মুখ্য-ভাবের মাঝে; অখণ্ডের মাঝে বিভাবনার সূত্রপাত হয় এমনি করে। আবার এই রীতিতেই বিশ্বের সকল তত্ত্ব সকল সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলে সে ঐ মহাত্রিপুটীর গর্ভ হতে। অতিমানসের যেমন আছে প্রচয় পরিণাম ও স্ফুরণের সামর্থ্য, তেমনি আছে সঙ্কোচ সংবরণ ও প্রচ্ছাদনেরও সামর্থ্য। বলতে গেলে সমস্ত সৃষ্টিই যেন দুটি সংবরণের মাঝে একটা ছন্দ-দোলা। তার একদিকে রয়েছে চৈতন্য—সব-কিছু সংবৃত যার মাঝে এবং যা হতে বিবৃতির একটি দোলা চলেছে নীচের দিকে জড়ের প্রত্যন্তে; আবার আর একদিকে

জড়েরও মাঝে সংবৃত হয়ে আছে সব-কিছু,—বিবৃতির আর-এক দোলায় উপর পানে চলেছে তারা চৈতন্যের প্রত্যন্তে।

বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আছে ঋত-চিতের যে বি-ভাবনা, তার সমগ্র রূপটি তাহলে এই : বিশ্বের রূপায়ণে নিয়ত প্রচ্ছুরিত হচ্ছে কতগুলি তত্ত্ব শক্তি ও রূপ—কিন্তু অতিমানসের সম্ভূতি-সংবিৎ তাদের মাঝেও দেখতে পায় অখণ্ড-সত্তার অন্তর্গূঢ় পরিশেষকে ; অথচ বিভূতি-সংবিৎ সেই পরিশেষকেই প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু তত্ত্ব শক্তি ও রূপের বিশিষ্ট প্রকাশকে করে পুরোধা। এই জন্যেই দেখি, ব্রহ্মাণ্ডে যেমন আছে পিণ্ড, পিণ্ডেও তেমনি রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যেক সত্ত্বের বীজসত্তা তাই তো বহন করে অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতনা ; অথচ চিৎ-পুরুষের জ্ঞানা-শক্তি বা ঋত-সঙ্কল্পের দ্বারা বিধৃত হয়ে তা অনুসরণ করে রূপায়ণ ও পরিণামের একটিমাত্র ছন্দ। এ-লীলায়ন পরমপুরুষের আত্ম-বিসৃষ্টি বলেই তার মাঝে আছে তাঁরি দিব্য বিজ্ঞান-ধাতুর সঙ্কল্প ও প্রশাসন। আত্মস্বরূপের স্ব-গত সত্যদর্শনের বীর্যই নিহিত রয়েছে বীজসত্তায়, তাই সে-দর্শনের বীজ স্বতই অঙ্কুরিত হয় স্ব-কৃৎ সত্যের স্বাতন্ত্র্য-লীলায়—পুষ্টি রূপায়ণ ও প্রবৃত্তির স্বভাবছন্দে—তাঁরি 'পূর্ব্য ব্রতের' অমোঘ অনুশাসনে। অতএব নিখিল বিসৃষ্টির মূলে আছে চিৎস্বরূপেরই কবিক্রতু; তাঁর আত্ম-সমাহিত বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যবীর্যকে এমনি করেই বিচ্ছুরিত করে চলেছেন তিনি শক্তি ও রূপের বিভূতিতে।

সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের এই পরিচয় হতে ধরা পড়ে, মনশ্চেতনা ও ঋত-চিতের স্বরূপে তফাৎ কোথায়। মননকে আমরা ভাবি সৃষ্টিছাড়া, আচ্ছিন্ন, অবাস্তব, বস্তুর'তত্ত্ব হতে বিবিক্ত একটা-কিছু ; কেউ জানে না, কোথা হতে মনন এসে বিষয় হতে তফাৎ থেকেই দখল করে পরীক্ষক, বোদ্ধা এবং বিচারকের আসন। সব-কিছুকে ভেঙে দেখা যে-মনের স্বভাব, অন্তত তার কাছে তো মননের এই পরিচয়। মনের প্রথম কাজ হল বিষয়কে আলাদা করা চারদিকে তার গণ্ডি টেনে ; বিবেকের চেয়ে বিদারণের দিকেই তার ঝোঁক। তাই বস্তুর সত্য আর বস্তুর মননের মাঝে গভীর এক বিদারণ-রেখা টেনে দুয়ের মাঝে ছিন্ন করে সে নাড়ীর যোগ। কিন্তু অতিমানসে সমস্ত সত্তাই চিৎস্বরূপ, সমস্ত চেতনা সত্তারই চেতনা ; তাই বিজ্ঞান বা ভাব সেখানে চেতনারই বিদ্যুৎ-গর্ভ স্পন্দন এবং সত্তার গর্ভেও সে ভ্রূণরূপে জাগিয়ে তোলে আত্মস্পন্দনেরই শিহরন। সৃষ্টিবিমুখ আত্মসংবিতের মাঝে ছিল যা প্রলীন হয়ে, সৃষ্টিকুশল

আত্ম-জ্ঞানের আকারে তার যে আদি-ব্যুত্থান, তাকেই বলি 'ভাব'। যা বস্তু-সৎ, এমনি করে তা-ই দেখা দেয় ভাব-সৎ হয়ে; ভাবের সেই বাস্তব সত্তাই তখন বিবর্তিত হয় আত্মচেতনার স্বয়ম্ভূবীর্যে। ভাবাধিরূঢ় সঙ্কল্পের প্রবেগে আপনাকে সে ফুটিয়ে চলে—নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে নিহিত যে চিন্ময় অনুভব, তারি অনির্বাণ দীপ্তিতে উন্মেষিত হয় তার আত্মরূপায়ণের কমলদল। সমস্ত সৃষ্টির, সকল পরিণামের মর্মসত্য এই।

সত্তা সংবিৎ এবং সঙ্কল্প মনোজগতে যেমন পৃথক পৃথক, অতিমানসে কিন্তু তেমন নয়। সেখানে তারা ত্রয়ীস্বরূপ—একই মহাস্পন্দের ত্রিস্রোতা পরিণাম। প্রত্যেকের আছে পরিণামের একটা বিশিষ্ট ধারা। সত্তা স্ফুরিত হয় সেখানে অধিষ্ঠান-ধাতুরূপে; সংবিৎ ফোটে বিদ্যাশক্তি হয়ে, রূপকৃৎ ভাবের স্বাতন্ত্র্যরূপে, সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ছন্দে; আর সংকল্প সঞ্চার করে আত্মসম্পূর্তির সংবেগ। কিন্তু ভাব বা বিজ্ঞান সেখানে বস্তু বা পরমার্থ-সতের স্বয়ংজ্যোতির ছটা; মনের চিন্তা বা কল্পনা বলা যায় না তাকে, কেননা তার মাঝে আছে স্বতঃসম্ভূত আত্মসংবিতেরই লীলা। তাই তাকে বলি সদ্ভূত-বিজ্ঞান বা ভাব-সৎ।

অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান ও সঙ্কল্প একেবারে অবিনাভূত, কোনও বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই নাই তাদের মাঝে; জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা বা স্বরূপ-ধাতুরও কোনও ভেদ নাই সেখানে, কেননা জ্ঞান সে-ভূমিতে সত্তারই অবিনাভূত স্বরূপ-জ্যোতি। দীপশিখার শক্তি যেমন আলাদা নয় অগ্নির স্বরূপ হতে, তেমনি বিজ্ঞানের শক্তিও সত্তার স্বরূপধাতু হতে আলাদা নয় কিছু, কেননা সদ্ভূত-তত্ত্ব নিজকে ফুটিয়ে তুলছে বিজ্ঞান ও তার পরিণামের ভিতর দিয়েই। আমাদের মাঝে জাগে ভাবের সঙ্গে তারি অনুরূপ একটা সঙ্কল্প, অথবা সঙ্কল্পের সংবেগ হতে বিমুক্ত একটা ভাব; কিন্তু কার্যত আমরা ভাবকে দেখি সঙ্কল্প হতে পৃথক করে এবং দুটিকেই আবার তফাৎ করি নিজের থেকে। আমি আছি; আমার সত্তায় ভাব একটা রহস্যময় আচ্ছিন্ন আবির্ভাব। তেমনি আমার সঙ্কল্পও একটা রহস্য—একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে না হলেও কতকটা তার কাছাকাছি; তবু আমার সঙ্কল্প আমি নয় কখনও; আমিই তাকে আঁকড়ে ধরি আর সে-ই আমাকে আঁকড়ে ধরুক, সঙ্কল্প আমার স্বরূপ নয় তবু। তাছাড়া সঙ্কল্প, তার সাধন আর তার পরিণাম—এ তিনটিও আমার কাছে পৃথক পৃথক; কেননা স্পষ্টই দেখছি, আমার বাইরে আমা হতে আলাদা একটা

বাস্তব সত্তা রয়েছে তাদের। অতএব আমি, আমার ভাব বা আমার সঙ্কল্প— এদের কারও মাঝে নাই স্বতঃস্ফুরণের প্রবেগ। ভাব খসে পড়তে পারে আমার থেকে, সঙ্কল্প হতে পারে ব্যর্থ, সাধনের ঘটতে পারে অভাব—এবং এ তিনের কারচুপিতে আমি স্বয়ং হতে পারি অসার্থক।

কিন্তু খণ্ডভাবের এমন কুণ্ঠা নাই অতিমানসের এলাকায়,—কেননা সত্তা জ্ঞান বা শক্তি কোনটার মাঝেই স্বগতভেদ নাই সেখানে, যেমন আছে মনের জগতে। স্বগতভেদ তো নাই-ই, সজাতীয় অথবা বিজাতীয় ভেদও নাই তাদের মাঝে। কারণ, অতিমানসই 'বৃহৎ'; তার প্রবৃত্তি একত্ব হতে, খণ্ডতা হতে নয়; সর্বগ্রাহিতাই মৌলিক ধর্ম তার, বিভাবনা তার গৌণ-বিলাস শুধু। অতএব সদ্‌ভূত-তত্ত্বের যে-সত্যই ফুটুক তার মাঝে, বিজ্ঞানে দেখা দেয় তার অবিকল প্রতিরূপ এবং সঙ্কল্প হয় সে-বিজ্ঞানের একান্ত অনুগামী (কেননা শক্তি চেতনারই অখণ্ড বীর্য); ফলে চিতি-শক্তির পরিণামও হয় সঙ্কল্পের অনুযায়ী। তাই অতিমানসের জগতে ভাবের সঙ্গে ভাবের, শক্তির সঙ্গে শক্তির অথবা সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের বিরোধ নাই কোনও—যেমন অহরহ দেখতে পাই মানুষের জগতে। অতিমানসে আছে এক বিরাট চেতনা, সকল ভাব যার দিব্যভাবনার অঙ্গীভূত অতএব যোগযুক্ত,—আছে এক বিরাট ক্রতু, যার অমেয় আত্ম-শক্তির সমুল্লাসে বিধৃত রয়েছে নিখিল শক্তির বিকিরণ। একটি বিভাবকে সংহৃত করে আর-একটি বিভাবকে এগিয়ে দেয় সে—নিজেরই বিজ্ঞানময় ক্রতুর দিব্যদর্শী ছন্দলীলায়।

বিশ্বের মূলে এই মহাভাবের অনুভূতি হতেই প্রচলিত সকল ধর্মে এসেছে সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠান ও সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা। অযৌক্তিক কল্পনা-বিলাস একে বলতে পারি না, কেননা কোনও সর্বাবগাহী দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে এর বিরোধ নাই যেমন, তেমনি আধ্যাত্মিক সমীক্ষা ও অনুভবেও পাই এরি ইশারা। জীবে-শিবে, ব্রহ্মে-জগতে অনপনেয় বিরোধ-কল্পনাই সকল প্রমা-দের মূল। সেই প্রমাদের বশে, সত্তা চেতনা ও শক্তির মাঝে অথক্রিয়ার দরুন বিভাবের যে-ভেদ, তাকেই আমরা ফাঁপিয়ে করি স্বরূপের ভেদ। কিন্তু এ-কথার আলোচনা পরে। আপাতত দেখতে পেলাম, পরাবরের মাঝখানে স্রষ্টারূপী অতিমানসকে মানবার প্রয়োজন কী; খানিকটা পরিচয়ও তার পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, এই দিব্য মহাভাবেরই মাঝে বিশ্বনিখিল সত্তায় সংবিতে সঙ্কল্পে ও আনন্দে হয়ে আছে অখণ্ড-সমাহিত; অথচ তার

মাঝে রয়েছে বিচিত্র বিভাবনারও অন্তহীন সামর্থ্য। সে-বিভাবনা একত্বকে নষ্ট করে না, তাকে ফুটিয়ে তোলে আরও স্পষ্ট করে। সত্য সে-মহাভাবের স্বরূপধাতু; সে-সত্যের প্রকাশ বিজ্ঞানরূপে, এবং বিশ্বরূপে তারি বিমর্শ। একই সত্যে তার মাঝে বিধৃত রয়েছে জ্ঞান আর সঙ্কল্প; আত্মসম্পূর্তির এক অখণ্ড সত্যে তাই উপচে পড়ছে স্বরূপের আনন্দ, কেননা আত্মসম্পূর্তিমাত্রেই আত্মসত্তার পরিতর্পণ। শাশ্বতকাল ধরে এমনি করে বিশ্বজোড়া ভাঙা-গড়ার লীলায় বেজে উঠছে এক স্বয়ম্ভূ নিত্যযুক্ত সৌষম্যেরই আনন্দ-ঝঙ্কার।

১৫

# ঋত-চিৎ

অতিচেতনার সুষুপ্তিতে অবস্থিত তিনি প্রজ্ঞানঘন হয়ে—আনন্দময়, আনন্দ-ভোক্তা...ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই উৎস সবার।

—মাণ্ডূক্য উপনিষদ (৫, ৬)

এই-যে সর্বমূল সর্বায়তন সর্বপ্রতিষ্ঠা অতিমানসের কথা বললাম তাকে জানতে হবে পরমপুরুষের স্ব-ভাব বলে; তাঁর নির্বিশেষ 'স্বয়ম্ভূ' স্বভাব নয় এ, এ তাঁর বিশ্বেশ্বর বিশ্বভাবন 'পরিভূ' স্বভাব। তাঁর এই স্বরূপকেই আমরা বলি ঈশ্বর। এমন ঈশ্বর অবশ্য পাশ্চাত্যের লোকায়ত 'গড্' নন, কেননা 'গড্' বিশেষ করেই 'পুরুষ-বিশেষ' 'এবং সোপাধিক—এমন-কি তাঁকে বলা চলে মানুষেরই অতিপ্রাকৃত রাজাধিরাজ সংস্করণ। সৃষ্টিপর অতিমানস আর জীবের অহন্তার মাঝে একটা বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করেই পাশ্চাত্য কল্পনায় গড়ে উঠেছে ঈশ্বরের এই নিতান্ত মানুষী কল্প-প্রতিমা। দিব্য-পুরুষ যে 'পুরুষবিধ', সে-কথাও ভুললে চলবে না আমাদের, কেননা নির্বিশেষ সন্মাত্র সত্তার অন্যতম বিভাব শুধু। দিব্য-পুরুষ যেমন সর্বময় 'সত্তা'মাত্র, তেমনি আবার অদ্বিতীয় 'সৎ'স্বরূপও তিনি; অদ্বিতীয় চিৎ-পুরুষ হয়েও তিনি পুরুষ বা পুরুষোত্তম।... যা হোক, তাঁর এ-বিভাব নিয়ে আলোচনা তোলা রইল আপাতত; আমরা এখন ডুবতে চাই দিব্যপুরুষের অপুরুষবিধ স্বরূপের মননে—এই সম্পর্কেই আমাদের ধারণাকে করতে চাই মার্জিত এবং উদার।

নিখিল বিশ্বে ঋত-চিৎ সর্বানুস্যূত হয়ে আছে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে, যা দিয়ে অখণ্ড-সৎ আপন অন্তহীন বহুত্বের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলেন বিচিত্র ছন্দলীলায়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নইলে তাঁর বিসৃষ্টি হত নিঋ্র্তির মেঘচ্ছায়া, কেননা তাঁর অমেয় ব্যঞ্জনা-শক্তিতে কে তখন আনত ছন্দমিতি? প্রত্যক্-দৃষ্টির সৌষম্য নাই বিশ্বে, নাই ঋতের প্রশাসন, বীজের পরিণামে পূর্বনিহিত

নাই বিজ্ঞানের অন্তর্যামী প্রৈতি—এই যদি হত বিসৃষ্টির ধারা, তাহলে এ-জগৎ হত অব্যাকৃত অনিশ্চিতির একটা প্রমত্ত ফেনোচ্ছ্বাস। কিন্তু যে-প্রজ্ঞা বিশ্বের প্রসূতি, বিসৃষ্টিতে আছে তার আত্মবীর্যেরই রূপায়ণ—অনাত্মবস্তুর সংঘটন নয়। তার স্বরূপসত্তায় নিহিত আছে প্রত্যেকটি অভিব্যঞ্জনার মর্মচর ঋত ও সত্যের অপরোক্ষ অনুভব; তার নিরূঢ় সংবিৎ জানে, বিচিত্র অভিব্যঞ্জনার বিক্ষিপ্ত দল কী নিগূঢ় যোগের ছন্দে মিলবে এসে কোন্ সৌষম্যের বৃন্তে। যে বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভূ-কল্পনায় একটা বিশ্বের আবির্ভাব, বিশ্বের জন্মলগ্নেই তার হৃৎস্পন্দনে জাগে বৃহৎ-সামের ঋতসুষমা—বিশ্বমূলা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার 'পূর্বচিতি' হতে যা সঞ্চারিত হয় বিশ্বের অণুতে-অণুতে; অতএব বিশ্বের পরিণামে সে-সুষমা তার অন্তর্নিহিত প্রৈতির বেগেই হয় রূপায়িত। এই প্রজ্ঞাই জগতের 'ধর্মধুক্', 'গোপা ঋতস্য'—নিখিল ধর্মের উৎসরূপিণী ও ধাত্রী; যদৃচ্ছার অনিয়ম নাই সে-ধর্মে, কেননা প্রত্যেক বস্তুর স্ব-ভাবের স্ফুরণ সে এবং সে স্ব-ভাবও বস্তুর বীজভাবে নিহিত সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানেরই অপ্রতিহত সত্য-বীর্য। অতএব বিসৃষ্টির পূর্বক্ষণে তার সমগ্র পরিণামের ছন্দটি বিধৃত থাকে বিসৃষ্টিরই নিগূঢ় আত্মসংবিতে, এবং পরিণামের মাঝে মুহূর্তে-মুহূর্তে তারি স্বতঃপ্রবৃত্তির লীলায় সে হয় উৎসারিত। তাই সৃষ্টি-পরিণামের প্রতিমুহূর্তে ঘটে তার অন্তর্গূঢ় অনাদি স্বরূপ-সত্যের সুনিয়ত স্ফুরণ; সেই সত্যের প্রবেগই অমোঘবীর্যে নিয়ন্ত্রিত করে তার ভবিষ্য চরণক্ষেপ; এমনি করে পরিণামে পুষ্পিত ও ফলিত হয় তার বীজসত্তার অন্তর্নিহিত আকৃতি।

স্বরূপসত্যের ছন্দে এমনি করে বিশ্বের যে পুষ্টি ও প্রগতি, তার মূলে আছে কালের কলনা, দেশের ব্যবস্থা এবং নিমিত্তের পরম্পরা। দেশে ব্যবস্থিত বস্তু-সমূহের সুনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে কালের পৌর্বাপর্য যুক্ত হয়ে দেখা দেয় 'নিমিত্ত'। দার্শনিকেরা বলেন, দেশ ও কাল আমাদের মনের কল্পনা, তাত্ত্বিক সত্য নয়। কিন্তু বিশ্বের সব-কিছুই যখন আত্মসংবিতের আধারে চিৎ-সত্তার আত্মরূপায়ণ, তখন দেশ-কালের ঐ বৈশিষ্ট্যটুকুর বিশেষ সার্থকতা নাই কিছুই। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেশ ও কাল চিৎ-স্বরূপের আত্মব্যাপ্তির স্বানুভব—তাঁর পরাক্ ব্যাপ্তিই দেশ আর প্রত্যক্ ব্যাপ্তিই কাল। আমাদের মন এ-দুটি পদার্থকে দেখে পরিমাণের ভিতর দিয়ে। মন বিভজনধর্মী, খণ্ড-প্রবৃত্তিতেই তার স্বাচ্ছন্দ্য; তাই অপরিমিতকে পরিমিত করা মনের পক্ষে স্বাভাবিক। নিরবচ্ছিন্ন গতির প্রবাহকে ক্ষণভঙ্গে অবচ্ছিন্ন করে', তারি

একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে সামনে-পিছনে মেলে দিয়ে মন পায় কালের কল্পনা ; তাতেই সত্তার অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা তার চেতনায় পরিমিত হয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঢেউয়ের খেলায়। আবার অবিভক্ত স্থিতির ব্যাপ্তিকে বিভাগের কল্পনায় পরিমিত করে তারি একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মন দেখতে পায় দেশ ; নিজের সেই অবস্থানবিন্দুর চারদিকেই বস্তু-ব্যবস্থাকে সে সাজিয়ে তোলে সম্বন্ধের জটিল জালে।

ব্যবহারিক জগতে, মনের কাছে কালের পরিমিতি হয় ঘটনায়, আর' দেশের পরিমিতি জড়বস্তুতে। কিন্তু চিত্তের 'অসঙ্কীর্ণ' অবস্থায়, ঘটনার প্রবাহ এবং বস্তুর সংস্থানকে উপেক্ষা করেই অনুভব করা চলে চিৎশক্তির সেই বিশুদ্ধ স্পন্দন,—দেশ ও কালের যা স্বরূপ-ধাতু। তখন দেখি, দেশ আর কাল বিশ্ব-ব্যাপিনী চৈতন্য-শক্তির দুটি বিভাব মাত্র ; তাদের ওতপ্রোত সম্বন্ধের টানা-প'ড়েনেই বোনা হয়েছে তার 'কর্মকর্তৃত্বের' পটভূমিকা। আবার উন্মনী দশায় দেখি, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যবসিত এক অখণ্ডসত্তায় ; ত্রিকাল সেখানে চেতনাব আধেয়—আধার নয় ; কোনও ক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাকে উন্মুখ হতে হয় না প্রসপণের জন্য। এ-অনুভবে কাল শুধু নিত্য বর্তমান। কোনও দেশ-বিন্দুতেও নাই সে-চেতনার অধিষ্ঠান, কেননা সকল বিন্দু ও স্থানের আধার সে-ই ; তাই দেশও তার কাছে অখণ্ড প্রত্যক্-ব্যাপ্তি মাত্র। আকাশ চিদাকাশ, কাল মহাকাল সে-চেতনায়। এক অখণ্ড-দৃষ্টির অপ্রচ্যুত-সংবিন্ময় একাত্মপ্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের স্পন্দলীলা—এ অনুভবও আমাদের জাগে কখনও।···কিন্তু দেশ ও কালের তুরীয় সত্যের স্বরূপ কী, এ প্রশ্ন নিরর্থক, কেননা সে-স্বরূপের ধারণা প্রাকৃত-মনের সাধ্যাতীত ; এমন-কি অখণ্ড-অদ্বয়তত্ত্ব যে ইন্দ্রিয়-মনের সাহায্য ছাড়াও জানতে পারে বিশ্বকে, এটুকু মানতেও রাজি নয় প্রাকৃত-মন।

কালের পরম্পরা ও দেশের খণ্ডতাকে পরম ঐক্যে সংহত করে জড়িয়ে আছে কী করে অতিমানস তার অখণ্ডদৃষ্টির সর্বগ্রাহী প্রত্যয়ে, আভাসে তার অনুভব পাই। এই অনুভবকে পূর্ণায়ত করে তোলাই আমাদের পুরুষার্থ। কাল-কলনা ও দেশ-ব্যবস্থা, বিসৃষ্টির পক্ষে দুইই প্রয়োজন। কালের পরম্পরা বলে কিছু না থাকত যদি, তাহলে পরিবর্ত বা প্রগতিও সম্ভব হত না। পরি-পূর্ণ সৌষম্যের নিত্য প্রকাশই তখন হত বিশ্বের নিত্যলীলা—এক শাশ্বত ক্ষণের বৃন্তে সংহত হত সৌষম্যের সকল দল, অতীত হতে ভবিষ্যের তরঙ্গ-

দোলা থাকত না তার মাঝে। কিন্তু বিশ্বে দেখছি আমরা উপচীয়মান সৌষম্যের নিত্য-পরম্পরা—অতীতের তপস্যা হতে তাকেই আত্মসাৎ করে বর্তমানের অভ্যুদয়। তেমনি বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে না থাকত যদি খণ্ডিত দেশের ভাবনা, তাহলে রূপে-রূপে বিচিত্র সম্বন্ধের এই নশ্বর লীলা, শক্তির সঙ্গে শক্তির এই অন্যোন্যসংঘাত—এও তো দেখা দিত না। বিশ্বের তখন সত্তা থাকলেও থাকত না 'স্ফুরত্তা' : এক দেশহীন বিশুদ্ধ প্রত্যক্-চেতনা অন্তরাবৃত্ত প্রত্যয়ের অনড় মুষ্টিবন্ধনে গুটিয়ে রাখত বিশ্বের সকল সম্ভূতি—হিরণ্যগর্ভের কবি-মানসে জগৎ-স্বপ্নের মত, কিন্তু আত্মবিসৃষ্টির পরাক্-ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে দিত না নিজকে সবার মাঝে রূপোল্লাসের অনন্ত ব্যঞ্জনায়। আবার কালই শুধু সত্য হত যদি, তার পরম্পরায় তাহলে ছন্দিত হত শুধু সত্তারই বিশুদ্ধ স্ফূর্তি—যার মাঝে তপশ্চিতের একটি পর্বের পর আর-একটি পর্ব দেখা দিত প্রত্যক্-চেতনার স্বচ্ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের লীলায়—সুরের মূর্ছনা অথবা কবিকল্পনার বলাকার মত। কিন্তু বিশ্বলীলায় ফুটেছে সর্বাধার দেশের পরিব্যাপ্তিতে রূপ ও শক্তির বিচিত্র যোগাযোগ এবং তাদের নিয়ে চলেছে কালের ছন্দে মালা গাঁথা। দেখছি, বিশ্ব জুড়ে শক্তির অবিরাম লীলা, রূপায়ণের অন্তহীন পরম্পরা, ঘটনার অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

অভিব্যঞ্জনার বহুমুখী সমাবেশ দেশ ও কালের বুকে বিচিত্র সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিয়ে ব্যূহিত আছে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে। তাই কালের পরম্পরা আমাদের মনে দেখা দেয় সংঘাতে ও সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ বস্তু-বিপরিণামের আকারে—অনায়াস পারম্পর্যের সাবলীল ছন্দে নয়। কিন্তু বাস্তবিক বস্তু-বিপরিণামের অন্তরে আছে স্বত-উৎসারণেরই সহজতা, বাইরের সংঘাত ও সংঘর্ষ তার একটা বহিশ্চর গৌণবিভাব মাত্র। সব-কিছুর অন্তরে রয়েছে অখণ্ড স্ব-ভাবের ঋতায়ন,—সৌষম্যের সুরে বাঁধা ; সেই ঋতের প্রশাসনে বাইরের অংশতঃ-বিপরিণামে দেখা দেয় সংঘর্ষের প্রতিভাস। অতিমানসী দৃষ্টি ঐ সৌষম্যের বৃহৎ ও গভীর সত্যকেই দেখতে পায় সবার মাঝে। কিন্তু মনের আছে বিবিক্ত বস্তু-দৃষ্টি, তাই বৈষম্যই তার চোখে পড়ে সবার আগে ; অথচ অতি-মানস এক নিত্য-উপচীয়মান সৌষম্যের অঙ্গীভূত দেখে বৈষম্যকে, কেননা তার দৃষ্টিতে বিশ্বনিখিল বহুধা-রূপায়িত একেরই বিভঙ্গ শুধু। তাছাড়া মনের কাছে আছে একটিমাত্র খণ্ডদেশ ও খণ্ডকাল ; তারি মাঝে দেখে সে অগণিত সম্ভাবনার তুমুল একটা বিপর্যাস—সার্থকতার বিচিত্র তারতম্যের

আভাসে সঙ্কুল। কিন্তু অতিমানসী দৃষ্টিতে ভাসে দেশ ও কালের সমগ্র প্রসার; অতএব নির্ভুলভাবে সে দেখতে পায় মনঃকল্পিত সম্ভাবনা ছাড়া আরও বহু সূক্ষ্ম সম্ভাবনা। তার দর্শনে নাই অনিশ্চয়তা বা বিশৃঙ্খলার এতটুকু ছোঁয়াচ; কারণ, দেশ-কাল-নিমিত্তের যথাযথ পরিবেশে স্বভাবের কোন্ শক্তি বা কী নিয়তি কাজ করছে প্রত্যেক অভিব্যঞ্জনার মূলে, কী ধারায় কোন্ পরিণামের পানে নিয়ে চলেছে তাকে, অতিমানসের দিব্যদৃষ্টিতে কিছুই তার নাই গোপন। অবিচল সমগ্র দৃষ্টিতে বস্তু-দর্শন মনের ধর্ম নয়; কিন্তু লোকোত্তর অতিমানসের তা-ই স্ব-ভাব।

আত্মরূপায়ণের সকল বিভূতি শুধু-যে ফুটে আছে অতিমানসের চিন্ময়ী দৃষ্টিতে, তা নয়; সবার মাঝে ব্যাপ্ত-অনুস্যূত হয়েও আছে সে অন্তর্যামী স্বয়ং-জ্যোতির দীপ্তি নিয়ে। সত্তা তার গুহাহিত হয়েও ভূতে-ভূতে শক্তির বিভূতিতে-বিভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট বিশ্ব জুড়ে। অতিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত অকুণ্ঠ প্রশাসনেই নিরূপিত হচ্ছে বিশ্বের ব্যাকৃতি শক্তি ও প্রবৃত্তি; নিয়মের শাসন সে-ই আনছে তার প্রবর্তিত বৈচিত্র্যের লীলায়; সিসৃক্ষার তেজকে সংহত, বিচ্ছুরিত, বিপরিণামিত করছে সে-ই। আর নিখিলব্যাপী এই বিচিত্র কৃতির মূলে আছে তারি স্বয়ম্ভূ প্রজ্ঞার প্রৈতি, যা রূপবিসৃষ্টির আদিম-ক্ষণে, শক্তি-প্রচলনের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নিরূপিত করেছে বিশ্বদেবের প্রথম ধর্ম*—'ধর্মাণি যা প্রথমান্যাসন্'। এই অতিমানসই গীতার ভাষায় 'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া'; উপনিষদ একেই বলছেন—'তদ্ অন্তরস্য সর্বস্য, তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'; এই 'পরিভূঃ কবিঃ'-ই 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

বিশ্বের সর্বভূতে—জড়ে-অজড়ে, চেতনে-অচেতনে—অন্তগূঢ় হয়ে আছে এক পরমা প্রজ্ঞা ও শক্তি, বস্তুর সত্তা ও প্রবৃত্তিকে বিধৃত রেখেছে যা আপন প্রশাসনে। তার সম্পর্কে সচেতন নই আমরা, তাই কখনও তাকে ভাবি অবচেতন, কখনও-বা অচেতন; কিন্তু বাস্তবিক চেতনা তার 'গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্ট' হয়ে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। তাই বুদ্ধিযুক্ত না হলেও জগতের সকল বস্তুতেই আছে বুদ্ধির আপাত-লীলা। উদ্ভিদ্ বা পশুর মধ্যে সে-বুদ্ধি স্তিমিত, মানুষে

* বৈদিক। বিশ্ব জুড়ে দেবতার লীলা চলছে 'প্রথম ধর্মের' শাসন মেনে; এই ধর্ম বা ব্রত 'পূর্ব্য' অতএব 'পরম', তাই তা বস্তুর স্ব-ভাবের ধর্ম।

অর্ধস্ফুট ; কিন্তু সকল বুদ্ধিই গুহাশায়ী দিব্য অতিমানসের সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের দীপ্তি। ঘটে-ঘটে এই-যে অন্তর্যামী বুদ্ধির প্রশাসন, এ তো মনোময়ী নয় এ সন্মাত্রেরই স্বয়ং-প্রজ্ঞ স্বরূপ-সত্য, যার মাঝে আত্মসংবিৎ আছে আত্মসত্তারই অবিনাভূত হয়ে। এই তো ঋত-চিৎ। মনের বিকল্পনার 'পরে নয় তার সিসৃক্ষার নির্ভর ; প্রজ্ঞানুসারিণী তার বিসৃষ্টি—যার মূলে আছে অনির্বাণ আত্ম-দর্শন ও স্বতঃসিদ্ধ অখণ্ডসত্তার অকুণ্ঠ বীর্যের প্রৈতি। মনন ছাড়া মনোময়ী বুদ্ধির চলে না, কেননা চিৎ-শক্তির একটা আভাসমাত্র সে ; তাই তার নাই ধ্রুব জ্ঞান, আছে কেবল জিজ্ঞাসা। এক লোকোত্তর প্রজ্ঞার লীলাকে অনুসরণ করে সে কালবৃত্তির পরম্পরায়—এইটুকু তার সাধ্য। কিন্তু সে-প্রজ্ঞা শাশ্বত, অখণ্ড, অব্যয় ; কাল তার করামলকের মত, তাই তার দৃষ্টির একটি ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

এই তবে অতিমানসী দিব্য-চেতনার আদিপ্রবর্তনা : এ এক বিশ্বম্ভর সত্যদর্শন,—যা সর্বায়তন, সর্বাধিবাস ও সর্বগত। দেশকালাতীত অবিচল স্বাত্মবোধরূপ প্রত্যক্‌-চেতনায় বিশ্ব সমাহিত রয়েছে তার মাঝে ; তাই দেশে ও কালে বিশ্বের এই পরাক্‌-রূপায়ণ প্রতি পর্বে প্রবর্তিত হচ্ছে অতিমানসের সম্ভূতি-সংবিতেরই ছন্দ-লীলায়।

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন নয় অতিমানস চেতনায়, সেখানে মূলত তারা এক। প্রাকৃত মন এ-তিনটিকে দেখে আলাদা করে, নইলে অচল হয়ে পড়ে তার কারবার। ত্রিপুটীর লয় যেখানে, সেখানে নাই মনের কোনও সাধন, নাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোনও ছন্দ—তাই মন সেখানে নিস্পন্দ, নিষ্ক্রিয়। সুতরাং মনের চোখে নিজকে দেখতে গিয়েও আমায় জাগিয়ে রাখতে হয় ত্রিপুটীর এই ভেদ। সে-দেখায় প্রথমত আমি আছি—জ্ঞাতা হয়ে ; দ্বিতীয়ত, যা দেখছি আমার মাঝে, তাকে জানছি জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় বলে—সে আমিও বটে, আবার নয়ও বটে ; তৃতীয়ত আমার জানার মাঝে আছে জ্ঞানের বৃত্তি, যা দিয়ে জ্ঞাতার সঙ্গে জুড়ছি জ্ঞেয়কে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, মননের এই ধারা নিতান্তই কৃত্রিম ; শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই কল্পনা তার, অতএব সত্যের মর্মপরিচয় মেলেনা তাকে দিয়ে। বস্তুত, যে-আমি জানছি, সে তো জানছি চৈতন্যরূপেই ; আমার জ্ঞানও সেই চৈতন্য অর্থাৎ আমিই —বৃত্তিরূপে ; আবার জ্ঞেয় যা, তা-ও তো আমিই, কেননা একই চৈতন্যের একটা স্পন্দ বা বিপরিণাম সে। অতএব তিনটি মিলিয়ে পাচ্ছি একই সত্তা

একই স্পন্দ—অবিভক্তেরই বিভক্তবৎ একটা প্রতিভাস ; রূপে-রূপে ব্যবস্থিতবৎ প্রতিভাত হয়েও বস্তুত সে অ-ব্যবস্থিত, অখণ্ডিত। এই অখণ্ড-জ্ঞানের একটা আঁচ শুধু পায় মন যুক্তি দিয়ে, কিন্তু তার ভিত্তিতে ব্যবহারিক জীবনকে গড়তে পারে না সে।...কিন্তু এ তো গেল মনের কথা। অহং-চেতনার বাইরে যা-কিছু দেখছি, তার বেলাতে আরও উৎকট হয়ে দেখা দেয় ত্রিপুটীর ভেদ। অভেদের একটা আঁচ পাওয়াও সেখানে মনের উপর বিষম জুলুম ; আর সেই ভাবকে ধরে রেখে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা—সে তো মনের পক্ষে বিজাতীয় একটা ব্যাপার, যা একেবারেই তার সাধ্যাতীত। এ-ভাবকে মন মানতে পারে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেই, যা দিয়ে তার খণ্ডবোধের স্বাভাবিক বৃত্তির শোধন-মার্জন চলবে শুধু ;—যেমন বুদ্ধি দিয়ে জানি, পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে এবং সে-জ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের শোধন-কার্যেও লাগাই কখনও। কিন্তু তা বলে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—এই ইন্দ্রিয়বোধের উপর যে-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত, 'সাংবৃতক' সত্য হলেও তাকে উচ্ছেদ করবার কল্পনাও কি করতে পারি ?

কিন্তু এই অভেদভাব অতিমানসের সিদ্ধবীর্য, তার সকল প্রবর্তনার পরম অয়ন ; মনের কাছে তা কৃচিৎ-লব্ধ সাধন-সম্পদ, তার দৃষ্টির স্বরূপসত্য নয়। বিশ্বের সমষ্টি আর ব্যষ্টিকে অতিমানস দেখে আত্মস্বরূপে—এক অখণ্ড-বিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে ; সে অখণ্ড-বৃত্তিই তার প্রাণ, বলতে গেলে তার স্বরূপ-সত্তার জীবনস্পন্দ। অতএব এই সর্বাবগাহী দৈবী-সংবিতের যে সত্য-সংকল্প, বিশ্ব-জীবনের নিয়তির শাস্তা অথবা নিয়ন্তা সে—শুধু এই বললেই যথেষ্ট হয় না ; বলতে হয়, বিশ্বের পরিপূর্ণতাকে নিজেরই মাঝে সিদ্ধ করে তোলে সে—প্রজ্ঞাবৃত্তির অবিনাভূত অকুণ্ঠ বীর্যের সংবেগে, যা তার আত্মসত্তারই স্পন্দমাত্র অর্থাৎ যার মাঝে সত্তা জ্ঞান ও শক্তির বৃত্তি অখণ্ড, অবিকল্পিত। কারণ পূর্বেই বলেছি, বিশ্বচিৎ আর বিশ্ব-শক্তি স্বরূপত এক—বিশ্বচেতনার বৃত্তিই স্ফুরিত হচ্ছে বিশ্বশক্তিরূপে। তেমনি দৈবী প্রজ্ঞা ও দিব্য সঙ্কল্পও এক, কেননা এক অখণ্ড-সত্তারই স্বরূপ-স্পন্দ তারা।

অতিমানস অখণ্ড সর্বাধার, একত্ব হতে অপ্রচ্যুত হয়েই বহুত্বের আয়তন সে—এই সত্যের অনুভব স্পষ্ট হওয়া চাই আমাদের মাঝে ; নইলে বিভজ্যদর্শী মনের প্রমাদ হতে বুদ্ধিকে নির্মুক্ত করে বিশ্বের একটা সত্যধারণা সম্ভব হবে না কোনমতেই। বীজ হতে বেরিয়ে আসে গাছ, বীজেরই মাঝে যে ছিল

নিহিত ; আবার গাছ হতে বেরিয়ে আসে বীজ। যে-বিসৃষ্টির চিরন্তন রীতিকে বলছি গাছ, তার মাঝে আছে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও অপরিবর্তনীয় ধারার প্রবর্তনা। কিন্তু গাছের জন্ম জীবন ও বংশবিস্তারকে মন দেখে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপাররূপে এবং সেই দৃষ্টি দিয়েই তার বিজ্ঞান রচনা করে সে। গাছকে সে ব্যাখ্যা করে বীজ দিয়ে, বীজকে গাছ দিয়ে ;—বলে, এই হল প্রকৃতির একটা নিয়ম। কিন্তু এ দিয়ে তত্ত্বের ব্যাখ্যা কিছুই হল না ; আমরা এতে পেলাম শুধু প্রাকৃতিক একটা রীতির বিশ্লেষণ ও বিবৃতি, কিন্তু রহস্য তার রহস্যই রয়ে গেল আমাদের কাছে। মন যদি চিৎশক্তির একটা নিগূঢ় সংবেগকে মেনেও নেয় ব্যাকৃতির মূলাধার ও মর্মসত্যরূপে, এবং রূপায়ণের সমগ্র ধারাকে বলে সেই শক্তিরই একটা বহিরঙ্গ প্রকাশ অথবা তারি নিয়তি-কৃত-নিয়মের লীলা,—তাহলেও ব্যাকৃতি তার কাছে একটা বিবিক্ত সত্তামাত্র, তার স্বধর্ম এবং গতি-প্রকৃতি দুইই মনের অনাত্মীয়। এই বিবিক্ত-বুদ্ধি আছে পশুর মাঝে এবং মানুষের মনশ্চেতনায়। সেখানে মন নিজেকেও ভাবে একটা বিবিক্ত পদার্থ বলে ; সচেতন বিষয়ীরূপে স্বতন্ত্র সে, তার বাইরে আর যা-কিছু সবই বিষয়রূপে বিবিক্ত তার থেকে। প্রাকৃত জীবনে এ-ভাগাভাগি প্রয়োজন, কেননা লোকব্যবহারের এই হল বনিয়াদ। কিন্তু একেই যখন একমাত্র সত্য বলে জানে মন, তখনই শুরু হয় অহন্তার যত প্রমাদ।

অতিমানসের ধারা অন্যরকম। গাছ এবং গাছের জীবন বিবিক্ত সত্তা হলে আপন স্বরূপে ফুটতেই পারত না তারা—এমন-কি তাদের সত্তাই হত অসম্ভব। বিশ্বসত্তার অন্তর্গূঢ় সংবেগ হতে বিশ্বের এই ব্যাকৃতি ; সত্তা এবং তার অন্যান্য বিভূতির সঙ্গে অন্যোন্যসম্বদ্ধ হয়ে তার এই রূপায়ণ। বস্তুর স্বধর্মে যে-বৈচিত্র্য, তা মহাপ্রকৃতির সর্বগত স্বভাব ও স্বরূপের লীলা ; সমষ্টি-পরিণামের ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যষ্টির বিশিষ্ট পরিণাম। বীজ দিয়ে গাছের তত্ত্ব অথবা গাছ দিয়ে বীজের তত্ত্ব বোঝা যায় না ; কেননা দুয়েরই তত্ত্ব নিহিত আছে বিশ্বভাবনায়, আর বিশ্বের তত্ত্ব আছে ঈশ্বরে। অতিমানস দ্বারা যুগপৎ ভাসিত হয়ে আছে বীজ, গাছ বা বিশ্বের যা-কিছু এবং ঐঅখণ্ড-অদ্বয় পরম-বিজ্ঞানই তার প্রাণ,—যদিও তার মাঝে আছে বিপরিণামের ছন্দদোলা। এই সর্বগ্রাহী অখণ্ডবিজ্ঞানে সত্তার স্বতন্ত্র কোনও কেন্দ্র নাই আমাদের বিবিক্ত অহন্তার মত ; কেননা আত্মসংবিতের মাঝে সমগ্র সত্তাই ভাসছে

সেখানে সমব্যাপ্ত সম্প্রসারণরূপে—তাই একত্বেও সে অদ্বয়, বহুত্বেও অদ্বয়, সর্বত্র সকল দশাতেই অদ্বয়। এর মাঝে সর্বভাব আর অদ্বয়ভাবে ফোটে এক অখণ্ড সদ্‌ভাবেরই পরম সামরস্য; ব্যক্তির সত্তাও যুগপৎ সর্বাত্মভূত ও ব্রহ্মভূত, অতএব পরম তাদাত্ম্যে একরস সেখানে, কেননা এই তাদাত্ম্যবোধই অতিমানস জ্ঞানের মর্মসত্য, অতিমানস আত্মপ্রত্যয়ের একটা নিত্য বিভাব।

সমরস একত্বের সে বিপুল প্রসারে সৎ-স্বরূপের নাই খণ্ডভাব বা বিকিরণ, আত্মপ্রসারণের সমব্যাপ্তিতে বিভুত্বকে তার ছেয়ে আছে সে অদ্বয়রূপে, তার বহুধা-ব্যাকৃতিকেও বাসিত করেছে অদ্বয়রূপে; তাই সর্বত্রই সে অখণ্ড-অদ্বয় 'সমং ব্রহ্ম'। দেশে ও কালে সৎ-স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রসারণ, ভূতে-ভূতে এই-যে তার নিরূঢ় অধিবাস, এও তো তার নির্বিশেষ অদ্বয়স্বভাবেরই অন্তরঙ্গ লীলায়ন, তার নিরুপাধিক অখণ্ডস্বরূপেরই বিভাবনা,—যার মাঝে কেন্দ্রও নাই, পরিধিও নাই, আছে শুধু দেশহীন কালহীন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অবি-সৃষ্ট ব্রহ্মের এই-যে অতিসমাহিত একঘন প্রত্যয়, স্বভাবের বশেই তা বিসৃষ্ট হবে সমব্যাপ্ত বিজ্ঞানঘন প্রত্যয়ে—এই অখণ্ড সর্বগ্রাসী সর্বগ্রাহী সংবিতে, এই বিশ্বম্ভর অবিভক্ত অবিকীর্ণ অধিবাসে, এই লোকোত্তর অদ্বৈত-বিলাসে, বহুত্বের লীলাতেও যা অন্যূন, অপ্রচ্যুত। 'ব্রহ্ম সর্বভূতে', 'সর্বভূত ব্রহ্মে' এবং 'সর্বভূতই ব্রহ্ম'—এই হল সর্ববিৎ অতিমানসের ত্রিবিদ্যা গায়ত্রী। আত্মবিভাবনার এক পরম-প্রত্যয়ই ফুটেছে এই মহাত্রিপুটীতে; আত্মদৃষ্টির অসঙ্কীর্ণ অনুভবে এই অবিবিক্ত পরমা বিদ্যাই হয় অতিমানসের বিশ্বলীলার মূলমন্ত্র।

কোথা হতে তাহলে এল মন, এল মন-প্রাণ-জড়ের ত্রয়ীতে অবর চেতনার এই লীলা—বিশ্বরূপে যাকে দেখছি আমরা? বিশ্বের সব-কিছুই যখন সর্ব-কৃৎ সর্ব-সম্ভব অতিমানসের কৃতি, তারি সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপের অনাদিলীলা, তখন ঋত-চিতের সিসৃক্ষায় স্ফুরিত হবে এমন-কোনও বৃত্তি, যা ঐ সৎ-চিৎ-আনন্দকেই ভেঙে অবরলোকে সৃষ্টি করবে মন প্রাণ ও জড়ের ধাতু। চিন্ময়ী সিসৃক্ষার একটা গৌণ বিভাবনায় পাই এই বৃত্তির পরিচয়: সে-বিভাবনা অতিমানসের পরাক্ গতিতে, তার প্রসর্পণের সামর্থ্যে, তার 'প্রজ্ঞানের' লীলায় —যার বেলায় সংবিৎ নিজের মাঝেই গুটিয়ে এসে উপদ্রষ্টারূপে সরে দাঁড়ায় তার সৃষ্টি হতে। আগে বলেছি সংবিতের সমব্যাপ্ত, সমাধানের কথা; কিন্তু

তার গুটিয়ে-আসা বলতে বুঝব একটা বিষমব্যাপ্ত সমাধান, যার মাঝে আত্ম-বিভাজনের প্রথম উন্মেষ—অথবা তার আপাত-প্রতিভাসের প্রথম কল্পনা।

এই প্রজ্ঞানের লীলায় প্রথম দেখি, বিজ্ঞানের মাঝে বিজ্ঞাতা নিজেকে সংহৃত করে রেখেছেন তাঁরি আত্মরূপায়ণের ছন্দলীলায়; অবিরাম সেই রূপায়ণে ব্যাপৃত থেকে চিৎশক্তি একবার গুটিয়ে আসছে তাঁর মাঝে, আবার বেরিয়ে যাচেছ তাঁর থেকেই। আত্মবিপরিণামের এই একটি ধারা হতেই এল ভেদের বিভঙ্গ যত, এবং তারাই গড়ল বিশ্বের ব্যবহারিক দৃষ্টি ও কর্মের বনিয়াদ। বিসৃষ্টির প্রয়োজনে এইখানে ফুটল বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞানের এক দিব্য ত্রিপুটী: দেখা দিল শক্তি, শক্তির সন্ততি ও বিভূতি—ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য—ব্রহ্ম, মায়া, সম্ভূতি—অবিকল্পিত অখণ্ডের এই ত্রিধা বিকল্পনা।

তারপর, বিজ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরুষ আত্মনিঃসৃত শক্তি বা প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ও ভর্তা হয়ে রূপে-রূপে ফুটিয়ে তুললেন নিজেরই প্রতিরূপ। চিৎ-শক্তির সহচরিত হয়ে তিনি নেমে এলেন যেন তার বিভূতিতে এবং প্রজ্ঞানের উদ্ভব যে-আত্মবিভাজন হতে, তারি পুনরাবৃত্তি করে চললেন শক্তির বিচিত্র প্রপঞ্চে। এমনি করে প্রত্যেক রূপে স্বীয়া প্রকৃতিকে অবষ্টব্ধ করে পুরুষ আছেন অধিষ্ঠিত এবং চেতনার সেই কল্পিত বিন্দু হতে আবার রূপে-রূপে দেখছেন নিজেরই প্রতিরূপ। একই আত্মা, একই দিব্য-পুরুষের অধিষ্ঠান সবার মাঝে: বহু বিন্দুতে তাঁর বিকিরণ সংবিতের একটা ব্যবহারিক প্রবৃত্তি শুধু, যার ফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দেবে ভেদের লীলা—অন্যোন্য-জ্ঞান, অন্যোন্য-সঙ্গম, অন্যোন্য-সংঘাত ও অন্যোন্য-সম্ভোগের খেলা। তার মাঝে স্বরূপগত অভেদের 'পরেই ভেদের প্রতিষ্ঠা, আবার অভেদেরও উল্লাস বিচিত্র ভেদের রূপায়ণে।

সর্বগত অতিমানসের এই অভিনব স্থিতির মাঝে দেখি প্রচ্যুতির একটা আভাস,—বস্তুর অদ্বয় স্ব-ভাবের সত্য হতে, অখণ্ড-চেতনার সমগ্রতা হতে একটা অবস্খলন যেন। অথচ এই অব্যভিচরিত অদ্বয়ভাবের 'পরেই রয়েছে বিশ্বসত্তার একমাত্র নির্ভর। মনে হয় আর-একটু নেমে এলেই এ-প্রচ্যুতি দাঁড়াবে অবিদ্যাতে, বহুত্বকে তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েই যার যাত্রা শুরু সত্যিকার একের পানে;—তারি জন্যে তো চলার পথে একত্বের আভাস রচে সে অহন্তার প্রতিভাসে। বেশ বোঝা যায়, ব্যক্তিত্বের বিন্দুকে জ্ঞাতার অধিষ্ঠান-কেন্দ্র বলে মানি যদি, তাহলেই দেখা দেবে মনোময়-চেতনার যত বিচিত্র পরিণাম—

ইন্দ্রিয়-সংবেদনরূপে, বুদ্ধির বিলাসে, সঙ্কল্পের আকারে। কিন্তু পুরুষের লীলা যতক্ষণ অতিমানস ভূমিতে, ততক্ষণ অবিদ্যার উদ্ভব হয়নি একথাও সত্য। তাই ঋত-চিতেরই মাঝে জ্ঞান ও কর্মের খেলা চলবে তখন—অদ্বয়-ভাবকে অনিরাকৃত করেই।

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে জানছেন সর্বগত অদ্বয়রূপে, সব-কিছুকে দেখছেন অভিন্ননিমিত্তোপাদানের আকারে নিজেরই পরিণামরূপে। ঈশ্বর তখনও শক্তির লীলাকে জানেন স্বরূপের লীলা বলে, সর্বভূতকে অনুভব করেন অন্তরে-বাইরে নিজেরই আত্মরূপায়ণ বলে। ভোক্তার মাঝে তখনও চলছে আত্মসত্তারই সম্ভোগ—বহুভাবনার উচ্ছলনে। কেবল একটি জায়গায় এসেছে সত্যিকার একটা পরিবর্ত্তন : চেতনার ঘনীভাবে দেখা দিয়েছে একটা বিষমতা, শক্তির বিকিরণে একটা বৈচিত্র্য। চৈতন্যের স্বরূপে বা আত্মদৃষ্টিতে সত্যিকার কোনও ভেদ বা খণ্ডতা দেখা দেয়নি, শুধু তার ব্যবহারে ফুটেছে বিশিষ্ট একটা ভঙ্গিমা। ঋত-চিৎ দাঁড়িয়েছে এসে এমন একটা স্থিতিতে, মনোময়-চেতনার ভূমিকা হলেও ঠিক আমাদের মন সে নয়। এবার এই সান্ধ্যলোকের তত্ত্ব বুঝতে পারলেই খুঁজে পাব মনের সেই আদিবিন্দু, যেখান থেকে ছিটকে পড়েছে সে খণ্ডতা ও অবিদ্যার অবরভূমিতে—ঋত-চিতের তুঙ্গ-বিশাল ঔদার্য হতে স্খলিত হয়ে। সুখের বিষয়, এই প্রজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝা বিশেষ কঠিন নয় আমাদের পক্ষে। কেননা প্রাকৃত-মনের প্রতিবেশী বলে তার একটা পূর্বাভাস দেখতে পাই প্রজ্ঞানের চলনে। কিন্তু অতিমানসের অনুভব ছিল কোন্ সুদূরে। বুদ্ধির অস্পষ্ট পরিভাষা দিয়ে তার অসম্পূর্ণ একটা পরিচয় দেবার চেষ্টাই করে এসেছি এতক্ষণ। কিন্তু পরিচয়ের বাধা আর দুর্লঙ্ঘ্য হবে না এবার হতে।

১৬

# অতিমানসের ত্রিপুটী

আমার আত্মা—যা ভূতভৃৎ এবং ভূতভাবন…আমিই সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা।

—গীতা ( ৯।৫, ১০।২০ )

তিনটি জ্যোতিঃশক্তি ধরে আছে জ্যোতির্ময় তিনটি দিব্যলোক।

—ঋগ্বেদ ( ৫।২৯।১ )

প্রাকৃত-মনের গণ্ডি ভেঙে অতিমানসের দিব্যলীলার শরিক যখন হন মুক্ত জীব, তখন এই পার্থিব ভূমির সকল তত্ত্ব সহজ হয়েই ধরা পড়ে তাঁর প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে। কিন্তু প্রজ্ঞানের স্বরূপ বোঝবার আগে ঈশ্বর-তত্ত্বের জ্ঞাত অথবা জ্ঞানগম্য রহস্যের একটা বিবৃতি দিয়ে নিই সংক্ষেপে, বুঝে নিই কেমন করে আত্মসত্তার চিদ্‌ঘন অনাদি একত্ব হতে আত্মমায়ায় বহুরূপে ফুটলেন তিনি জগৎ হয়ে।

আমাদের প্রথম সূত্র ছিল: যা-কিছু আছে, তা এক অখণ্ড সন্মাত্র—যাঁর স্বরূপ হল অখণ্ড চৈতন্য; আর চৈতন্যের স্ব-ধর্ম হল শক্তি বা ক্রতু। সে-সন্মাত্র আনন্দরূপ, সে-চৈতন্য আনন্দরূপ, সে-শক্তি বা ক্রতুও আনন্দরূপ। অখণ্ড সত্তা চৈতন্য এবং শক্তি বা ক্রতুর অব্যভিচরিত শাশ্বত আনন্দ শান্তিতে শয়ান রয়েছে নিজেরই মাঝে কুণ্ডলিত হয়ে, অথবা সিসৃক্ষায় হচ্ছে পরিস্পন্দিত—এই হল ব্রহ্মের স্বরূপ; আমাদের প্রতিভাগ-নির্মুক্ত পরমার্থ-সত্তায় আমরাও ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম যখন স্বসমাহিত এবং নিস্পন্দ, তখন তাঁর মাঝে—অথবা তিনিই—শাশ্বত অব্যভিচরিত স্বরূপানন্দ। আবার সিসৃক্ষায় স্পন্দিত যখন, তখন তাঁর মাঝে—অথবা তাঁরি আত্মরূপায়ণে—উথলে ওঠে সত্তা চৈতন্য শক্তি ও ক্রতুর লীলাচঞ্চল আনন্দ। তাঁর সেই সম্ভূতির লীলাই বিশ্ব—আর সে-আনন্দই বিশ্বের হেতু প্রৈতি এবং লক্ষ্য। ব্রাহ্মী-চেতনায় এ লীলা ও আনন্দ শাশ্বত, নিত্যযুক্ত; আমাদের যে স্বরূপ-সত্তা ঢাকা পড়েছে মনোময় অহন্তার বিরূপতায়, তারও মাঝে আছে এই লীলা ও আনন্দের শাশ্বত

অব্যভিচরিত উল্লাস, কেননা আমাদের আত্মা ব্রহ্মের অবিনাভূত,—স্বরূপত আমরা ব্রহ্মই। অতএব দিব্যজীবনের অভীপ্সা জাগে যদি আমাদের মাঝে, তবে তার চরিতার্থতা ঘটতে পারে শুধু ঐ আবৃত স্বরূপের গুণ্ঠনমোচনে, মানস অহন্তা বা বিমূঢ় আত্মভাবের এই বর্তমান দীনতা হতে স্বরূপ-সত্তা বা আত্মমহিমার পথে উত্তরায়ণে, ব্রাহ্মী-চেতনায় পরম-তাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভবে। আমাদের মাঝেই আছে এমন-এক অতিচেতন সত্তা, যা বিভোর হয়ে থাকে এই তাদাত্ম্যের আস্বাদনে—নইলে আমাদের সত্তাই হত না সম্ভব; অথচ প্রাকৃত মনশ্চেতনা যেন গ্রহের ফেরে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে সে-আনন্দের অধিকার হতে।

যখন বলি, সত্তার এক মেরুতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এবং আর-এক মেরুতে সখণ্ড মানসের খেলা, তখন একটা অনপনেয় বিরোধ দেখা দেয় দুয়ের মাঝে। মনে হয়, দুটি কোটির একটিকে সত্য মানলে আর-একটিকে বলতেই হবে মিথ্যা, একটিকে সম্ভোগ করতে গিয়ে আর-একটিকে করতেই হবে অবলুপ্ত। অথচ এ-জগতের আমরা মনোময় জীব—আমাদের দেহ ও প্রাণের আধারে মনেরই রূপায়ণ। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনাকে যদি মুছে ফেলতে হয় অখণ্ড সচ্চিদা-নন্দকে পেতে গিয়ে, তাহলে এই পৃথিবীতেই দিব্যজীবন যাপনের কল্পনা হয় একটা মরীচিকা। তুরীয়-ভূমির আনন্দ পেতে বা তার মাঝে ফিরে যেতে তখন বিশ্বকে অলীক ভেবে ছেড়ে যেতেই হবে আমাদের।…অখণ্ড ব্রহ্ম আর সখণ্ড মনকে দুটি বিরোধী তত্ত্ব ভাবলে আর-কোনও পথ খুঁজে পাই না—সর্বনাশের এই পথটি ছাড়া। কিন্তু মধ্যবর্তী আর-একটা বস্তু এসে অখণ্ড আর সখণ্ডকে মিলিয়ে দেয় যদি দুয়ের মাঝে অন্যোন্যযোগের সূত্রটি আবিষ্কার করে', তাহলে এই দেহ-প্রাণ-মনের আধারেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সম্ভোগকে আর বলতে পারি না আকাশ-কুসুম।

মিলনের সেতু একটা আছেই। তাকেই বলছি ঋত-চিৎ বা অতিমানস। মনেরও ঊর্ধ্বে তার স্থান; তার সত্তা প্রবৃত্তি ও রীতির আশ্রয় হল বস্তুর অখণ্ড স্বরূপসত্য,—প্রতিভাসের আপাত-খণ্ডতা নিয়ে কারবার নয় তার প্রাকৃতমনের মত। যে-সূত্র ধরে আমাদের এষণার শুরু, তাতে অতিমানস তত্ত্বের স্বীকৃতি অতর্কিত নয় মোটেই। কারণ সচ্চিদানন্দ যে দেশ-কালের অতীত নির্বিশেষ তত্ত্ব, সে-কথা মানতেই হবে। কিন্তু জগৎ তো তা নয়: সে ব্যাপ্ত হয়ে আছে দেশে এবং কালে,—তাদেরি মাঝে নিমিত্তের শাসনে স্পন্দিত হচ্ছে (অন্তত

আমাদের দৃষ্টিতে) বিচিত্র সম্বন্ধ ও সম্ভাবনার জাল ছড়ানো পরিণতির ক্রমায়ণে। এই নিমিত্তের যথার্থ সংজ্ঞা হল ঋত বা 'দৈব্য ব্রত'। সে-ঋতের স্বরূপ ফোটে বস্তুর সত্য স্ব-ভাবের স্বয়ংসিদ্ধ পরিণতিতে—পর্বায়িত পরিণামের মর্মমূলে বিজ্ঞান-স্বরূপের স্বতঃস্ফুরণে। অনন্ত সম্ভাবনার অব্যাকৃতি হতে বিশিষ্ট স্পন্দনের একটি নিরূপিত ছন্দকে আগে থাকতে বেছে নেওয়া—এই হল ঋতের কাজ। সব-কিছুকে এমনি করে পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে যে, নিশ্চয়ই সে কবি-ক্রতু বা চিতি-শক্তি; কেননা বিশ্বের বিসৃষ্টি চিতি-শক্তিরই লীলা এবং চিতি-শক্তিই সত্তার স্ব-ভাব। কিন্তু এই কবি-ক্রতুর যে-প্রবৃত্তি পরিণতির ছন্দে প্রকাশিত, তা মনোময় হতে পারে না কখনও, কেননা মন তো জানে না ঋতের স্বরূপ, বা তার 'পরে নাই তার কোনও শাসন কি অধিকার। বরং মনকেই চলতে হয় ঋতের শাসন মেনে, তারি একটা বিশিষ্ট পরিণামের ধারা হয়ে। তাছাড়া ঋতম্ভরা পরিণতির বহিরঙ্গনে প্রতিভাসের জগতেই মনের আনাগোনা, তাই সে রাখে না বিশ্বলীলায় নেপথ্যের খবর। এইজন্য পরিণতির শেষ অঙ্কে সে দেখতে পায় খণ্ডভাবের খেলা শুধু,—সত্যের মর্মে পৌঁছবার আকূতি তার বন্ধ্যা হয় বারে-বারে। বিসৃষ্টি ও পরিণতির মূলে যে-কবিক্রতু, বস্তুর অখণ্ড-স্বভাবের আবেশ থাকবে তার মাঝে, এবং সেই আবেশ হতেই বহু-ভাবকে করবে সে বিচ্ছুরিত। কিন্তু মনের মাঝে কোথায় অখণ্ডের আবেশ? বহু-ভাবনার শুধু একটি বিভাবকে পেয়েছে সে হাতের মুঠোয় এবং সে-ও তার পুরো পাওয়া নয়।

অতএব মনের ন্যূনতাকে পূরণ করতে মনেরও ওপারে চাই একটা পরতর তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা। সে-তত্ত্ব যে সচ্চিদানন্দ, সে তো অসংশয়িত। কিন্তু তাঁর অনন্ত অব্যয় শুদ্ধ চৈতন্যের শাশ্বতী স্থিতিও নয় সে; অথচ ঐ পরমা প্রতিষ্ঠা হতেই অথবা তাকে মূলাধার করেই তাঁর সে স্পন্দ-প্রবৃত্তি—উছলে পড়ছে তেজরূপে, বিশ্ববিসৃষ্টির সাধন হয়ে। সত্তার শুদ্ধ-বীর্য ফুটেছে চৈতন্য ও শক্তি এই দুটি স্ব-ভাবের উল্লাসে; অতএব প্রজ্ঞা ও ক্রতুও হবে সেই বীর্যেরই রূপায়ণ, যখন দেশ ও কালের ভূমিকায় জগৎ-বিসৃষ্টির প্রৈতি জাগবে তার মাঝে। এই প্রজ্ঞা আর ক্রতু হবে অখণ্ড, অনন্ত, সর্বগ্রাহী, সর্বাধার ও সর্বকৃৎ; স্পন্দনে যাকে রূপায়িত করবে, তাকে শাশ্বত কাল ধরে নিজেরই মাঝে ধারণ করবে তারা। অতএব সন্মাত্র যখন বৈশিষ্ট্যাবগাহী অবচ্ছিন্ন আত্মসংবিতে পরিস্পন্দিত, তখনই তিনি অতিমানস; স্বরূপসত্যের

বিশিষ্ট কতগুলি বিভাবের অনুভবকে তখন তিনি মূর্ত করে তুলতে চান—তাঁরি দেশকালাতীত সদ্‌ভাবের দৈশিক ও কালিক সম্প্রসারণের ভূমিকায়। যা-কিছু আছে তাঁর সত্তায়, তাই ফোটে আত্মসংবিৎ হয়ে, ঋত-চিৎ হয়ে, সম্ভূত-বিজ্ঞান হয়ে; আর আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তি অভিন্ন যখন, তখন সেই স্বরূপের বিজ্ঞানই দেশে ও কালে নিজকে উপচে বা ফুটিয়ে তোলে অধৃষ্য ক্রতুর সংবেগে।

ব্রাহ্মী-চেতনার এই পরিচয়। চিৎ-শক্তির স্পন্দবেগে তার মাঝে হয় বিশ্ব-ভূতের বিসৃষ্টি। তাদের পরিণতি ঘটে সেই চেতনার আত্মপরিণামের ছন্দে, তারি নিরূঢ় কবি-ক্রতুর সংবেগে, যার অমোঘ প্রেরণা বস্তুর স্বরূপ-সত্য বা সম্ভূত-বিজ্ঞানের বীজভাবকে ফুটিয়ে তুলছে তিলে-তিলে। এমনি নিত্যচেতন যিনি, তাঁকেই বলি ব্রহ্ম। অবশ্যই তিনি সর্বগত, সর্বজ্ঞ ও সর্বে-শ্বর। তিনি সর্বগত, কেননা বিশ্বরূপের বিসৃষ্টি তাঁরি চিন্ময় স্বরূপের বিভূতি, দেশ-কাল তাঁরি আত্মপ্রসারণ,—সেই ভূমিকায় আত্মশক্তির স্পন্দবেগে তাঁরি আত্মরূপায়ণ এই নিখিল জগৎ। তিনি সর্বজ্ঞ, কারণ তাঁর চিৎ-সত্তাই বিশ্ব-ভূতের আধার নিবাস এবং রূপকার। আবার তিনি সর্বেশ্বর, কেননা সর্বা-ধিবাস এই চৈতন্যই সর্বাধিবাস শক্তি এবং বিশ্বকর্মা দিব্যক্রতু। তাঁর মাঝে নাই প্রজ্ঞা আর ক্রতুর বিরোধ—যেমন আছে আমাদের প্রাকৃত চেতনায়, কেননা স্বরূপত তারা একই সত্তার অবিভক্ত স্পন্দমাত্র অতএব ভেদলেশশূন্য। অন্য-কোনও সঙ্কল্প শক্তি বা চৈতন্য ব্যাহত করতে পারে না তাদের বাইরে বা ভিতরে থেকে, কারণ অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বের বাইরে কোনও শক্তি কি চৈতন্যের কল্পনাও যে অসম্ভব। আর তার মাঝে যে বিজ্ঞান-শক্তির লীলা, সে তো কিছুই নয় তিনি ছাড়া; সে যে এক সর্বসমঞ্জসা প্রজ্ঞা ও সর্বনিয়ামক ক্রতুরই খেলা শুধু। শক্তি ও সঙ্কল্পের মাঝে সংঘর্ষ দেখি আমরাই, কেননা খণ্ডিত বিশেষের রাজ্যে আছি বলে সমগ্রকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে-সংঘর্ষকেই অতি-মানস দেখে এক পূর্ব্য সৌষম্যের উদ্বেলিত উপাদানরূপে। ঘটনার উত্তালতা যতই প্রবল হোক, অতিমানসের দৃষ্টিতে তা সৌষম্যের ছন্দ হারায় না কখনও, কেননা সে-দৃষ্টিতে ভাসছে বিশ্বভূতের শাশ্বত ও সমগ্র রূপ।

ব্রাহ্মী-চেতনার স্থিতি বা প্রবৃত্তি যাই হোক, এই তার চিরন্তন পরিচয়। সত্তা তার স্বয়ংসিদ্ধ এবং আত্মনিরূঢ়িতে অব্যাহত; অতএব সে-সত্তার শক্তিও অব্যাহত তার আত্মব্যাপ্তিতে। তাই বিশেষ কোনও স্থিতি বা প্রবৃত্তির সীমা টানা যায় না তার চারদিকে। প্রাতিভাসিক দৃষ্টিতে মানুষ দেশ ও কালের

বেষ্টনীতে ঘেরা চৈতন্যের একটা বিশিষ্ট রূপমাত্র। তাই এক সময়ে একটি স্থিতি, একটি পর্যায়, অনুভবের একটিমাত্র মণ্ডল,—এই শুধু ফোটে তার প্রাকৃত চেতনায়। এর বাইরে কিছু জানবারও উপায় নাই তার; সুতরাং জীবনের একটি বিভাবকেই মানে সে সত্য বলে। একদিন যা সত্য ছিল, আজ সে চলে গেছে অতীতের কোঠায়; কিংবা একদিন যা সত্য হবে, আজও সে হাজির হয়নি সামনে এসে; অতএব কেউ তারা সত্য নয় তার চেতনায়। কিন্তু ব্রাহ্মী-চেতনায় নাই এমনতর বিশেষের বন্ধন। যুগপৎ বহু-রূপ হওয়া, অথবা একাধিক স্থিতিতে নিশ্চল থাকা শাশ্বত কাল ধরে, কোনটাই অসম্ভব নয় তার কাছে। তাই দেখি, অতিমানসের বিশ্বভাবিনী চেতনার মাঝেও রয়েছে তিনটি স্থিতি বা ভূমি। তার প্রথম ভূমিতে আছে বিশ্বভূতের অব্যভিচরিত একত্বের ভাবনা; দ্বিতীয় ভূমিতে সেই একত্বেই দেখা দেয় এমন একটা বিভঙ্গ, যা হয় একের মাঝে বহু এবং বহুর মাঝে একের লীলায়নের আধার; সর্বশেষ ভূমিতে সে-বিভঙ্গ আরও কুটিল হয়ে ফোটায় ব্যষ্টিত্বের বিচিত্র পরিণাম, যা অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের অবর-চেতনায় দেখা দেয় বিবিক্ত অহংএর বিভ্রমরূপে।

অতিমানসের আদ্যস্থিতিতে আছে বিশ্বভূতের অব্যভিচরিত একত্বের ভাবনা; আমরা দেখেছি, কী তার স্বরূপ। নিরুপাধিক অদ্বয়চেতনা বলা যায় না তাকে, কারণ সে হল সচ্চিদানন্দের দেশকালাতীত আত্মসমাধান। সে নিরুপাধিক স্থিতিতে নাই চিৎশক্তির কোনও সম্প্রসারণের লীলা। বিশ্ব সেখানে থাকলেও আছে শাশ্বত যোগ্যতারূপে শুধু—কালকলিত বাস্তবতা নিয়ে নয়; অথাৎ বিশ্ব সেখানে 'ভব্য' মাত্র, 'ভূত' নয়। কিন্তু আমরা যার কথা বলছি, সে হল সচ্চিদানন্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ—সর্বগ্রাহী, সর্বাবেশী, সর্বাশয় তার স্বরূপ। কিন্তু সর্ব সেখানে অখণ্ড,—বহুত্বে খণ্ডিত নয়; কেননা তখনও ব্যষ্টিভাব দেখা দেয়নি তার মাঝে। স্তব্ধ পরিশুদ্ধ চিত্তে অতিমানসের এই আলো ঝরলে পরে হারিয়ে যায় ব্যষ্টিত্বের সকল অনুভব, কেননা ব্যষ্টি-পরিণামকে বহন করবার মত চেতনার কোনও কুণ্ডলী থাকে না তখন আধারে। সর্বেরই স্বগত-পরিণাম চলে সে-অতিমানসে—অখণ্ড-অদ্বয় ভাবের ধৃতিতে; সমষ্টি 'ভাব' সেখানে ব্রাহ্মীচেতনার স্বরূপসত্তার অন্তরঙ্গ বিভূতি, বিবিক্ততার আভাসটুকুও নাই তার মাঝে। মনে যেমন চিন্তা কি কল্পনার ঢেউ ওঠে—আমাদের থেকে পৃথক হয়ে নয়, কিন্তু চেতনারই স্বাভাবিক রূপায়ণে—তেমনি

যেন জাগে বিশ্বের নাম আর রূপের স্পন্দ অতিমানসের এই আদ্যাপীঠে। এই তো দিব্যচেতনার বিজ্ঞান ও বিকল্পনার নিরঞ্জন লীলা আনন্ত্যের মহা-ব্যোমে। কিন্তু সে-লীলা বস্তুশূন্য নয় আমাদের মনোবিকল্পের মত,—চিন্ময়ের সত্যসঙ্কল্পের সে 'বিলাস-বিবর্ত'। দিব্যপুরুষের এই স্থিতিতে কোনও ভেদ নাই চিৎ-পুরুষ আর চিন্ময়ী শক্তির মাঝে, কেননা চৈতন্যের তরঙ্গায়নেই সেখানে শক্তির প্রকাশ। তেমনি সব আধার চিন্ময় বলে জড় আর চিতের মাঝেও ভেদ নাই সে-ভূমিতে।

অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে ব্রাহ্মী-চেতনা আত্মস্পন্দ হতে বিজ্ঞানের মাঝে সরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে করে অনুবিদ্ধ; তারি সঙ্গে অন্বিত থেকে, তার সকল প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ও আবিষ্ট হয়ে নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয় নিজেরই রূপে-রূপে। প্রতি নাম-রূপে নিজেকে সর্বসম কূটস্থ আত্মারূপে অনুভব করেও আবার নিজেকে জানে সে চিদাত্মার কুণ্ডলী বলে। ব্যষ্টি স্পন্দলীলার অনুমন্তা ও ভর্তারূপে তার বৈশিষ্ট্যকে অন্য স্পন্দবৃত্তি হতে পৃথক করে' এইভাবে সে বজায় রাখে। এইজন্যই সবার মাঝে চিৎস্বরূপে এক হয়েও চিদাভাসে বিচিত্র সে। যে চিৎ-কুণ্ডলী এই চিদাভাসের ভর্তা, তাকেই বলি ব্যষ্টি-ব্রহ্ম বা জীবাত্মা; আর সর্বভূতাশয়স্থিত অখণ্ড সর্বগত ব্রহ্ম যিনি, তিনিই বিশ্বাত্মা। দুয়ের মাঝে স্বরূপে ভেদ না থাকলেও অর্থক্রিয়ায় ভেদের আভাস আছে লীলার প্রয়োজনে; কিন্তু স্বরূপের তাদাত্ম্যবোধ লুপ্ত হয় না তাতে। বিশ্বভাবন বিশ্বাত্মা সকল চিদাভাসকেই জানেন নিজের স্বরূপ বলে, অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবাইকে যুক্ত করেন বিবিক্ত সম্বন্ধের চিত্র-লীলায়। তাঁর মাঝে জীবাত্মা তার সত্তাকে অনুভব করবে একেরই চিদাভাস ও চিৎস্পন্দরূপে। সর্বগ্রাহী সংবিতের পরিব্যাপ্তিতে যেমন সে পাবে অদ্বয়-স্বরূপ ও নিখিল চিদাভাসের সঙ্গে পরম-সাম্যের অনুভব; তেমনি খণ্ডগ্রাহী সংবিৎ বা প্রজ্ঞানের প্রসর্পণে তার ব্যষ্টিলীলারও ভর্তা এবং ভোক্তা হবে সে—অদ্বয়-স্বরূপ এবং তার সকল বিভূতির সঙ্গেই থাকবে তার স্বচ্ছন্দ ভেদাভেদের সম্বন্ধ। আমাদের পরিশুদ্ধ চিত্ত যদি অতিমানসের এই মধ্যস্থিতির জ্যোতিতে হয় সমুজ্জ্বল, তাহলে জীবভাবের অধিষ্ঠান ও ভর্তা হয়েও আমরা এই আধারেই পেতে পারি সর্বাধার সর্বভাবন সর্বভূতস্থ পরম অদ্বয়ের অনুভব—এমন-কি জীবভাবের বিশিষ্ট লীলাতেও আমাদের ব্রহ্মরস ও সর্বাত্মভাবের আনন্দ থাকে অক্ষুণ্ণ। অতিমানসের এই ভূমিতেও সামরস্যের ছন্দ কোথাও হয় না ব্যাহত,

কোথাও দেখা দেয় না পরিবেশের কোনও পরিবর্তন। তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ফোটে বহুভাবন একের সঙ্গে একীভূত বহুর রসোল্লাসে। যা-কিছু রং কি রূপের বদল, সে কেবল এই মহারাসেরই আয়োজনে।

অতিমানসের অন্ত্যস্থিতিতে, স্পন্দলীলার অন্তর্যামী প্রভু হয়েও ব্রহ্মের চিদ্‌ঘন অধিষ্ঠান স্পন্দ হতে সরে দাঁড়ায় না নির্লিপ্ত অনুমন্তা ও ভোক্তারূপে, —কিন্তু তাকে যেন জড়িয়ে থাকে নিজকে তার মাঝে প্রসর্পিত করে'। তাই এখানে বদলে যায় তার লীলার ধরন। জীবাত্মা এখানে বিশ্বাত্মা ও তাঁর বিভূতির সঙ্গে সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে এমনভাবে নামিয়ে আনে চিন্ময়-ব্যবহারের ভূমিতে যে, পরমসাম্যের অনুভব জীবাত্মার নিত্য সহচর হয়েও এবার তার সকল অনুভবের পর্যবসানরূপেই ফুটে ওঠে ব্যষ্টিলীলার পর্বে-পর্বে। কিন্তু মধ্যস্থিতিতে সাম্যের অনুভবই মুখ্য এবং স্বারসিক, বৈচিত্র্য তার লীলায়ন মাত্র। অন্ত্যস্থিতিতে তাই দেখা দেয় জীবে-শিবে অদ্বৈতসম্পুটিত দ্বৈতের এক স্বারসিক আনন্দময় অনুভব—দ্বৈতের গৌণব্যঞ্জনার দ্বারা বিশিষ্ট অদ্বৈতের অনুভবই নয় শুধু। আর তারি মাঝে নেমে আসে দ্বৈত-প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক যা-কিছু বিচিত্র পরিণাম।

মনে হতে পারে, এই দ্বৈত-প্রবৃত্তির প্রথম পরিণাম হবে অবিদ্যার মাঝে চেতনার অবস্খলন; কারণ অবিদ্যাই তো বহুকে জানে পরমার্থ বলে, একত্ব তার কাছে বহু-ব্যক্তির একটা বিরাট সমাহার শুধু।...কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। অতিমানসের এই অন্ত্যস্থিতিতেও ম্লান হবে না জীবাত্মার অদ্বৈত-চেতনা। নিজেকে এখানেও জানবে সে অদ্বয়-স্বরূপেরই চিন্ময়ী আত্ম-বিসৃষ্টির তরঙ্গরূপে। অর্থাৎ দেশ ও কালের পটে আত্মবিভূতির বিচিত্র মেলায় বিচিত্র ব্যঞ্জনার নিয়ন্তা ও ভোক্তারূপে যে অন্তহীন চিদ্‌ঘন বিন্দুতে নিজেকে করেছেন তিনি পরিকীর্ণ, জীবাত্মা আপনাকে জানবে তারি একটি বিন্দুরূপে। একটা স্ব-তন্ত্র বা বিবিক্ত সত্তাও যে আছে তার, এ-অভিমান তাকে ছুঁয়ে যাবে না কোনকালেই। একত্বের অচল প্রতিষ্ঠায়ও আছে বিভেদের ছন্দদোলা—এই তত্ত্বকেই স্বীকার করবে সে অখণ্ড-সত্যের দুটি মেরু বলে, একই দিব্য লীলায়নের মূলাধার ও সহস্রাররূপে। অখণ্ডের রসকে পুরো-পুরি পাবার জন্যেই চাইবে সে খণ্ডরসের আস্বাদন।

অতিমানসের তিনটি স্থিতি একই সত্যের আস্বাদনের তিনটি ভঙ্গি মাত্র। এক স্বরূপসত্য কিন্তু সম্ভোগের তিনটি ধারা, অথবা আত্মার তিনটি বিভঙ্গে আনন্দময় অনুভব তার—এ-বিলাসের তত্ত্ব হল এই। আনন্দের রূপ

হবে বিচিত্র, কিন্তু কখনও স্খলিত হবে না সে ঋত-চিতের ভূমি হতে, নেমে আসবে না অনৃত আর অবিদ্যার প্রদোষলোকে। অতিমানসের আদ্যস্থিতিতে একত্বের রসে সান্দ্র হয়ে আছে যে-দিব্যভাব, মধ্য ও অন্ত্যস্থিতিতে বহুত্বের বিভাবনায় তারি চিন্ময় বিলাস শুধু। তবে আর তাদের মাঝে অনৃত ও অবিদ্যার ছায়া কোথায়? উপনিষদের বাণীতে আছে এই লোকোত্তর অনুভবের প্রাচীনতম প্রামাণিক বিবৃতি; সেখানেও পাই দিব্য-পুরুষের সম্ভূতি-লীলায় এই তিনটি স্থিতিরই সমর্থন। এককে বলি বহুর পূর্বভাবী; কিন্তু সে-পূর্বভাব কালের প্রাক্তনতা নয়। বিশেষ হতে সামান্যের দিকে চেতনার যে স্বাভবিক ঝোঁক, তা হতেই পূর্বভাবের কল্পনা। ব্রহ্মানু-ভবের কোনও বিবৃতি বা বেদান্তের কোনও প্রস্থানই তাকে অস্বীকার করে না; সবাই বলে, বহুর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা একের 'পরেই, অতএব একই বহুর পূর্বভাবী। কালের কলনায় বহুকে মনে হয় অশাশ্বত—মনে হয় এক হতে বিসৃষ্ট হয়ে একেই প্রলয় তার,—অতএব একত্বই বস্তুস্থিতি, বহুভাব অবাস্তব। কিন্তু এমন তর্কও করা চলে: কালিক প্রকাশ একটা শাশ্বতী স্থিতি যখন—অন্তত শাশ্বতী আবৃত্তি তো বটেই,—তখন কালকলনার ওপারে একত্বের মত ব্রহ্মের বহুভাবও একটা শাশ্বত সত্য হবে না কেন? নইলে কোথা হতে এল তার এই অনতিবর্তনীয় চিরন্তন কালিক আবৃত্তি?

সকল দর্শন একই স্বরূপসত্যের দর্শন। তাদের মাঝে খণ্ডন-মণ্ডনের প্রয়াস চলে শুধু দ্বৈতবুদ্ধির কারসাজিতে। মানুষের মন বিভজ্যদর্শী, তাই অখণ্ড অধ্যাত্ম-অনুভবের একটা দিকে জোর দেওয়া তার স্বভাব। সত্যের একটা বিভাবকেই খণ্ড-দর্শনের যুক্তি দিয়ে একমাত্র শাশ্বত সত্য বলে প্রচার করা—এই হতে অধ্যাত্মজগতেও দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি। কখনও বলি, অদ্বৈত-চেতনাই একমাত্র সত্য; অথচ অদ্বৈতের বহুধা-বিলাসকেও মানি—মনের ভাষায় সত্যিকার ভেদে তার তর্জমা করে'। এমনি করে অভেদে আর ভেদে বিরোধ ঘটে যখন, তখন মনের ভুলকে ভাঙতে আশ্রয় করি না কোনও বৃহৎ দর্শনের সত্যকে; বরং উল্‌টে বলি, বহুর বিলাস একটা মায়ার খেলা! কখনও আবার একের লীলাকেই দেখি বৃহৎ করে। তখন বলি, অদ্বৈতের বিশিষ্ট ভাবই সত্য—জীবাত্মা পরমাত্মারই চিন্ময় বিভূতি। শুধু তাই নয়; এই বিশিষ্ট-ভাবকেই ব্রহ্মের শাশ্বত স্বভাব মেনে নিরুপাধিক চৈতন্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভবকে বলি মিথ্যা।...আবার কখনও ভেদের

লীলাই দেখা দেয় বড় হয়ে। তখন জীবাত্মা আর পরমাত্মায় শাশ্বত ভেদকেই জানি সত্য বলে; অভেদ-জ্ঞানে ভেদ যে মুছেও যেতে পারে, এ-অনুভবের প্রামাণ্যকে মানি না তখন।...এমনি করে সত্য নিয়েও চলে এসেছে কত রেষারেষি। কিন্তু এবার অচল প্রতিষ্ঠার আসন পেতেছি যে-ভূমিতে, সেখানে অমন কাটছাঁটের কোনও প্রয়োজন তো নাই। আমরা দেখি, সব দর্শনেই সত্য আছে; কিন্তু তাকে ফাঁপিয়ে তোলার ঝোঁকেই দেখা দেয় খণ্ডন-মণ্ডনের মিথ্যা কোলাহল। তাই আমরা মানি: তৎ-স্বরূপের নির্ব্যূঢ় নির্বিশেষ স্বরূপ—যার মাঝে নাই মনঃকল্পিত একত্ব বা বহুত্বের কোনও উপাধি। আরও মানি: তাঁর অদ্বয়ভাবে বহুধা-বিসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা যেমন, তেমনি তাঁর বহুভাবকে আশ্রয় করেই আবার ফিরে আসা যায় অদ্বয়তত্ত্বে—দিব্য বিসৃষ্টিতে আস্বাদন করা চলে অদ্বয়েরই আনন্দ। সুতরাং এক আর বহু, অভেদ আর ভেদ, অদ্বৈত আর দ্বৈত—তাঁর এ-সব বিভাব নিয়ে তর্কের ধুলো ঝোঁটিয়ে তোলবার প্রয়োজন নাই কোনও। আমরা জানি, ব্রহ্মের আনন্ত্যে আছে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের নির্বারিত উল্লাস; অতএব ভেদবুদ্ধির সীমাটানা শুষ্ক তর্কের কারায় তাকে বন্দী করব—এ কি শুধু পণ্ডশ্রমই নয় আমাদের?

১৭

# দিব্য পুরুষ

যাঁর আত্মা হয়েছে সর্বভূত,—কেননা বিজ্ঞান আছে তাঁর—কীই-বা মোহ, কীই-বা শোক থাকবে তাঁর, একত্ব দেখছেন যিনি সকল ঠাঁই?

—ঈশ উপনিষৎ (৭)

অতিমানসের একটা ধারণা আমাদের হয়েছে এতক্ষণে। এইটুকু বুঝেছি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের নির্ভর যে-মনশ্চেতনার পরে, অতিমানস তার বিপরীত কোটিতে। অতিমানসের এই ধারণা হতেই 'দিব্যভাব' ও 'দিব্যজীবন' সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট মনোভাব পেয়েছে একটা সুব্যক্ত রূপের ব্যঞ্জনা। নইলে ও-দুটি সংজ্ঞাকে আমরা বরাবরই ব্যবহার করে এসেছি কতকটা শৈথিল্যের সঙ্গে; ভেবেছি, যা অতিবৃহৎ অথচ প্রায় নাগালের বাইরে, এমন-একটা বস্তুর আকূতিকেই প্রকাশ করতে চাই ও-দুটি শব্দের কুহেলিকায়। কিন্তু অস্পষ্টতার অপবাদ দূর হয়েছে এবার; দিব্যভাব ও দিব্যজীবনকে দার্শনিক যুক্তির দৃঢ়ভিত্তির 'পরে দাঁড় করানোও অসম্ভব নয় এখন। মানুষ-ভাব আর মানুষ-জীবনকেই আমরা চিনি ভাল; তবু তার সঙ্গে দিব্যভাব আর দিব্যজীবনের সম্বন্ধটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমাদের মনে। নিঃসংশয়ে বুঝেছি, বিশ্বপ্রকৃতির স্বভাবছন্দের মাঝেই আছে আমাদের চিরন্তনী আশা ও আকূতির সায়, কেননা আমাদের ঘিরে বিশ্বের যে অতীত পরিবেশ, ভবিষ্য উদয়নের দিকেই তার সুনিশ্চিত ইশারা। অন্তত বুদ্ধি দিয়েও বুঝেছি, যে-পরমার্থতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলি, কী তাঁর স্বরূপ, কী করে বিশ্বরূপে আত্মবিসৃষ্টি তাঁর। ব্রহ্ম হতে যা বেরিয়ে এসেছে, আবার যে ব্রহ্মেই তা ফিরে যাবে—এ নিয়েও আর-কোনও সংশয় নাই আমাদের মনে। এবার তাহলে একটা প্রশ্নের আরও স্পষ্ট জবাব দাবি করবার সময় এসেছে। প্রশ্নটি এই: ব্রহ্মই যদি হন জীবনের স্বরূপসত্য, তাহলে কী করে তাঁর দিকে

ফিরিয়ে দেব জীবনের মোড়? আঁধারের কোন্ রূপান্তর সহজ হলে আমরা সহজভাবেই পৌঁছতে পারব তাঁর মাঝে—শুধু সত্তার গভীর গহনে সমাধি-সিদ্ধির নিঃসঙ্গ প্রত্যয় নিয়ে নয়, সবার রঙে রং-মেশানো এই জীবন ও প্রকৃতির অবিকৃত স্বরূপকে নিয়েই? অবশ্য এখন পর্যন্ত আমাদের দর্শন কতকটা একাঙ্গী, কেননা প্রকৃতির সঙ্কোচের মাঝে ব্রহ্মের অবতরণের দিকটাই আমরা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি এতক্ষণ। কিন্তু আমাদের স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উত্তরণের লীলা—জীবে অভিনিবিষ্ট ব্রহ্ম যেখানে চাইছেন প্রকৃতির সঙ্কোচ কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরে যেতে। এই গতির ভেদ হতেই এসেছে মানুষ আর দেবতায় জীবনছন্দের তারতম্য। দেবতাকে অবতরণের আয়াস স্বীকার করতে হয়নি কখনও, তাই উত্তরণের সাধনাও অজ্ঞাত তাঁর। কিন্তু যে-মানুষ মুক্তি অর্জন করেছে তপস্যার বীর্যে, অন্ধকারের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে দেবত্বের স্বাধিকার, তার অনুভবে এসেছে অগ্নিদীপ্তি, চেতনার নবীন সম্পদ সে জয় করেছে অন্ধতমিস্রায় অবতরণের দুঃসাহসী স্বীকৃতি দিয়েই। কিন্তু তবুও এ-দুয়ের মাঝে নাই স্বরূপসত্যের কোনও ভেদ—শুধু আকার আর রঙের বদল ছাড়া। তাই এতক্ষণের আলোচনায় যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তাহতেই অসম্ভব হবে না আমাদের অভীপ্সিত দিব্য-জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করা।

প্রশ্ন তাহলে এই: মনে করা যাক চিৎ এখনও নেমে আসেনি জড়ের মাঝে, জীবাত্মা আচ্ছন্ন হয়নি জড়প্রকৃতির দ্বারা, অতএব অবিদ্যারও করাল ছায়া দেখা দেয়নি; এ-অবস্থায় কোনও চিন্ময় দিব্য পুরুষের স্বরূপ-কথা কী হবে? কীই-বা হবে তাঁর চেতনার পরিচয়? অবশ্য এটুকু বুঝি: বস্তুর স্বরূপ-সত্যে প্রতিষ্ঠা তাঁর—অব্যভিচরিত অদ্বয়ভাবের শাশ্বত প্রত্যয়ে; ব্রহ্মসত্তারই মত আপন অনন্তসত্তার অবিচল আয়তনে তাঁর স্থিতি; অথচ দেব-মায়ার লীলায়, ঋতচিতের সংজ্ঞানময় ও প্রজ্ঞানময় দুটি উল্লাসে ব্রহ্মের সঙ্গে যুগপৎ ভেদ ও অভেদকেও আস্বাদন করেন তিনি; আবার অদ্বয়স্বরূপের বহুধা-আত্মরূপায়ণের অন্তহীন বিলাসে, অন্যান্য দিব্য পুরুষের সঙ্গেও তিনি সম্ভোগ করেন এই ভেদাভেদের আনন্দ।...এই নিত্যসিদ্ধ চেতনাই আমাদের কাম্য বলে তার স্বরূপকে বুঝতে চাই আরও তলিয়ে।

স্পষ্টই বোঝা যায়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অপ্রপঞ্চিত উল্লাসে নিত্য-ছন্দিত এই দিব্য পুরুষের চেতনা। অসম্ভূত সৎস্বরূপে তিনি অন্তহীন নিরঞ্জন

সন্মাত্র ; আবার সম্ভূতিরূপে অজর অমর প্রাণের প্রমুক্ত উচ্ছ্বাস তিনি ; দেহের জন্ম মৃত্যু ও বিপরিণামদ্বারা অপরামৃষ্ট তাঁর সত্তা, কেননা তাঁতে নাই অবিদ্যার ছায়া, নাই জড়ভূতের অন্ধ আবরণ। আবার শক্তিরূপে তিনি অন্ত-হীন নিরঞ্জন চেতনা—শাশ্বত জ্যোতির্ময় প্রশান্তির অচল প্রতিষ্ঠায় নিত্য-সংস্থিত ; অথচ বিজ্ঞান ও চিৎশক্তির বিচিত্র বিলাসে উপচে পড়ে তাঁর অক্ষুণ্ন স্বাতন্ত্র্য। প্রমাদী মনের স্খলন নাই তাঁর মাঝে, নাই আয়াসক্লিষ্ট ব্যর্থ সঙ্কল্পের বঞ্চনা, কেননা অন্বয়ভাবের সত্য হতে কখনও প্রচ্যুত হন না তিনি,। দিব্য স্বভাবের স্বচ্ছন্দ সুষমা ও স্বরূপ-জ্যোতি কখনও ম্লান হয় না তাঁর। পরিশেষে, আনন্দস্বরূপে তিনি শাশ্বত আত্মরতির অব্যভিচরিত নিরঞ্জন উল্লাসে সমুচ্ছল। কাল-কলনাতেও সে-আনন্দের প্রবাহ বিচিত্র ও মুক্তচ্ছন্দ। আমাদের মত তার মাঝে নাই ঘৃণা বিদ্বেষ অতৃপ্তি ও সন্তাপের বিকৃতি ; কেননা বুদ্ধির সঙ্কোচ দ্বারা, প্রমত্ত দুরাগ্রহের ব্যর্থতা দ্বারা, অন্ধবাসনার তাড়না দ্বারা খণ্ড-ক্লিষ্ট নয় সে-আনন্দ।

দিব্য পুরুষের সংবিতে অনন্ত সত্যের কোন বিভাবই থাকবে না অনধি-গম্য, বিচিত্র সম্বন্ধের জালে জড়িত হয়েও তার দিব্যস্থিতিতে দেখা দেবে না সীমার সঙ্কোচ। এমন-কি, জীবত্বের প্রতিভাস এবং ভেদ-ব্যবহারের লীলাকে পরিপূর্ণ স্বীকার করেও সে-সংবিৎ স্বরূপানুভব হতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হবে না কখনও। দিব্য পুরুষের আত্ম-সংবিৎ পরা-সংবিৎ দ্বারাই অধিবাসিত থাকবে নিরন্তর। পরা-সংবিৎ আমাদের কাছে অনিরুক্ত সত্তার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম আছেন পরাৎ-পর হয়ে ; অবিজ্ঞেয় তিনি, নিজকে জানেন আমাদের জ্ঞানের ধারা ধ'রে নয় ;—বুদ্ধি ব্রহ্মের এই পরিচয় জানে শুধু, তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সে পারে না। কিন্তু দিব্যপুরুষের নিবাস বস্তুর স্বরূপসত্যে, অতএব নিজেকে নিত্য অনুভব করেন তিনি পরা-সংবিতেরই প্রকাশরূপে। তাঁর অক্ষরসত্তা তুরীয় সচ্চিদানন্দের অব্যাকৃত স্বরূপ-সত্তা ; আবার তাঁর চিদ্বিলাস তৎ-স্বরূপেরই সচ্চিদানন্দময় বিভূতি। তাঁর বিজ্ঞানময় স্থিতি বা প্রবৃত্তির প্রত্যেকটি বিভাবকে অনুভব করবেন তিনি অপ্রমেয়র আত্মপ্রমিতির একটা বিচিত্র 'প্রকার'রূপে। তাঁর বীর্য সঙ্কল্প ও শক্তির প্রত্যেকটি স্থিতি বা বিভঙ্গে জানবেন তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা ও প্রজ্ঞার চিন্ময় বীর্যবিভূতিতে সেই পরমশিবের আত্মবিভাবনের স্ফূর্তি। তেমনি তাঁর আনন্দ প্রেম ও আত্মরতির প্রত্যেকটি স্থিতি বা তরঙ্গে পাবেন তিনি আত্মারামের

চিন্ময় রমণোল্লাসের অনুভব। পরা-সংবিতের এই সাযুজ্য দিব্য পুরুষের সংবিতে একটা চকিত দীপ্তি নয় শুধু ; অথবা এমনও নয় যে বহু আয়াসে এক-বার এই চরম ভূমিতে পৌঁছে একে কোনরকমে আঁকড়ে আছেন তিনি। তাঁর সাধারণ স্থিতির 'পরে এ-যে একটা বিশেষণ, সিদ্ধি বা চরম পরিণতির প্রলেপ তাও নয় ; ভেদে এবং অভেদে এ-সাযুজ্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, তাঁর স্বারসিক অনুভব। জ্ঞানে কর্মে ভোগে অথবা সঙ্কল্পে এ-অনুভব তাঁর ম্লান হয় না কখনও। কালাতীত অচলপ্রতিষ্ঠায় অথবা কাল-কলনার তরঙ্গদোলায়, দেশাতীত পরম সদ্ভাবে অথবা দেশাবচ্ছিন্ন সত্তার বিভূতিতে, হেতু-প্রত্যয়ের অতীত নিরুপাধিক নিরঞ্জন স্বভাবে অথবা হেতু-প্রত্যয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্যবহার্য স্থিতিতে তাঁর সাযুজ্যের অনুভব কোথাও হবে না গ্রস্ত কিংবা স্তিমিত। পরা-সংবিতের এই নিত্য-সাযুজ্য হবে তাঁর অন্তহীন স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দের নিরন্ত নির্ঝর, তাঁর লীলাবিভূতিকে করবে স্বপ্রতিষ্ঠায় প্রমাদহীন, তাঁর দিব্যভাবের হবে পরম রসায়ন।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আত্মবিভাবনের যে-দুটি অবিনাভূত কোটিকে আমরা জানি এক এবং বহু বলে, সে-দুটি শাশ্বত বিভাবকে যুগপৎ অধিকার করে আছে দিব্য পুরুষের চেতনা। বস্তুত দিব্য পুরুষের কেন, সর্বভূতেরই স্থিতির এই একটি ধারা। কিন্তু আত্মসংবিৎ আমাদের খণ্ডিত বলে এক এবং বহুতে আমরা দেখি অনপনেয় একটা বিরোধ। তখন দুয়ের মাঝে একটিকে বেছে নিতে হয় আমাদের : বহুর মেলায় থাকলে অখণ্ডের সমগ্র ও অপরোক্ষ সংবিৎ আমাদের মাঝে হয় লুপ্ত ; আবার অখণ্ডে অবগাহন করলে বহুর চেতনাকে নিরা-কৃত করতেই হয় বাধ্য হয়ে। কিন্তু দিব্য পুরুষের চেতনায় নাই এই দ্বন্দ্ব ও অসমুচ্চয়ের জুলুম। নিঃশেষ আত্মসমাধান ও অন্তহীন আত্মপ্রসারণ কি আত্ম-বিচ্ছুরণ দুয়েরই সমুচ্চিত অনুভব তাঁর স্বভাব। তাঁর মাঝে অখণ্ডের অদ্বৈত-চেতনায় অনন্ত আত্মবিভাবনার সংবেগ আছে যেন সম্পুটিত এবং অব্যাকৃত হয়ে,—যদিও স্ফুরত্তা তার নিত্য সম্ভাবিত ; অথচ আমাদের মনশ্চেতনায় এ-বিভাব জাগায় শুধু অসৎ বা শূন্যের কল্পনা। কিন্তু এই অদ্বৈতানুভবের সঙ্গে দিব্য পুরুষের মাঝে আছে অখণ্ডেরই চিদ্বিলাসের অনুভব—নিজের চিন্ময় সত্তা সঙ্কল্প ও আনন্দের লীলায়নে বহুবিভাবনার অফুরন্ত উল্লাস। বহুর অব্যক্তভাবে একের অদ্বৈতপ্রত্যয় এবং একের আত্মপ্রসারে বহুর অভি-ব্যক্তি—সচ্চিদানন্দের এই দ্বিদল-লীলার যুগপৎ আস্বাদনই তাঁর অদ্বৈতবোধের

স্বরূপ। যে-অদ্বয়তত্ত্ব বহুত্বের শাশ্বত প্রভব এবং স্বরূপসত্য, বহুর মাঝে নিগূঢ় ঐক্যভাবনার আকূতি নিরন্তর তাকে আকর্ষণ করছে নিজের ভূমিতে ; আবার লোকোত্তরের মহাসঙ্কর্ষণে বহু ছুটেছে একের সেই মহারাসমঞ্চে, যেখানে নিখিল ভেদলীলার শাশ্বত পর্যবসান ও আনন্দময় সার্থকতা। চিৎশক্তির এই উজান-ভাটার যুগললীলাই অখণ্ডৈকরস হয়ে ভাসছে দিব্য পুরুষের চেতনায়। এই পরমদর্শনই ঋত-চিতের সম্প্রত্যয়, বৈদিক ঋষি যাকে বলেছেন 'সত্যম্ ঋত-বৃহৎ'। সমস্ত বিরোধের এই পরম-সমন্বয়ই যথার্থ 'অদ্বৈত'—যে সংজ্ঞা-, শব্দের মাঝে আছে অবিজ্ঞেয়েরই বিজ্ঞানের উদারতম ব্যঞ্জনা।

দিব্য পুরুষ জানবেন : সত্তা সংবিৎ সঙ্কল্প ও আনন্দের এই-যে বৈচিত্র্য, এ সেই আত্মসমাহিত পরমাদ্বৈতেরই আত্মপ্রসারণ ও বিচ্ছুরণ—স্বভাবের উল্লাসে তাঁর উপচে পড়া। তাঁর আত্মবিপরিণামের এ-লীলা তো ভেদদ্বারা খণ্ডিত করা নয় নিজকে—এ-যে অন্তহীন অখণ্ডতাকেই আর-একরূপে ছড়িয়ে দেওয়া শুধু। আত্মস্বরূপে তিনি নিত্যসমাহিত অদ্বয়রূপ ; অথচ সেই স্বরূপেরই প্রসারণে বৈচিত্র্যের এই উল্লাস তাঁর। যা-কিছু রূপায়িত হচ্ছে তাঁর মাঝে, সে তো অদ্বয়রূপেরই অন্তহীন সামর্থ্যের বিচ্ছুরণ। এমনি করে নামহীন নৈঃশব্দ্যের গহন হতে জাগছে বাক্ বা নামের ঝঙ্কার, অরূপের স্বরূপ হতে ফুটছে রূপের লীলা, শক্তির 'নিমেষ' হতে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সঙ্কল্প ও বীর্যের সংবেগ, আত্মসংবিতের কালকলনাহীন আদিত্যবিম্ব হতে ঝিকিয়ে উঠছে আত্মপ্রত্যয়ের রশ্মিরেখা, চিন্ময়ী অসম্ভূতির চিরন্তন প্রতিষ্ঠার বুকে দুলছে সম্ভূতির স্পন্দিত চেতনা, অনুদ্বেলিত আনন্দের শাশ্বত স্তব্ধতা হতে উৎসারিত হচ্ছে প্রেম ও হর্ষের অফুরন্ত জোয়ার। এ-লীলা নির্বিশেষেরই আত্ম-বিভাবনের দ্বিদললীলা। তার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বিভূতিতে থাকবে একটা একান্তী প্রত্যয়, কেননা প্রত্যেক বিশেষই সেখানে নিজেকে জানে নির্বিশেষের বিভূতিরূপে। অথচ এই ঐকান্তিকতার মাঝে থাকবে না অবিদ্যার ছোঁয়াচ, অতএব একটি বিশেষ অপর বিশেষকে নিরাকৃত করবে না অপূর্ণ বা অসগোত্র জ্ঞানে।

বিশ্বের পরিব্যাপ্তিতে দিব্য পুরুষ অনুভব করবেন অতিমানসী স্থিতির তিনটি পর্ব—আমাদের মনঃকল্পিত তিনটি বিবিক্ত পর্বরূপে নয়, সচ্চিদা-নন্দেরই আত্মবিভাবনার একটি অখণ্ড ত্রিপুটীরূপে। তাঁর আত্মস্বরূপের সর্বায়তন অখণ্ড উপলব্ধির মাঝে অবিবিক্ত হয়ে ধরা দেবে তারা, কেননা অখণ্ড-

গ্রাহী বৃহৎ পরিব্যাপ্তিই হল ঋতচিন্ময় অতিমানসের স্বধর্ম। দিব্য পুরুষের কল্পদৃষ্টিতে, অনুভবে বা ব্যক্ত-প্রত্যয়ে এমনি করে সর্বভূত প্রতিভাত হবে আত্মারূপে। সে-আত্মা তাঁরি আত্মা, সর্বভূতের আত্মভূত এক আত্মা, অথবা এক অখণ্ড আত্মভাব এবং সর্বগত আত্মবিভাবনা। বিভূতির বৈচিত্র্যেও নাই তার খণ্ডতা, কেননা আত্মসংবিৎ আর আত্মবিভূতির বিবিক্ত সত্তা নাই সেখানে। আবার তাঁর কল্পদৃষ্টিতে, অনুভবে ও ব্যক্ত-প্রত্যয়ে সর্বভূত দেখা দেবে এক অদ্বয়স্বরূপেরই বিচিত্র চিন্ময় বিগ্রহরূপে। সে দিব্য-অনুভবে প্রতি ভূত এক অখণ্ড-সত্তাতেই সত্তাবান,—অখণ্ডেরই মাঝে বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা তার। ভূতে-ভূতে যে-অদ্বয়স্বরূপের আনন্ত্যের অভিব্যঞ্জনা, তার মাঝে প্রতি ভূতের অন্যোন্য-সম্বন্ধ বিধৃত থাকবে অদ্বয়-স্বরূপেরই নিত্যযোগে, কেননা প্রতি ভূত তাঁরি অন্তহীন আত্মরূপায়ণের চিদ্‌ঘন বিচ্ছুরণ। পরিশেষে তাঁর কল্পদৃষ্টিতে, অনুভবে ও ব্যক্ত প্রত্যয়ে প্রতি ভূত ভাসবে তার সনাতন বৈশিষ্ট্য নিয়ে—চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম-বিন্দুর বিবিক্ত ভঙ্গি হয়ে। তখন প্রতি বিগ্রহে একই পরম-দেবতার অধিবাস; অতএব বিগ্রহ মিথ্যা বা কল্পমায়া নয়, অখণ্ড-সত্যের একটা মায়িক অংশ নয়, কিংবা এক অবিচল মহাসমুদ্রের ফেনোচ্ছল তরঙ্গলীলা নয় শুধু,—কেননা এ-সমস্তই অপূর্ণদর্শী মনের জল্পনা মাত্র। দিব্যদৃষ্টিতে ব্যক্তির সত্তা অখণ্ডেরই অখণ্ড বিলাস; অনন্ত সত্যের পূর্ণ ব্যঞ্জনা তার সত্যে,—বিন্দুতে সিন্ধুর প্রতিফলন নয় শুধু, সিন্ধুর পরিপূর্ণ আবেশ। এই বিশেষই সেই পরিপূর্ণ নির্বিশেষ তখন, কেননা সত্যের দৃষ্টি তার মাঝে দেখতে পায় প্রতিভাসের মর্ম ভেদ করে পূর্ণস্বরূপের স্বমহিমাকে।

কিন্তু এই-যে তিনটি অনুভব, অতিমানসের সংপিণ্ডিত অদ্বৈতানুভবে এক অখণ্ডৈকরস প্রত্যয় এরা—এদের একটি হতে আর-একটিকে বিবিক্ত করা চলে না সেখানে। মানুষী ব্রহ্মানুভূতিতে ধরে তারা আত্মবিজ্ঞানেরই তিনটি রূপ। উপনিষদ প্রথমটিকে বলেছেন, 'যস্য সর্বভূতানি আত্মৈবাভূৎ'—আমাদের আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত। দ্বিতীয় অনুভবের সূত্র, 'সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব'—সর্বভূতকে দেখা আত্মার মাঝে। আর তৃতীয় অনুভবে, 'সর্বভূতেষু আত্মানম্‌'—আত্মাকে দেখা সর্বভূতে। আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত—এই হল আমাদের সর্বাত্মভাবের ভিত্তি; আত্মার মাঝেই সর্বভূত—এই অনুভবে হয় ভেদের মাঝেও অভেদ দর্শন; আর সর্বভূতেই আছেন আত্মা—এই অনুভবে ঘটে বিশ্বে জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা। তিনটি অনুভবকে আলাদা করে দেখানো

হল বুদ্ধির প্রয়োজনে; কিন্তু স্বারসিক প্রত্যয়ে তারা অবিবিক্ত। আমাদের মনে খুঁত আছে, ঝোঁক আছে একটা-কিছুকে একান্ত বিবিক্ত করে আঁকড়ে ধরবার। তাই অখণ্ড আত্মোপলব্ধির যে-কোনও বিভাবকে বড় করতে পারে সে আর-সবাইকে ছাপিয়ে। এমনি করে উপলব্ধির অপূর্ণতা ও ব্যবর্তকতায় পরমার্থ-সত্যের মাঝেও লাগে মানুষের প্রমাদী মনের ছোঁয়াচ, অদ্বৈতের সর্বাবগাহী ভাবনাতেও জাগে বিরোধ ও অন্যোন্য-প্রতিষেধের কল্পনা। কিন্তু দিব্য পুরুষের অতিমানসী চেতনা মনের বিকল্প হতে নির্মুক্ত—তার মাঝে আছে সর্বগ্রাহী অদ্বৈতপ্রত্যয়ের বৈপুল্য, আছে আনন্ত্যের সমগ্র ধৃতি। অতএব তাঁর কাছে দিব্য অনুভবের এই ত্রয়ী একই পরানুভবের মহাত্রিপুটী মাত্র।

কল্পনা করা যাক, এই দিব্য পুরুষের চেতনা কোনও ব্রহ্মভূত জীব-চেতনায় আবিষ্ট। তখন সেই জীব-ব্রহ্ম আত্মজীবনে এবং তথাকথিত অপর জীবের সঙ্গে বিবিক্ত ব্যবহারেও, চেতনার মর্মমূলে অনুভব করবেন সর্বযোনি অদ্বৈতের অখণ্ড সমগ্রতা; আবার তাঁর চেতনার পরিমণ্ডলে থাকবে বিশ্বাত্মভাবন অথচ সবিশেষ অদ্বয়ভাবনা। বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের দুটি দুয়ারই খোলা থাকবে তাঁর কাছে এবং তাদের ভূমিকা থেকে জীবত্বের লীলাকে আস্বাদন করা একান্ত সহজ হবে তাঁর। বেদে দিব্যভাবের এই তিনটি ভঙ্গিই স্থান পেয়েছে দেবস্বরূপের ভাবনায়। স্বরূপত দেবতারা এক, কেবল ঋষিরা বিভিন্ন নামে ডাকেন তাঁদের—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' কিন্তু 'সত্যম্ ঋতং বৃহতের' পরমা প্রতিষ্ঠা হতে উৎসারিত দেখি যখন তাঁদের ক্রতুর লীলা, তখন জানি অগ্নিই (অথবা অন্য-কোনও দেবতা) হয়েছেন সকল দেবতা—অখণ্ড থেকেই তিনি সব হয়েছেন; আরও জানি, নাভিতে সমর্পিত অরসমূহের মত সকল দেবতা আছেন তাঁরি মাঝে—'স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্তি'; আবার জানি, বিশিষ্ট দেবতারূপে সবার মিত্র তিনি, বীর্যে প্রজ্ঞায় ছাপিয়ে গেছেন সবাইকে, তবু তিনি 'দেবানাম্ অবমঃ'—আছেন সবার নীচে, দেবতাদের দূতরূপে; মানুষের 'পুরোহিত' তিনি, তিনি 'ক্রাণা' বা কর্মী; বিশ্বের স্রষ্টা তিনি, আমাদের পিতৃস্বরূপ, অথচ তিনি 'সহসঃ সূনুঃ'—আমাদেরই দুঃসাহসের বীর্যে জাত; অর্থাৎ অনাদি অথচ প্রজাত অন্তর্যামী আত্মা বা ব্রহ্ম তিনি, তিনি সর্বভূতাধিবাস অদ্বয়স্বরূপ।

দিব্য পুরুষের ব্যবহারও দিব্য। সর্বাবগাহী আত্মসংবিৎ দ্বারাই জানেন তিনি—ব্রহ্ম পরমাত্মা অথবা তাঁরি আত্মরূপী জীবের সঙ্গে কী তাঁর সম্বন্ধ।

সে-সম্বন্ধের বিলাসে আছে শুধু আত্মভাব সংবিৎ বিজ্ঞান শক্তি সংকল্প প্রেম ও আনন্দের ছন্দলীলা। বৈচিত্র্যের শেষ নাই এ-লীলায়, কেননা আত্মারও সামর্থ্যের অন্ত নাই দিব্য পুরুষের নির্মুক্ত চেতনায়। তাই তাদাত্ম্যভাবের অব্যভিচারী অনুভবে সমন্বিত অনন্ত সম্বন্ধের নিরঙ্কুশ বৈচিত্র্যে তাঁর ভোগ হবে সমৃদ্ধ—আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্ভাবিত কোনও সম্বন্ধকেই ছাঁটবার প্রয়োজন হবে না সেখানে। একদিক দিয়ে সে-ভোগ হবে আত্মসমাহিত আত্মারামের দিব্য-সম্ভোগ, আর একদিকে সে বিশ্ববৈচিত্র্যে আত্মবিভাবনারই বিচিত্র আস্বাদন—রূপে-রূপে বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সেই বহুরূপে রমমাণ হবার অনির্বচনীয় উল্লাস। আবার ভেদভাবনায় সর্বভূতের বিবিক্ত অনুভবকে আত্মবৎ সম্ভোগ করা—এই হবে তাঁর আস্বাদনের আর-একটি ভঙ্গি। দিব্য-রতির এই বিপুল সামর্থ্য তাঁতেই সম্ভব ; কেননা তিনি জানেন, তাঁর স্বকীয় কি পরকীয় অনুভব, অথবা অপরের সঙ্গে তাঁর অন্যোন্য-সম্বন্ধ—এসব তাঁরি আত্মস্বরূপ অখণ্ড পরমাত্মার রসোদ্‌গার, তাঁর নিরঙ্কুশ আনন্দের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। ভূতে-ভূতে এক সর্বাধিবাসই 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'—এইটুকুতেই ভেদের আভাস ; কিন্তু তাঁর অখণ্ড সম্ভূতি-সংবিতের পরম অনুভবে সে-আভাসও গেছে মিলিয়ে। এই তাদাত্ম্যবোধেই দিব্য পুরুষের সকল অনুভবের প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর মাঝে নাই খণ্ডিত চেতনার দ্বন্দ্ব,—অবিদ্যা ও বিবিক্ত অহমিকার স্বাভাবিক পরিণাম যা আমাদের চেতনায়। আত্মায়-আত্মায় অন্যোন্য-সম্বন্ধের বৈচিত্র্য তাঁর চেতনায় বেজে উঠবে এক দিব্যরাগিণীর সুষম ঝঙ্কারে—চিন্ময় লীলোচ্ছলতায় পরস্পরকে তারা ছেড়ে গিয়েও জড়িয়ে ধরবে,—মিলিয়ে যাবে এক শাশ্বত স্বরমূর্চ্ছনার অগণিত বীচিভঙ্গে।

দিব্য পুরুষের চেতনায় আত্মভাব বিজ্ঞান ও সঙ্কল্পের বেলাতেও চলবে এই অন্যোন্য-আপ্যায়নের লীলা। তাঁর আনন্দময় অনুভবে স্ফুরিত হচ্ছে চিদানন্দময় আত্মভাবের উল্লাস শুধু ; অদ্বৈতানুভবের ঋতময় প্রশাসনে তার মাঝে তাই প্রজ্ঞার সঙ্গে নাই সঙ্কল্পের বা উভয়ের সঙ্গে আনন্দের কোনও বিরোধ। এমন-কি চেতনার এই ভূমিতে একটি পুরুষের বিজ্ঞান সঙ্কল্প ও আনন্দের সঙ্গে আর-একটি পুরুষের বিজ্ঞান সঙ্কল্প ও আনন্দের দেখা দেবে না কোনও সংঘর্ষ ; কারণ আমাদের খণ্ডসত্তা যাকে জানে সংঘর্ষ ও বৈষম্যের উত্তে-জনা বলে, তাঁদের অখণ্ডানুভব-বাসিত চেতনায় তা ফুটবে এক অনন্তস্বরসঙ্গ-তির বিচিত্র স্বরলীলা হয়ে—যার মাঝে থাকবে শুধু মিলন-সুষমার ছন্দলীলা।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে দিব্য পুরুষের সম্বন্ধ হবে পরম-তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ, কেননা বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চৈতন্যকে আত্মচৈতন্যরূপেই অনুভব করবেন তিনি। তাঁর স্বরূপব্যক্তিতে যে-ব্রহ্মতাদাত্ম্যের অনুভব, ঘটে-ঘটে ব্রহ্মানুভবে ফুটবে তারি বিশ্বোতমুখ বিচ্ছুরণ। ব্রহ্মসংস্পর্শে তাঁর বিজ্ঞান হবে ব্রহ্মেরই সার্বজ্ঞ্যের লীলা, কেননা ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অজ্ঞান, ব্রাহ্মী-চেতনায় তা স্বরূপবোধের বিশ্রান্তিতে জ্ঞানের সংহরণমাত্র,—যাতে তাঁর আত্মবোধের প্রভাস হতে একটি রশ্মি বিকীর্ণ হয়ে আমাদেরই ভিতর দিয়ে দেয় তাঁকে খণ্ডবোধের আস্বাদন। তেমনি দিব্য পুরুষের সঙ্কল্প হবে ব্রহ্মেরই সর্বৈশ্বর্যের লীলা, কেননা ব্রহ্ম শক্তি সঙ্কল্প ও বীর্যস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অশক্তি ও অসামর্থ্য, তাঁর মাঝে তা শক্তির অবিক্ষুব্ধ পুঞ্জভাবে সঙ্কল্পের সংহরণ মাত্র। তারি ফলে চিৎশক্তির বিশেষ-একটা বিভূতি আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে মিতবীর্যের বিশিষ্ট ছন্দে। এমনি করে দিব্য পুরুষের প্রেম ও আনন্দ ব্রহ্মেরই চিন্ময় রসোল্লাস, কেননা ব্রহ্ম প্রেম ও আনন্দস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অপ্রেম ও নিরানন্দ, তাঁর কাছে তা আত্ম-রতির গহন সমুদ্রে হ্লাদিনী-শক্তির অবগাহন মাত্র। দিব্য-সম্প্রয়োগের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি এই ভূমিতেই আনন্দ-সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এ তারি আয়োজন। এমনি করে সম্ভূতির চিত্রলীলায় দিব্য পুরুষের মাঝে ঘটবে ব্রহ্ম-সম্ভাবেরই উচ্ছল রূপায়ণ। আমাদের কাছে যা বিরতি, মৃত্যু বা অত্যন্ত-নাশ, তাঁর অনুভবে সে শুধু সচ্চিদানন্দের শাশ্বত অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চোল্লাসময়ী মায়ার বিশ্রান্তি বৈচিত্র্য বা সংহরণ মাত্র। অথচ অদ্বৈতের এই নিত্যানুভবে দিব্য পুরুষের চেতনা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদে-ভেদের বিলাস হতেও হবে না বঞ্চিত—সে হবে তাঁর অদ্বৈত-রতিরই আর-একটি বিভাব মাত্র। পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে রসিকের হৃদয়ে জাগে যে অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের অনির্বচনীয় রসোদ্গার, দিব্য পুরুষের চেতনায় তার সকল সম্ভাবনাই থাকবে নিরর্গল।

এখন প্রশ্ন এই : কোন্ পরিবেশে, কী সাধনের সহায়ে চরিতার্থ হবে দিব্য পুরুষের এই জীবনায়ন? ব্যবহার-জগতের সকল অনুভবের মূলে আছে বিশিষ্ট কতগুলি সাধনের মধ্যস্থতায় 'সন্ধিনী-শক্তির' একটা রূপায়ণ; তাদের আমরা নাম দিয়েছি—ধর্ম, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্তি। যেমন ব্যবহার-ভূমিতে নামতে হলে মনোধাতুর ব্যাকৃতি চাই—ধর্মগ্রাহিতা, বিষয়াবেক্ষণ,

স্মৃতি, সমবেদনা প্রভৃতি বিচিত্র মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিপরিণামে ; তেমনি ঋত-চিৎ বা অতিমানসেরও পুরুষে-পুরুষে সংযোগসাধনার জন্য চাই অতিমানসী কতগুলি শক্তি বৃত্তি ও ক্রিয়ার উদ্ভাবন, নইলে বৈচিত্র্যের লীলাই হবে না সম্ভবপর। দিব্যজীবনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আবার তুলব অতিমানসী বৃত্তির কথা ; এখন শুধু দেখছি কী তার তাত্ত্বিক ভিত্তি, কীই বা তার যথাযথ স্বভাব ও স্বধর্ম। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট, বিবিক্ত অহংবোধের ও ব্যবহারিক-চেতনায় খণ্ডবৃত্তির অভাব অথবা উচ্ছেদই দিব্য-জীবনসাধনার মূলমন্ত্র,—কেননা এরা আছে বলেই মানুষ মরণধর্মী এবং ব্রাহ্মী স্থিতি হতে বিচ্যুত। ইহুদী শাস্ত্রের ভাষায় ঐ তো আমাদের "আদি দুরিত" —দার্শনিক যার তর্জমা করে বলবেন, এমনি করেই ভ্রষ্ট হয়েছি আমরা শুদ্ধ-চিতের সত্য ও ঋত হতে, তার অখণ্ড-অদ্বয় সৌষম্য হতে। অবিদ্যার অতল গহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবাত্মার শুরু হল যে সংসার-অভিযান, দুঃখের অরণিমন্থনে মানুষের হৃদয়ে সমিদ্ধ হল যে অভীপ্সার বহ্নি-শিখা—এই স্বরূপচ্যুতি সে-তপস্যারই অপরিহার্য সাধন।

## ১৮

# মন ও অতিমানস

তিনি জানতে পারলেন, মনও ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ৩।৪ )

অবিভক্ত তিনি, কিন্তু ভূতে-ভূতে বিভক্ত হয়ে আছেন যেন।

—গীতা ( ১৩।১৭ )

সচ্চিদানন্দের ভূমিতে যে অতিমানসী লীলার অবিকল্প স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন দিব্য পুরুষ, তার স্বরূপসত্যের একটা ধারণা করতে চেয়েছি এতক্ষণ। প্রাকৃত দেহমনের আধারে স্ফুরিত হয়েছে সচ্চিদানন্দের যে-বিগ্রহ, সেই মানুষী চেতনাতেও অতিমানসের প্রকাশ সম্ভব—এই আমাদের আশা। কিন্তু অতিমানসী ভূমির যতটুকু আভাস পেয়েছি, তাতে মনে হয় না আমাদের অভ্যস্ত জীবলীলার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক বা সমতা আছে তার। দেহ আর মনের দুটি ভুবনের মাঝে প্রাণের অন্তরিক্ষলোকে প্রাকৃত-জীবনের উৎস ও আশ্রয় ; তার মাঝে কোথায় আছে অতিমানসের ঠাঁই ? মনে হয় না কি, অতিমানসী চেতনায় বিদেহ 'সত্ত্বেরই' বিলাস শুধু—শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ আনন্দের উল্লাসে আত্মায়-আত্মায় মেশামেশি সে-লোকে ; সেখানে নাই রূপের স্থূল সীমা, জড়বিগ্রহের ভার। ভেদের আভাস আছে সেখানে আত্মায়-আত্মায়, কিন্তু বিগ্রহের সীমাঙ্কিত হয়নি তা এখনও। চেতনা সেখানে আনন্ত্যের প্রমুক্ত উল্লাসে উচ্ছলিত, সান্ত রূপের কারাগারে নয় বন্দী। তাইতো শঙ্কা জাগে, জীবনের যে-একটিমাত্র রূপকে চিনি আমরা, দিব্যজীবনের আবির্ভাব সম্ভব কি তার সঙ্কীর্ণ পরিবেশে—সীমার সঙ্কোচে দেহের রূপায়ণ যেখানে, আর তারি জালে জড়িয়ে আছে প্রাণ, তারি কারাগারে বন্দী রয়েছে মন ?

এ-জগৎ বস্তুত যে অনন্ত পরম সত্তা চিৎশক্তি ও স্বরূপানন্দের উল্লাস, আমাদের মনশ্চেতনা যার বিকৃত ছায়ামাত্র,—তারি একটা মোটামুটি ধারণা করতে চেয়েছি এতক্ষণ। বুঝতে চেয়েছি, কী এই দেবমায়া, এই

ঋতচিৎ, এই সম্ভূত-বিজ্ঞান,—যা দিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক পরমার্থ-সতের চিন্ময়ী মহাশক্তি প্রপঞ্চোল্লাসময় আত্মবিভাবনায় এই বিশ্বের করে কল্পনা, গড়ে রূপ, ঋতের ছন্দে করে তাকে লীলায়িত। পরম পরার্ধে আছে সৎ চিৎ আনন্দ ও দেবমায়ার নিত্যলীলা ; কিন্তু এই দিব্য চতুষ্টয়ীর সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মন-রূপা আমাদের নিত্যপরিচিত পার্থিব ত্রয়ীর কী সম্পর্ক, সে তো জানি না। দ্যুলোকে যেমন আছে 'দেবী মায়া,' ভূলোকে তেমনি আছে বুঝি 'অদেবী মায়া' ; আমাদের সকল কৃচ্ছ্রসাধনা ও সন্তাপের সেই তো নিদান। কিন্তু কী করে ঐ মায়া হতে এই মায়ার হয় রূপায়ণ ? এ-রহস্যের মীমাংসা যতক্ষণ না হবে, হারানো যোগ-সূত্রটি যতক্ষণ না খুঁজে পাব দুয়ের মাঝে, ততক্ষণ বিশ্বও আমাদের কাছে থেকে যাবে রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা—অতএব উত্তর-ভূমির সঙ্গে এই অবর-জীবনের মিলন কখনও সম্ভব কিনা, তাই নিয়েও থাকবে সংশয়ের অবকাশ। জানি, সচ্চিদানন্দ হতেই এ-জগতের বিসৃষ্টি, তিনিই এর অধিষ্ঠান। এ-ধারণাও আসে, জগন্নিবাস তিনি,—বিশ্বের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আত্মা ও প্রভু তিনিই। এ-ও দেখেছি, আমাদের ইন্দ্রিয়ে মনে শক্তিতে সত্তায় যে দ্বন্দ্ববিধুরতা,—সেও তাঁরি আনন্দ, তাঁরি চিন্ময় সংবেগ, তাঁরি দিব্যভাবের মূর্ছনা। কিন্তু তবু মনে হয়, আমাদের এই জীবন-দ্বন্দ্ব কি তাঁর লোকোত্তর তত্ত্বভাবের বিপরীত নয় একেবারে ? যতক্ষণ এই বৈপরীত্যের হেতূচ্ছেদ না হবে, মায়ার অবর-ত্রয়ীর জালে জড়িয়ে থাকব যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধ্যের বাইরে থাকবে না কি দিব্যভাবের অকুণ্ঠিত সিদ্ধি ? তার জন্য এই অবর-সত্তাকে উত্তীর্ণ করা চাই উত্তর-ভূমিতে ; অথবা দৈহ্য-সত্তার বিনিময়ে চাই নির্বিশেষ শুদ্ধ-সত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশক্তির অবিমিশ্র বিলাস, ইন্দ্রিয়-মনের চেতনার বিনিময়ে আনন্দ ও প্রজ্ঞার পরিশুদ্ধ বিকিরণ ; এমনি করে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা চাই চিন্ময় পরমার্থের মাঝে। কিন্তু তাহলেই কি আমাদের এই পার্থিব অথবা সীমিত ভূমিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে উত্তীর্ণ হতে হবে না সত্তার বিপরীত মেরুতে—হয় নির্বিকল্প চিৎস্বভাবের কোনও ভূমিতে, কিংবা সম্ভাবিত কোনও সত্য-লোকে, অথবা দিব্য ভাব, দিব্য বীর্য ও দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল কোনও মহাভূমিতে ?...তাই যদি সত্য হয়, তাহলে মানবতার গণ্ডি পেরিয়েই সিদ্ধ হবে মানব জাতির পরম-পুরুষার্থ। পৃথিবীতে মানব-চেতনার চরম পরিণাম তাহলে অগ্র্যা-ধীর প্রলীয়মান সূক্ষ্মতায় ; সেখান হতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে

হয় অরূপের স্তব্ধ প্রশান্তিতে, অথবা কোনও 'রূপাবচর' ভূমির বিদেহ আনন্দে।

কিন্তু বস্তুত অদিব্য বলি যাকে, সেও তো সেই দিব্য-চতুষ্টয়ীরই স্পন্দ-পরিণাম। ঠিক এই স্পন্দেরই প্রয়োজন ছিল যে রূপের জগৎ গড়ে তুলতে। রূপের বিসৃষ্টি হয়েছে পরমদেবতারই সত্তা চিৎশক্তি ও আনন্দের বুকে—তার বাইরে তো নয়। ব্রহ্মের সম্ভূত-বিজ্ঞানের বিলাস এ রূপের লীলা, এ তো বহিরঙ্গ নয় তার। সুতরাং রূপের জগতে সম্ভব নয় উত্তরজ্যোতির সত্য বিভূতি—এ-কল্পনা একেবারেই অমূলক। যে-মনশ্চেতনা, প্রাণলীলা ও 'রূপধাতুর' 'পরে রূপজগতের একান্ত নির্ভর, তারা যে স্বরূপের বিকৃত রূপায়ণ শুধু, এও সত্য হতে পারে না। সম্ভবত সত্য এই যে, ব্রহ্মেরই তত্ত্ব-রূপের মাঝে পাব আমরা দেহ-প্রাণ-মনের শুদ্ধ-রূপের সন্ধান—তাঁর চেতনার গৌণবৃত্তিরূপে, তাঁরি পরা-শক্তির নিত্য সাধন-সামগ্রীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে। তাই যদি হয়, দেহ-প্রাণ-মনের দিব্য ভাবসিদ্ধি তো অসম্ভব নয় তাহলে। পার্থিব-পরিণামের একটি যুগের বন্ধনীতে তাদের আকৃতি-প্রকৃতির যে-ইতিহাস বিজ্ঞান আজ সামনে ধরেছে, তারি মাঝে হয়ে গেছে জীবদেহে তাদের সকল সম্ভাবনার ইতি—একথাই-বা বলি কোন্ সাহসে? দেহ-প্রাণ-মন বস্তুত দিব্য-ভাবের বিভূতি; দিব্য-সত্যের চেতনা হতে কোনও কারণে বিবিক্ত হয়েই দেখা দিয়েছে তাদের এই অদিব্য বৃত্তি। একবার যদি এ-আড়াল ভেঙে যায় মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্য বীর্যের বিস্ফোরণে, তাহলে তাদের বর্তমান কুণ্ঠিত প্রবৃত্তিতেও আসতে পারে অভাবনীয় এক রূপান্তর। অথচ সে-রূপান্তর অস্বাভাবিকও হবে না, কেননা ঋত-চিতের পরিবেষে আছে তাদের যে স্বভাব-ছন্দের শুদ্ধলীলা, ঊর্ধ্ব-পরিণামের অমোঘ ধারা ধরে তারি প্রকাশ হবে তখন এই মর্ত্য আধারে।

তাহলে মানুষের দেহে-মনে দিব্যভাবের প্রকাশ ও ধারণা শুধু-যে সম্ভব তাই নয়; দিব্যভাবের আবেশে ও ক্রমিক উপচয়ে দেহ-প্রাণ-মনের আমূল রূপান্তরও সাধিত হতে পারে তার সর্বজয়া শক্তিতে,—শাশ্বত সত্যের পরিপূর্ণ প্রতিরূপ হয়েও ফুটতে পারে তারা। তখন শুধু ভাবে নয়, বস্তুতেও—দ্যুলোকের সাম্রাজ্যকে এই পৃথিবীর বুকে সিদ্ধরূপ দেওয়া অসম্ভব হবে না চিৎশক্তির পক্ষে। মানুষের অন্তরে দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠাই তো জয়ন্তী চিৎশক্তির প্রথম অরুণচছটা; এই মর্ত্য ভূমিতেই সে-আলো নেমে এসেছে

বহু সিদ্ধ-চিত্তে দিব্যভাবের ন্যূনাধিক বিচ্ছুরণে। মানুষের বহির্জীবনেও তার প্রতিষ্ঠায় দিব্য জয়শ্রীর উত্তরজ্যোতি যদিও অতীত যুগে নেমে আসেনি ভবিষ্য কল্পনার দিশারী হয়ে, তবু পার্থিব-প্রকৃতির অবচেতনায় আজও স্তব্ধ হয়ে আছে তার ধ্রুবা স্মৃতি। ইশারা তার সেই মহাভবিষ্যের পানে,—ব্রহ্ম যেদিন জয়লাভ করবেন শুধু 'দেবেভ্যঃ' নয়—'মনুষ্যেভ্যঃ'ও। কে বলেছে এই পার্থিব জীবন হর্ষ-শোকে সঙ্কুল ও ক্লিষ্ট-প্রয়াসে নিত্য বিপর্যস্ত হয়েই থাকবে —এই তার নিয়তি? কে বলবে অনুত্তরা সিদ্ধি নয় এর চরম পরিণাম, দিব্য-পুরুষের আনন্দ ও মহিমা এই পৃথিবীর বুকেই হবে না মূর্ত?

এই সমস্যার সমাধান তাহলে প্রয়োজন এখন : পরমার্থত দেহ প্রাণ ও মনের স্বরূপ কী? দিব্য বিভূতির সম্যক স্ফূর্তিতে যখন ধন্য হবে মর্ত্য-জীবন, প্রাকৃত বিবিক্ত-বোধ ও অবিদ্যার সকল বন্ধন খসে গিয়ে পরমসত্যের জ্যোতিরাবেশে সব-কিছু হয়ে উঠবে প্রভাস্বর, তখন দেহ-প্রাণ-মনের পরম তত্ত্ব কী রূপ ধরে ফুটবে এই আধারে—কোন্ মহিমার নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে? দিব্যধামের সিদ্ধ মহিমা এখনও প্রচ্ছন্ন তাদের মাঝে; মর্ত্য আধারে এখনও তার উত্তরসিদ্ধির অভিযাত্রী শুধু। জড় হতে মনের অভিব্যক্তির প্রথম ধাপে রয়েছি বলে মন আমাদের স্ব-ভাবের নির্মুক্ত প্রকাশ খুঁজে পায়নি এখনও। আজও তাকে জড়িয়ে আছে রূপের-মাঝে-সংবৃত চিৎসত্তার কুণ্ঠা ও দৈন্য; দিব্যজ্যোতির যে-ছায়া হতে জড়প্রকৃতিতে অন্ধ অন্নময়-চেতনার আবির্ভাব, তারি মাঝে সে-জ্যোতির আত্মসংহরণের অবর-মায়া এখনও মনকে রেখেছে পঙ্গু করে। পূর্ণতার যে-আদর্শের পানে আমাদের নিত্য প্রসরণ, যে চরম অভ্যুদয় এ-জীবনের দিব্য নিয়তি, তার অখণ্ড রূপটি স্বমহিমায় ফুটে আছে লোকোত্তর সম্ভূত-বিজ্ঞানের মাঝে। তার সিদ্ধ-চেতনার আকর্ষণেই তো আমরা ধীরে-ধীরে দল মেলছি তার পানে—তারি মাঝে। পরম-পুরুষের দিব্য-বিজ্ঞানে চরম অভ্যুদয়ের সিদ্ধসত্তাই তো মানুষের মনশ্চেতনায় জাগায় তথাকথিত আদর্শের এষণা। আমাদের কল্পিত 'আদর্শ' বস্তুত শাশ্বত 'বাস্তবেরই' আ-ভাস; প্রাকৃত ভূমিতে আজও তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি—এইটুকু তার ন্যূনতা। নইলে সে-আদর্শ এমন-কোনও 'অসৎ' পদার্থ নয়—দিব্য-পুরুষের শাশ্বত চেতনায় নাই যার শাশ্বত সিদ্ধরূপ, শুধু আমাদের কুণ্ঠিত কল্পনায় ভেসে উঠেছে যার অস্পষ্ট ছবি, অতএব যার রূপসৃষ্টি একমাত্র আমাদেরই দায়।

মনের পরিচয়ই তাহলে নেওয়া যাক প্রথমে, কেননা কুণ্ঠার নিগড়ে বাঁধা হলেও আজও মনই মানুষের জীবনের অধিনায়ক। মন স্বরূপত চিৎশক্তি; তবু তার ধর্ম—অমেয়কে মিত করে', অখণ্ডকে খণ্ডিত করে' আবার সেই পরিমিত খণ্ডের প্রত্যেকটিকে বিবিক্ত অখণ্ডরূপে ধারণ করা, ব্যবহার করা। স্পষ্টই যা সমগ্রের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, মনের বিকল্পদৃষ্টি ব্যবহারের জগতে তাকেও দেখে একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে—অখণ্ডের একটা অংশ বা বিভাবরূপে নয়; এবং এই দর্শনকেই তার ব্যবহারের ভিত্তি করে সে। মনের মাঝে এ সংস্কার এতই পাকা যে, একটা খণ্ডবস্তুকে তত্ত্ব নয় জেনেও তত্ত্বরূপে ব্যবহার না করে পারে না সে, কারণ তা না হলে মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বস্তুকে আপন বশে আনতে পারে না কিছুতেই। ভাবনা, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা কল্পনার স্থষ্টিলীলা প্রভৃতি মনের যে-কোনও ব্যাপারের 'পরেই আছে এই মানস-ধর্মের শাসন। মন বিষয়কে ভাবে, প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করে যেন একটা বৃহৎ স্তূপ হতে কঠিন মুষ্টিতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে। ঐ মুঠো-মুঠো বস্তুই তার হিসাবের একক বা ধ্রুবমান—তাদের নিয়েই তার স্থষ্টি বা ভোগ। এমনি করে সকল কর্মে সকল ভোগে অখণ্ডকে নিয়ে মনের কারবার হলেও আসলে তারা বৃহত্তর অখণ্ডের একদেশ মাত্র। আবার এই তথাকথিত অখণ্ডকে খণ্ডিত করে' সেই খণ্ডগুলিকে বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে সে দেয় অখণ্ডের মর্যাদা। বিষয়কে নিয়ে তাই হরণ-পূরণ যোগ-বিয়োগের যে-খেলা চলে মনের, সে খণ্ড-গণিতের বাইরে যাবার সাধ্যও তার নাই। স্বধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে অখণ্ডের ধারণা করতে গিয়ে সে যেন হয় দিশাহারা। খণ্ডের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অখণ্ডকে ধরতে যাওয়া—সে তো তার কাছে অস্পর্শ অনন্তের অতল গহনে তলিয়ে যাওয়া; তার মাঝে সে দেখবে কী, ভাববে কী, ধরবে কী, স্থষ্টি আর ভোগের লীলা চলবে সেখানে তার কাকে নিয়ে? অনন্তকে ধরা-ছোঁয়া বা ভোগ করবার কথা ওঠেও যদি মনের বেলায়, বুঝতে হবে সে একটা কথার কথা—অনন্তেরই ছায়াছবি নিয়ে একটা খেলা শুধু। অনন্তের সে অস্পষ্ট ধারণায় আছে বৃহতের একটা আকার-প্রকারহীন অনুভব মাত্র—কোথায় তার মাঝে দেশাতীত অনন্তের বাস্তব প্রত্যয়? আনন্ত্য সব সময়ে অব্যবহার্য, অসম্ভোগ্য তার কাছে। ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে তাকে ভোগ করতে গেলেই আবার দেখা দেয় সেই খণ্ড-করণের অনিবার্য প্রবৃত্তি, আবার শুরু হয় মূর্তি নিয়ে রূপ নিয়ে কথা নিয়ে মনের কারবার। বস্তুত অনন্তকে

ধারণা বা ভোগ করা অসম্ভব মনের পক্ষে ; সে শুধু পারে অনন্তের ছোঁয়ায় এলিয়ে পড়তে, তার দ্বারা আবিষ্ট ও ভুক্ত হতে। দিব্য-ভূমির অগম গহন হতে ঝরে পড়ছে পরমসত্যের জ্যোতির্ময়ী ছায়ার মায়া ; সেই রভসে অবশ হয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলা—এইটুকুই মন পারে শুধু। অতিমানসের ভূমিতে না উঠলে সম্ভব হয় না আনন্ত্যের সত্য সম্ভোগ ; এমন-কি তার বিজ্ঞানও সম্ভব নয়—মন যদি অসাড় হয়ে নিজেকে না সঁপে দেয় ঋতচিন্ময় পরমসত্যের পরা-বাণীর শক্তিপাতের কাছে।

এই স্বারসিক সঙ্কুচিত প্রবৃত্তিই মনের স্বরূপ ; এতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার স্বভাব ও স্বধর্ম।. দিব্য-পুরুষের এই তো প্রশাসন তার ’পরে—পরা-মায়ার পূর্ণলীলায় এইটুকু তার স্বাধিকার। তার স্বরূপসত্য দিয়েই নিরূপিত হয়েছে এই স্বাধিকার এবং সে-সত্য স্বয়ম্ভূ-সতের শাশ্বত আত্ম-ভাবনারই একটি ছন্দ ; সেই ছন্দ হতেই মনের আবির্ভাব। অনন্তকে তর্জমা করবে সে সান্তের সংজ্ঞায়, তাকে মিত সীমিত খণ্ডিত করবে—এই তার কাজ। সত্যি বলতে অনন্তের সমস্ত তাত্ত্বিক প্রত্যয়কে বিলুপ্ত করে দিয়ে এই কাজই করছে সে আমাদের চেতনায়। তাই তো মন হল মূলা-অবিদ্যার আদিবিন্দু, কেননা বিভাগ ও বিক্ষেপের সে-ই তো প্রবর্তক। এইজন্যই কেউ-কেউ ভুল করে ভেবেছেন,—মনই বিশ্বের প্রসূতি, দেবমায়ার সবটুকু শুধু মনের লীলা। কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে দেবমায়ার মাঝে। আমরা ভাবি, সান্তভাব অবিদ্যারই খেলা বুঝি। কিন্তু একটা কথা খুব স্পষ্ট, —সান্ত অনন্তেরই প্রতিভাস, তারি বিসৃষ্টি, তারি ভাবের রূপায়ণ। অনন্তের সত্তা এবং আয়তনে তাকেই প্রতিষ্ঠা জেনে সান্তের প্রকাশ—অনন্তেরই স্বরূপ-শক্তির লীলায়নে। অতএব ব্রাহ্মী-চেতনার এমন-একটা অনাদি বিভাব নিশ্চয় আছে, যার মাঝে সামরস্যে বিধৃত রয়েছে সান্ত আর অনন্ত, দুয়ের অন্যোন্য-সম্বন্ধের সকল তত্ত্বই ভাসছে সেখানে এক পরম জ্ঞানে। অবিদ্যার সত্তা সম্ভব নয় সে-চেতনায়, কেননা সেখানে অনন্তের অপরোক্ষ অনুভবে সান্ত বিচ্ছিন্ন হয়নি অনন্ত হতে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে। অথচ তার মাঝে আছে সঙ্কোচ-সাধনার একটা গৌণ-লীলা, নতুবা বিশ্বের বিসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সেই সঙ্কোচের বৃত্তিই ফোটে মনশ্চেতনায়, ভেঙে জোড়া দেওয়া যার স্বভাব ; ফোটে প্রাণের লীলায়, যার মাঝে নিত্য চলছে পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা ; ফোটে জড়-বস্তুর আণবিকতায়, অনন্ত বিভাজন আর স্বয়ং-

সঙ্কলনের যুগ্মলীলা যার মাঝে। অথচ এ-সবারই মূলে আছে এক অখণ্ড তত্ত্বভাবের অনাদি স্পন্দন। পরমার্থ-চেতনায় এই-যে শাশ্বত কবি-ক্রতু ও পরম মনীষার গৌণ-লীলা,—যার মাঝে আছে আত্মসংবিৎ ও সর্ব-সংবিতের পূর্ণজ্যোতি, কৃতি যেখানে প্রজ্ঞার বিলাস, সান্তের বিসৃষ্টিতে আনন্ত্যের চেতনা মুহূর্তের তরেও যেখানে নয় অবলুপ্ত—তাকে বলা যেতে পারে দিব্যমানস। স্পষ্টই বোঝা যায়, দিব্যমানস অতিমানসের স্বয়ম্ভূ-লীলার অবিনাভূত একটা গৌণ বিভূতি। তাই অতিমানসের সংজ্ঞান বা সম্ভূতি-সংবিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই ঋত-চিতের প্রজ্ঞান বা বিভূতি-সংবিতের লীলায়নে দেখা দেয় তার প্রবর্তনা।

বিশ্বকে আমরা জানি এক অখণ্ড সর্বস্বরূপের আত্ম-কৃতির পরিণাম বলে। সে-কৃতির যেমন তিনি কর্তা এবং রূপকার, তেমনি তার ভর্তা এবং সাক্ষীরূপে প্রবর্তক ও জ্ঞাতাও তিনি। নির্মাণ-প্রজ্ঞার বিষয় ও বিলাসরূপে আত্মকৃতিকে ফুটিয়ে তোলা তাঁর চেতনায়—এই হল প্রজ্ঞানের কাজ। কবি যেমন আত্মচেতনার সৃষ্টিকে সামনে রাখে স্রষ্টা ও সৃষ্টিশক্তি হতে বিবিক্ত একটা সত্তারূপে, এও কতকটা তেমনি যেন; অথচ কবির কল্পনা সর্বত্র তার আত্মরূপায়ণের লীলামাত্র এবং কল্পক থেকে কল্পনাকে পৃথক করাও সম্ভব নয় কোনমতেই। এমনি করে প্রজ্ঞানের প্রবর্তনায় পুরুষ আর প্রকৃতির বিবেকে হয় ভেদের প্রথম সূচনা এবং ক্রমে তাই পল্লবিত হয় বিশ্বরূপে। পুরুষ দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, তাঁরি দৃষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিধান; প্রকৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও চক্ষুরূপা, তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা ও সর্ববিধায়িকা শক্তি। দুয়েরই এক ভাব, এক সত্তা; তাঁদের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে যে-রূপ ফোটে, তারা ঐ অদ্বৈতভাবেরই বহুধা রূপায়ণ। প্রজ্ঞারূপী পুরুষ নিজেই প্রজ্ঞাতারূপী নিজের সামনে ধরছেন সেই রূপের মেলা—তিনি নিজেই শক্তি, নিজেই 'শক্ত'। একে বলতে পারি প্রজ্ঞানের মধ্যকল্প। শেষ কল্পে, পুরুষ আত্মসত্তার চিন্ময় প্রসারে ছড়িয়ে পড়েও তার প্রতি বিন্দুতে হন প্রদ্যোতিত, প্রতি রূপে হন বিলসিত; অথচ বিন্দুঘন চেতনার অক্ষি দিয়ে প্রতি ব্যষ্টি-ভূমিকায় থেকে সমষ্টিকে দর্শন করেন বিবিক্তভাবে যেন। এমনি করে প্রতি জীবাত্মায় নিহিত তাঁরি প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের বিশেষ ছন্দময় দৃষ্টি দিয়ে নিরূপিত করেন অপর জীবাত্মার সঙ্গে তার সম্বন্ধ।

এমনি করে হয়েছে খণ্ডভাবের সৃষ্টি। প্রথমত অখণ্ডের অনন্ত ব্যঞ্জনা অসীম দেশ ও কালের ভাবনায় হল প্রসারিত; দ্বিতীয়ত সেই চিন্ময় স্বতঃ-

প্রসারে অখণ্ডের সর্বগত মহিমা অগণিত চিদ্‌বিন্দুরূপে হল রোমাঞ্চিত—আমরা যাদের জানি সাংখ্যের 'বহুপুরুষ' বলে; তৃতীয়ত পুরুষের সেই বহুত্ব অন্বয়-ভাবের অখণ্ড ব্যাপ্তিকে রূপান্তরিত করল বহুধা-খণ্ডিত 'ভোগায়তনের' কল্পনায়। খণ্ড-আয়তনের এ-কল্পনা বস্তুত অপরিহার্য; কারণ বহুপুরুষের প্রত্যেকেই নন স্বতন্ত্র জগতের অধিষ্ঠাতা, তাঁদের প্রকৃতি বিভিন্ন নয় বলে বিভিন্ন ভোগ্য জগতের সৃষ্টি হচেছ না তাঁদের জন্য। একই প্রকৃতির ভোক্তা তাঁরা সবাই, কেননা আত্মশক্তির বহুধা বিসৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত একই অন্বয়স্বরূপের চিদ্‌বিভূতি তাঁরা। অথচ এক প্রকৃতিই ভোগ্য বিশ্বের জননী বলে পুরুষে-পুরুষে অন্যোন্য-সম্বন্ধও অপরিহার্য। প্রতি রূপে অভিনিবিষ্ট পুরুষের অবিবেক ঘটে সেই রূপের সঙ্গে এবং তাইতে একটি রূপের মাঝে নিজকে সীমিত করে তাঁরি অন্যান্য রূপকে বিবিক্তভাবে দেখেন তিনি অপরাপর আত্মভাবের আধাররূপে। অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে 'ভাবাদ্বৈত' থাকলেও 'ক্রিয়াদ্বৈত' তাঁর নাই, কেননা তাঁর অনুভবে সম্বন্ধ অধিকার গতি ও দৃষ্টির বৈচিত্র্যে সবাই পরস্পর বিভিন্ন তাঁরা। অথচ বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে এক অখণ্ড সদ্বস্তুরই শক্তি চেতনা ও আনন্দকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলছেন ব্যবহারে। অবশ্য বলা চলে: ব্রাহ্মী-স্থিতিতে পরিপূর্ণ আত্মসংবিৎ রয়েছে নিত্যজাগ্রত; অতএব বহুপুরুষের কল্পনায় সেখানে সূচিত হয় না সত্যিকার সীমার বন্ধন, কেননা রূপের অধ্যাস তো পুরুষকে অমোচন শৃঙ্খলে বন্দী করে না সে-ভূমিতে—প্রাকৃত জীবের মত। প্রাকৃত-ভূমিতে দেহাত্মবোধের জালে জড়িয়ে গিয়ে ব্যষ্টি অহন্তার সঙ্কোচকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি না কোনমতেই। চেতনায় কালের একটা বিশিষ্ট প্রবাহ বয়ে চলেছে দেশের একটা বিশিষ্ট ভূমিকায়,—সে-বিশেষের বন্ধন আমাদের অনতিক্রমণীয়। কিন্তু ব্রাহ্মী-স্থিতিতে তো এমন দুরপনেয় নয় সীমারেখার কুণ্ডলী।...নয় সত্য, কিন্তু তবু একটা কথা আছে। বন্ধন সেখানে অবিদ্যাকল্পিত না হলেও সে তো বন্ধনেরই পূর্বাভাস। মুহূর্তে-মুহূর্তে একটা অবিবেকের খেলা চলছেই সেখানে, যদিও তার মাঝে আছে স্বাতন্ত্র্যের নিরঙ্কুশতা; কেননা দিব্যপুরুষের অব্যভিচারী আত্মসংবিৎ কিছুতেই সেখানে বাঁধা পড়ে না বিবিক্তভাব ও কাল-কলনার আড়ষ্ট শৃঙ্খলে আমাদের মত।

তাই খণ্ডলীলার সূচনা হয়েছে সেখান থেকেই। আত্মভাবের খেলা সেখানে, তবু তার মাঝে দেখা দিয়েছে ভেদের একটা আভাস যেন। রূপের

সঙ্গে রূপের, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ ঘটছে বটে ; তাহলেও তারা যেন এক-একটা পৃথক ভাব, পৃথক শক্তি, পৃথক চেতনা। এখনও তারা "যেন" পৃথক ; কেননা দিব্য-পুরুষের মাঝে নাই মোহ,—সব-কিছুকেই জানেন তিনি এক অপ্রচ্যুত সদ্‌ভাবের বিভূতি বলে, সেই সদ্‌ভাবের সত্যেই বিধৃত তাঁর সত্তা। অখণ্ড ভাবের নিত্যজাগ্রত চেতনা হতেও স্খলিত নন তিনি : মনের লীলা তাঁর মাঝে অনন্ত বিজ্ঞানেরই গৌণ-বৃত্তি—আনন্ত্যের অপরোক্ষ-অনুভবের ভূমিকাতে বস্তুর বিশিষ্ট বোধের আভাস তাতে। অখণ্ড সমগ্রতাই যে বস্তুর স্বরূপ, তা জেনেও সীমার বেষ্টনী রচে তাঁর মন। অথচ তাতে সমগ্রতার বোধ ক্ষুণ্ণ হয় না তাঁর, কেননা সে-বোধে নাই খণ্ডের সঙ্কলন ও সমাহারে গড়ে-তোলা বহু-সমন্বিত সমগ্রতার ভান শুধু—প্রাকৃত-মনের মত। অতএব সীমার বন্ধন বাস্তব নয় দিব্য-পুরুষের চেতনায়। পুরুষের মাঝে আছে আত্মবিশেষণের যে-সামর্থ্য, তাকেই তিনি প্রয়োগ করেন সুবিবিক্ত রূপ ও শক্তির বিসৃষ্টিতে—আত্মস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।

দিব্য-পুরুষের মন সঙ্কোচের কর্তা, অতএব স্ব-তন্ত্র। কিন্তু প্রাকৃত মন সঙ্কোচের কর্ম, অতএব পরতন্ত্র। দিব্য মন গুণাধীশ, গুণলীলাতেও স্বরূপদৃষ্টি আচ্ছন্ন নয় তার ; কিন্তু প্রাকৃত মন গুণাধীন, নিজের গুণের জালেই জড়িয়ে যায় সে, নিজেই নিজকে করে প্রবঞ্চিত। অতএব দিব্য মন হতে প্রাকৃত মনের পরিণাম ঘটাতে হলে চাই একটা নূতন উপাদান, চিৎশক্তির একটা নতুন ধরনের খেলা। এই নূতন উপাদানটি হল অবিদ্যা বা চেতনার আত্মাবরণী বৃত্তি, যা মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে অতিমানসের ক্রিয়া হতে,—যদিও অতিমানসই মনের উৎস এবং এখনও আড়ালে থেকে নিয়ন্তা তার। অতিমানস হতে বিযুক্ত হয়ে মন তাই দেখে শুধু বিশেষকে, সামান্যকে নয় ; বড়জোর সামান্যের একটা বিকল্প-প্রত্যয়ের 'পরে বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করে সে, কিন্তু সামান্য আর বিশেষ উভয়কেই আনন্ত্যের বিভূতিরূপে ধারণা করতে পারে না কখনও। এমনি করে দেখা দেয় সঙ্কুচিত প্রাকৃত-মন, যার কাছে প্রতিভাস মাত্রেই একটা তত্ত্ববস্তু—একটা সমষ্টির বিবিক্ত অংশরূপে। কিন্তু সমষ্টির বোধও বিশুদ্ধ আনন্ত্যের বোধ জাগায় না মনের মাঝে, কেননা একটা সমষ্টিকে দেখে সে বৃহত্তর আর-একটা সমষ্টির বিবিক্ত অংশরূপেই। এমনি করে ব্যষ্টির সমাহারে সমষ্টির কল্পনাকে ইচ্ছামত বাড়িয়ে চলেও অখণ্ডের অপরোক্ষ-অনুভবে পৌঁছতে পারে না সে কোনকালেই।

# মন ও অতিমানস

মন বস্তুত অনন্তেরই বিভূতি; তাই টুকরো করা আর জোড়া দেবার কাজও তার অন্তহীন। অখণ্ড সত্তাকে বহুধা-কল্পিত সমষ্টিতে খণ্ডিত করে তাদের আবার ভাঙে সে ক্ষুদ্রতর সমষ্টিতে; এমনি করে ভেঙে-ভেঙে পরমাণুতে পৌঁছে তাকেও ভেঙে করে সে অতি-পরমাণু,—কিন্তু তবুও ভাঙার ঝোঁক থামে না তার। পারলে অতিপরমাণুকেও গুঁড়িয়ে সে মিলিয়ে দিত শূন্যতায়। কিন্তু মন তা পারে না; কেননা তার এই ভাঙনের লীলার অন্তরালে আছে অতিমানস বিজ্ঞানের আবেশ। অতিমানস জানে, প্রত্যেকটি সমষ্টি, এমন-কি প্রতিটি পরমাণু অখণ্ড সৎ-চিৎ-শক্তিরই একটা ঘন-বিগ্রহ, তারি আত্মপ্রতিভাসের একটা প্রতীক। সমষ্টিকে ভেঙে-ভেঙে অন্তহীন শূন্যতায় পর্যবসিত ক'রে মনের যে প্রলয়-সাধনা, অতিমানস তাকে জানে বিন্দু-ঘন চিৎসত্তারই আত্মপ্রতিভাস হতে আত্মস্বরূপের আনন্ত্যের মাঝে আবার ফিরে আসা বলে। বাস্তবিক, যে-পথ ধরেই চলুক মন, 'অণোরণীয়ান্' বা 'মহতো মহীয়ান' যার পানেই হোক তার অভিসার, শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে সে নিজেরই মাঝে—নিজেরই অন্তহীন অখণ্ডতায়, নিজেরই শাশ্বত স্বরূপ-সত্তায়। এই তো অতিমানসের সিদ্ধ বিজ্ঞান। মনের বৃত্তি যখন সচেতন ভাবে নিজেকে সঁপে দেয় এই বিজ্ঞানের আবেশের মাঝে, তখন অমনীভাবের ঐ রহস্যের ঢাকাও খুলে যায় তার কাছে। তখন সে জানে, অখণ্ডের মাঝে বাস্তবিক কোথাও নাই খণ্ডভাব, আছে শুধু এক অবিভক্ত সত্তার মাঝে অনন্ত-বিচিত্র বিন্দুঘন রূপায়ণের মেলা এবং সম্বন্ধের বিচিত্র ছন্দে অন্যোন্যবিলাস তাদের। খণ্ডভাব তার মাঝে গৌণ একটা প্রতিভাস মাত্র—দেশ ও কালের ভূমিকায় অখণ্ডকে লীলায়িত করবার একটা অপরিহার্য কৌশল। কেননা ভাঙতে-ভাঙতে অণোরণীয়ান অতি-পরমাণুতেও যদি পেঁাছও গিয়ে; অথবা জুড়তে-জুড়তে পৌঁছও মহতো-মহীয়ান অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অকল্পনীয় বৈপুল্যে, তবু বলতে পারবে না কোথাও গিয়ে বস্তুর তত্ত্বরূপটিকে ধরতে পেরেছ তুমি। মনের তত্ত্বৈষণাকে পরাভূত করে সবার পিছন থেকে উঁকি দেবে অনির্বচনীয়া এক মহাশক্তি—অণু হতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যার তরঙ্গলীলা শুধু। একমাত্র সে-ই বাস্তব, আর-সমস্তই তার স্বয়ম্ভূ জগন্মূর্তি, তার আত্মরূপায়ণের উল্লাস, তার অন্তহীন শাশ্বত চিদ্বিলাস।

কোথা হতে তবে এল এই সঙ্কোচনী অবিদ্যা, অতিমানস হতে মনের এই অবস্খলন, এবং তার ফলে বাস্তব খণ্ডলীলার এই আতুর কল্পনা?

অতিমানসের এ কোন্ তির্যক বিলাস ?···এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সম্ভব। জীবভূত ব্যষ্টিচেতনা যখন অন্যভূমির কথা ভুলে সব-কিছুকে দেখে নিজের ভূমি থেকে শুধু; অর্থাৎ বিন্দুঘন চেতনা যখন অন্যব্যাবৃত্ত হয়ে বিশিষ্ট দেশ ও কালদ্বারা সীমিত নিজের একটি বিভাবকেই মনে করে তার সমগ্র আত্মভাব,—তখনই তার মাঝে দেখা দেয় অবিদ্যার খেলা। জীব তখন ভুলে যায়, অপর জীবও তার আত্মস্বরূপ, অপরের কর্মও তারি কর্ম। কালের একটি বিশেষ ধারায়, দেশের বিশেষ ভূমিকায় রূপের একটি বিশিষ্ট ব্যাকৃতিকেই জানে সে নিজস্ব বলে,—সে-ও যেমন সত্য; তেমনি অন্যান্য আধারে ও ভূমিতে স্ফুরিত সত্তা ও চেতনার সকল বিভাবই নিজস্ব তার, একথাও তো সত্য। কিন্তু তবুও সে একটি ক্ষণকে, একটি ক্ষেত্রকে, একটি রূপকে, বিশ্বগতির একটি ছন্দকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে আর-সবাইকে ফেলে হারিয়ে! অথচ অন্তরের অন্তর্গূঢ় প্রেরণায় হারানো অখণ্ডকে আবার ফিরে পেতে চায় সে—ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুকে জুড়ে দীর্ঘায়ত দেশকালের কল্পনায় এবং তাদেরই ভূমিকায় একে-একে সাজিয়ে তুলে রূপের মেলা, দুলিয়ে দিয়ে গতির দোলা। এমনি করেই কিন্তু ঢাকা পড়ে যায় তার কাছে অখণ্ড কালের সত্য, অবিভাজ্য শক্তি ও বস্তুর তত্ত্ব। এমন-কি, সব মন যে এক পরম মনেরই বিভিন্ন স্থিতি মাত্র, সব প্রাণ যে এক প্রাণ-গঙ্গোত্রীরই সহস্রধারা, সব দেহ ও আধার যে এক অখণ্ড শক্তি ও চেতনার ধাতুতেই গড়া—আপাত-স্থাণত্বের বিচিত্র পিণ্ডভাবের লীলায়,—এই সহজ সত্যটাকেও ভুলে যায় সে। কিন্তু সত্যি বলতে কোথায় স্থাণুত্ব ? সকল পিণ্ডের মাঝেই তো চলছে এক অবিরত স্পন্দনের ঘূর্ণাবর্ত. যা একটি রূপেরই আবৃত্তি করে চলেছে রূপান্তরের আড়াল দিয়ে। কিন্তু মন চায় নিরূপিত আকারের আড়ষ্ট রেখায় বন্দী ক'রে আপাত নিশ্চল-নির্বিকার বহিরঙ্গ নির্মিত্তের জালে জড়িয়ে রাখতে সবাইকে, নইলে যে কাজ চলেনা তার। সে ভাবে, তার চাওয়া বুঝি পাওয়াতে সত্য হল এমনি করেই। কিন্তু বাস্তবিক জগৎ জুড়ে চলছে কেবল অবিরাম ভাঙা-গড়ার লীলা, তার মাঝে কোনও রূপই তো নয় তাত্ত্বিক, বাইরের কোন নির্মিত্তই তো নয় নির্বিকার। একমাত্র শাশ্বত সম্ভূত-বিজ্ঞানই আছে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে; এই নিত্য-চঞ্চল ঘূর্ণির মাঝে রূপের রেখা আর সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে সে-ই বেঁধে রেখেছে অবিচল ঋতের ছন্দে। সেই ছন্দনিষ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ করতে চায় প্রাকৃত-মন নিত্যচঞ্চলের মাঝে অচঞ্চলের আরোপ

করে। বিশ্বের ঐ তত্ত্বরূপটিই আবার খুঁজে পেতে হবে মনকে। তার খবর যে রাখেনা সে, এমন নয়; কিন্তু সে-জ্ঞান লুকানো আছে চেতনার গভীর গুহায়, তার আত্মভাবের মণি-কোঠায়। ব্যবহারের জগতে আড়াল করেছে তার আলো-কে মনের নিজেরই অবিদ্যা; কেননা মনের বিভাজক বৃত্তি বিভক্ত-স্থিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এখানে, তাই আপন সৃষ্টির জালে আপনিই সে জড়িয়ে গেছে অতিমানসের ভূমি হতে স্খলিত হয়ে।

দেহাত্মবোধের সঙ্গে-সঙ্গে আরও ঘনিয়ে ওঠে অবিদ্যার ঘোর। আমরা ভাবি দেহই বুঝি মনের নিয়ন্তা, কেননা দেহের সঙ্গেই সকল সময়ে তার মাখামাখি। স্থূল জগতে মনের বহিশ্চর চেতনার লীলা দেহের ক্রিয়াকে বাহন করে চলছে; অতএব তাকে ছাড়িয়ে যাবার কল্পনাও করতে পারে না সে। নিজেকে দেহের আধারে উন্মিষিত করতে গিয়ে মস্তিষ্ক ও নাড়ীচক্রের যে-জড়যন্ত্রটি গড়ে তুলেছে, তাকে নিয়ে এমনই মত্ত সে যে নিজের 'অসঙ্কীর্ণ' শুদ্ধ-বৃত্তির পানে ফিরে তাকানোর অবসরটুকুও তার নাই। শুদ্ধ-মনের খেলা প্রাকৃত-মনে তাই তলিয়ে গেছে অবচেতনার গহনে। কিন্তু দেহাত্মবোধ প্রকৃতি-পরিণামের পর্ববিশেষে জীবের অলঙ্ঘ্য নিয়তি হলেও, তাকে ছাড়িয়ে অসম্ভব নয় এক শুদ্ধ প্রাণময় মন বা প্রাণময় সত্তার কল্পনা। সে বিদেহ মন প্রত্যক্ষ অনুভব করবে,—দেহের পরে দেহ ধারণ করে চলেছে সে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায়, প্রতি দেহে বিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হয়ে দেহের নাশেই মিলিয়ে যাওয়া—এই নয় তার নিয়তি। বস্তুত দেহের জন্মের সঙ্গে যে-মনকে জন্মাতে দেখি, সে তো জড়ের 'পরে মনের একটা স্থূল ছাপ শুধু। তাকে বলতে পারি দৈহ্য-মানস, পুরোপুরি মনোময়-পুরুষও নয় সে। এই দৈহ্য-মানস আসল মনের বহির্ভাগ মাত্র—যাকে আমাদের মনঃসত্ত্ব মেলে ধরেছে জড়জগতের অভিঘাতের পানে। এই মর্ত্য আধারেই আছে আর-একটি মন আমাদের অবচেতনা বা অধিচেতনার আড়ালে, নিজকে জানে সে বিদেহ বলে। প্রাকৃত-মনের মত এত স্থূল নয় তার চলন; বহিশ্চর মনে যখনই দেখা দেয় কোনও বৃহৎ গভীর ও প্রবল বৃত্তির উল্লাস, তখন তার উৎস থাকে সাধারণত ঐ মনেই। ঐ গুহাশায়ী মনের অনুভব অথবা প্রভাব চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন, তখনই আমরা পাই অন্তর্যামী 'পুরুষের' প্রথম অনুভূতি।*

---

* আমরা অনুভব করি তাঁকে 'প্রাণময় পুরুষ'-রূপে।

দেহের প্রমাদ হতে মুক্তি দিলেও মনের প্রমাদ হতে কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় না আমাদের এই প্রাণময় মানস। এখনও তাকে ছেয়ে আছে অবিদ্যার সেই মৌলিক বৃত্তি, যার ফলে জীবব্যক্তি জগৎকে দেখে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তার কাছে বিষয়-মাত্রেই বহির্বৃত্ত ; দেশ-কালের যে বিবিক্ত চেতনাকে নিজস্ব বলে জানে সে, তারি ভূমিকায় ফুটে ওঠে তারা অতীত ও বর্তমান অনুভবের বিশিষ্ট আকার এবং সংস্কারের রূপ-রেখায়। বিষয়ের এই পরিচয়কেই জানে সে সত্য বলে। ভূতে-ভূতে তার আত্মস্বরূপের অপর বিভূতিকে প্রাণময়-পুরুষ চেনে শুধু তাদের বহির্ব্যক্ত ইশারাতেই। চিন্তায় কথায় কর্মে বা 'অনুভাবে' নিজের যে-পরিচয়টুকু বাইরে ফুটিয়ে তোলে তারা, অথবা অন্নময়-কোশের অগোচর প্রাণের সূক্ষ্ম সংস্পর্শ থেকে বিকীর্ণ হয় যোগাযোগের যে-আভাসটুকু—অপরকে জানতে তার বাইরে আর-কোনও সাধন নাই প্রাণময়-পুরুষের। তেমনি নিজেকেও পুরোপুরি জানে না সে ; কারণ, কালস্রোতে প্রবহমান জীবন-পরম্পরায় একই শক্তি বিচিত্র বিগ্রহে মূর্ত হয়ে উঠেছে বার-বার—একেই সে জানে তার স্বরূপ বলে। প্রাকৃত করণ-মন দেহ-বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত যেমন, তেমনি এই অবচেতন জঙ্গম-মনও বিভ্রান্ত হয়েছে প্রাণ-বুদ্ধিতে। প্রাণের মাঝে আবিষ্ট ও সমাহিত সে—প্রাণদ্বারাই সে সীমিত, তারি সঙ্গে সে একাত্মক। অতএব এই মহলেও আমরা খুঁজে পাই না মন ও অতিমানসের সেই সন্ধিভূমিটি, যেখান থেকে দুয়ের মাঝে জেগেছে বিচ্ছেদের প্রথম আভাস।

কিন্তু এই প্রাণচঞ্চল জঙ্গম-মনেরও পরে আছে প্রাণের আবেশ ও দুরাগ্রহ হতে মুক্ত আর-একটা স্বচ্ছতর ভাবময় মানস। সে জানে, দেহ আর প্রাণকে স্বীকার করেছে সে, তার ভাব ও সঙ্কল্পকে বীর্যের সমুল্লাসে মূর্ত করবে বলেই। এই মনই বিশুদ্ধ 'মন্তা' আমাদের মাঝে। সে জানে কী তার তত্ত্বরূপ, তাই জগৎকে দেখে সে দেহ আর প্রাণের সত্য বলে নয়—মনের সত্য বলে। এই 'মনোময়-পুরুষকেই' অন্তরাবৃত্ত হয়ে দেখি যখন, তখন কখনও কখনও ভুল করে ভাবি তাকে নিরঞ্জন পুরুষ বলে,—যেমন জঙ্গম-মনকে ঘুলিয়ে ফেলি শুদ্ধ-জীবের সঙ্গে। উর্ধ্বভূমির এই মন অপর জীবকে জানে এবং বোঝে তার বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপেরই বিভূতি-রূপে। তাদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয় নিছক ভাবের অভিঘাত ও সংক্রমণে,—শুধু প্রাণ ও নাড়ী-চক্রের সংবেদনে অথবা দেহের স্থূল ইশারাতে নয়। অখণ্ডভাবের একটা

মনোময় রূপও আছে তার ভাণ্ডারে। তা ছাড়া তার প্রবৃত্তি ও সঙ্কল্পের মাঝে আছে সৃষ্টি ও আবেশের একটা অপরোক্ষ-সামর্থ্য—প্রাকৃত স্থূল ব্যবহারে যার পরিচয় গৌণ এবং কুণ্ঠিত। শুধু নিজের সত্তাতেই নয়—অপরের প্রাণে-মনেও ছড়িয়ে পড়ে সে-সিসৃক্ষার সংবেগ। তবু মনের সেই অনাদি প্রমাদ হতে এই শুদ্ধ-মানসও মুক্ত নয় পুরোপুরি, কারণ তার বিবিক্ত মানস-সত্তাকেই বিশ্বের কেন্দ্র সাক্ষী ও ধাতা করে পৌঁছতে চায় সে তার স্বরূপসত্যের উত্তর-ভূমিতে। তার জগতে সে নিজে ছাড়া আর-সবাই ব্যূহ রচে তাকেই ঘিরে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যের আহ্বান আসে যখন, তখন প্রাণ ও মনের বিকল্প হতে নিজেকে তার গুটিয়ে নিতে হয় অখণ্ডের তত্ত্বরূপে তলিয়ে যাবার জন্য। এতেই বোঝা যায়, এখনও মন আর অতিমানসের মাঝে সরে যায়নি অবিদ্যার যবনিকা ; তাই তার ভিতর দিয়ে এপারে পৌঁছয় সত্যের একটা কল্প-রূপ, তার আত্ম-রূপ নয়।

অবিদ্যার এই আবরণ বিদীর্ণ হয়ে উত্তর-জ্যোতির আলোকসম্পাতে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে খণ্ডিত মন, অতিমানসের শক্তিপ্রবাহের কাছে নিঃশব্দ স্তব্ধতায় এলিয়ে পড়ে তার চেতনা, তখনই সে পায় সত্যদর্শনের অধিকার। তখন দেখি, এই মনেরই মাঝে জেগেছে বিচারের জ্যোতির্ময় 'বৈশারদ্য'—সম্ভূত-বিজ্ঞানের দিব্য আবেশের বাহন ও সাধনরূপে। তখনই বুঝতে পারি, *জগতের স্বরূপ কী ; সর্বতোভাবে তখন নিজেকে জানি পরের মাঝে পরের* রূপে, পরকে জানি নিজের রূপে—এবং সবাইকে জানি বিশ্বরূপে অখণ্ডেরই আত্মবিচ্ছুরণ বলে। ব্যক্তি-সত্তার যে-বিবিক্ততা ছিল সর্ববিধ সঙ্কোচ এবং প্রমাদের মূল, কোথায় মিলিয়ে যায় তার কঠিন আড়ষ্টতা। অথচ দেখি, অবিদ্যাচ্ছন্ন মন যা-কিছু জেনেছিল সত্য বলে, তত্ত্বত তা সত্য হলেও সত্যের একটা বিকৃত প্রমাদদুষ্ট বিকল্পনাই ফুটেছিল তার মধ্যে। দেখি, এখনও আছে খণ্ডভাব, আছে ব্যষ্টিভাবনা,—তেমনি চলছে আণবিক বিসৃষ্টির লীলা ; কিন্তু তাদের তত্ত্বরূপ আর অনাবৃত নয় আমাদের কাছে। আমরা কী তা যেমন জানি, তেমনি জানি তারাও কী। তখন বুঝি, মন ঋত-চিতের একটা গৌণবৃত্তি, তার সিসৃক্ষার একটা সাধন,—এই তার সত্য পরিচয়। দিব্য-ঈশনার জ্যোতির্ময় পরিবেশের মাঝে মনের স্বানুভব অপ্রমত্ত থাকে যতক্ষণ, যতক্ষণ তার মাঝে জাগে না বিবিক্ত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা, শুধু নিমিত্তরূপে সেই ঈশনার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েই তৃপ্ত থাকে সে স্বার্থপর আত্মসম্পূর্তির

প্রয়াস ছেড়ে,—ততক্ষণ মনের 'স্বনুষ্ঠিত' স্বধর্ম হয় জ্যোতির্মহিমায় ভাস্বর। সত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থেকে সে তখন রূপ হতে রূপকে পৃথক করে শুধু প্রাতিভাসিক ভেদের রেখায় ; স্বচ্ছন্দ নির্মুক্ত প্রবৃত্তির চারদিকে টেনে দেয় শুধু অতাত্ত্বিক সীমার বেষ্টনী, অথচ তার অন্তরালে স্বয়ম্ভূর বিশ্বব্যাপ্ত ঈশনা থেকে যায় নিরঙ্কুশ ও নিত্যচেতন। এক সর্বগত বিশ্বতশ্চক্ষু ও সত্যসঙ্কল্পের বার্তাবহ সে, তারি অমোঘ সত্যদর্শনের প্রশাসনকে ছড়িয়ে দেয় সে বিশ্বময়। এক ঋতময় চেতনা আনন্দ শক্তি ও 'ধাতুর' ব্যষ্টি-ভাবনাকে ধরে আছে সে অন্তর্গূঢ় অথচ অব্যভিচরিত সমষ্টি-ভাবনার মাঝে। অখণ্ডের ঋতম্ভরা বহুভাবনাকে রূপায়িত করে সে আপাত খণ্ডলীলায়—যাতে ভূতে-ভূতে বিচিত্র-সম্বন্ধ বিশেষের রূপরেখায় বিবিক্ত হয়েও আবার মিলিত হয় পরিপূর্ণ এক সৌষম্যের ঐকতানে। এক শাশ্বত একত্ব ও অন্যোন্য-সংমিশ্রণের মাঝে সে জাগিয়ে তোলে সংযোগ-বিয়োগের আনন্দবিলাস। এই মনেরই সহায়ে অখণ্ড-স্বরূপ নিজকে লীলায়িত করেন ব্যষ্টির আপাত-খণ্ডতায় এবং আপন অখণ্ড ভাবকে অব্যাহত রেখে ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বিচিত্র সম্বন্ধজালে নিজকে করেন পরিকীর্ণ। অখণ্ডের এই খণ্ডলীলাই তো বিশ্বের তত্ত্ব। মন হল ঋত-চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলীলা, এই বিশ্ববৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে তারি অনুভাবে। আমরা অবিদ্যা বলি যাকে, সে তো নতুন কিছু গড়ে না, বা আত্যন্তিক মিথ্যাত্বেরও সৃষ্টি করে না—শুধু সত্যকেই দেখায় সে বিকৃত আকারে। বিজ্ঞানের উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের জ্ঞানবৃত্তিই ধরে অজ্ঞান বা অবিদ্যার রূপ,—বিশ্বরূপে প্রকটিত পরম-সত্যের লীলা-সুষমাকে মূর্ত চেতনায় প্রতিবিম্বিত করে আপাতবিরোধ ও সংঘর্ষে সঙ্কুল আড়ষ্ট-কঠিন একটা দুঃস্বপ্নের আকারে যেন।

মনের প্রমাদের মূল তাহলে এই। আত্মসংবিৎ হতে অবস্খলিত হয়ে জীব তার ব্যষ্টিভাবকে ধারণা করে একটা স্বতন্ত্র সত্য বলে, অখণ্ডের বিভূতি বলে নয় ; তাইতে ভাবে সে, তার বিশ্বের সে-ই বুঝি কেন্দ্র,—ভুলে যায়, বিশ্বরূপেরই চিদ্‌ঘন স্ফুলিঙ্গ সে। এই আদি প্রমাদের স্বাভাবিক পরিণামরূপে তার মাঝে দেখা দেয় অবিদ্যার বিশিষ্ট উপাধি যত। বিশ্বের বিপুল প্রবাহ তার খণ্ডচেতনাকে প্লাবিত করেও তার অহন্তার সঙ্কীর্ণ খাতে বয়ে চলেছে যে-ধারায়, সে শুধু তাকেই চেনে। কাজেই তার মাঝে প্রথমে দেখা দেয় আত্মভাবের সঙ্কোচ ; সেই সঙ্কোচ আনে চেতনার এবং তজ্জনিত

জ্ঞানের সঙ্কোচ—চিৎশক্তি ও সঙ্কল্পের সঙ্কোচ; তাতেই তার বীর্য হয় কুণ্ঠিত, আত্মসম্ভোগের দীনতায় আনন্দ হয় স্তিমিত। ব্যষ্টিভাবনার সীমাঙ্কিত হয়ে তার চেতনায় বিশ্ব ধরা দেয় শুধু একটি রূপ নিয়েই; তাই তার বাইরে আর-কোনও রূপের খবর রাখেনা সে। এই অবচ্ছিন্ন ভাবনার জন্যে, যাকে সে জানে মনে করে, তাকেও জানে ভুল করে; কেননা বিশ্বের সকল ভাবই অন্যোন্যাশ্রিত যখন, তখন অংশকেও ঠিকমত জানতে হলে অংশীর স্বরূপ-সত্যকে না জানলে তো চলে না। এইজন্যই পৌরুষেয় সকল জ্ঞানেই থেকে যায় প্রমাদের একটা ছোঁয়াচ।…তেমনি আমাদের প্রাকৃত সঙ্কল্প চেনে না দিব্যক্রতুর অবন্ধ্য পূর্ণরূপটি; সুতরাং তার সকল সাধনায় দেখা দেয় অল্পবিস্তর অসামর্থ্য ও বীর্যহীনতার ন্যূনতা। জ্ঞান ও সঙ্কল্পের এই অনীশ্বর দীনতায় আত্মার স্বরূপানন্দ ও বিষয়ানন্দের পরিপূর্ণ উল্লাস হয় ক্ষুণ্ন; তাই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দভাবনা দিয়ে কোনও-কিছুকেই আত্মসাৎ করতে পারি না বলে সন্তাপ হয় আমাদের নিত্য সহচর। অতএব নিজকে-না-জানাই হল জীবনের সকল বৈকল্যের মূল; এই আত্ম-অবিদ্যাই যখন আত্মসঙ্কোচের ফলে ধরে অহমিকার রূপ, তখন প্রাকৃত চেতনায় আরও দৃঢ়মূল হয় সে-বৈকল্য।

অথচ অবিদ্যা এবং তজ্জনিত বৈকল্য সত্য ও ঋতের বিকৃতি মাত্র—আত্যন্তিক মিথ্যাত্বের বিলাস সে নয়। মন নিজেকে এবং নিজের কল্পিত খণ্ডভাবকে যখন সচ্চিদানন্দের সত্য-লীলার বিভূতি ও সাধনরূপে না দেখে বিশ্বকে নিতান্তই জানে খণ্ডতার একটা মেলা বলে, তখনই দেখা দেয় অবিদ্যার এই বিভ্রম। স্বাধিকারভ্রষ্ট মন তার স্বরূপসত্যে ফিরে গিয়ে আবার ফুটে ওঠে ঋত-চিন্ময় প্রজ্ঞানেরই অন্ত্যলীলায়। প্রজ্ঞানের দিব্যজ্যোতি ও সত্যবীর্যে যে সম্বন্ধের প্রপঞ্চ সে গড়ে তোলে, তা হয় সত্যেরই বিসৃষ্টি—বৈকল্যের বিভ্রম নয়। বৈদিক ঋষির প্রাঞ্জল বিবেক-বাণীতে,—সে-জগৎ চলে 'ঋজুনীত্যা', মর্ত্যের কুটিল 'ধৃতি'কে আশ্রয় করে নয়। সে-জগতে আছে শুধু দিব্যভাবের সত্যলীলা—স্বয়ংজ্যোতির দিব্য পরিবেষে আত্মনিষ্ঠ চেতনা ক্রতু ও আনন্দের ছন্দদোলা। কিন্তু প্রাকৃত জগতে আছে প্রাণ-মনের তির্যক সর্পিল গতি: আত্মহারা জীব ফিরে যেতে চায় তার তত্ত্বভাবে; প্রমাদী চিত্তের কল্পিত সত্যে-মিথ্যায় ধর্মে-অধর্মে কুণ্ঠিত-বিকৃত হয়েছে যে পরম-সত্য, তারি নির্মুক্ত দীপ্তিতে ঘটাতে চায় সে প্রমাদ-আঁধারের মরণ; কার্পণ্যোপহত প্রাণের বীর্যে ও দৌর্বল্যে শক্তিসাধনার যে

অচরিতার্থ আয়োজন, তাকে রূপান্তরিত করতে চায় সে দিব্য-সামর্থ্যের অমোঘ ঈশনায়; অতৃপ্ত হৃদয়ের হর্ষে ও বিষাদে ফুটে ওঠে যে ব্যর্থ আনন্দসাধনার আর্ত উত্তালতা, তাকে ফোটাতে চায় সে দিব্য-রতির অফুরন্ত উল্লাসে; জগৎ জুড়ে জীবন-মরণের অন্ধ আবর্তনে রয়েছে যে অমৃতভাবনার ইঙ্গিত, তাকে মূর্ত করতে চায় সে মৃত্যুঞ্জয়ের শাশ্বত মহিমায়। জীবের এই-যে শ্রান্তিহীন মন্থর অভিযান উত্তরায়ণের পথে, পথের বাঁকে-বাঁকে অপ্রবুদ্ধ চেতনায় সেই না রচে অনৃতের অশাশ্বত কুটিল মায়া।

## ১৯

# প্রাণ

প্রাণই সর্বভূতের আয়ু ; তাই তাকে বলা হয় সর্বায়ু অর্থাৎ বিশ্বের জীবন।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ২।৩ )

মনের দিব্য স্বরূপ কী, কীই-বা তার সম্বন্ধ ঋত-চিতের সঙ্গে, তার একটা পরিচয় আমরা পেলাম এতক্ষণে। বুঝলাম, আমাদের মানুষভাবের উপাদান যে অপরা-ত্রয়ী, তার প্রথমে রয়েছে মন। দিব্য-চেতনার একটা বিশেষ 'কলা' সে ; অথবা তার বিসৃষ্টি-লীলার সে-ই হল অন্ত্যা বিভূতি। মনকে দিয়েই পুরুষ রূপভেদ ও শক্তিভেদের প্রপঞ্চকে করেন অন্যোন্য-বিবিক্ত ; যে ভেদাভাসের বিসৃষ্টি হয় তাতে , ঋত-চিন্ময় ভূমি হতে স্খলিত জীব তাকেই জানে তাত্ত্বিক খণ্ডভাব বলে। দৃষ্টির এই আদি বৈকল্য হতে দেখা দেয় প্রাকৃতভূমির বিকল ভাবনা যত, যার জন্যে অবিদ্যাকবলিত জীব দ্বন্দ্ববিরোধের সংঘাতকেই মেনে নেয় স্বভাবের সত্য বলে। কিন্তু মন যতক্ষণ থাকে অতিমানসের সঙ্গে যোগযুক্ত, ততক্ষণ সে আর অনৃত ও বিপর্যয়ের প্রযোজক নয়—বিশ্বসত্যের চিত্রবিভূতির সূত্রধার সে।

এই দৃষ্টিতে দেখলে মনকেও মানতে পারি বিশ্ব-বিসৃষ্টির সাধক বলে। কিন্তু সচরাচর মন সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ না করে আমরা তাকে জানি বিষয়-গ্রহণের সাধনরূপে। জড়ের মাঝে শক্তির লীলায় যা সৃষ্ট হয়েই আছে, মন তাকে শুধু গ্রহণ করতে পারে অবশভাবে ; বড়জোর সৃষ্ট-রূপের সংযোগ-বিয়োগের ফলে নূতন রূপসমাহার আবিষ্কার করা, সৃষ্টির এই অধিকারটুকু আছে তার—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের কল্যাণে একটা ভাব আমরা ফিরে পাচ্ছি আবার ; বুঝতে পারছি, জড় অথবা শক্তির মাঝেও আছে এক অবচেতন মনঃশক্তির খেলা, যার নিশ্চিত রূপ ফুটে উঠছে প্রথমত প্রাণের বৈচিত্র্যে এবং পরে মনেরও বৈচিত্র্যে। উদ্ভিদ এবং প্রত্নযুগের পশুর জীবনে নাড়ীচক্রের চেতনায় উন্মিষিত হয়েছে

তার আদিরূপ ; এবং পশুজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ও মানুষের মাঝে মনশ্চেতনার ক্রমিক পরিণতিতে ফুটছে তার দ্বিতীয় রূপ। আগেই দেখেছি, জড় আর শক্তি আলাদা তত্ত্ব নয় দুটি—জড় শক্তিরই উপাদান-বিগ্রহ মাত্র ; এবার তেমনি দেখতে পাব, জড়-শক্তিও মনেরই তপোবিগ্রহ। জড়শক্তি বাস্তবিক বিশ্বক্রতুর একটা অবচেতন লীলামাত্র। মনে হয়, আমাদের মাঝে এই ক্রতু বুঝি জ্যোতির্ময়, কিন্তু বস্তুত তা আলো-আঁধারের মিশ্রণ ; তেমনি জড়শক্তিকে মনে হয় একটা অপ্রবুদ্ধ অন্ধকারের উত্তালতা বলে। তত্ত্বত বিশ্বক্রতু আর জড়শক্তি কিন্তু পরস্পরের অবিনাভূত। জড়বিজ্ঞানও এই একত্বের একটা অস্পষ্ট সহজ অনুভব পেয়েছে গোড়া থেকেই, যদিও বিশ্বকে উল্টো অথবা তলার দিক থেকে দেখা তার অভ্যাস। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিশ্বকে দেখে উপর থেকে, তাই বহুদিন হতেই এ-তত্ত্ব প্রাঞ্জল ছিল তার কাছে। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা চলে, শক্তিকে আপন প্রকৃতি বা প্রৈতির বাহন করে এক অবচেতন বিরাট মন বা বুদ্ধিই সৃষ্টি করেছে এই জড়ের জগৎ।

কিন্তু এখন জানি, মনও কোনও স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব নয়, সেও অতিমানস বা ঋত-চিতের অন্ত্যবিভূতি মাত্র। অতএব যেখানে আছে মন, সেখানেই থাকবে অতিমানস। অতিমানসই বিশ্ববিসৃষ্টির নিত্য ও সত্য প্রযোজক। প্রাকৃত-জগতে মনশ্চেতনা তমসাচ্ছন্ন ও স্বধামচ্যুত, তবু তার বৃত্তিতে আছে অতিমানসের উদার পরিবেশের প্রচ্ছন্ন সংবেগ। সেই সংবেগের বশে মনোবৃত্তির অন্যোন্য-সম্বন্ধের মাঝে দেখা দেয় ঋতের ছন্দ, নিগূঢ় বীর্যের অনতি-বর্তনীয় পরিণাম,—নির্দিষ্ট বীজ হতে নির্দিষ্ট গাছটিকে সে-ই তোলে ফুটিয়ে। তাইতো তার অকুণ্ঠিত প্রশাসনে মূঢ় তমশ্ছন্ন নিশ্চেতন জড়শক্তির অন্ধলীলাও হয় ঋতম্ভরা ছন্দসুষমার বাহন—নইলে এ-জগৎ হত যদৃচ্ছা ও নির্ঋতির একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততা শুধু। অবশ্য এই ঋতচ্ছন্দও আপেক্ষিক ; এর পূর্ণ সুষমা ফুটে উঠত, মন যদি তার চেতনাকে পরাঙ্মুখ না করত অতিমানস হতে। বিভজ্য-বৃত্তি মন সৃষ্টি করে চলেছে যে ভেদের সংঘাত, একই পরম-সত্যের মাঝে দ্বন্দ্ববিধুর যে-বিরোধাভাস, তারি স্বাভাবিক ছন্দ-পরিণাম ফুটেছে এই মানসলোকের ঋতায়নে। আত্মরূপায়ণের এই দ্বৈত বা খণ্ডলীলার মূলে আছে ব্রাহ্মী-চেতনার ঋতম্ভরা কল্পনার প্রবর্তনা। অখণ্ড ঋত-চিতের প্রশাসনে বিধৃত এই সত্যসঙ্কল্পই সম্বন্ধবৈচিত্র্যের অনতিবর্তনীয় পরিণতিতে অথবা অবর-ব্রহ্মের সত্যে হয়েছে রূপায়িত, যার সিদ্ধকল্পনা রয়েছে ব্রহ্মের

সম্ভূতি-বিজ্ঞানে এবং তাঁর 'জীব-ঘন' বিভূতিতে ফুটেছে যার বাস্তবরূপ। বিশ্বে সত্য বা ধর্মের প্রকাশ হয় এই ধারাতেই : সত্তার গহনে যা নিগূঢ় হয়ে থাকে বীজরূপে, বস্তুর স্বরূপ-প্রকৃতিতে নিরূঢ় থাকে যে সত্যের কল্পনা, পরমপুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে বস্তুর যা 'স্ব-ভাব' ও 'স্বধর্ম' তারি যথাযথ স্ফুরণ ও পরিশীলন ঘটে বিশ্বলীলায়। উপনিষদের অপরূপ মন্ত্রবর্ণে আছে এই সত্যেরই ইঙ্গিত—বাঙ্ময় বিদ্যুতের ঝলক লাগে ঋষির এই কটি কথাতে : সেই স্বয়ম্ভূই কবি ও মনীষীরূপে সব-কিছু হয়েছেন সবঠাঁই, তাঁরি মাঝে শাশ্বত-কাল ধরে বিধান করেছেন সকল অর্থ—'যাথাতথ্যত: ' অর্থাৎ তাদের স্বরূপ-সত্যের ছন্দে।*

অতএব, দেহ-প্রাণ-মনের যে-ত্রয়ী আমাদের বর্তমান নিবাসভূমি, তাকে ত্রিধা-বিকল্পিত বলে জানব শুধু তার যথাভূত বাস্তব পরিণামকে মেনেই। তাই দেখি, যে-প্রাণ ছিল জড়ে গুহাহিত, সে-ই নিজেকে আবার উন্মিষিত করল মননধর্মী চেতনায়। কিন্তু মনশ্চেতনার এই স্ফুরণের অন্তরালেও ছিল 'মনু'র আবেশ ; অতএব প্রাণে এবং জড়েও প্রচ্ছন্ন ছিল সে ; আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অতিমানস, যা আর তিনটি বিভূতির উৎস এবং নিয়ন্তা। সুতরাং মনের মত অতিমানসও একদিন উন্মিষিত হবে এই আধারে। বিশ্ব-তত্ত্বের মূলে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই বুদ্ধিকে ; কেননা বুদ্ধিই আমাদের মতে চিৎশক্তির পরম পরিণতি,—তার আলোকে, তারি প্রশাসনে চলছে আমাদের কৃতি এবং সৃষ্টি। তাই আমরা ভাবি, বিশ্বের মূলে চৈতন্যের লীলা থাকেই যদি, তাহলে নিশ্চয় তার আকার হবে বুদ্ধির মত,—অর্থাৎ আমাদের মনোময়ী চেতনাই হবে বিশ্বের ধাত্রী। কিন্তু বুদ্ধির প্রাকৃত অনুভব ও ব্যব-হারেও প্রতিফলিত হয় তার উত্তরভূমির কোনও সত্যের বিভূতি, বুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে সীমিত যার ধারণা ; এই বিভূতির মাঝে থাকবে চেতনার একটা উৎকৃষ্টতর রূপ, যা সেই উত্তরভূমিরই সত্যের ছটা। তাই সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কেও আমাদের ধারণা পালটিয়ে বলতে হয় : অবচেতন মন বা বুদ্ধি নয়,—গুহা-হিত সংবৃত অতিমানসই এই জড়বিশ্বের স্রষ্টা ; মন চিৎশক্তিতে নিগূঢ় তার দিব্যক্রতুর সদ্য-ক্রিয় বিভূতি-বিশেষ বলে 'প্রজাপতি মনু'কেই অতিমানস

* কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।
—ঈশোপনিষদ্ (৮)

করেছে সে-সৃষ্টির পুরোধা ; আর জড়শক্তি বা বস্তু-সত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন আকৃতিকে করেছে সে তার বিশ্ববিধায়িকা প্রকৃতি।

কিন্তু প্রাকৃত-জগতে দেখি, শক্তির যে বিভূতি-বিশেষকে বলি প্রাণ, তাকে আশ্রয় করেই মনোধাতুর স্ফুরণ। তাহলে প্রশ্ন হবে, প্রাণের কী তত্ত্ব? অতিমানসের সঙ্গে কী তার সম্পর্ক? সৎ-চিৎ-আনন্দের যে-মহাত্রিপুটী সম্ভূত-বিজ্ঞান বা ঋত-চিতের সহায়ে বিশ্বসৃষ্টিতে লীলায়িত, তার সঙ্গেই-বা কোথায় তার যোগ? মহাত্রিপুটীর কোন্ বিভাব হতে উৎপত্তি তার? প্রাণের আবির্ভাবের মূলে আছে কোন্ দিব্য সত্যের প্রৈতি, অথবা কোন্ অদেবী মায়ার মূঢ় সংবেগ? 'জীবন একটা জঞ্জাল, একটা বঞ্চনা, একটা পাগলামি, একটা প্রলাপ—এর হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজতে হবে আমাদের শাশ্বত সত্যের অচল প্রতিষ্ঠায়'—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই আর্তবিলাপে ক্ষুব্ধ হয়েছে গগনতল। কিন্তু সত্যি কি তাই—সত্যি কি বিশ্বের প্রাণলীলা একটা ছলনা শুধু? তাই যদি হয়, তবে কেনই-বা এ ছলনা? কিসের খেয়ালে শাশ্বত-পুরুষ এই অনর্থে, এই প্রলাপে, এই খ্যাপামিতে নিজকে করলেন লাঞ্ছিত ; অথবা ছলনাময়ী মায়ার ক্রূরলীলায় জীব সৃষ্টি করে এই অভিশাপে করলেন তাদের জর্জরিত? না এই প্রাণলীলার মূলে আছে কোনও দিব্যভাবের প্রেরণা, আছে শাশ্বত-সত্তার কোনও আনন্দ-ঝঙ্কার—আত্মরূপায়ণের অবন্ধ্য আকূতিতে এমনি করে যা দুলে উঠেছে দেশ-কালের লাস্যলীলায়, রোমাঞ্চিত হয়েছে বিশ্বের অগণিত লোকে পরিকীর্ণ কোটি-কোটি প্রাণরূপের অফুরন্ত উচ্ছলনে?

পৃথিবীর বুকে জড়ের আধারে প্রাণের প্রকাশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি, ঐক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির বিভূতি বা পরিস্পন্দ এই প্রাণ, তারি দুর্বার স্রোতে জোয়ার-ভাটার খেলা শুধু—এই তার স্বরূপসত্য। সেই মহাশক্তির নিরন্ত লীলায়নে গড়ে উঠেছে রূপের মেলা ; বীর্যধারার অবিচ্ছেদ সঞ্চারণে তাদের সে করছে আপ্যায়িত, অবিরাম ভাঙা-গড়ার শিল্পকলায় রাখছে জিইয়ে ;—এই তো জগৎ জুড়ে প্রাণের রূপ! এ হতে কি মনে হয় না, জীবনের আর মরণের মাঝে যে-বিরোধকে জানি স্বভাবের সত্য বলে, আসলে সে আমাদের মনের ভুল—একটা অবাস্তব বিরোধের বিকল্প শুধু? প্রাকৃত ব্যবহারের ভূমিতে এ-বিরোধ বাস্তব হলেও অন্তর্গূঢ় সত্যের বিচারে তো মিথ্যাই বলব একে। বিশ্বব্যাপী অখণ্ডতার মাঝে এমন কত বিরোধাভাসেরই না সৃষ্টি করছে প্রাকৃত-মন তার উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে। বস্তুত প্রাণের মুক্ত-

ধারায় মৃত্যু একটা আবর্তমাত্র—এই তো সত্য পরিচয় তার। উপাদানের ভাঙা-গড়া, রূপ বদ্‌লে রূপ বজায় রাখা—এই নিয়ে নিত্য চলছে প্রাণের খেলা। সে চায় পরিবর্তন, চায় বৈচিত্র্য,—তবেই সার্থক হয় তার রূপায়ণের লীলা। সেই লীলাতে মৃত্যু এসে জোগান দেয় ভাঙার কাজটাকে দ্রুত ক'রে—প্রাণেরই প্রয়োজনে। তাই দেহের মরণেও তো নিবৃত্ত হয় না প্রাণের ক্রিয়া,—শুধু একটা আধার ভেঙে গিয়ে সেই মালমশলায় গড়ে ওঠে অন্য আধার। ক্রিয়াসারূপ্য প্রকৃতির ধর্ম বলে স্বচ্ছন্দে এমন কথাও বলা চলে : প্রাণশক্তি ছাড়া দেহের আধারে মন বা চেতনার শক্তিও নিহিত থাকে যদি, তাহলে দেহের ধ্বংসে তারও ধ্বংস হয় না কখনও,—সে-শক্তিও এক আধার হতে ছাড়া পেয়ে অন্য আধার গড়ে তোলে দেহান্তর-সংক্রমণের বিশেষ-কোনও কৌশলে। এমনি করে সবারই হয় নবকলেবর, বিনাশের মাঝে তলিয়ে যায় না কিছুই।

অতএব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, বিশ্ব জুড়ে আছে এক প্রাণ, এক মহাশক্তিরই জঙ্গমলীলা (জড়ের দিকটা তার স্থূলতম স্পন্দনমাত্র), যা সৃষ্টি করে চলেছে জড়বিশ্বের এই বিচিত্র রূপের পসরা। সে-প্রাণ শাশ্বত, অবিনশ্বর ; আজ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায় বিশ্বের রূপায়ণ, তবু সে-প্রাণ থাকবে তেমনি অব্যাহত, নূতন বিশ্ব গড়ে তোলবার সামর্থ্য থাকবে তার তেমনি অকুণ্ঠিত। উত্তর-শক্তির প্রয়োজনে নিশ্চলতায় সংহৃত বা আত্মসমাহিত না হলে অফুরান চলবে তার বিসৃষ্টির লীলা। তাই যদি হয়, তাহলে প্রাণকে বলব শক্তির সেই বিভূতি, যা গড়ছে রাখছে ভাঙছে বিশ্বজোড়া এই রূপের হাট। প্রাণই ফুটছে মাটির পৃথিবী হয়ে, সেই মাটির বুকে তরুলতা হয়ে ; আবার পৃথিবীতে বেঁচে আছে যে জীবগোষ্ঠী তরুলতা বা পরস্পরের প্রাণশক্তিকে আত্মসাৎ ক'রে, তারাও তো সেই প্রাণেরই বিচিত্র বিভূতি। বস্তুত বিশ্ব-ভূত জড়ের আধারে বিশ্বপ্রাণেরই রূপায়ণ। নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজনে জড়ক্রিয়াতেও প্রচ্ছন্ন রাখে সে প্রাণের ক্রিয়া—ক্রমে অবমানস ইন্দ্রিয়-চেতনায় ও মনোময় প্রাণনে তাকে করে বিকশিত ; কিন্তু তবু আত্মরূপায়ণের পর্বে-পর্বে সে বহন করে এক অখণ্ড প্রাণতত্ত্বেরই সৃষ্টির আকৃতি।

আপত্তি হতে পারে, প্রাণ বলতে অখণ্ডতার একটা ছবি তো ফোটে না আমাদের মনের সামনে। বিশ্বশক্তির বিশেষ-কোনও পরিণামকে আমরা জানি প্রাণ বলে ; তার পরিচয় পাই পশুতে ও উদ্ভিদে—কিন্তু ধাতুখণ্ডে প্রস্তরে

বা বায়বীয় পদার্থে নয়; জীবকোষে প্রাণের ক্রিয়া মানলেও জড়-পরমাণুর মাঝে মানতে পারি কি?...অতএব যুক্তির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, শক্তির যে-পরিণামবিশেষকে বলি প্রাণ, কী তার সত্যিকার প্রকৃতি: আর সেই শক্তির যে-জড়লীলাকে বলি নিষ্প্রাণ, তার সঙ্গে কোথায় তার তফাৎ। শক্তির তিনটি লীলাভূমি দেখছি পৃথিবীতে: একটি পশুজগৎ, আমরা যার অধিবাসী; আর-একটি উদ্ভিদজগৎ, আর তৃতীয়টি জড়জগৎ— যাকে ধরে নিয়েছি নিষ্প্রাণ বলে। প্রশ্ন হবে, উদ্ভিদের প্রাণ-লীলা হ'তে আমাদের প্রাণ-লীলা তফাৎ হয়েছে কোন্ জায়গায়? প্রাচীনেরা যাকে বলতেন ধাতুজগৎ, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে রাসায়নিক জগৎ, সেই নিষ্প্রাণ পদার্থের সঙ্গে কোথায় ঘটেছে উদ্ভিদের পার্থক্য?

সাধারণত প্রাণের কথা বলতে আমরা লক্ষ্য করি পশুকেই, কেননা সে খায়-দায়, চলে বেড়ায়, নিঃশ্বাস নেয়,—তার অনুভব আছে, ইচ্ছা আছে। গাছ পালারও প্রাণ আছে,—আমাদের কাছে এ কথাটা বাস্তব না হয়ে রূপক-ঘেঁষা বরং, কেননা উদ্ভিদের প্রাণনকে প্রাণধর্মের মর্যাদা দিতে পারিনি আমরা, চিরকাল তাকে ফেলে এসেছি জড়-প্রক্রিয়ার কোঠায়। বিশেষত শ্বাস-ক্রিয়াকে প্রাণনের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে নিই সব সময়; 'শ্বাসই প্রাণ'—এমন উক্তি সব ভাষাতেই আছে। কথাটা মিথ্যাও নয়, যদি তলিয়ে ভাবি 'বিশ্ব-প্রাণের উচ্ছ্বাস (অথবা নিঃশ্বসিত)' বলতে বাস্তবিক কী বোঝায়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, শ্বাস নেওয়া স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা বা আহার সংগ্রহ করা প্রাণধর্ম হলেও তা-ই প্রাণের স্বরূপ নয় কখনও। যে নিগূঢ় আপ্যায়নী শক্তিকে জানি আমাদের সঞ্জীবনী বলে, এইসব শারীরক্রিয়ায় চলে তারি প্রজনন বা সঞ্চালন; অথবা দেহের বিধারণ সম্ভব হয়েছে যে ভাঙা-গড়ার লীলায়, তারি পোষক এরা। কিন্তু এই জীবনযোনি-প্রযত্নকে বজায় রাখতে শ্বাস-প্রশ্বাস বা দেহ-পোষণের অভ্যস্ত আয়োজনকে একেবারে অপরিহার্য বলা চলে না। শ্বাস-প্রশ্বাস হৃৎস্পন্দন ইত্যাদিকে প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত বলে জানি আমরা; অথচ এসব ক্রিয়াকে সাময়িক স্তম্ভিত রেখেও মানুষ এই দেহেই বাঁচতে পারে, এবং তাও পুরোপুরি সজ্ঞানে—এরও তো চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। এমন-কি, উদ্ভিদের মাঝে পশুর মত চেতনার সাড়া আজও প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তাদের শারীরক্রিয়া যে আমাদেরই সগোত্র, আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মূল গড়ন যে একই, বিচিত্র তথ্যের সমাহারে

এ-তত্ত্বও সপ্রমাণ হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের বিচারহীন মিথ্যা সংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার পক্ষে এ-দুটি প্রমাণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য বহিরঙ্গ লক্ষণের স্থূল যবনিকা ভেদ করে আমাদের পৌঁছতে হবে প্রাণতত্ত্বের গোড়ার কথায়।

এ-যুগের কোন-কোনও আবিষ্কার* হতে যে-তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তার দীপ্ত আলোকে জড়াশ্রিত প্রাণের রহস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অনেকখানি। এদেশেরই একজন প্রখ্যাত জড়বিজ্ঞানী, অভিঘাতে সাড়া দেওয়াই যে প্রাণ-সত্তার অবিসংবাদিত পরিচয়—এই তত্ত্বের 'পরে জোর দিয়েছেন বিশেষ করে। তাঁর আহরিত তথ্য উদ্ভিদের জীবনরহস্যের 'পরে করেছে বিশেষ আলোক-পাত, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল প্রবৃত্তিরই নিয়েছে নিবিড় পরিচয়। শুধু তাই নয়; যেমন উদ্ভিদে তেমনি ধাতুখণ্ডেও আবিষ্কার করেছেন তিনি প্রাণনের সেই একই লক্ষণ—তারাও সাড়া দেয় অভিঘাতে; প্রাণের যে অনূপ ছন্দকে বলি জীবন আর প্রতীপ ছন্দকে বলি মরণ, তারও দোলা আছে তাদের মধ্যে। তথ্যের সাক্ষ্য তেমন জোরালো নয় এক্ষেত্রে উদ্ভিদের মত, তাই প্রাণের প্রকাশধারা যে দুয়ের মাঝে অবিকল এক, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়নি এখনও। কিন্তু মনে হয়, তার উপযোগী অতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বাধাও থাকবে না; ধাতু আর উদ্ভিদের মাঝে যে আরও অনেক সাম্য রয়েছে প্রাণনের দিক দিয়ে, তা প্রমাণ করা কঠিন হবে না

---

* সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে এ-তত্ত্ব আহরণ করবার উদ্দেশ্য পার্থিব ভূমিতে জড়ের আধারে প্রাণের গতি-প্রকৃতির ধারা নিরূপণ করা নয়, কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা। বিজ্ঞান এবং তত্ত্ব-বিদ্যার (শুধু বুদ্ধির জল্পনার 'পরেই হোক্ অথবা এদেশের মত অধ্যাত্মদর্শন কিংবা অধ্যাত্ম-অনুভবের চরম প্রামাণ্যের 'পরেই হোক তাদের ভিত্তি) অধিকার যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই স্বতন্ত্র তাদের গবেষণার ধারা। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে তত্ত্ববিদ্যার ঘাড়ে অথবা তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো—দুইই সমান অযৌক্তিক। কিন্তু সকল অবস্থাতেই পুরুষ-প্রকৃতির মাঝে আছে এমন একটা সামরস্যের ব্যঞ্জনা, যা উভয়ের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সত্যের দ্যোতক। যুক্তিযুক্ত শ্রদ্ধার এ-রায়কে মানলে পরে, জড়জগতের সত্য যে বিশ্বে লীলায়িত মহাশক্তির রহস্যময় গতি-প্রকৃতিকে একটুখানি উজ্জ্বল করে তুলতেও পারে, এ-কল্পনা অসঙ্গত হয় না। অবশ্য সত্যের পূর্ণজ্যোতি বলা চলে না তাকে, কেননা স্বভাবতই জড়বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; তা ছাড়া মহাশক্তির যে-লীলা অতীন্দ্রিয়, তাকে ধরাছোঁয়ার সামর্থ্যও নাই তার।

তখন। সাম্য আবিষ্কার করা সম্ভব না হয় যদি, তাহলে তার অর্থ এও হতে পারে,—প্রাণ-প্রকাশের ধারা দুয়ে স্বতন্ত্র, অথবা এখনও তা ধাতুতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি হয়তো ; তবু প্রাণনের প্রথম স্পন্দনের একটুখানি আভাস তার মাঝে থাকা অসম্ভব নয়। যত অস্পষ্টই হোক প্রাণের লক্ষণ, তার রেশটুকুও ধাতুখণ্ডের মাঝে থাকে যদি, তাহলে তার সগোত্র অন্যান্য জড়পদার্থে কি মাটির মধ্যেও তা সংবৃত হয়ে থাকবে না কেন—ভ্রূণরূপে তার বীজসত্তা নিয়ে ? বস্তুত, গবেষণা আরও গভীর হলে হাতের কাছে সাধনসামগ্রী তৈরী না থাকার জন্যে অসময়ে তার মাঝে আর দাঁড়ি টানতে হবে না আমাদের। তখন প্রকৃতির সারূপ্যলীলার 'পরে নির্ভর করে নিঃসংশয়ে একদিন আবিষ্কার করব, তার কৃতির ধারায় ছেদ নাই কোথাও। বাস্তবিক মাটি আর তার বুকে-গড়া ধাতুর তাল, দুয়ের মাঝে কোনও কঠিন ভেদের রেখা টানা একেবারেই অসম্ভব ; ধাতু আর উদ্ভিদের বেলাতেও তাই। এই সামান্য সূত্র ধরে এগিয়ে দেখি, মাটি বা ধাতু গড়ে উঠেছে যে মূলভূত আর পরমাণুর সমাহারে, একই অবিচ্ছেদ ধারা রয়েছে তাদেরও মূলে। এমনি করে অখণ্ড-সত্তার পর্বানুক্রমে আদিপর্ব উদ্যত হয়ে আছে উত্তরপর্বের জন্যে, তার আ-ভাসকে ভ্রূণরূপে সে ধারণ করছে নিজের মধ্যে। সব ছেয়ে আছে এক অখণ্ড প্রাণ—কোথাও গূঢ় কোথাও প্রকট, কোথাও ব্যাকৃত কোথাও অব্যাকৃত, কোথাও সংবৃত কোথাও বিবৃত ; কিন্তু আছে সে বিশ্ব জুড়ে,—সব ছেয়ে, অবিনশ্বর হয়ে। ভেদ-বৈচিত্র্য শুধু তার রূপায়ণে আর ব্যাকৃতিতে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। বাইরের অভিঘাতে সাড়া দেওয়া প্রাণনের একটা বহিরঙ্গ লক্ষণমাত্র ; আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আর চলাফেরাও তাই। গবেষণাগারে গবেষক বিশিষ্ট অভিঘাতের ফলে পেলেন সুস্পষ্ট একটা সাড়া ; অমনি তিনি ধরে নিলেন, যে সাড়া দিল নিশ্চয়ই তার প্রাণ আছে। ধরা যাক, সাড়া দিয়েছে একটা উদ্ভিদ। কিন্তু অভিঘাতে সাড়া দেওয়া তার এই কি প্রথম ? সারা জীবন ধরেই তো চারদিকের পরিবেশ হতে সে পেয়ে এসেছে পুঞ্জিত অভিঘাত, আর প্রতি মুহূর্তেই তার উত্তরে দিয়ে এসেছে দুর্নিরীক্ষ্য বিচিত্র সাড়া। অর্থাৎ পরিবেশের শক্তির অভিঘাতে সাড়া দেবার মত শক্তির একটা ভাণ্ডার নিত্যসঞ্চিত রয়েছে তার মাঝে। কেউ-কেউ বলেন, নাড়া পেলেই সাড়া দেওয়া থেকে প্রমাণ হয়, উদ্ভিদ কিংবা অন্যান্য জীবদেহে প্রাণশক্তি বলে একটা পৃথক শক্তি স্বীকার করবার

প্রয়োজন নাই কোনও,—কেননা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, জীব-প্রবৃত্তি আর-কিছুই নয় জড়শক্তির একটা যন্ত্রলীলা ছাড়া। কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভিদকে অভিহত করার অর্থ,—শক্তির বিশেষ-একটা সংবেগকে কোনও নির্দিষ্ট ধারায় সঞ্চারিত করা তার মধ্যে। তেমনি উদ্ভিদের সাড়া দেবার অর্থও হল, শক্তির সংবেগ যেন অন্য-একটা ধারায় বেদনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে নাড়া পেয়ে। এমনি করে নাড়া খেয়ে সাড়া দেবার মাঝে ফোটে তার সত্তারই হৃদয়স্পন্দ। শুধু তাই নয়; উদ্ভিদের টিকে থাকবার এবং বাড়বার আকূতি হতেই পাই একটা অবমানস অন্ন-প্রাণময় কোশের পরিচয়—যা তার অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তিরই বিসৃষ্টি।...সব মিলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: বিশ্ব জুড়ে যেমন আছে স্থূল-সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপে উচ্ছ্বসিত এক বিপুল শক্তি-সংবেগের নিত্য স্পন্দন, তেমনি প্রতি জড়বিগ্রহে বা বস্তুতে (হোক্ সে পশু উদ্ভিদ কি ধাতু) সঞ্চিত হয়ে আছে সেই শক্তিবেগেরই চাঞ্চল্য। এ-দুয়ের মাঝে অন্যোন্য-বিনিময়ের লীলাকে আমরা সাধারণত জানি প্রাণ বলে। শক্তির এই বিকিরণে পাই আমরা প্রাণের তেজোময় রূপের পরিচয় এবং এই তেজের সক্রিয় আধারকেই বলি প্রাণ-শক্তি। মনের তেজোরূপ, প্রাণের তেজোরূপ, জড়ের তেজোরূপ—সমস্তই এক বিশ্ব-শক্তিরই বিচিত্র বিচ্ছুরণ মাত্র।

আমরা যাকে মনে করি মৃত, তারও মাঝে সুপ্ত আছে প্রাণশক্তির সংহত বীর্য, যদিও সুপরিচিত প্রাণবৃত্তি স্তম্ভিত সেখানে এবং তাদের অত্যন্ত-প্রলয়ও আসন্ন। যে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলা কোন-কোনও ক্ষেত্রে অসম্ভব নয় একেবারে। তাতে প্রমাণ হয়, আমরা প্রাণ বলি যাকে, দেহে তখনও তার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সে ছিল সুপ্ত; অর্থাৎ তার অভ্যস্ত ক্রিয়ার নিশানা ছিল না কোনও—ছিল না শারীরক্রিয়া, ছিল না নাড়ী-সংবেদনের লীলা, ছিল না জান্তব মনশ্চেতনার সুপরিচিত সাড়া। প্রাণ বলে আলাদা একটা-কিছু পালিয়ে গিয়েছিল দেহ ছেড়ে, এবং দেহটাকে চেতিয়ে তোলায় সুযোগ বুঝে আবার সে ঢুকে পড়ল তার মাঝে—এমন কল্পনা এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব; কেননা প্রাণ দেহকে একেবারে ছেড়ে যায় যদি, তাহলে দেহের সঙ্গে সকল যোগ নষ্ট হওয়ায় কী করে সে জানবে যে আবার তার দেহে ফেরবার সময় হয়েছে? আবার কোন-কোনও ক্ষেত্রে—যেমন মূর্চ্ছা-রোগে—জীবনের সকল চিহ্ন সকল বৃত্তি স্তম্ভিত হয়ে গেলেও মন থাকে সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বতন্ত্র, যদিও দেহ দিয়ে সাড়া দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার লুপ্ত হয়ে যায়।

তখন এমন বলা চলেনা যে মানুষটার দেহের মৃত্যু হলেও মন তার বেঁচে আছে, অথবা প্রাণ পালিয়েছে দেহ ছেড়ে কিন্তু মন দেহকে আঁকড়ে আছে তবু। স্বাভাবিক শারীর-ক্রিয়া স্তম্ভিত হলেও মন এখনও সক্রিয়—এই ব্যাখ্যাই এ-ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত।

তেমনি সমাধিরও বিশেষ-কোনও অবস্থায় শারীরক্রিয়া এবং বহিশ্চর মনের ক্রিয়াও স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাদের কাজ শুরু হয়,—কখনও বাইরের পরিচর্যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ভিতর হতে ব্যুত্থানের স্বাভাবিক প্রেরণায়। আসল ব্যাপারটা এখানে এই। সমাধি-পরিণামের ফলে বহিশ্চর মনঃশক্তি অবচেতন মনে এবং বহিশ্চর প্রাণশক্তি অন্তশ্চর প্রাণে গুটিয়ে আসায়, হয় গোটা মানুষটাই তলিয়ে যায় অবচেতন ভূমিতে, নয়তো বহির্জীবনকে অবচেতনায় সংহৃত ক'রে অন্তশ্চেতনাকে উৎক্ষিপ্ত করে সে অতিচেতন লোকে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই: যে-শক্তি ( স্বরূপ তার যা-ই হোক্ ) প্রাণের সংবেগকে ধরে রাখে দেহের আধারে, বাইরের বৃত্তিকে তার স্তম্ভিত করেও ভিতরে-ভিতরে সে কিন্তু ছেয়ে থাকে সমস্তটা দেহপিণ্ডই। তারপর একটা সময় আসে, যখন স্তম্ভিত বৃত্তিকে আবার সে ফিরে সচল করতে পারে না। কখনও দেহের মর্মতন্তু ছিন্ন হয়ে দেহটা হয়ে যায় অকেজো অথবা অভ্যস্ত ক্রিয়ার অক্ষম ; আবার কখনও তন্তুবিচ্ছেদ না ঘটলেও দেহের মাঝেই শুরু হয় 'বিস্রস্তি'র ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণবৃত্তিকে সজাগ করে তুলবে যে-শক্তি, পরিবেশের বিচিত্র শক্তির হানাতেও সে আর সাড়া দেয় না ; তাই পুঞ্জিত অভিঘাতের ফলে শক্তির যে অন্যোন্য-বিনিময় চলছিল এতকাল ধরে, তার নিবৃত্তিতে দেহেরও পুনরুজ্জীবন হয় অসম্ভব। কিন্তু তখনও দেহের মাঝে চলছে প্রাণের লীলা ; তবে প্রাণ লেগেছে গড়বার কাজে নয়,—যে-ঘর সে বেঁধেছিল, তাকে ভাঙবার কাজে। ঘরের মালমশলা আবার তখন গিয়ে জমে আদিম-ভূতের ভাণ্ডারে এবং তাই দিয়ে শুরু হয় নতুন করে ঘর-বাঁধবার আয়োজন। বিশ্বশক্তির যে-দিব্যক্রতু দেহপিণ্ডকে ধরে ছিল এতক্ষণ, এইবার মুষ্টি শিথিল করে সায় দেয় সে বিশরণের কাজে। এমনি করে ভিতর থেকে ধ্বংসলীলার শুরু না হলে সত্যিকার মরণ হয় না দেহের।

প্রাণ তাহলে বিশ্বব্যাপিনী এক মহাশক্তির জঙ্গমলীলা। সে-শক্তির মাঝে কোন-না-কোনও আকারে, অন্তত আধারতত্ত্বরূপেও প্রচ্ছন্ন আছে

মানস-চেতনা এবং নাড়ীসঞ্চারী প্রাণবৃত্তি। তাই এ-জগতে জড়ের আধারে তাদের আবির্ভাব ও ব্যাকৃতি হয় সম্ভব। এই বিশ্বশক্তির প্রাণলীলা স্বরচিত বিচিত্র মূর্তির মাঝে ফুটে ওঠে অভিঘাত ও সাড়ার অন্যোন্য-বিনিময়ে। প্রত্যেক মূর্তির মাঝে আছে শক্তির নিজেরই নাড়ীর নিত্যস্পন্দন; প্রত্যেক মূর্তির মাঝে শ্বাসে-প্রশ্বাসে চলছে ঐ এক উৎস হতেই উৎসারিত 'অনিল অমৃতের' অজপা। এক মহাশক্তিই প্রত্যেক মূর্তির আহার ও পুষ্টির বহুধাবৃত্ত সাধন: কখনও-বা পরোক্ষ উপায়ে নিজকে পোষণ করে তারা অপর মূর্তির মাঝে সঞ্চিত তেজকে আত্মসাৎ ক'রে, আবার কখনও সোজাসুজি শোষণ করে নেয় চারদিকে বিচ্ছুরিত বিশ্ব-শক্তির বিচিত্র তরঙ্গকে। এ-সমস্তই প্রাণের লীলা। কিন্তু আমরা তাকে ভাল চিনি, যখন বহিশ্চর বৃত্তির জটিলতায় পাই তার ব্যূহভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়—বিশেষত আমাদের সুপরিচিত নাড়ীতন্ত্র যখন হয় তার শক্তির বাহন। এই জন্যই উদ্ভিদে প্রাণ আছে, একথা স্বীকার করতে বেগ পেতে হয় না আমাদের, কেননা প্রাণের লক্ষণ অস্পষ্ট নয় তার মাঝে। ব্যাপারটা আরও সহজ ঠেকে যখন দেখি,—উদ্ভিদের দেহেও আছে নাড়ীতন্ত্রের নিশানা, অনেকটা আমাদেরই মত তার প্রাণন-বৃত্তি। কিন্তু ধাতুতে মাটিতে কি ভূতাণুতে প্রাণ আছে, একথা আমরা মানতে নারাজ; কেননা প্রাণের বাহ্য লক্ষণের কোনও আভাস হয় দুর্নিরীক্ষ্য নয়তো আপাত নিশ্চিহ্ন তাদের মাঝে।

কিন্তু জীব আর তথাকথিত অজীবের মাঝে এই বাইরের তফাৎটুকুকে স্বরূপের ভেদ বলে গণ্য করা কি ঠিক? ধর আমাদের জীবন আর উদ্ভিদের জীবন; দুয়ের মাঝে কোথায় তফাৎ? দুটি বিষয়ে উদ্ভিদ থেকে আমরা আলাদা: প্রথমত, আমাদের আছে চলাফেরার ক্ষমতা,—যদিও প্রাণনের নাড়ীর খবর মেলেনা তাতে; দ্বিতীয়ত সচেতন বোধশক্তির দাবি আছে আমাদের, কিন্তু যতদূর জানি উদ্ভিদের মাঝে সে-শক্তির বিকাশ হয়নি আজও। আমাদের নাড়ীতন্ত্রে যে-সাড়া জাগে—সবসময় বা পুরোমাত্রায় না হোক্—একটা সচেতন ইন্দ্রিয়বোধের সাড়া সে আনেই মনের মাঝে। যেমন মনের কাছে, তেমনি নাড়ীতন্ত্রে বা তার ঝঙ্কারে প্রহত দেহযন্ত্রের কাছে একটা বিশেষ মূল্য আছেই সে-সাড়ার। মনে হয়, উদ্ভিদের মাঝেও নাড়ীর বোধ যে আছে, তার নিশানা দুর্লভ নয় একেবারে। তার কতকগুলি সাড়াকে আমাদের ভাষায় তর্জমা করা যেতে পারে সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণ, উচ্ছ্বাস-

অবসাদ ও ক্লান্তির সংজ্ঞায়। নাড়ীতন্ত্রের ঝঙ্কারে উদ্ভিদের দেহও রণিত হয়ে ওঠে নিশ্চয়, কিন্তু মনশ্চেতনায় তার বোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা মানতেই হবে, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ—এখন মনের চেতনায় কি প্রাণের সাড়ায় যে-আকারেই সে ফুটুক না কেন। তাছাড়া 'সম্মুগ্ধ'-বোধও চেতনারই একটা রূপ। স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন নিজকে গুটিয়ে আনে কোনও-কিছুর ছোঁয়াচ হতে, তখন বেশ বোঝা যায়, আঘাতটা বেজেছে তার নাড়ীতন্ত্রে এবং এমন-কিছু আছে তার মাঝে যা বাইরের ছোঁয়াচটা পছন্দ করে না বলেই গুটিয়ে আসে। এক কথায়, উদ্ভিদের মাঝেও আছে অবচেতন একটা বোধশক্তি,—যেমন জানি আমাদের মাঝে আছে এমন কত অবচেতনার ক্রিয়া। মানুষের বেলায় অবচেতন অনুভবগুলিকে উপরে টেনে তোলা যায় অতীতের কবর খুঁড়ে,—নাড়ীতন্ত্রে তাদের কোনও রেশ বেঁচে না থাকলেও। চেতনার চেয়ে অবচেতনার রাজ্যই যে সুদূরপ্রসারী আমাদের মাঝে, নিত্য-উপচীয়মান স্তূপাকার তথ্যের সাক্ষ্যে পাওয়া গেছে তার অকাট্য প্রমাণ। অতএব উদ্ভিদের মাঝে একটা বহিশ্চর জাগ্রৎ-মন অবচেতন অনুভবকে যাচাই করতে পারছে না বলেই প্রমাণ হয় না যে তার অনুভব মিথ্যা। অথচ অবচেতনার রীতি মানুষ আর উদ্ভিদের মাঝে হুবহু এক। রীতি এক হয় যদি, তাহলে মূল-বস্তুটাও এক, অর্থাৎ মানুষে অবচেতন মন বলে কিছু থাকলে উদ্ভিদেও তা আছে। এও সম্ভব, ধাতুর মাঝেও আছে এক সম্মুগ্ধ-বোধময় অবচেতন মনের প্রাণলীলা অতি অস্পষ্ট ভ্রূণের আকারে, যদিও নাড়ীতন্ত্রের ঝঙ্কারে রণিত হবার মত দেহযন্ত্র তার নাই। কিন্তু দৈহ্য অনুরণন না থাকলেও ধাতুখণ্ডে প্রাণন-শক্তি থাকার বাধা হয় না কোনও, যেমন নাকি দৈহ্য চলৎশক্তি না থাকাতেও তা অসম্ভব হয়নি উদ্ভিদের মাঝে।

চেতনা যখন তলিয়ে যায় অবচেতনার গহনে, অথবা অবচেতনা উঠে আসে চেতনার ভূমিতে, বাস্তবিক কী ঘটে তখন? এখানে সত্যিকার বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হচ্ছে—বৃত্তির একদেশেই চিৎশক্তির পরিপূর্ণ অভিনিবেশে, তার অল্পাধিক অন্যব্যাবৃত্ত আত্মসংহরণে। আত্মসংহরণ বা আত্মসমাধানের কোনও-কোনও দশায় প্রজ্ঞানের বহির্বৃত্তি (আমরা যাকে বলি মনশ্চেতনা) আর যেন সচেতনভাবে কাজ করে না, কিংবা একেবারে নিরুদ্ধ হয়েও যায়। কিন্তু তখনও দেহ, নাড়ী-তন্ত্র ও 'আলোচন'-মনের ক্রিয়া চলতে থাকে অসাড়ে

অথচ অবিচ্ছেদে ও নিখুঁতভাবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির একটা ধারা ধরেই মন তখন হয় সক্রিয় এবং প্রভাস্বর,—তার আর-সব তলিয়ে যায় অবচেতনার মাঝে। লেখবার সময় লেখকের শারীর-ব্যাপার যেটুকু, তার বেশির ভাগ, কখনও-বা সবটাই থাকে অবচেতন মনের শাসনে; নাড়ী-তন্ত্রের ইঙ্গিতে শরীর যেন তখন অচেতনভাবে নড়তে থাকে বিশেষ কতগুলি ভঙ্গিতে, আর মন সচেতন থাকে তার প্রত্যাসন্ন চিন্তা নিয়ে। গোটা মানুষটাই কখনও অবচেতনায় তলিয়ে যেতে পারে এমনি করে, অথচ কতগুলি অভ্যস্ত আচরণ থেকে বোঝা যায় তার মন তখনও সক্রিয়,—এই যেমন স্বপ্ন-সঞ্চরণে। আবার কখনও অতিচেতন ভূমিতে উঠে যেতে পারে সে, অথচ দেহে তার চলতে থাকে অধিচেতন মনের ক্রিয়া—যেমন কোনও-কোনও যোগসমাধিতে। এ হতে স্পষ্টই বোঝা যায়, উদ্ভিদের বোধে এবং আমাদের বোধে এইটুকু তফাৎ যে, উদ্ভিদের মাঝে বিশ্বরূপা চিৎশক্তি এখনও যেন জড়ত্বের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেনি পুরোপুরি। যে অতিচেতন-বিজ্ঞান বিশ্বকর্মের প্রবর্তক, প্রবর্তিত শক্তি তার থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে আছে উদ্ভিদ-চেতনায় এবং এই বিচ্ছেদের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। কাজেই অবচেতন ভাবে আজ তাই সে করে চলেছে, মূঢ়-অভিনিবেশের মূর্ছাভঙ্গে মানুষের মাঝে জেগে ওঠে একদিন যা করবে সচেতন হয়ে। তখন আবার ঐ হবে তার বিজ্ঞানাত্মার মাঝে প্রবুদ্ধ হবার পরোক্ষ আয়োজন। এমনি করে একই চৈতন্যলীলা চলছে পরিণামের পর্বে-পর্বে, কিন্তু প্রতি পর্বে তার ভঙ্গি স্বতন্ত্র, কেননা চেতনার প্রকাশের দিক থেকে তার প্রয়োজনও স্বতন্ত্র।

একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। দেখছি, জড়-পরমাণুর মাঝেও আছে এমন-কিছু, যা আমাদের মাঝে এসে নেয় ইচ্ছা আর বাসনার আকার। বাইরে থেকে পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ভিন্ন-গোত্র মনে হলেও, বস্তুত আমাদের অনুরাগ-বিরাগের সঙ্গে রয়েছে তার নাড়ীর যোগ; শুধু বলতে পারি, জড়ের মাঝে এ-'বেদনা' অচেতন বা অবচেতন। এই ইচ্ছা আর বাসনার লীলা তত্ত্বত ছেয়ে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সকল ঠাঁই, কেবল আমাদের চোখে তার রূপটি স্পষ্ট নয়; নইলে এক অবচেতন বুদ্ধি-শক্তির অনুষঙ্গ—এমন-কি তারি প্রকট রূপ বলে স্বচ্ছন্দে তার ব্যাখ্যা করা চলে। তাকে অবচেতন বলতে আপত্তি থাকলে বলব অচেতন—অর্থাৎ একান্তই সংবৃত-চেতন; কিন্তু তবু সে জুড়ে আছে বিশ্বময়। প্রতি জড়-পরমাণুতে এই সংবৃত

বুদ্ধির বেদনা থাকলে জগতের সকল বস্তুতেই তা থাকবে, কেননা বস্তুমাত্রেই তো পরমাণুপুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। আবার পরমাণু যে-মহাশক্তির রূপান্তর, সে চিন্ময়ী বলে প্রতি পরমাণুই স্বরূপত একটি চিৎকণা। বেদান্তীর কাছে মহাশক্তি বস্তুতই চিৎ-তপঃ বা চিৎ-শক্তি অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপের স্ব-গত চিন্ময় প্রবেগ। সেই শক্তিই ফুটে ওঠে উদ্ভিদের মাঝে অবমানস-বোধময় নাড়ী-তন্ত্রের সামর্থ্যে, বাসনার বেদনা ও সংবেগ নিয়ে আদিম প্রাণিদেহে, আত্ম-সচেতন বেদনা ও সংবেগ নিয়ে ঊর্ধ্বতন জীবের মাঝে এবং মনোময় সঙ্কল্প ও বিজ্ঞানের লীলায় সকল প্রাণীর সেরা মানুষের মাঝে। প্রাণ যেন তপোঘনা বিশ্বশক্তির মহাতন্ত্রী, তারি ঘাটে-ঘাটে বেজে উঠছে অচেতনা হতে চেতনা পর্যন্ত বিচিত্র সুরের লীলা। মহাশক্তির এ যেন অন্তরিক্ষলোক; বীর্য তার সুপ্ত-নিমজ্জিত রয়েছে জড়ের গুহাশয়নে, নিজেরই শক্তির প্রবেগে অঙ্কুরিত হচ্ছে অবমানস চেতনায় এবং পরিশেষে মনঃশক্তির উন্মেষে পল্লবিত হয়ে উঠছে তার বিচিত্রবীর্যের বিপুল সম্ভাবনা।

প্রাণের উন্মেষের বহিরঙ্গ লীলাকেও যদি বিচার করি বিশ্ব-পরিণামের তত্ত্বালোকে, তাহলে আর-কিছু না হোক অন্তত যুক্তির খাতিরেও এ-সিদ্ধান্তকে না মেনে উপায় নাই আমাদের। স্পষ্টই দেখছি, উদ্ভিদের মাঝে যে-প্রাণ, পশু হতে তার সংহননের ধারা স্বতন্ত্র হলেও স্বরূপত সে তো একই শক্তি;—উদ্ভিদেরও পশুরই মত আছে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু, বীজের সহায়ে বংশবিস্তার, অবক্ষয়ে ব্যাধিতে অত্যাচারে মরণ, বাইরে থেকে পুষ্টির উপাদান আহরণ করে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা, আলো ও তাপের 'পরে নির্ভর, বহুপ্রজনন বা বন্ধ্যাত্ব—এমন-কি সুপ্তি ও জাগরণ, উত্তেজনা ও অবসাদের ছন্দে জীবনায়ন, শৈশব প্রৌঢ়ি ও বার্ধক্যের ক্রম-পরিণাম। তাছাড়া উদ্ভিদে আছে জীবনীশক্তির মুখ্য উপাদান, তাই প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক অন্ন সে। যদি মানি, তার মাঝে আছে নাড়ীতন্ত্র, আছে অভিঘাতে সাড়া দেবার সামর্থ্য, অবমানস অথবা অবিমিশ্র প্রাণময়-বোধের একটা আভাস কি ফল্গুধারা, তাহলে পশু আর উদ্ভিদের সারূপ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু বলব, উদ্ভিদ রয়েছে প্রাণ-পরিণামের অন্তরিক্ষলোকে—জীবজগৎ আর "অজীব" জড়জগতের মাঝামাঝি। কিন্তু এই মধ্যস্থিতিই তো স্বাভাবিক তার পক্ষে; কেননা প্রাণ যদি হয় বিশ্বশক্তির সেই সংবেগ, জড় হতে অঙ্কুরিত হয়ে যা মঞ্জরিত হচ্ছে মনের লীলায়, তাহলে জড় আর মনের মাঝে এমন-একটি মধ্যলোকের সম্ভাবনাই তো প্রত্যাশিত।

তাই যদি হয়, তাহলে মানতে হবে, জড়েরই মাঝে সুপ্ত বা মগ্ন হয়ে ছিল প্রাণ—জড়ত্বের অবচেতন কি অচেতন তমোঘনতার গভীরে। নইলে কোথা হতে হল তার আবির্ভাব? জড় হতে প্রাণের বিবৃতি মানতে গেলেই জড়ের মাঝে মানতে হয় তার প্রাক্তন সংবৃতি; নইলে বলতে হয়, প্রকৃতির মাঝে প্রাণের এই অতর্কিত আবির্ভাব একটা অহৈতুক ইন্দ্রজাল। তাই যদি হয়, তাহলে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে হয় অসৎ হতে, কিংবা জড়ের কোনও প্রক্রিয়া-বিশেষ হতে (যদিও কোনও জড়প্রক্রিয়াতে নাই তার এতটুকু আভাস), অথবা প্রাণেরই সগোত্র কোনও জড়ভূত হতে। আবার এমনও কল্পনা করা চলে, প্রাণ এসেছে স্থূল বিশ্বের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত জড়াতীত কোনও ভূমি হতে। প্রথম দুটি সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেওয়া চলে কল্পনার খেয়াল ভেবে। শেষ সিদ্ধান্তটি তবুও সম্ভবপর, যুক্তিসিদ্ধ কল্পনার অনুকূল ব'লে; তাছাড়া মরমীর রহস্য-দৃষ্টিও বলে, জড়ভূমির ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনও প্রাণ-লোকের আবেশেই পৃথিবীর বুকে ফুটেছে প্রাণের অরুণচ্ছটা। কিন্তু তবু, জড়ের মাঝে প্রাণ জেগেছে জড়েরই অবশ্যম্ভাবী আদ্যচ্ছন্দরূপে, একথা মানতে বাধা নাই। কারণ, জড়ভূমির ঊর্ধ্বে প্রাণলোক আছে বলেই জড়ের আধারে ফুটবে না প্রাণ, যদি অচিতির মাঝে আত্মরূপায়ণের পর্বে-পর্বে চিৎসত্তার যে-অবতরণ, প্রাণলোক না হয় তার সন্ধিভূমি বা 'আশয়'। তাইতো চিৎসত্তার সমস্ত বীর্য বীজরূপে নিহিত হয় জড়ের মাঝে—পরিণামের ধারা ধরে আবার উন্মিষিত হবে বলেই। এমনি আত্মনিগূহন ছাড়া আত্ম-উন্মেষ সম্ভব নয় কখনও। জড়ের মাঝে নিগূহিত প্রাণের সূচনা কখনও অব্যাকৃত বা অপরিণত, কখনও-বা নিমুপ্ত প্রাণ বাইরে কোনও লেখাই ফুটিয়ে তোলে না; কিন্তু তার সার্বভৌম অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে এই ধরনের লক্ষণ-বিচারের খুব বেশী প্রয়োজন আছে কি? যে-জড়শক্তির মাঝে দেখি সঙ্কলন ব্যাকৃতি ও বিকলনের* লীলা, সেও কিন্তু ভূমিভেদে ঐ একই মহাশক্তি—জন্ম পুষ্টি ও মরণের তরঙ্গে দুলছে যে প্রাণের ছন্দে বিশ্ব জুড়ে। এমনি করেই তো স্বপ্নসঞ্চারী অব-

* জীবপ্রকৃতির জন্ম পুষ্টি আর মরণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে জড়প্রকৃতির সঙ্কলন ব্যাকৃতি ও বিকলনেরই শামিল, যদিও তার ভিতরের ক্রিয়া ও তাৎপর্য আরও সূক্ষ্ম এবং গভীর। রহস্য-দর্শনের রায় মানলে বলা চলে, চৈত্য-পুরুষের জীবদেহ আশ্রয় করার ব্যাপারটাও বাইরে-বাইরে একই রকম। জন্মের পূর্বে চিৎ-কেন্দ্ররূপে জীব অন্নময় প্রাণময় এবং মনোময় কোশের উপাদান ও বৃত্তিসমূহকে প্রথমে আকর্ষণ ও সঙ্কলন করে নিজের

চেতনায় নিগূঢ় থেকেও বুদ্ধির লীলায় সে প্রমাণ করে, জাগ্রত চেতনায় সে-ই ফুটেছে মন হয়ে। তার এই ধরন দেখে মনে হয়, প্রাণ ও মনের অনুন্মিষিত বীর্য যত, সমস্তই ভ্রূণরূপে শয়ান আছে তার গর্ভাশয়ে, এখনও তারা জেগে ওঠেনি বিশিষ্ট ব্যাকৃতি বা পরিণামের ধারা ধরে।

পরমাণু হতে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহলে স্বরূপত এক অখণ্ড প্রাণের প্রকাশ। সত্তার যে প্রকৃতি ও পরিণাম অবচেতন হয়ে আছে পরমাণুর মাঝে, পশুতে তাই পেয়েছে চেতনার মুক্তি ; উদ্ভিদ-জীবন দুয়ের মাঝে পরিণামের একটা মধ্যপর্ব শুধু। বস্তুত প্রাণ চিৎশক্তিরই এক বিশ্বব্যাপিনী লীলা—অন্তরে-বাইরে থেকে জড়ের 'পরে চলছে যার নিগূঢ় শাসন। এই প্রাণই আকৃতি বা বিগ্রহের সৃষ্টি পুষ্টি ও ধ্বংস দ্বারা আবার তাদের গড়ে তোলে নতুন করে, নাড়ীতন্ত্রে সঞ্চারিত সঞ্চেতনী শক্তির উজান-ভাটায় চেতনার সাড়া জাগায় আধারে-আধারে। তার এই বোধনলীলার আছে তিনটি পর্ব। আদিপর্বে, জড়ের নিষুপ্তিতে যেন কাঁপন ধরেছে পরিপূর্ণ অবচেতনার ঘোরে—একেবারে সম্মূঢ় যন্ত্রাবর্তনেরই মত। মধ্যপর্বে দেখা দিয়েছে একটা অস্পষ্ট অবমানস সাড়া—আমরা যাকে চেতনা বলি, তারি সে কাছাকাছি। আর অন্ত্যপর্বে প্রাণি-দেহে ফুটেছে মনশ্চেতনা, যেখানে বোধের অনুলিপি আঁকা হয় মনের পটে এবং তা হতে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধির বনিয়াদ। এই মধ্যপর্বেই সাধারণত আমরা পাই জড় ও মন হতে বিবিক্ত প্রাণের পরিচয় ; কিন্তু বস্তুত প্রত্যেক পর্বে ছিল একই অখণ্ড প্রাণের লীলা—মনঃসত্তা ও জড়সত্তার সেতুরূপে ; প্রতিপর্বেই জড়ের সে উপাদান এবং মনের সে আশয়। চিৎশক্তির লীলা হয়ে প্রাণ যে শুধু রূপ-ধাতুকে গড়ে তুলছে তা নয় ; অথবা শুধু মনের বৃত্তিরূপে রূপধাতুকে সে যে প্রজ্ঞানের বিষয় করছে, তাও নয়। বরং বলা চলে, প্রাণ যেন চিৎসত্তারই তেজোময় বিচ্ছুরণ, যা রূপধাতুর সাক্ষাৎ কারণ ও আধার হয়ে তবেই হয়েছে সচেতন মানস-প্রজ্ঞানের অবান্তর কারণ এবং আধার। চিৎসত্তার এই অবান্তরব্যাপাররূপেই প্রাণ বোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি দেয় সিস্‌ক্ষার

---

মাঝে ; তারপর নবজন্মে তাদের ব্যাকৃত ক'রে জীবদ্দশায় পুষ্টি ঘটায় ; অবশেষে মরণের সময় সঙ্কলিত 'স্কন্ধ'কে বিকলিত ক'রে ছেড়ে যায় তাকে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্তঃশক্তি-সমূহকে নিজের মাঝে আকর্ষণ ক'রে আবার তাদের করে সঙ্কলিত। এমনি ভাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলে একই ধারার পুনরাবৃত্তি।

সেই নিগূঢ় বীর্যকে, সত্তার স্বরূপধাতুতে নিলীন ছিল যার স্পন্দমান আকূতি। এমনি করে প্রাণের প্রভাবে মুক্তি পায় সত্তার সেই প্রজ্ঞানের লীলা, আমাদের মাঝে যা ধরে মনের রূপ ; প্রাণই আবার মনের মাঝে সঞ্চারিত করে এমন এক সাধন-সংবেগ, যার ফলে শুধু নিজের বৃত্তি নয়, প্রাণ ও জড়ের বিচিত্ররূপ নিয়েও কারবার চলে তার। জড় আর মনের যোগাযোগকে প্রাণই বজায় রাখে দুয়ের সেতু হয়ে। সে-যোগাযোগের সাধন হল জীবদেহের নাড়ীতন্ত্রে ছন্দিত প্রাণের অবিরাম বিদ্যুন্ময় প্রবাহ, যা রূপের শক্তিকে বোধে রূপান্তরিত করে যেমন ঘটায় মনের বিপরিণাম, তেমনি মনের শক্তিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করে ঘটায় জড়ের বিকার। তাইতো প্রাণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এই নাড়ীর সামর্থ্য ; এদেশের দর্শনও একেই বলেছে প্রাণশক্তি। কিন্তু নাড়ীর সামর্থ্য শুধু পশুর দেহে প্রাণের রূপ। অথচ এই প্রাণই অখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আছে সকল রূপে—এমন-কি পরমাণুরও মাঝে ; কেননা বিশ্বের সর্বত্র তার স্বরূপ এক, সর্বত্র সে এক চিৎশক্তিরই লীলা। এক মহাশক্তিই তার আত্মবিভূতির রূপধাতুকে ধরে আছে—ফুটিয়ে তুলছে বিপরিণামের বিচিত্র ছন্দে। মূঢ় বা অচেতন নয় সে-শক্তি, বোধ ও মনের নিগূঢ় স্পন্দন জেগে আছে তার মাঝে—যদিও রূপের মাঝে তাদের প্রথম আভাস অন্তর্গূঢ়, স্ফুরত্তার আকূতিতে টলমল, কিন্তু চরম প্রকাশ তাদের স্বচ্ছন্দ। এই তো 'সর্বগত মহান্' প্রাণের অখণ্ড তাৎপর্য ; জড়বিশ্বের স্রষ্টা এবং অন্তর্যামী ধাতা সে-ই।

২০

# মৃত্যু, কামনা ও অশক্তি

প্রথমে সব-কিছু আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা; বুভুক্ষাই মৃত্যু; নিজেরই প্রয়োজনে সে সৃষ্টি করল মন—'আত্মবান্ হব আমি' এই ভেবে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।২।১)

এই তো সেই বীর্য, মর্ত্য যাকে খুঁজে পেল; বহুবিচিত্র স্পৃহা তার বিশ্বকে জড়িয়ে ধরবে বলে; সকল অন্নের নেয় সে স্বাদ, আবার ঘরও বাঁধে জীবের তরে।

—ঋগ্বেদ (৫।৭।৬)

আগের অধ্যায়ে প্রাণকে দেখেছি অন্নময় ভূমি হতে; বুঝতে চেয়েছি কী করে জাগল সে জড়ের মাঝে, কী ধারায় চলল সেখানে প্রাণনের লীলা। তার জন্য তথ্য আহরণ করেছি আমাদের এই নিত্যপরিণামী পার্থিব-লোক হতেই। তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে,—যেখানেই হোক্ প্রাণের আবির্ভাব, যেমন পরিবেশে যে-ধারা ধরেই চলুক তার কাজ, তত্ত্বত সর্বত্রই এক অখণ্ড স্বরূপ তার। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী সেই মহাশক্তি, যা বিশ্বের রূপ-ধাতুকে সৃষ্টি করছে, বীর্যাধানদ্বারা পুষ্ট করছে, আবার ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়ছে তাকে। ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত এক চিৎ-তপসই তার অনাদি স্বরূপ, বিগ্রহে-বিগ্রহে চলছে তারি অন্যোন্য-বিনিময়ের লীলা। আমরা আছি জড়ভূমিতে; মন সেখানে প্রাণের মাঝে নিগূঢ় হয়ে আছে অবচেতনার আচ্ছাদনে, যেমন অতিমানস রয়েছে অন্তর্গূঢ় অবচেতন মনেরই মণিকোঠায়; আবার প্রাণসংবেগের এই অব্যক্ত চেতনাও সংবৃত-মনের অবচেতনাকে নিয়ে নিগূঢ় হয়ে আছে জড়ের মাঝে। তাই মনে হয়, জড়ের ভিত্তিতে যেন এখানে সবার শুরু; উপনিষদের ভাষায়, 'পৃথিবী পাজস্যম্'—পৃথিবীই যেন খুঁটি আমাদের। বিদ্যুৎ-ব্যূহরূপী পরমাণুর ব্যাকৃতিতে জড়বিশ্বের পত্তন; অথচ ঐ পরমাণুতেই রয়েছে এক অবচেতন কামনা ইচ্ছা ও বুদ্ধির অব্যাকৃত আকূতি। জড়ের বুকে জাগে প্রাণের আভাস—নিজের মাঝে বন্দী মনকে

জীবদেহের সহায়ে সে চায় মুক্তি দিতে। আবার মনেরও আছে অতিমানসকে মুক্তি দেবার দায়, যে-অতিমানস নিগূঢ় রয়েছে তার সকল বৃত্তির অন্তরালে। কিন্তু এ তো গেল এই লোকের কথা। এমন লোকও কল্পনা করতে পারি আমরা, যার গড়ন অন্যরকম : সেখানে আদিতে সংবৃত নয় মন, আপন স্বধার বীর্যে সচেতন হয়েই সে ফোটাতে পারে রূপধাতুর নতুন লীলা, এখানকার মত অবচেতনার কুহেলিকায় স্খলিতচরণে হয়না তার যাত্রা শুরু। এমন কামজগতের ধারা এ-জগৎ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও সেখানে মন আর রূপের মধ্যে প্রাণই হবে শক্তি-লীলার বাহন। এমন-কি লীলা-ভঙ্গির পূর্ণ বিপর্যয়েও শক্তির স্বরূপের বিপর্যয় ঘটবে না কোনখানেই।

তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মন যেমন অতিমানসের অন্ত্যা বিভূতি, প্রাণও তেমনি অন্ত্যা বিভূতি চিৎ-তপসের—যার বিসৃষ্টি ও বিশেষণ ঘটছে সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের প্রশাসনে। শক্তিস্বরূপ যে-চৈতন্য, তাই পরমার্থ-সতের স্বীয়া প্রকৃতি ; এই চিন্ময় সন্মাত্র নিজকে যখন প্রকট করেন 'জ্ঞানময় তপের' সৃষ্টিলীলায়, তখন তাকেই বলি সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অথবা অতিমানস। এই অতিমানস কবিক্রতুকে বলতে পারি চিৎ-তপসের স্বতঃস্ফুরণ,—যা হতে ফোটে অখণ্ডেরই বিচিত্র রূপের বিলাস ঋতসুষমার ছন্দলীলায়, আমরা যাকে নাম দিয়েছি জগৎ বা বিশ্ব। তেমনি মন এবং প্রাণও সেই চিৎ-তপস বা কবি-ক্রতুরই রূপায়ণ ; কিন্তু এদের মাঝে চলছে তার রূপ-বৈশিষ্ট্যের বিবিক্ত লীলা। প্রত্যেকটি রূপ এবার ঘেরা নিজস্ব সীমার রেখায়, সংঘাত ও বিরোধের ভিতর দিয়েই ঘটছে তাদের অন্যোন্য-বিনিময়। তাই প্রতি আধারে পুরুষ এবার ফুটিয়ে তুলছে অপর হতে আপাত-ব্যাবৃত্ত একটি বিশিষ্ট মন ও প্রাণ। কিন্তু বস্তুত তারা ব্যাবৃত্ত নয়, একরস তত্ত্বের বিচিত্র রূপায়ণে একই অখণ্ড চেতনা মন ও প্রাণের লীলায়ন তারা। কথাটা এই : আমরা জানি, সর্বসংজ্ঞানী ও সর্বপ্রজ্ঞানী অতিমানসের ব্যষ্টিলীলার চরম পর্বে দেখা দিয়েছে মন, যাকে আশ্রয় করে তার চেতনা প্রতি ব্যষ্টি-আধারে কাজ করে যায় নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বিশ্বের সকল সম্বন্ধকে করে সেই দৃষ্টির অধীন। তেমনি প্রাণকে বলতে পারি, চিৎ-পুরুষের স্বরূপশক্তির অন্ত্যবিভূতি—বিশ্বব্যাপী অতিমানসের সর্বধারক ও সর্বকারক দিব্যক্রতুর চিন্ময় বিলাস। এই প্রাণের লীলাতেই হয় ব্যষ্টি আধারের পুষ্টি ও বীর্যাধান, চলে তাদের গঠন এবং পুনর্গঠন ; ভূতে-ভূতে একে ভিত্তি করেই স্ফুরিত হয় চেতনবিগ্রহের যত প্রবৃত্তি।

প্রাণ বস্তুত ব্রহ্মের তপোবীর্য—বিদ্যুতাধারে নিত্য-উপচীয়মান রূপের বিদ্যুৎ-পুঞ্জ যেন সে ঘটে-ঘটে। বিকর্ষণের লীলায় সে যেমন প্রহত বিচ্ছুরিত হয় চারদিকের বস্তুরূপের 'পরে, তেমনি সঙ্কর্ষণের লীলায় আবার চারদিক হতে নিজের মাঝে টেনে আনে বিচিত্র প্রাণের অভিঘাত,—প্লাবিত-অনুষিক্ত হয় বিশ্বপরিবেশের অবিরাম ধারাবর্ষণে।

এইভাবে দেখলে প্রাণকে মনে হয় চৈতন্যের একটা তপোময় রূপ—সে যেন জড়ের 'পরে মনের ক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক অবান্তর-ব্যাপার মাত্র। এক অর্থে সে যেন মনেরই তপোবিভূতি,—যা দিয়ে বিশ্বধাতু হতে মন করে রূপের বিসৃষ্টি, বোনে রূপের জাল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মন একটা বিবিক্ত পদার্থ নয়, তার পিছনে আছে অখণ্ড অতিমানসের আবেশ; বস্তুত অতিমানসই সৃষ্টি করেছে মনকে ব্যষ্টিভাবনার অন্ত্যপর্বরূপে। তেমনি প্রাণও একটা স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নয়, অখণ্ড চিৎ-শক্তির প্রবেগ প্রচ্ছন্ন আছে তার পিছনে, তার সকল প্রবৃত্তিতে; বস্তুত বিশ্বের বিসৃষ্টিতে আছে একমাত্র চিৎশক্তিরই অবিনাভূত বিচ্ছুরণ। মন ও দেহের মাঝে প্রাণ হল চিৎশক্তির অন্ত্যবিভূতি; অতএব প্রাণের সকল পরিচয়েই যুক্ত থাকবে তার আশ্রয়-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক প্রাণের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির কোনও খবরই জানতে পারি না আমরা, যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির স্বরূপটি ভেসে ওঠে আমাদের চেতনায়, কেননা প্রাকৃত প্রাণ ঐ শক্তিরই বহিরঙ্গ বিভূতি ও সাধন মাত্র। প্রাণের এই নিগূঢ় সত্য-রূপটিকে চিনলেই নিজকে আমরা জানি ব্রহ্মের জীববিগ্রহ বলে, বিশ্বলীলায় তাঁর মনোময় ও অন্নময় সাধন বলে; তখন তাঁর দিব্যক্রতুকে বিজ্ঞান-চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করে এই জীবনেই ফুটিয়ে তুলতে পারি তার সার্থক রূপ। তখনই অবিদ্যা-চেতনার কুটিল 'ধৃতি'কে পরিহার করে প্রাণ ও মন চলতে পারে সত্যধৃতির নিত্য-উপচীয়মান 'অধ্বর'-গতির পথে। মনকে যেমন সচেতন-যোগে যুক্ত হতে হয় অতিমানসের সঙ্গে অবিদ্যার কল্পিত বিচ্ছেদ ভুলে, তেমনি প্রাণকেও সচেতন হতে হবে তার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির সম্পর্কে,—জানতে হবে, এই জীবনে কী তার আকৃতি, কী তার তাৎপর্য। আজ সে দিব্য-আকৃতির কোনও সন্ধানই রাখে না প্রাণ, কেননা তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত শুধু বেঁচে থাকার প্রয়াসে,—যেমন মন আমাদের ব্যস্ত আছে শুধু প্রাণ আর জড়কে নিজের রসে জারিত করবার কাজে। তাই প্রাণের সকল প্রবৃত্তি তার নিজের কাছেও তমোগূঢ়; দিব্য-আকৃতির

প্রশাসনকেই মেনে চলে সে, কিন্তু অবিদ্যার আঁধারে আঁধা হয়ে—সিদ্ধবীর্যের প্রমুক্তিতে ভাস্বর হয়ে নয়, অথবা স্বয়ম্ভূর প্রজ্ঞা বীর্য ও আনন্দের স্বচ্ছন্দ-লীলায় নয়। অথচ তাই কিন্তু তার দিব্য নিয়তি।

বস্তুত প্রাণ আমাদের মাঝে মনের তমসাচ্ছন্ন খণ্ডন-বৃত্তির অধীন বলে নিজেও হয়ে আছে খণ্ডিত এবং আঁধারে-ছাওয়া। তাই মৃত্যু সঙ্কোচ দৌর্বল্য সন্তাপ ও অন্ধপ্রবৃত্তি দ্বারা লাঞ্ছিত সে। তার এই লাঞ্ছনার মূলে আছে পাশবদ্ধ সঙ্কুচিত স্পষ্ট-মনের আড়ষ্টতা। পূর্বেই দেখেছি, আত্ম-অবিদ্যার পাশে জড়িত জীবাত্মার আত্মসঙ্কোচ এই বিপর্যয়ের কারণ। অন্যব্যাবৃত্ত আত্ম-কুণ্ডলনের ফলে নিজকে সে জানে একটা স্বয়ম্ভূ বিবিক্ত ব্যক্তিসত্তা বলে; তাই বিশ্ব-লীলার শুধু সেই রূপটিই চেনে সে, যা ফোটে কেবল তার ব্যষ্টি-চেতনায়—তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা জ্ঞান শক্তি ও সম্ভোগের সীমিত ভাবনায়। একথা সে ভুলে যায়, অখণ্ডের চিদ্-বিভূতি সে, অতএব তার সত্তা ছড়িয়ে আছে বিশ্ব-নিখিলে,—বিশ্বের সকল চেতনা, সকল জ্ঞান, সকল ইচ্ছা, সকল শক্তি ও সকল সম্ভোগে অব্যাহত আবেশ তার। তাইতো মনের কারায় বন্দী জীব-চেতনার এই সঙ্কীর্ণ শাসন মেনে, আমাদের মাঝে বিশ্বপ্রাণও তার স্বরূপ ভুলে ব্যষ্টি প্রবৃত্তির নিগড়ে নিজকে করে বন্দী। তাকে ঘিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে উদার প্রাণোচ্ছলন, তার প্রবেগ ও অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করতে পারে না সে; তাই নিজের বিবিক্ত-লীলায়, সঙ্কুচিত সামর্থ্যের দৈন্য নিয়ে অবশ হয়ে আপনাকে সে সঁপে দেয় তার কাছে। বিশ্বশক্তির যে বিপুল অন্যোন্য-সংঘাত ব্রহ্মাণ্ডকে আলোড়িত করছে প্রতিনিয়ত, তার মাঝে ব্যক্তিসত্তার কার্পণ্যোপহত স্বভাব নিয়ে প্রাণ প্রথমত অসহায়ভাবে সয়ে যায় তার প্রচণ্ড উদ্দাম শাসন: যা-কিছু তার 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে গ্রাস করে, সম্ভোগ করে, তাড়িয়ে ফেরে হাজার প্রয়োজনে, যন্ত্রমূঢ়ের মত শুধু সে সাড়া দেয় তার সকল অভিঘাতে। কিন্তু চেতনার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে নিষুপ্ত সংবৃতির অসাড় অন্ধকার হতে ধীরে-ধীরে ব্যক্তিসত্তায় ফোটে যখন স্বয়ং-জ্যোতির অরুণিমা, তখন আত্মবীর্যের একটা অস্পষ্ট বোধ সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে। তাই সে তখন প্রথমত নাড়ীতন্ত্র দিয়ে, তারপর মন দিয়ে আপন বশে আনতে চায় বিশ্বের শক্তিলীলাকে, তাকে খাটাতে চায় আপন সম্ভোগের প্রয়োজনে। এই বীর্যের উদ্বোধনে ক্রমে হয় আত্মচেতনারও উদ্বোধন; কেননা প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য, বীর্যই ক্রতু এবং ক্রতু ঈশ্বর-চৈতন্যেরই ঈশনার লীলা। ব্যক্তির

মাঝেও তাই প্রাণের গভীর গহনে ক্রমে জেগে ওঠে এই বোধ—সচ্চিদানন্দের সত্যসঙ্কল্পের যে অবন্ধ্য সংবেগ বিশ্বের শাস্তা, সে-ই তার স্বরূপ ; অতএব তারও মাঝে জাগে তার ব্যক্তিজগৎকে আপন শাসনে আনবার অভীপ্সা। আত্মবীর্যের অপরোক্ষ অনুভব, এবং নিজের জগৎকে জেনে অক্ষুণ্ণ বশীকার যে-জগতের 'পরে—এই তো ব্যষ্টিপ্রাণের উপচীয়মান নিত্য আকৃতি। ব্রহ্ম যে বিশ্বরূপে নিজকে ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছেন স্বমহিমার পূর্ণতায়, জীবের ঐ আকৃতিতেই আমরা পাই তার মর্ম-পরিচয়।

সত্য বটে, প্রাণ বীর্যস্বরূপ এবং ব্যষ্টি-প্রাণের পুষ্টিতে ব্যষ্টিচেতনার বীর্যই হয় পুষ্ট ; তবু ব্যষ্টি-প্রাণের খণ্ডভাব তার শক্তিকে করে দীন, তার ঈশনাকে করে কুণ্ঠিত। নিজের জগতের ঈশ্বর হবার অর্থই হল সর্বশক্তির ঈশ্বর হওয়া ; কিন্তু চেতনা যেখানে খণ্ডিত ও ব্যষ্টিভূত, শক্তি ও সঙ্কল্পেও সেখানে দেখা দেবে ব্যষ্টিভাবের খণ্ডতা ও সঙ্কোচ, অতএব সে-চেতনার পক্ষে সম্ভব হবে না সর্বশক্তির ঈশান হওয়া। শুধু সর্বক্রতুই হতে পারেন সর্বেশ্বর। ব্যষ্টিজীবের পক্ষে সে-পরমৈশ্বর্য সম্ভবও হয় যদি, তাহলেও তার জন্যে তাকে লাভ করতে হবে সর্বক্রতুর অতএব সর্বশক্তির পরম সাযুজ্য। নইলে ব্যষ্টি-আধারে ব্যষ্টি-প্রাণ চিরকাল কুণ্ঠিত হয়ে থাকবে মৃত্যু কামনা ও অশক্তি—এই তিনটি উপাধির লাঞ্ছনে।

ব্যষ্টি-প্রাণ মৃত্যুকবলিত হয় তার স্বভাবের বশে যেমন, তেমনি বিশ্বরূপা সর্বশক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধ-বৈশিষ্ট্যের ফলেও। বস্তুত ব্যষ্টি-প্রাণ বিশ্বতেজেরই একটা বিশিষ্ট ধারা ; সে-তেজের শতরূপা প্রকৃতির একটি রূপই ফুটেছে তার মাঝে বিশেষ করে। এমনি করে বিশ্বময় অগণিত রূপের মেলা—বিশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকারের আবেষ্টনে ; প্রত্যেকে তারা সেই পরম তেজেরই একটি রশ্মিরেখা—ফুটছে, আছে, কাঁপছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের বিশেষ ব্রতের উদ্‌যাপনে। দেহের মাঝে সঞ্চিত আছে যে প্রাণের তেজ, বিশ্বে ছড়ানো বাইরের তেজোরাশির অভিঘাত সইতে হচ্ছে তাকে প্রতিনিয়ত ; অহরহ নিজের মাঝে টেনে নিয়ে তাদের যেমন গ্রাস করছে সে, তেমনি আবার গ্রস্তও হচ্ছে তাদের দ্বারা। তাই উপনিষদের ভাষায় জড়মাত্রেই 'অন্ন' ; "অন্ন-ভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অন্ন"—এই হল জড়জগতের বিধান। দেহের মাঝে পিণ্ডিত হয়েছে যে-প্রাণ, বাহ্য-প্রাণের অভিঘাতে প্রতিমুহূর্তে রয়েছে তার চূর্ণ হবার সম্ভাবনা। বাহ্য-প্রাণকে গ্রাস করবার সামর্থ্য যদি হয় তার

কুণ্ঠিত, কিংবা অপর্যাপ্ত হয় তার পোষণ ও আপ্যায়ন, অথবা বাহ্য-প্রাণের অন্ন যোগানোর সামর্থ্য কি প্রয়োজনের সঙ্গে তার নিজের অন্নগ্রহণের সামর্থ্যের যদি ঘটে বৈরূপ্য ; তাহলেই ব্যষ্টি-প্রাণ আর আত্মরক্ষা করতে না পেরে হয় বাহ্য-প্রাণের কবলিত, অথবা নতুন করে নিজকে না গড়তে পেরে ক্ষয়ে যায় বা গুঁড়িয়ে যায়। এমনি করে নতুন হয়ে ফোটবার জন্যেই মৃত্যুকে সে নেয় বরণ করে।

শুধু তাই নয়। উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে প্রাণ যেমন দেহের অন্ন, দেহও তেমনি প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ আমাদের মাঝে সঞ্চিত যে প্রাণের তেজ, সে যেমন আধারের গঠন পোষণ ও নবায়নের সকল উপাদান জুটিয়ে আনে বাইরে থেকে, তেমনি তার আপন ধাতুর সৃষ্টি ও সঞ্চয়কেও সে আত্মসাৎ করতে থাকে প্রতিনিয়ত। এই দুটি বৃত্তির মাঝে সাম্যের যদি ন্যূনতা কি ব্যাঘাত ঘটে, অথবা বিচিত্র প্রাণের ধারার ঋতায়নে তালভঙ্গ হয় যদি, তাহলেই দেখা দেয় ব্যাধি এবং ক্ষয়—শুরু হয় ভাঙনের লীলা। তাছাড়া প্রাণের আধারে সচেতন প্রভুশক্তির উপচয়, এমন-কি মনঃশক্তির সমৃদ্ধিও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করে অনেক সময়। কারণ এ-অবস্থায় আধারে সঞ্চিত প্রাণের চাহিদা ক্রমে বাড়তে থাকায় প্রাণের আদিম পুঁজি থেকে বাড়তি চাহিদার যোগান দেওয়া হয় অসম্ভব। প্রকৃতির হিসাবে যে-বিপর্যয় ঘটে এমনি করে, নতুন পুঁজি দিয়ে তাকে সামাল দেবার আগেই দেখা দেয় আয়ুঃক্ষয়কর নানা বিভ্রাট, আধার জুড়ে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। তাছাড়া প্রভুত্বের সূচনাতেই প্রাণের পরিবেশে জাগে একটা প্রতিক্রিয়া ; কেননা সেখানেও আছে এমন-সব শক্তি যার চায় আত্মসম্পূর্তি, অতএব অতর্কিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে তারাও ঘোষণা করে বিদ্রোহ। এমনি করে যেমন ভিতরে তেমনি বাইরের পরিবেশেও সমত্ব হয় ক্ষুণ্ন, অতএব আরও তুমুল একটা সংগ্রামের সূচনা হয় সেখানে। প্রভুত্বকামী প্রাণের শক্তি যতই প্রবল হোক, তবুও অসীমের কোঠায় সে না পৌঁছয় যদি, অথবা সৌষম্যের নূতন ছন্দে না বাঁধতে পারে পরিবেশকে, তাহলে বাইরে-ভিতরে সকল বাধা ঠেলে জয়শ্রীকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না সকল সময় ; সুতরাং পরাভূত হয়ে একদিন তাকে ভেসে যেতেই হয় ভাঙনের স্রোতে।

তাছাড়াও একটা কথা আছে। প্রাণবিগ্রহেরই প্রকৃতি ও আকূতিতে আছে এক অনাদি প্রয়োজনের তাগিদ—সান্তের ভূমিকায় চায় সে অনন্তের

আস্বাদন। কিন্তু যে-বিগ্রহ হবে এই আস্বাদনের সাধন, তার কাঠামোটাই যখন পূর্ণভোগের সম্ভাবনাকে করে সীমিত, তখন তাকে ভেঙে-চুরে নূতন ভোগায়তন গড়ে তোলা ছাড়া প্রাণের আকূতি সাথক হবার আর তো উপায় নাই কোনও। পুরুষ খণ্ডিত দেশে-কালে আপনাকে কুণ্ডলিত ক'রে একবার যখন বাঁধা পড়েছে সীমার বাঁধনে, তখন আনন্ত্যকে ফিরে পেতে তাকে আশ্রয় করতে হয় অনুবৃত্তি বা পারম্পর্যের যোজনা। ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে জুড়ে এক দীর্ঘায়িত ক্ষণসন্তানের মাঝে সঞ্চয় করে সে তার কালিক-অনুভব এবং তাকেই বলে তার অতীত। সেই কালের মাঝে থেকেই সঞ্চরণ করে সে বিচিত্র দেশ, বিচিত্র অনুভব বা বিচিত্র জীবনের পরম্পরায়—পর্বে-পর্বে গেঁথে তোলে তার শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের সঞ্চয়। তার অবচেতন বা অতিচেতন স্মৃতিতে এমনি করে অতীতের উপার্জন আশয়রূপে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে তিলে-তিলে। এই ধারায় চলতে গেলে কায়ের পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক। কিন্তু পুরুষ ব্যষ্টি-আধারে সংবৃত হয়ে আছে যেখানে, সেখানে কায়াবদলের অর্থই হল আধারের ধ্বংস বা বিশরণ—জড়বিশ্বে অনুস্যূত বিশ্বপ্রাণেরই অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে। বিশ্বপ্রাণ আধারের উপাদান যোগায় যেমন, তেমনি সে উপাদানের 'পরে তার দাবিকেও করে না শিথিল; কেননা অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্য-বুভুক্ষায় সংক্ষুব্ধ জগতে শরীরী প্রাণকে বাঁচতে হবে লড়াই করে—আঘাত সয়ে, আঘাত দিয়ে। এ হতেই দেখা দেয় বিশ্বপ্রাণের কল্পিত মৃত্যু-বিধান।

অতএব মৃত্যুর প্রয়োজন ও সার্থকতা এইখানে; প্রাণেরই একটা ভঙ্গিমা সে, তার প্রতিষেধ নয়। মৃত্যুর প্রয়োজন আছে জগতে, কেননা সান্ত জীববিগ্রহের অমৃত-অভীপ্সা একমাত্র অন্তহীন কায়-পরিবর্তন দ্বারাই হতে পারে সার্থক; আর সেই বিগ্রহে সংবৃত সান্ত-মনের মাঝেও আনন্ত্যের ভাবনা রূপ পায় একমাত্র অনুভবের শাশ্বত ক্ষণভঙ্গেই। কিন্তু কায়াবদল, যদি হয় শুধু একই রূপাদর্শের অবিচিছন্ন আবৃত্তি—যেমন দেখি জীবন ও মরণ দিয়ে ঘেরা জীবের একটি জন্মের বেষ্টনীতে—তাহলে কিন্তু প্রাণের ভোগৈশ্বর্যের আকাঙক্ষা পুরোপুরি মিটতে পারে না। কারণ, রূপাদর্শের বদল না হলে, অনুভবিতা মন দেশ-কাল-পরিবেশের নূতন পরিস্থিতিতে নূতন আধারের আশ্রয় না পেলে, স্বভাবতই দেশ-কালের ভূমিকায় অনুভবের যে-বৈচিত্র্য ছিল একান্ত প্রত্যাশিত, তার সকল সম্ভাবনা যায় বিলুপ্ত হয়ে। এইজন্যই

জীবন জুড়ে মৃত্যুর প্রলয়-তাণ্ডব, এই জন্য প্রাণই অন্নাদ হয়ে গ্রাস করছে প্রাণকে। কিন্তু মর্ত্য-চেতনায় আমরা স্বাতন্ত্র্যহীন, নিয়তি-তাড়িত, দ্বন্দ্ব-বিধুর, দুঃখহত—একটা আপাতপ্রতীয়মান অনাত্মসত্তার শাসনে জর্জরিত ; তাই মরণরূপে রূপান্তরের এই শিবময় বিধানও আমাদের কাছে একটা অবাঞ্ছিত বিভীষিকা। মৃত্যু আমাদের সত্তাকে গ্রাস করে, বিচূর্ণ-বিধ্বস্ত করে, ছিনিয়ে নেয় মমতার বাঁধন ছিঁড়ে—তাই মৃত্যুর দংশনে এত জ্বালা ; মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকব লোকান্তরে, এ-আশ্বাসেও সে-জ্বালাকে সইতে পারি না তারি জন্যে।

কিন্তু এও দেখেছি, অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্য-বুভুক্ষাতেই জড়ের মাঝে ফুটল প্রাণের রূপ ; মৃত্যুর লীলা তারি একটা অপরিহার্য বিধান। উপনিষদ বলেন, প্রাণের লীলা 'অশনায়া মৃত্যুঃ' অর্থাৎ মরণের বুভুক্ষুরূপ এবং এই বুভুক্ষাই সৃষ্টি করেছে জড়ের জগৎ। প্রাণ এখানে নিজেকে ঢালছে জড়ভূতের ছাঁচে ; কিন্তু জড়ভূতে রূপ ধরেছে অখণ্ড-সত্তারই অনন্ত বিভাজন ও সঙ্কলনের পরিস্পন্দ। এই-যে অন্তহীন ভাঙা-গড়ার দুটি প্রবেগ, তার মহাসঙ্গমে জন্ম নিয়েছে বিশ্বের জড়স্থিতি। তারি মাঝে ফুটল ব্যষ্টি-জীব প্রাণের পরমাণু হয়ে। সে চায় বাঁচতে, বৃহৎ হতে—এই তো তার সকল আকূতির নিষ্কর্ষ। নিখিল জুড়ে প্রসারিত হোক্ উপচীয়মান অনুভবের সীমা, সব-কিছুকে হাতের মুঠোয় এনে নিঃশেষে তার রসপানে মহাপিপাসার ঘটুক্ তর্পণ—এমনি করে দেহে প্রাণে মনে মনুষ্যত্বের গৌরবে আসুক জোয়ার, এই তো তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপসত্তার অনাদি অমোচন অনুত্তরণীয় প্রৈতি ; কেননা ব্যষ্টিভাবনায় খণ্ডিত হয়েও সে-সত্তার মাঝে আছে সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী আনন্ত্যের নিগূঢ় সংবিৎ। সেই নিগূঢ় সংবিৎকে ব্যক্তবোধের দীপ্তিতে ফুটিয়ে তোলার প্রৈতিই বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপের মাঝে এনেছে কামনার উদগ্র প্রবেগ, প্রতি জীবে জ্বালিয়ে তুলেছে দেহবান আত্মার অনির্বাণ আকূতির শিখা। অতএব প্রাণের উপচীয়মান পুষ্টি ও প্রসার দ্বারা সে যে খুঁজবে এই আকূতির চরিতার্থতা, এ যেমন অপরিহার্য, তেমনি ধর্ম্য ও মাঙ্গল্যও বটে। কিন্তু অন্নময় জগতে এই আত্মসম্পূর্তির সাধনা সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র অন্নাদরূপে পরিবেশকে কবলিত ক'রে,—অপরকে বা অপরের বিত্তকে গ্রাস কি আত্মসাৎ ক'রে। জগৎ জুড়ে তাই দেখা দিল মহাবুভুক্ষার সার্থক লীলা। কিন্তু অন্নাদ যে, তাকেও হতে হবে অন্ন ; কেননা অন্নময় জগতে প্রাণের লীলায়

আছে অন্যোন্যবিনিময় ও ঘাতপ্রতিঘাতের অলঙ্ঘ্য বিধান এবং তারি ফলে ব্যষ্টি-আধারের সীমিত সামর্থ্যের সুনিশ্চিত অবক্ষয় ও পরাভব।

অবচেতনার মাঝে যা ছিল প্রাণের ক্ষুধা, মনশ্চেতনায় ফোটে তার সমৃদ্ধতর রূপান্তর; প্রাণময়-কোশের বুভুক্ষা মনোবাসিত প্রাণে জাগে কামনার আকূতি হয়ে, বুদ্ধি- বা মনন-শাসিত প্রাণে দেখা দেয় সে সঙ্কল্পের প্রবেগ রূপে। বিশ্বের শাশ্বত বিধানের বশেই এই কামনার বেগ হয় অনিরুদ্ধ, যতদিন না ব্যষ্টি-জীব পর্যাপ্ত শক্তিসঞ্চয়ের দ্বারা পায় স্বারাজ্যের অধিকার এবং অনন্তস্বরূপের উপচীয়মান সাযুজ্যবশত আপন বিশ্বের সাম্রাজ্যকে করে অধিগত। কামনাকে নিমিত্ত করেই চিন্ময় প্রাণ বিশ্বের মাঝে খুঁজে পায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ; অতএব স্থাণুত্বের সাধনায় কামনার নির্বাণ-প্রয়াস সেই দিব্য-প্রাণের মূঢ় নিরাকৃতি মাত্র। এ শুধু অসতের প্রতি অভিনিবেশ, অতএব অবিদ্যারই নামান্তর,—কেননা ব্যষ্টিত্বের অত্যন্তাভাব কখনও সিদ্ধ হতে পারে না অনন্তসমাপত্তির সদ্‌ভাব ছাড়া। তাই কামনার যথার্থ নিবৃত্তি হয়—যখন তার সম্প্রসারণ কিংবা পর্যবসান ঘটে অনন্তের কামনাতে; তখন অনন্ত-স্বরূপের সর্বাবগাহী পূর্ণৈশ্বর্যের আনন্দে ঘটে তার শাশ্বত আত্মসম্পূর্তি, তার যুগান্তব্যাপী আকূতির সুচির-তর্পণ। আবার এরি জন্যে অন্যোন্যগ্রাসী বুভুক্ষার সঙ্কুল পথ ছেড়ে উত্তীর্ণ হতে হয় তাকে উৎসর্গের উদার পথে, আত্ম-দানের উপচিত আনন্দে সমুজ্জ্বল অন্যোন্যবিনিময়ের সাধনায়। জীব তখন অপর জীবের মাঝে নিজকে ঢেলে দিয়ে আবার তাদের ফিরে পায় নিজের মাঝে। ছোট যেমন নিজেকে সঁপে দেয় বড়র কাছে, বড়ও তেমনি ছোটর মাঝে নিজেকে দেয় বিলিয়ে; তাইতে উভয়ের মাঝে ঘটে উভয়ের চরিতার্থতা। মানুষ যেমন নিজেকে সঁপে দেয় দেবতার কাছে, দেবতাও তেমনি নিজকে বিলিয়ে দেন মানুষের মাঝে; ব্যষ্টির অন্তর্গূঢ় সর্বস্বরূপ উৎসর্গ করেন আপনাকে সমষ্টিগত সর্বস্বরূপের কাছে এবং সেই চিন্ময় বিনিময়ে সমষ্টিভাবের সিদ্ধসত্তাকে ফিরে পান নিজের সত্তায়। বিশ্বজোড়া বুভুক্ষার বিধান এমনি করে ক্রমে রূপান্তরিত হয় প্রেমের বিধানে, খণ্ডতার রীতি পর্যবসিত হয় অখণ্ডতার বিধিতে, মৃত্যুর শাসন ধরে অমৃতচ্ছন্দের রূপ। জগৎ জুড়ে ঐ-যে কামনার বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য—এই তার প্রয়োজন, এই তার সার্থকতা, এই তার আত্মসম্পূর্তির চরম লীলা।

সান্ত চায় অনন্ত অমৃতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাই প্রাণ পরেছে মরণের মুখোস; তেমনি প্রাণের ব্যষ্টি বিগ্রহে অবরুদ্ধ সন্ধিনী-শক্তির সংবেগই

ধরেছে কামনার রূপ। সে চায় সচ্চিদানন্দের অনন্ত আনন্দকে ফুটিয়ে তুলতে সান্তের ভূমিকায়—কালিক পরম্পরা ও দৈশিক আত্মপ্রসারণের ছন্দময় প্রগতিতে। ব্রহ্মশক্তির যে-সংবেগ কামনার মুখোস পরে আছে আমাদের মাঝে, তা এসেছে প্রাণের তৃতীয় প্রতিভাস হতে, আমরা যাকে জানি অশক্তি বলে। স্বরূপত অনন্ত শক্তি হয়েও প্রাণ ফুটতে চাইছে সান্ত আধারে; অতএব সান্তের মাঝে ব্যষ্টিভাবের প্রকটলীলায় তার সর্বেশনা পদে-পদে ব্যাহত হয়ে ধরে সীমিত সামর্থ্য ও কুণ্ঠিত অনীশতার রূপ। অথচ ব্যষ্টি-জীবের প্রত্যেক কর্ম যত অশক্ত, যত অসার্থক, যত পঙ্গুই হোক্, তার পিছনে আছে সর্বেশনাময়ী অনন্তশক্তির পরিপূর্ণ আবেশ—অতিচেতনা ও অবচেতনার নিগূঢ় দীপ্তি নিয়ে। ঐ আবেশ ছাড়া স্পন্দিত হয় না বিশ্বের একটি নিশ্বাসও; তার বিশ্বগত সমষ্টি-কর্মের মাঝে বিধৃত হয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি কর্ম ও স্পন্দন—সর্বান্তর্যামী অতিমানসের সর্ববিৎ সর্বেশনাময় ঋতের শাসনে। কিন্তু ব্যষ্টি-প্রাণ নিজকে অনুভব করে অশক্ত ও সঙ্কুচিত বলে; কেননা চলতে গিয়ে প্রতি পদে তাকে লড়তে হয় অন্যান্য ব্যষ্টি-প্রাণের পুঞ্জিত পরিবেশের সঙ্গে। শুধু তাই নয়; সমষ্টি-প্রাণের শাসন ও অসহযোগের পীড়াও তাকে সইতে হয় ততদিন, যতদিন আত্মরতির সম্মূঢ় ছলনায় তার অপ্রবুদ্ধ চেতনা সমষ্টির শাশ্বত বিধানের বিরুদ্ধে করে বিদ্রোহ। তাই ব্যষ্টি-প্রাণের খণ্ডলীলায় দেখা দেয় তার তৃতীয় উপাধি—সংবেগের স্তিমিত সঙ্কোচ বা অশক্তির আকারে। অথচ সত্তার গহনে তার প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মপ্রসারণ ও সর্ব-গ্রসনের প্রৈতি, যা তার বর্তমান সংবেগ বা সামর্থ্যের সীমার মাঝে কিছুতেই নিজেকে রাখবে না সঙ্কুচিত। এমনি করে, ভোগৈশ্বর্যের আকৃতি আর ভোগৈশ্বর্যের সামথ্য, দুয়ের সংঘাতে জাগে কামনা। আকৃতির সঙ্গে সামর্থ্যের বিষম-অনুপাত না থাকত যদি, ভোগের সামর্থ্য যদি ভোগ্য বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেত সকল সময়, অথবা বিনা আয়াসেই নিশ্চিত সিদ্ধির নাগাল পেত যদি, তাহলে কামনার এতটুকু আভাসও ফুটত না কোথাও, নিখিল জুড়ে থাকত শুধু স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য-সঙ্কল্পের আকৃতিহীন প্রশান্তি—আপ্তকাম ব্রহ্মের দিব্যক্রতুর মত।

ব্যষ্টি-আধারের সামর্থ্য যদি হত অবিদ্যা-নির্মুক্ত মনের তেজোময় বিচ্ছুরণ, মাঝখানে তবে এমনভাবে দেখা দিত না সীমার সঙ্কোচ বা কামনার প্রবেগ। কারণ, অতিমানসের সাযুজ্যবশত বিজ্ঞানের দৈবীসম্পদ রয়েছে যে-মনের, সে জানে তার প্রত্যেকটি কর্মের অভিপ্রায় অধিকার ও অপরিহার্য

পরিণাম ; অতএব আকৃতিতে চঞ্চল অথবা আয়াসে ক্ষুব্ধ না হয়ে আপাত-লক্ষ্যের সিদ্ধিতেও করে সে সুনিরূপিত অথচ সুনিশ্চিত সামর্থ্যের অব্যর্থ যোজনা। এমন-কি বর্তমানকেও যদি ছাড়িয়ে যায় তার প্রয়াস, আপাত-সিদ্ধির সম্ভাবনাহীন কর্মভার যদি তুলে নিতে হয় তাকে, তবুও তার মাঝে দেখা দেয় না কামনা বা সঙ্কোচের দৈন্য। কারণ, পরমদেবতার আপাত-অসিদ্ধিও তাঁর সর্ববিৎ সর্বেশনারই লীলা ; তিনি জানেন, কোন্ মুহূর্তে কোন্ পরিবেশে তার বিশ্বকর্মের প্রৈতি হবে অঙ্কুরিত, বিচিত্র দশাবিপর্যয়ে পল্লবিত এবং আপাত ও চরম সিদ্ধিতে ফলিত। দিব্য অতিমানসের সঙ্গে যোগযুক্ত বিজ্ঞানী-মনেও আছে এই সর্ববিৎ ও সর্বনিয়ামিকা ঈশনার আবেশ। কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে ব্যষ্টি-প্রাণের মাঝে স্ফুরিত হয়েছে শুধু ব্যষ্টি-ভাবনা ও অজ্ঞানী-মনের সীমিত বীর্য। সে-মন স্খলিত হয়েছে তার অতিমানস স্বরূপের বিজ্ঞান হতে, তাই অশক্তি তার জীবনের নিত্য-সহচর—বিশ্ববিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই। কারণ, যে-শক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সীমিত পরিবেশের মাঝেও যে সে পাবে সর্বেশনার বাস্তব অধিকার, একথা অকল্পনীয়। তাহলে তার অনৃতময় অহমিকা সর্ববিৎ সর্বেশনার দিব্য কল্পনাকে প্রতিহত ক'রে বিশ্বের ঋতময় বিধানকে করত বিপর্যস্ত—বিশ্বব্যাপারে যা একেবারেই অসম্ভব। অতএব সীমিত শক্তির মাঝে দেখা দেয় যে দ্বন্দ্ব ও আয়াস, তার ফলে তাদের পরিমিত সামর্থ্যের ঘটে উপচয়—সচেতন অথবা অবচেতন বাসনার অনিরুদ্ধ সংবেগে, এই হল প্রাণধর্মের প্রথম পরিচয়। যেমন বাসনার রীতি, তেমনি এই বিক্ষুব্ধ আয়াসেরও রীতি : এ যেন সগোত্র শক্তিসমূহের মাঝে একটা সচেতন মল্লযুদ্ধ—পরস্পরের শক্তিপরীক্ষার দ্বারা পরস্পরের আনুকূল্যসাধন মাত্র। এ-দ্বন্দ্বের ফলে বিজেতা এবং বিজিত, অথবা ঊর্ধ্ব হতে নেমে আসে যে শক্তির ধারা এবং তারি প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে-নিম্নশক্তি—দুয়েরই হয় সমান পুষ্টি, সমান লাভ। এই দ্বন্দ্বই অবশেষে রূপান্তরিত হয় দিব্য-ভাবের আনন্দরভসোচ্ছলিত অন্যোন্যবিনিময়ে—সংঘাতের উন্মত্ত-নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ পরিণত হয় প্রেমের নিবিড়-ব্যাকুল আলিঙ্গনে। তবু দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই মানব-প্রাণের বিজয়-অভিজানের অপরিহার্য শিবময় সূচনা। মৃত্যু, কামনা আর সংঘাত—খণ্ডিত প্রাণলীলার এই-যে ত্রয়ী, এ তো বিশ্বজিৎ দিব্যপ্রাণেরই প্রথমকল্পিত ছদ্মরূপমাত্র।

## ২১

# প্রাণের উদয়ন

চলে যাক বাণীর পথ দেব-গণের পানে—'অপ্'-এর পানে যাক সে চলে মনের প্রযোজনায়!......হে শিখা, দ্যুলোকের অর্ণবের পানে চলেছ তুমি, চলেছ দেবতাদের পানে; সঙ্গত কর দিব্যধামবাসী দেবতাদের—সূর্যের ওপারে রয়েছে যে 'অপ্'-রা, জ্যোতির্লোকে আর অবরলোকেও রয়েছে যারা, তাদের সাথে।

—ঋগ্বেদ (১০।৩০।১; ৩।২২।৩)

তৃতীয় ধাম জিনে নেন সেই আনন্দময় মহেশ্বর; বিরাটের আত্মভাবের ছন্দে তাঁর পোষণ ও শাসন; শ্যেনের মত, শকুনের মত আধারে নিষণ্ণ হয়ে তাকে তুলে ধরেন—জ্যোতির বেত্তা তিনি তুরীয় ধামকে করেন প্রকাশ, সংসক্ত হয়ে থাকেন সেই সমুদ্রে, উত্তাল যে 'অপ্'-এর ঊর্মিমালায়।

—ঋগ্বেদ (৯।৯৬।১৮, ১৯)

তিনটিবার চরণক্ষেপ করলেন বিষ্ণু—নিহিত করলেন তাঁর পদকে অব্যাকৃত পাংশুজাল হতে তুলে ধরে; তিনটি পদক্ষেপ করলেন বিষ্ণু—নিখিলের রক্ষক তিনি অধৃষ্য; ওপার হতে ধরে আছেন তাদের ধর্ম যত। সেই তো তাঁর পরম পদ, সূরিরা যাকে দেখেন সদা—দ্যুলোকে আতত চক্ষু যেন! তাকেই উদ্ভাসিত জাগ্রত বিপ্রেরা করেন সমিদ্ধ—বিষ্ণুর যে পরম পদ, তাকেই।

—ঋগ্বেদ (১।২২।১৭-২১)

এতক্ষণে এইটুকু বুঝেছি আমরা: স্বয়ং-জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মী-চেতনার আপাতিক আত্মপ্রতিষেধই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বনিয়াদ; ঐ আত্মপ্রতিষেধের সঙ্গে সে-চেতনার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হল খণ্ডিত মর্ত্য-মন দিয়ে,—অজ্ঞান সঙ্কোচ ও দ্বন্দ্ব-বুদ্ধির জনক হলেও যাকে বলা যায় দিব্য অতিমানসেরই একটা স্তিমিত আ-ভাস। ঠিক এই ধারা ধরে প্রাণ ফুটেছে জড়বিশ্বে,—জড়ের গহনে বন্দী গুহাহিত বিভাজক-মনের অবচেতন বিচ্ছুরণরূপে; মৃত্যু বভুক্ষা ও অশক্তির জনক হলেও প্রাণকে জানি ব্রহ্মের অতিচেতন মহাশক্তিরই

স্তিমিত আ-ভাসরূপে,—যে শক্তির পরমা বিভূতি ফোটে অনন্ত অমৃতে, নিত্যতৃপ্ত উল্লাসে. অকুণ্ঠ ঈশনায়। অতিচেতনা হতে মর্ত্যচেতনার এই আ-ভাস হতে নিরূপিত হয় বিরাটের ব্রহ্মাণ্ড-লীলার ধারা, আমরা যার অঙ্গীভূত; এই আ-ভাসের প্রশাসনেই বিধৃত রয়েছে আমাদের ক্রম-পরিণামের আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্ব। প্রাণ-প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ দেখি খণ্ড ভাবনায়, অন্ধশক্তি-তাড়িত অবচেতন সঙ্কল্পের মূঢ় এষণায়—যাকে সঙ্কল্প না বলে বলা চলে জড়শক্তিরই উত্তাল অথচ নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস; আধার ও পরিবেশের মাঝে যে অন্যোন্য-বিনিময়ের যন্ত্রলীলা, প্রাণ যেন নির্বীর্য হয়ে অসাড়ে নিজকে সঁপে দিয়েছে তার কাছে। মহাশক্তির এই অচিতি, এই অন্ধ অথচ দুর্ধর্ষ প্রবৃত্তি ফুটেছে জড়-বিশ্বের সেই রূপ নিয়ে, জড়বিজ্ঞানীর সাথে যার একান্ত পরিচয়; তাঁর মতে এই জড়ের দর্শনই বিশ্বের তত্ত্বদর্শন,—বিশ্বের সকল ব্যাপার এরি অন্তর্গত। আমরা একে বলতে পারি অন্নময় চৈতন্য—অন্নময় জীবনের পরিনিষ্ঠিত রূপ। কিন্তু শুধু জড়ক্রিয়াতেই তো প্রাণশক্তি হয়নি নিঃশেষিত; তাই জড়লীলাকে অতিক্রম করেও ফোটে তার প্রকাশের একটা নতুন ধারা। প্রাণ যতই জড়-আধারের নাগপাশ হতে নিজকে করে নির্মুক্ত, সচেতন মনোলীলার দিকে যতই এগিয়ে চলে তার অভিযান, অভিনবের রূপটি ততই তার মাঝে ফোটে স্পষ্ট হয়ে। একে বলতে পারি প্রাণ-প্রকৃতির মধ্যবিভূতি: এতে আছে, মৃত্যু ও অন্যোন্য-কবলনের লীলা, আছে বুভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সঙ্কীর্ণ প্রসর ও সামর্থ্যের একটা পীড়িত অনুভব, আপনাকে ছড়িয়ে দেবার বাড়িয়ে তোলবার একটা ক্ষুব্ধ আয়াস, বিজিগীষা ও বিত্তৈষণার একটা প্রমত্ততা। একেই আমরা বলেছিলাম মৃত্যু কামনা ও সংঘাতের ত্রয়ী; প্রকৃতি-পরিণামের যে-পরিচয় মানুষের প্রথম জ্ঞানগোচর হল ডারুউইনের অভিব্যক্তিবাদে, এই কিন্তু ভিত্তি তার। বিশ্ব জুড়ে চলছে একটা বিপুল আয়াসের বিক্ষোভ—এই হল তার মূল কথা। মৃত্যুর মাঝেও আছে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার ক্ষুব্ধ প্রয়াস; কেননা মৃত্যু প্রাণেরই একটা নেতিরূপ, যার আড়ালে নিজকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রাণ তার ইতিরূপের মাঝে জাগিয়ে তুলছে অমৃতত্বের উন্মাদনা। তেমনি বুভুক্ষা ও কামনার মাঝেও দেখি অকুণ্ঠ আত্মতর্পণের নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছবার একটা প্রচণ্ড দুরাগ্রহ, কেননা কামনার প্রমত্ততা দিয়ে প্রাণ চাইছে অতৃপ্ত বুভুক্ষার নেতিরূপ হতে নির্মুক্ত করে ইতিরূপকে তার প্রচোদিত করতে অনন্ত-সত্তার

নিরঙ্কুশ সম্ভোগের পানে। সামর্থ্যের সঙ্কোচ হতে তেমনি দেখা দেয় নিজকে ছড়িয়ে দেবার, ঈশনা ও সম্ভোগকে কবলিত করবার একটা দুর্দম আয়াস। তার মাঝে প্রাণ চায় পুরোপুরি নিজকে পেতে, চায় পরিবেশকে জিনে নিতে; কেননা শক্তির সঙ্কোচ ও দৈন্য হল প্রাণের নেতিরূপ, যা দিয়ে ইতিরূপের মাঝে মূর্ত করে তুলতে চায় সে পূর্ণতাসিদ্ধির শাশ্বত সম্ভাবনাকে। তাই জীবন-সংগ্রাম টিকে থাকবার সংগ্রামই নয় শুধু, তার মাঝে আছে সর্বগ্রসন ও সর্বসিদ্ধিরও একটা তপস্যা। কারণ, টিকে থাকবার সম্ভাবনা তখনই হয় সুনিশ্চিত, যখন পরিবেশকে আমরা পাই অল্প-বিস্তর হাতের মুঠোয়; তার জন্যে নিজকে কখনও মানিয়ে নিতে হয় তার সঙ্গে, কখনও-বা তোয়াজ করে হোক আর জুলুম করেই হোক,—তাকে খাপ খাওয়াতে হয় নিজের সঙ্গে। এইজন্যই সর্বগ্রসন বা বিত্তৈষণাও একটা প্রাণের দায়। সর্বসিদ্ধির এষণাও তেমনি দায় একটা, কেননা নিজের সিদ্ধরূপটি যতই পরিস্ফুট করে তুলব আমরা, ততই তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও হবে সুনিশ্চিত অর্থাৎ চিরকাল টিকে থাকবার দাবি খাটবে তখনই। ডারুউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-বাদের মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই সত্যের ইঙ্গিত।

কিন্তু ডারুউইনীয় অভিব্যক্তিবাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে একটি সত্য ধরা পড়েনি। জড়ের মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে চৈতন্যের যে-যন্ত্রলীলা, জড়বিজ্ঞানী তার অবশ-ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন প্রাণের স্ববশ-স্ফুরণকে,—দেখলেন না প্রাণের মাঝে উন্মিষিত হয়েছে এমন-একটা নূতন তত্ত্ব, যার সার্থকতা হল অবশ যন্ত্রলীলাকে নিজের বশে আনায়। তেমনি ডারুউইনীয় মতবাদও প্রাণের মাঝে যুযুৎসু ভাবটাকে দেখল বড় করে; জীব-জগতে ব্যষ্টি-প্রাণের স্বার্থোদ্ধততাই সত্য, আত্মরক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আততায়ী হয়ে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তিই জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক—এই তার রায়। কিন্তু জড়-প্রকৃতিতে ও ইতরজীবের প্রকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রাণধর্মের যে-দুটি বিভূতি, তার মাঝে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আর-একটা নূতন তত্ত্ব ও নূতন বিভূতির বীজ—যার অঙ্কুর জাগবে, যখন জড়ের আধারে সংবৃত মন প্রাণতন্ত্রের ভিতর দিয়েই ফিরে যাবে তার স্বধর্মে। আজ প্রাণ যেমন ফুটে উঠছে মন হয়ে, তেমনি মন ফুটবে যেদিন অতিমানস হয়ে, সেদিন প্রাণলোকে আসবে আর-একটা মন্বন্তর। আজ জীবের টিকে থাকবার কিংবা নিত্য-প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পরাভূত হয়েছে মৃত্যুর শাসনে; তাই ব্যষ্টি-জীব বাধ্য হয়ে স্থায়িত্বের

সন্ধান করে জাতির মাঝে, ব্যক্তির মাঝে নয়। তার জন্য আবশ্যক হয় তার পরের সহযোগ এবং অন্যোন্য-নির্ভর। নিজের প্রয়োজনেই চাই তার অপরকে,—চাই স্ত্রী পুত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব, চাই গোষ্ঠী, চাই সমাজ। এমনি করে পরস্পরের মেলামেশায়, সচেতন সঙ্ঘবন্ধন ও অন্যোন্য-সংমিশ্রণে উপ্ত হয় যে নূতন ভাবের বীজ, তা হতেই ফোটে একদিন প্রেমের ফুল। একথা মানি, প্রেম একটা বড় রকমের স্বার্থ ছাড়া কিছু নয় প্রথমত এবং বহুকাল ধরে চলে এই স্বার্থের জুলুম—এমন-কি সমাজ-পরিণামের উচ্চতর কোটিতেও তার নিদর্শন বিরল নয় আজও। কিন্তু মানস-পরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে মন যত প্রতিষ্ঠিত হয় তার স্ব-ভাবে, ততই জীবনব্যাপী ভালবাসা ও অন্যোন্যনির্ভরের সাধনা হতে বুঝতে পারে সে, ব্যষ্টির সত্তা নিখিল সত্তার একটা গৌণ বিভূতি মাত্র,—বাস্তবিক ব্যক্তি বেঁচে আছে বিশ্বেরই অঙ্গীভূত হয়ে। একবার যদি এ-সত্যের সন্ধান পায় মানুষ,—এবং মানুষের প্রকৃতি মনোময় বলে এ-সত্যের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী তার মাঝে,—তাহলে তার দিব্য নিয়তি হয় অবধারিত, অনুত্তরণীয়। কারণ, এই ভূমিতে এসেই তার মনে জাগে উন্মনীভূমির আভাস। তারপর থেকে, যত-না অস্পষ্ট ও মন্থর হোক তার প্রগতি, ঐ উন্মনীভূমিতে, ঐ অতিমানসে, ঐ অতিমানবতার চিন্ময়ী প্রতিষ্ঠায় একদিন যে পৌঁছুতে হবে তাকে, তারি প্রেতি দুর্মোচন রেখায় মুদ্রিত হয়ে যায় তার চেতনায়।

অতএব প্রাণপ্রকৃতির প্রকাশে যে তৃতীয় একটা পর্ব আছে, প্রাণের স্ব-ভাবেই নিহিত রয়েছে তার অনতিবর্তনীয় সম্ভাবনা। প্রাণের এই উদয়নের ধারাকে লক্ষ্য করলে দেখব, নিয়তির বশে প্রাণপরিণামের তৃতীয় পর্ব যদিও দেখা দেয় তার প্রথম পর্বের একান্ত বিরোধীরূপে, তবুও সে ঐ আদি-পর্বেরই পরিপূর্তি ও রূপান্তর ছাড়া আর-কিছুই নয়। প্রাণের আদিপর্ব শুরু হল বিভাজনবৃত্তির চরম লীলায়, জড়ত্বের আড়ষ্টকঠিন রূপাণু নিয়ে। তার প্রতিরূপ আমরা পাই পরমাণুতে, যা নিখিল জড়রূপের ভিত্তি ও প্রতীক। পরমাণু তার সহচরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও থাকে বিযুক্ত, শক্তির সাধারণ প্রয়োগে তার মৃত্যু এবং প্রলয় ঘটানো সম্ভব নয় কখনও। তাই তাকে বলা চলে বিবিক্ত অহন্তার জড় প্রতীক, যা প্রকৃতির আত্মহারা-সংমিশ্রণের নীতিকে উপেক্ষা ক'রে নিজের সত্তাকে করে উদগ্র। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে খণ্ডভাবের মত অখণ্ডভাবও প্রবল; বরং অখণ্ডভাবই তার তত্ত্ব, খণ্ডভাব তারি একটা

গৌণ বিভাব মাত্র। তাই, যন্ত্রলীলার মূঢ় তাগিদে হোক্ কিংবা আপন খুশিতে, পরের প্ররোচনায় কি জবরদস্তিতেই হোক্, অখণ্ড-ভাবের কাছে একভাবে না একভাবে নিজকে সঁপে দিতেই হয় প্রকৃতির যত খণ্ডরূপকে। সুতরাং প্রকৃতি যদিও-বা আপন গরজেই পরমাণুকে সাধারণত বাধা দেয় না আত্মহারা-সংমিশ্রণের প্রলয়লীলা হতে নিজকে ঠেকিয়ে রাখতে ( কেননা তা নইলে রূপ সংযোজনের একটা শক্ত কাঠামো বা নির্দিষ্ট রূপ-বীজ সে পাবে কোথায় ), তবুও পুঞ্জভাবের বেলায় ঐ সংমিশ্রণের রীতি মানতে পরমাণুকেও সে বাধ্য করে। তাই পরমাণু-প্রচয়ে দেখা দেয় জড়-প্রকৃতির প্রথম পুঞ্জভাব ; ঐ হল তার 'অবয়বি'-গঠনের গোড়ার উপাদান।

প্রাণ যখন পৌঁছয় প্রস্ফুরণের দ্বিতীয় পর্বে, আমরা যাকে জানি প্রাণন বা 'জীবনযোনি প্রযত্ন' বলে, তখন তার মাঝে ফোটে একটা বিপরীত ধারা ; অর্থাৎ প্রাণময় অহংএর জড়-আধারকে বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয় প্রলয়ের শাসন। আধারের কাঠামো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে তখন, যাতে একটি প্রাণবিগ্রহের উপাদানকে রূপান্তরিত করা যায় অন্যান্য বিগ্রহের মৌল উপাদানে। এই ভাঙাগড়ার খেলার পূর্ণ পরিচয় আজও আমরা পাইনি ; কেননা অন্নময়-প্রাণ ও জড়ের বিজ্ঞান আমাদের যতখানি আয়ত্ত হয়েছে, মনোময়-প্রাণ ও চিৎসত্তার বিজ্ঞান ততখানি দখলে আসেনি এখনও। তবুও মোটা-মুটি এইটুকু বোঝা যায় : শুধু জড়দেহের উপাদানই নয়, সূক্ষ্ম প্রাণময়-কোষের যেসব উপাদান—আমাদের প্রাণ ও বাসনার সূক্ষ্মতেজ, আমাদের বীর্য প্রযত্ন ও সংবেগ—আমরা বেঁচে থাকতেই এবং মরলে পরেও এ-সমস্তই সংক্রামিত হচ্ছে অপরের প্রাণধাতুতে। প্রাচীন রহস্য-বিজ্ঞান বলে : অন্নময় শরীরের মত একটা প্রাণময় শরীরও আছে আমাদের ; মৃত্যুর পর তারও বিশরণ ঘটে এবং তার উপাদান দিয়ে গড়ে ওঠে অন্যান্য প্রাণময় শরীর ; বেঁচে থাকতেও আমাদের প্রাণের তেজ অহরহ মিশ্রিত হচ্ছে অপরের তেজের সঙ্গে। তেমনি মনোময় জীবনেও চলছে পরস্পরের মাঝে আদান-প্রদানের লীলা। আমাদের মনোধাতু অনবরত ভেঙে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার গড়ে উঠছে মনের সঙ্গে মনের সংঘাতে—অবিরাম চলছে তাদের আত্মসংমিশ্রণ ও অন্যোন্য-বিনিময়। এমনি করে ভূতে-ভূতে অন্যোন্যবিনিময়, অন্যোন্যসংমিশ্রণ ও একাত্ম-সম্মেলন—এই হল প্রাণের রীতি, প্রাণের স্বরূপ-ধর্ম।

প্রাণক্রিয়ার দুটি ধারা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা : একদিকে রয়েছে বিবিক্ত অহং-এর টিকে থাকবার তাগিদ বা সঙ্কল্প—নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সকল আঘাত বাঁচিয়ে জিইয়ে রেখে ; আর-একদিকে রয়েছে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসন—নিজকে তার মিলিয়ে দিতেই হবে অপরের মাঝে। জড়-জগতে প্রকৃতির ঝোঁক প্রথম ধারাটির 'পরে, কেননা সেখানে প্রয়োজন তার বিবিক্ত স্থাণুরূপের বিসৃষ্টি। এই তার সর্বপ্রথম ও সর্বকঠিন তপস্যা ; কারণ যে-ভূমিতে আছে আনন্ত্যের অখণ্ডভাবের পরিব্যঞ্জনা এবং বিশ্বশক্তির অবিরাম নিত্যচঞ্চল স্পন্দলীলা, সেখানে বিবিক্ত ব্যষ্টি-ভাবকে টিকিয়ে রাখা কি স্থাণু আধার গড়া তার জন্যে বস্তুতই একটা দুর্জয় সমস্যা। তাই ব্যষ্টিরূপ যখন পরমাণুর জীবনে পেল স্থাণুভাবের একটা ভিত্তি এবং পরমাণু-প্রচয়ের ফলে দেখা দিল অবয়বি-সংস্থানের মাঝে অল্পাধিক স্থায়িত্বের একটা সুনিশ্চিত সম্ভাবনা, তখন ভবিষ্যৎ প্রাণময় ও মনোময় ব্যষ্টিভাবের সেই হল বনিয়াদ। এমনি করে রূপের একটা শক্ত কাঠামো পেয়ে উত্তর-সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে প্রকৃতি যখন হল নিশ্চিন্ত, তখন উলটে দিল সে প্রাণের চলন ; এইবার ব্যষ্টি-রূপকে ধ্বংস করে তারি বিস্রস্ত উপাদান দিয়ে শুরু হল প্রাণবিগ্রহের পুষ্টি। কিন্তু একেও বলা চলে না প্রাণের অন্ত্য পরিণাম ; দুটি ধারার পূর্ণ সামঞ্জস্যে দেখা দেবে পরিণামের চরম পর্ব। তখন ব্যষ্টি-চেতনাকে বজায় রেখেই ব্যষ্টি-জীব আত্মসংমিশ্রণ করবে অপরের সঙ্গে ; অথচ তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভারকেন্দ্রও যেমন বিচলিত হবে না তার, তেমনি উদ্বর্তনের সম্ভাবনাও থাকবে অব্যাহত।

এই সামঞ্জস্য-সাধনাই প্রাণের সমস্যা। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে মনঃ-শক্তির আবির্ভাব ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু প্রাণন আছে, কিন্তু চেতন-মনের আবেশ নাই—এতে সাম্য আসে না কখনও ; এর ফলে দেখা দেয় সাময়িক ভারসাম্যের যে অনিশ্চিত ব্যাপার, তার পর্যবসান ঘটে দেহের মৃত্যুতে ; অর্থাৎ ব্যষ্টি-ভাবের প্রলয়ে বিশ্ব-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার উপাদান যত। অন্নময়-প্রাণের প্রকৃতিই এই, ব্যষ্টি-আধারকে কিছুতেই দেবে না সে নিজেকে অব্যাহত ও অবিকৃত ভাবে জিইয়ে রাখবার শক্তি—আধারস্থিত পরমাণুদের মত। এ পারে শুধু মনোময়-পুরুষ, যার মর্মকোষে অধিষ্ঠিত রয়েছে অন্তরাত্মার চিদ্‌ঘন বিন্দুর স্ফুরত্তা। অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে সে-ই বইয়ে দিতে পারে স্থিতির একটা অখণ্ড প্রবাহ। আধারের 'চ্যুতি'তে যদি কখনও অন্নময় স্মৃতির ছেদও

দেখা দেয় তার মাঝে, তবু মনোময়-পুরুষের স্মৃতি থাকে অব্যাহত এবং সেই স্মৃতিই ক্রমে পুষ্ট হয়ে দেহের জন্মমরণজনিত অন্নময়-স্মৃতির ত্রুটিকেও করতে পারে অচ্ছিদ্র। আজও শরীরী-মনের পূর্ণ পরিণতি রয়েছে বহুদূরে; তবু মনোময়-পুরুষ দেহের সীমায় বন্দী জীবনের এলাকা ছাড়িয়েও অতীত ও ভবিষ্যতের অনেকখানি খবর রাখে এখনও। সে জানে তার ব্যক্তিগত অতীতকে, জানে যে ব্যষ্টি-জীবনের পরিণাম-পরম্পরা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ফুটেছে তার এই বর্তমান জীবন; এমন-কি এ হতে যে ভবিষ্যৎ জীবন-পরম্পরার সূচনা, তারও সন্ধান রাখে সে। ব্যষ্টির এই পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সমষ্টি জীবন-ধারা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অতীত হতে ভবিষ্যতে, যার মাঝে তার অস্তিত্বের অনুবৃত্তি অনুস্যূত হয়ে আছে একটি অংশুর মত,—তারও চেতনা আছে তার। 'ভব-প্রত্যয়ের' এই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে জড়বিজ্ঞান জানে বংশানুক্রম বলে; কিন্তু মনোময়-পুরুষের অন্তরালে নিত্য উপচীয়মান জীবাত্মা জানে তাকে তার স্থির-সত্ত্বরূপে। মনোময়-পুরুষ এই জীব-চেতনার বিভূতি, অতএব তাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যক্তি-জীবন ও সমূহ-জীবনের স্থির প্রত্যয়। প্রাণের এ-দুটি বিভাবের সঙ্গম ও সৌষম্যের আধার সে-ই।

ব্যক্তি ও সমূহের মাঝে এই-যে নূতন সম্বন্ধ, তার বীর্য নিহিত রয়েছে আসঙ্গে—যার মূল সুর প্রেম এবং প্রেমের পূর্ণচ্ছটার উদয়ন যার তাৎপর্য। অতএব প্রেমময় আসঙ্গই হল প্রাণ-পরিণামের তৃতীয় পর্বের নিয়ামক শক্তি। প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন আত্মচেতনাকে জিইয়ে রাখা চাই, তেমনি জাগ্রতচিত্ত নিয়েই চাই আত্ম-বিনিময়ের বা নিজকে বিলিয়ে কি মিলিয়ে দেবার আকৃতি ও নিয়তিকে মেনে নেওয়া। এ-দুয়ের একটিকে বাদ দিয়ে জীবনে আর যা ফুটুক, প্রেম ফোটে না। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ এমন-কি বাঞ্ছিতের মাঝে পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের একটা স্বপ্নকে বহন করা স্বাভাবিক মনোময়-পুরুষের পক্ষে,—তার ঝোঁকও আছে সেদিকে; কিন্তু সে-উৎসর্গসাধনার তাৎপর্য হল প্রাণের এই তৃতীয় ভূমিকেও ছাড়িয়ে যাবার প্রৈতিতে।···বস্তুত তৃতীয় ভূমির সাধনায় আমরা ক্রমে ছাড়িয়ে উঠি—পরস্পরকে গ্রাস করে নিজে বাঁচবার উন্মত্ত প্রয়াসকে এবং সে-প্রয়াস দ্বারা যোগ্যতমের টিকে থাকবার মূঢ় ব্যবস্থাকে। কেননা এ-ভূমিতে টিকে থাকবার প্রয়াস সার্থক হয় পরস্পরের সহযোগিতায়; প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসম্পূর্তির সুযোগ পায় রেষারেষিতে নয়—মেশামেশিতে,

আত্মবিনিময়ে, নিজকে খাপ খাইয়ে অপরের সঙ্গে। সমস্তটা জীবনই আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা সাধনা—এমন-কি অহংএর পুষ্টি ও উদ্বর্তন তার অপরিহার্য অঙ্গও বটে। তবুও শুধু একার অহংটিকে নিয়ে সে-সাধনার সিদ্ধি সম্ভব হয় না ; কেননা প্রাণ-পরিণামের এই তৃতীয় পর্বে ব্যক্তির প্রয়োজন বিশ্বকে, —একটি অহং এখানে খোঁজে আর-একটি অহংকে ; অপরকে নিজের মাঝে টেনে আনবার এবং নিজকে অপরের মাঝে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক এই ভূমিতে। ব্যক্তি এবং সমূহের মাঝে টিকে থাকবার যোগ্যতা এখানে সবার বেশি তাদেরই—যারা আনন্দ ও ভালবাসার বিধানকে জয়ী করতে পেরেছে জগতে, পরস্পরের আনুকূল্য দয়া মায়া মৈত্রী ও একতাই জীবনের আদর্শ যাদের, অন্যোন্য-আত্মদানের ভিতর দিয়েই যারা খুঁজে পেয়েছে মৃত্যুঞ্জয় হবার পথ। তারা জানে ব্যক্তির আপ্যায়নে ব্যক্তির ও সমূহের পুষ্টি যেমন, তেমনি সমূহের আপ্যায়নেও ব্যক্তি ও সমূহের পুষ্টি—এই হল প্রকৃতির বিধান।

প্রাণ-প্রকৃতির এই শিবময় পরিণামে সূচিত হয় মনঃ-প্রকৃতিরই* উপচীয়মান প্রভাব ; বোঝা যায়, অন্নময় আধারের 'পরে মনোময়-পুরুষের অনুশাসন ক্রমেই হচ্ছে বিজয়ী। প্রাণের চেয়ে মন সূক্ষ্ম বলে নিজের আহার সম্ভোগ ও পুষ্টির জন্যে অপরকে গ্রাস করতে হয় না তার ; বরং যতই দেয়, ততই সে পায়, তার পুষ্টিও হয় ততই অব্যাহত। পরের মাঝে নিজকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়ে পরকেও সে জীর্ণ করে নিজের রসে ; এমনি করে ক্রমেই প্রসারিত হয় তার অধিকার। অন্নময় প্রাণ অতিদানে যেমন ফতুর করে নিজকে, তেমনি অতি-আহারেও ডেকে আনে নিজের মরণ। মনেরও মাঝে থাকে এই ন্যূনতা, যতক্ষণ সে মেনে চলে জড়ের বিধান ; কিন্তু স্বারাজ্যের অধিকার যতই হয় নিরঙ্কুশ, ততই এ-বন্ধন তার খসে পড়ে। তখন জড়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে এক হয়ে যায় তার দেওয়া এবং নেওয়া। এই তার উদয়নের স্বাভাবিক ছন্দ, কেননা ভেদে-অভেদের যে চিন্ময় বিধানে সচ্চিদানন্দের দিব্য প্রকাশ এই বিশ্বরূপে, মন স্বরূপত সেই ঋতম্ভরা লীলারই বাহন।

* এখানে যে-মনের কথা বলছি, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তার প্রভাব সোজাসুজি পড়ে প্রাণ-পুরুষের 'পরে। শুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব নয়, কিন্তু তার যে-আভাসটুকু ফুটেছে জগতে, বস্তুত তা প্রাণেরই ধর্ম—মনের নয়। কিন্তু তারও প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব হয়, যখন মন তাকে টেনে নেয় আপন জ্যোতির্লোকে। অন্নময় ও প্রাণময় আধারে দেখা দেয় যে-ভালবাসা, তা বুভুক্ষারই একটা চঞ্চল রূপমাত্র।

# প্রাণের উদয়ন

পূর্বেই বলেছি, প্রাণের স্বরূপ-স্থিতিতে আছে যে অবচেতন সঙ্কল্পের মধ্য-বিভূতি, পরিণামের মধ্যপর্বে তাই দেখা দেয় বুভুক্ষা ও স্ফুট-বাসনার আকারে, যাকে বলা যায় 'মনসো রেতঃ' বা চেতন মনের আদিবীজ। যখন আসঙ্গস্পৃহা ও ভালবাসার উপচয়ে ঘটে তৃতীয় পর্বে প্রাণের উদয়ন, তখনও কিন্তু কামনার বিলোপ হয় না—হয় তার পূর্ণতা ও রূপান্তর। আত্মদানের দ্বারা অপরকে ফিরে পাওয়া নিজের মাঝে, এই হল ভালবাসার স্বভাব। কিন্তু অন্নময় প্রাণ দিতে চায় না, সে শুধু চায় নিতে। অবশ্য কিছু-না-কিছু দিতেই হয় তাকে বাধ্য হয়ে, কেননা দেবার দায় এড়িয়ে শুধু নিতে চায় যে-প্রাণ, তাকে শুকিয়ে মরতেই হয় বন্ধ্যা হয়ে। ইহলোকে কি লোকান্তরে এমন কৃপণ প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয় কখনও ; তাই জড়ভূমিতেও প্রাণকে ছাড়তে হয় কিছু, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। সেখানে অবশ হয়ে সে মেনে চলে বিশ্ব-প্রকৃতির অবচেতন আকূতিকে, ত্যাগের সচেতন সাধনায় সায় থাকে না তার। এমন-কি ভালবাসা জাগলেও, প্রথমত তার আত্ম-দানের রীতি হয় অনেকটা পরমাণুর মাঝে প্রচ্ছন্ন আকূতির যন্ত্রলীলারই মত। প্রেমও প্রথম ধরে বুভুক্ষার ধারা ; নিজকে দেবার চেয়ে পরের কাছে আদায় করাতেই তার তৃপ্তি তখন—আত্মদান ও আত্মসমর্পণকে সে জানে শুধু বাঞ্ছিত বস্তুকে পাবার একটা অত্যাবশ্যক সাধন বলে। কিন্তু একে তো প্রেমের স্বরূপ-প্রকৃতি বলতে পারি না কিছুতেই। প্রেমের স্বরূপ ফোটে 'সমঞ্জসা-রতি'তে, যেখানে দেবার আনন্দ পাবার আনন্দের সমান,—বরং তাকে ছাড়িয়ে যাবার দিকেই ঝোঁক তার। কিন্তু ছাড়িয়ে যাওয়াকে বলি 'সমর্থা-রতির' দিব্যোন্মাদ, যার প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে প্রেম ডুবে যেতে চায় পরম-সাম্যের অন্তর্দশায় ; তখন যে ছিল অনাত্মা, সেই হয় তার পরমাত্মা—তার অন্তরাত্মার চেয়েও মহত্তর ও প্রিয়তর। কিন্তু উন্মনী প্রেম যাই হোক, প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র হল অপরের মাঝে পুরোপুরি নিজকে পাওয়া—অপরকে পেয়ে। তখন অপরের ঐশ্বর্য বাড়িয়েই বাড়ে প্রেমের আপন ঐশ্বর্য ; ভোগ করতে গিয়ে ভুক্ত হতে হয় তাকে তখন, কেননা পরের আবেশ ছাড়া নিজকে যে কখনও পাওয়া যায় না পূর্ণ করে।

এমনি করে প্রাণ-পরিণামের প্রথম পর্বে ফোটে—পরমাণু-জগতের অসাড় অশক্তিহেতু আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা অভাব ; জড়-ব্যক্তি সেখানে সম্পূর্ণ অনাত্মার কবলে। দ্বিতীয় পর্বে ফোটে একটা ন্যূনতার চেতনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার

একটা আকৃতি; প্রাণ চায় আত্মা এবং অনাত্মা দুয়েরই বশীকার। এরই মাঝে তৃতীয় পর্বের উন্মেষে প্রকৃতির রূপান্তরে দেখা দেয় এমন-একটা পূর্ণতা ও সৌষম্য, যা বিরোধাভাসের ভিতর দিয়েই প্রকৃতিকে করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে আসঙ্গ ও ভালবাসার সাধনায় অনাত্মাই দেখা দেয় 'মহান্ আত্মা' হয়ে; তখন তার অনুশাসন ও প্রয়োজনের কাছে সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবার বাধা থাকে না কোনও এবং তার ফলে সমূহ-জীবনের ব্যক্তি-জীবনকে আত্মসাৎ করবার উপচীয়মান আকৃতি হয় তৃপ্ত। আবার সেইসঙ্গে ব্যক্তির মাঝেও দেখা দেয় অপরের জীবনকে জারিত করবার এবং তার দেওয়া বিত্তকে আত্মসাৎ করবার প্রবেগ, যার ফলে ব্যক্তি-জীবনের সমূহ-জীবনকে সম্ভোগ করবার বিপরীত আকৃতিও হয় তৃপ্ত। জীব আর জগতের এই যে 'অন্যোন্য-সম্ভাবনে'র সম্বন্ধ, তার সম্যক অথবা সুনিশ্চিত স্ফূর্তি সম্ভব হতে পারে একমাত্র ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং সমূহে-সমূহে অনুরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠায়! এক দুশ্চর তপস্যা চলছে মানুষের জীবনে। একদিকে তার মাঝে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা, তাই দিয়ে সে পায় নিজকে; আর-একদিকে আছে আসঙ্গ প্রেম ভ্রাতৃ-ভাব ও মৈত্রীর দাবি, যা মেনে তার দিতে হয় নিজেকে। এ-দুয়ের মাঝে তাকে সামঞ্জস্য ঘটাতে হয় যেমন, তেমনি দুটি বিরুদ্ধ আকৃতির সমন্বয়ে সাম্য ন্যায় ও সৌষম্যের এক কল্প-জগৎ সৃষ্টি করবার সাধনাতে নিয়োজিত করতে হয় তার সকল শক্তি। তার এই প্রয়াসের মূলে আছে বিশ্বপ্রকৃতিরই এক নিগূঢ় সমস্যা-সমাধানের অনতিবর্তনীয় প্রৈতি। সে-সমস্যা প্রাণের সমস্যা: জড়ের আধারে উন্মিষিত প্রাণের মর্মমূলে নিহিত আছে যে দ্বন্দ্বের সংঘাত, তার মাঝে মিলনের সূত্রটি আবিষ্কার করাই তার সমাধান। সে-সমাধানের সাধনা করছে মন—প্রাণের উত্তর-সাধক রূপে; কেননা সে-ই শুধু জানে মহাপ্রকৃতির ঈপ্সিত সৌষম্যের পথের খবর, যদিও একমাত্র উন্মনীভূমিতেই ঘটতে পারে সে-সৌষম্যের চরম সিদ্ধি।

কারণ, যে-তথ্যকে ভিত্তি করে আমাদের এই এষণা, সে যদি সত্য হয়, তাহলে পথের শেষে সিদ্ধির উপান্তে মন পৌঁছতে পারবে তখনই যখন অমনী-ভাবের মহারহস্যে নিজকে সে ফেলবে হারিয়ে। এই উন্মনীই তো মনের স্বরূপসত্য,—মন তার অবর-বিভূতি ও সাধন মাত্র। একে আশ্রয় করে অখণ্ড অরূপের যেমন হয় খণ্ডরূপে অবতরণ, তেমনি একে ধরেই আবার সে উঠে যায় রূপ ও খণ্ডতার ব্যূহকে ভেদ করে আপন স্বরূপে। অতএব শুধু মনের

ও হৃদয়ের প্রসারণে, শুধু আসঙ্গ আত্মবিনিময় ও প্রেমের বহিরঙ্গ-সাধনায় কখনও হবে না জীবনসমস্যাব পূর্ণ সমাধান। তার জন্য চাই এক লোকোত্তর তুরীয় ভূমিতে প্রাণের উদয়ন, যেখানে বহুর শাশ্বত একত্ব উপলব্ধ হয় চিন্ময় তাদাত্ম্যবোধের নিবিড়তায়। সেখানে জাগ্রত-জীবনের সকল প্রবৃত্তির আপ্যায়ন দেহের খণ্ডতা-বোধে নয়, প্রাণবৃত্তির উদ্ধত বাসনা ও বুভুক্ষায় নয়, মনঃকল্পিত সমাহার ও সৌষম্যের অপূর্ণ সাধনায় নয়—এমন-কি এ-সবার সমবায়েও নয়। চিৎ-স্বরূপের অখণ্ড তাদাত্ম্যবোধ ও নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যেই সেখানে প্রাণের 'অতিমুক্তি' ও জীবনের প্রতিষ্ঠা।

২২

# প্রাণের সঙ্কট

এই জন্যই তাকে বলা হয় সর্বায়ুঃ বা বিশ্বপ্রাণ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৩)

ঈশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে—যন্ত্রারূঢ় সকল ভূতকে ভ্রামিত ক'রে তাঁর মায়ায়।

—গীতা (১৮।৬১)

সত্য জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানে যে, বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সঙ্গেই ভোগ করে সে কামনার সকল বিত্ত।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।১)

বিশ্বলীলার একটা বিশিষ্ট পর্বে চিৎ-শক্তির বিশেষ বিচ্ছুরণকেই আমরা জানি প্রাণ বলে। স্বরূপত সে-শক্তি অনন্ত, নির্বিশেষ, অব্যাহত—অখণ্ড-স্বভাবের নিত্যতৃপ্তিতে অবিচল প্রতিষ্ঠা তার; অর্থাৎ সে-শক্তি সচ্চিদানন্দেরই চিৎ-তপঃ। অনন্ত সন্মাত্রের নিরঞ্জন স্বভাব ও অখণ্ড শক্তির নিরঙ্কুশ আত্ম-প্রতিষ্ঠা হতে আপাত-বিবিক্ত হয়ে যখন দেখা দিল এই বিশ্বলীলা, তখন তার মূলসূত্র হল অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের বিভাজনবৃত্তি। এক অখণ্ড শক্তির এই খণ্ড-লীলা হতেই জগৎ জুড়ে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও বিরোধের বিভ্রম—মনে হয় ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বভাব বুঝি নিরাকৃত এখানে। এই আপাত-নিরাকৃতিকে চিরন্তন তত্ত্ব বলে মেনে নেয় মন; অথচ বিশ্ব-চেতনার যে-দিব্যদ্যুতি গোপন রয়েছে মনের আড়ালে, সে কিন্তু জানে তাকে এক বহুবিচিত্র পরমার্থতত্ত্বেরই বিকৃত প্রতিভাস বলে। তাইতো এ-জগতে দেখি নানা বিরুদ্ধ সত্যের সংঘাত শুধু। সবাই তারা খুঁজছে সার্থকতার পথ এবং সে-অধিকারও তাদের আছে বলেই বিচিত্র সমস্যা ও বিপুল রহস্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দিকে-দিকে। সমস্যার সমাধান না করেও উপায় নাই, কেননা এই উত্তাল অনৃতের

পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এক অখণ্ড সত্যের যে ঋত-সুষমা, তাকে আবিষ্কার করতে পারলেই এ-জগতে ঘটবে সেই সত্যের স্বচ্ছন্দ ও নির্মুক্ত প্রকাশ।

সমস্যার সমাধান খুঁজেও পাবে মন; কিন্তু তাহলেও এ তো মনের একলার কাজ নয়। মনের সমাধানকে রূপ দিতে হবে জীবনে; চেতনায় ফুটবে যা, তাকে রূপ দিতে হবে কর্মেও। চেতনার শক্তিরূপই গড়েছে এই জঙ্গম জগৎ, সৃষ্টি করেছে এর যত সমস্যা; অতএব সেই শক্তিই করবে এসব সমস্যার সমাধান, জঙ্গম জগৎকে উত্তীর্ণ করবে অপরাজিতা সিদ্ধির সেই শাশ্বত-লোকে—যেখানে সার্থক হবে তার নিগূঢ় তাৎপর্য, মূর্ত হবে তার উন্মিষৎ-সত্যের কল্পনা। মনের সমাধান তাই সার্থক হওয়া চাই প্রাণের সমাধানে। বিশ্বে পর-পর তিনটি রূপ ফুটেছে প্রাণের। প্রথমত তার অন্নময় রূপ: সেখানে চলছে এক মগ্নচৈতন্যের লীলা—আত্মপ্রকাশের বহিরঙ্গ প্রবৃত্তিতে নিজকে হারিয়ে ফেলেছে যে, আত্ম-শক্তিরই বিলাসে লুপ্ত হয়ে গেছে যার নিজস্ব পরিচয়; তাই সেখানে দেখি শুধু প্রবৃত্তির স্পন্দন, শুধু শক্তির রূপায়ণ, কিন্তু অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের পাই না সন্ধান। তার পরে দেখা দিল প্রাণের প্রাণময় রূপ: চেতনার আধখানি ফুটেছে সেখানে আবরণের আড়াল থেকে,—প্রকাশ পেয়েছে প্রাণের বীর্য, আধারের পুষ্টি প্রবৃত্তি ও অবক্ষয়ের লীলায়; আদিম কারাবন্ধন হতে অর্ধমুক্ত চেতনা অবরুদ্ধ বীর্যের আবেগে স্পন্দমান সেখানে—ধরেছে প্রাণবাসনার দুর্বার আকূতির রূপ, তৃপ্তি অথবা বিদ্বেষের অভিঘাতে দুলছে সে; কিন্তু কোথায় তার মাঝে আলোর স্পন্দন? সে কি জানে তার আত্মসত্তার স্বরূপ, তার পরি-বেশের রহস্য? অসাড় শূন্যতা হতে ধীরে-ধীরে জাগে তার মাঝে আলোর আভাস—অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন···তারপর দেখা দেয় তৃতীয় ভূমিতে প্রাণের মনোময় রূপ: এবার চেতনা উন্মিষিত আধারের মাঝে; জীবনসত্যের অনুভবকে রূপান্তরিত করে সে মনোময় বোধের আকারে, বাইরের অভিঘাতে জেগে ওঠে অপরোক্ষ দর্শন ও ভাবের সাড়া; চেতনার এই নবীন অভ্যুদয় ভাবকেই তোলে জীবনের সত্য করে, অন্তরে আনে একটা যুগান্তর এবং তার অনুকূলে বাইরের জীবনকেও গড়তে চায় নতুন ভঙ্গিতে। এমনি করে মনের ভূমিতে এসে চেতনা মুক্তি পায় তার শক্তির সম্মূঢ় প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের কারাবন্ধন হতে; কিন্তু তবু সে-মুক্তি তাকে দেয় না প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের 'পরে অকুণ্ঠ প্রশাসনের

অধিকার, কেননা এখনও শুধু ব্যষ্টিবিগ্রহে চেতনার প্রকাশ বলে তার সমগ্র প্রবৃত্তির একদেশ মাত্র ফুটেছে তার মধ্যে।

মানব-জীবনের যত সমস্যা ও গ্রন্থি জটিল হয়ে উঠেছে এইখানে স্বরূপত মানুষ মনোময় পুরুষ, মনশ্চেতনারই শক্তিবিগ্রহ সে; বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বশক্তির অঙ্গীভূত হয়েও কেবল আভাসে পায় সে তাদের অনুভব। তার বিশ্বব্যাপ্ত প্রসারকে প্রত্যক্ষ জানেনা সে, এমন-কি নিজেরও সমগ্র পরিচয় অগোচর তার; তাই জগতের প্রাণশক্তির 'পরে, এমন-কি নিজের জীবনের 'পরেও নাই তার স্বচ্ছন্দ ঈশনার অধিকার,—সর্বজয়া কল্পনার বাস্তব সিদ্ধি কুণ্ঠিত ও পরাভূত তার আধারে। জড়কে জানতে চায় সে জড়ময় পরিবেশকে আপন বশে আনবে বলে; তেমনি প্রাণকে জেনে চায় সে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার স্বাতন্ত্র্য। পশুর মত তার মন নয় আত্মচেতনার একটা ঝলক শুধু,—জ্ঞানের নিত্য-উপচয়ে লেলিহান শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠছে তা দিনে-দিনে; তাই তাকে ঘিরে মনশ্চেতনার যে বিপুল রহস্য স্পন্দিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাকে আপন বশে আনবার জন্যে জানতে চায় সে মনের তত্ত্ব। এমনি করে নিজকে জেনে সে চায় স্বারাজ্যের মহিমা, জগৎকে জেনে চায় 'বৈরাজ্যের' অধিকার। তার সত্তায় নিত্যনিবিষ্ট সন্মাত্রের এই তো প্রৈতি, তার চিৎস্বরূপের এই তো প্রয়োজন; তার জীবন জুড়ে মহাশক্তির যে-উল্লাস, এই মহাসিদ্ধির পানেই তো তার একাগ্র সংবেগ। এমনি করে তার অভীপ্সায় রূপ ধরেছে সচ্চিদানন্দের গোপন আকূতি; নিজকে প্রকাশ করেও গোপন রেখে এ-জগতে চলছে তাঁর যে-লুকোচুরি, তাঁর জীব-লীলাতেই তো তার সার্থক পরিচয়। জ্ঞান ও সিদ্ধির এই অনির্বাণ অভীপ্সা সার্থক হবে কেমন করে, সে-সমস্যার সমাধানই মানুষের জীবনব্রত; কেননা তার সত্তার মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এরি সংবেগ, এই তার 'হৃদি-সন্নিবিষ্ট' অন্তর্যামীর অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। যতদিন না মানুষ খুঁজে পাবে এ-সমস্যার সমাধান, যতদিন না সার্থক হবে ঐ দুর্নিবার প্রৈতি, তার এষণা ও সাধনারও বিরাম হবে না ততদিন। হয় নিজকে বিরাটরূপে সাথক করে মেটাতে হবে তার অন্তর্যামীর চিরন্তন পিপাসা, অথবা নরের আধারেই ঘটাতে হবে এমন নরোত্তমের আবির্ভাব, যার পক্ষে সুসাধ্য হবে এ-পিপাসার পরিতর্পণ। অর্থাৎ হয় মানুষকে নিজেই হতে হবে দেবমানব, অথবা অতিমানবকে পথ ছেড়ে দিতে হবে এরি জন্যে।

# প্রাণের সঙ্কট

বিশ্বের নীতি ও নিয়তির মাঝে আছে আমাদের এ-কল্পনার সমর্থন। কারণ, মানুষের মনশ্চেতনাতেই যে চিৎশক্তি প্রমুক্ত মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে জড়ের অন্ধকবল হতে ছাড়া পেয়ে, তা নয়। চিৎ-প্রকাশের বিপুল অভিযানে এ একটা মধ্যপর্ব মাত্র। আজ মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখানে এসেই থেমে যেতে পারে না প্রকৃতির পরিণাম ; তার সিসৃক্ষার সংবেগ হয় মানুষের মাঝেই ফুটিয়ে তুলবে এর উত্তর-পর্ব, নয়তো তাকে ছাড়িয়ে চলবে তার অভিযান—যদি এগিয়ে যাবার সামর্থ্য মানুষের না-ই থাকে। আজ যে মনোলীলা জীবনে ফুটতে চাইছে সত্য হয়ে, তার অভিযানও তো শেষ হবে না, যতদিন জীবনসত্যের পূর্ণমহিমায় সে না জ্বলে উঠছে এই আধারে। একে-একে খসিয়ে ফেলবে সে তার আবরণ যত, পূর্ণায়ত হয়ে জাগবে সে উদ্ভাস্বর চেতনার জ্যোতির্মহিমায় ও সার্থক বীর্যের অকুণ্ঠ উল্লাসে—এই তার নিয়তি। বিশ্বমূল সন্মাত্রের এই তো প্রকাশ-রীতি : তার স্ফুরণ বীর্যে, তার স্ফুরণ জ্যোতিতে,—কেননা শক্তি ও চৈতন্যই যে সত্তার স্ব-রূপ। এ-দুটি বিভাব সঙ্গত হয় তৃতীয় আর-একটি বিভাবে যাকে জানি স্বয়ম্ভূসত্তার নিত্যতৃপ্ত আনন্দ বলে। এমনি করে শক্তি চৈতন্য ও আনন্দের তাদাত্ম্য-সঙ্গমেই সত্তার পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই নিত্যসিদ্ধ ভাবোল্লাসে পৌঁছনো আমাদেরও নিয়তি। কিন্তু পরিণামের ধারাবাহিকতায় পর্বে-পর্বে ফুটছে মানুষের জীবন ; তাই সিদ্ধির চরমে পৌঁছতে হলে আত্মার এষণাকে করতে হবে তার সাধনা—আবির্ভাবের পরম লগ্নেই তার মাঝে যে-আত্মা গুহাহিত হয়ে ছিলেন বীজরূপে। সেই আত্ম-আবিষ্কার দ্বারাই মানুষ ফুটিয়ে তুলবে দলে-দলে জীবন-যোনি চিৎশক্তির অন্তর্গূঢ় বীর্য যত নিহিত ছিল আধারে। সচ্চিদানন্দই মানুষের মাঝে এই গুহাহিত চিদ্-বীর্য। ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের বিশিষ্ট এক সামরস্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন তিনি মানব-আধারে। তাঁর সেই নিগূঢ় প্রৈতিকে অনুসরণ করেই মানুষ একদিন চেতনা বীর্য ও আনন্দের সার্বভৌম অখণ্ড-অনুভবে প্রকাশ করবে অনির্বাচ্য অনুত্তরকে, বিশ্ব জুড়ে নিজকে যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন রূপের মেলায়।

চৈতন্যই প্রাণের উপাদান ; অতএব প্রাণের প্রকাশ সর্বত্র অনুসরণ করে চৈতন্যের মৌলবিভাবকে,—কেননা সত্তার সকল ভূমিতেই চৈতন্য যেমন, তারি অনুরূপ হয় শক্তির স্ফুরণ। যেমন সচ্চিদানন্দে : চৈতন্য সেখানে অখণ্ড অনন্ত ক্রিয়াতীত রূপাতীত অথচ আত্মবিচ্ছুরণের ভর্তা ভোক্তা ও অন্তর্যামী

মহেশ্বর ; তেমনি শক্তিরও সেখানে অন্তহীন স্বাধিকার, অখণ্ড বিভূতি, অনু-ত্তর বীর্য ও আত্মসংবিৎ। আবার জড়-প্রকৃতিতে চৈতন্য গূঢ়, আত্মবিস্মৃত—ভেসে চলেছে আপন শক্তির অন্ধ প্রমত্ত আবেগে যেন (অথচ চৈতন্যই সেখানে বস্তুত শক্তিবাহিনীর সারথি, কেননা দুয়ের মাঝে এই সম্বন্ধই শাশ্বত) ; তেমনি জড়ের মাঝে শক্তিও অসাড় অচিতির একটা উন্মত্ত বিপুল তাণ্ডব—সে জানে না কী আছে তার মাঝে, আকস্মিকতার দুর্নিবার তাড়নায় যদৃচ্ছার অনুকূল প্রশাসনে যন্ত্রবৎ সিদ্ধি তার—যদিও প্রতি পদক্ষেপে নির্ভুলভাবে মেনে চলেছে সে তার অন্তর্গূঢ় ঋত ও সত্যের শাসন, যার মূলে আছে তারি অন্তর্যামী শাশ্বত চিন্ময় পুরুষের কবিক্রতু। আবার দেখি মনে : চৈতন্য সেখানে দ্বন্দ্ব-বিধুর, আধারে-আধারে সঙ্কীর্ণ, আত্মরত, অপর আধার সম্বন্ধে অজ্ঞান ও নিঃসম্পর্ক—জানে শুধু বস্তু ও শক্তির আপাত-খণ্ডতা ও সংঘাত, জানেনা তাদের স্বরূপগত ঐক্য ও সৌষম্য ; তেমনি শক্তিও ফুটেছে তার মাঝে আমাদেরই অভ্যস্ত ও পরিচিত জীবনলীলায়। প্রাণের ভূমিতে দেখা দিয়েছে সেখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মূঢ় সংঘর্ষ, অপরের সম্পর্ককে অস্বীকার ক'রে আত্মসম্পূতির অন্ধ আবেগ, বিচিত্র খণ্ডিত বিরুদ্ধ শক্তির কৃচ্ছ্র সমাবেশ ও অন্যোন্যসংগ্রাম ;-তেমনি মনোভূমিতে আছে শুধু খণ্ডিত বিরুদ্ধ ও বিভিন্নমুখী ভাবনার মিশ্রণ সংঘাত সংগ্রাম ও অনিশ্চিত সমাগার—নাই তার মাঝে অন্যোন্যসম্বন্ধের বিজ্ঞান কি স্বীকৃতি ; তারা জানে না, এক অন্তগূঢ় অদ্বৈত-ভাবনার বিচিত্র বিভূতি তারা, অতএব সেই ঐক্যের অনুভবেই আছে তাদের সকল দ্বন্দ্বের পরম সমন্বয়। কিন্তু চৈতন্য যেখানে বহুত্ব এবং একত্ব দুটি ভাবনারই আধার, বহুত্বের ভাবনা বিধৃত যেখানে একত্বের প্রশাসনে, বিশ্বের সত্য ঋত ও ব্রতের সঙ্গে ব্যক্তির সত্য ঋত ও ব্রত একছন্দে গাঁথা যে-চৈতন্যে সামরস্যের অপরোক্ষ-অনুভবে, এক জানছেন বহুকে আত্মস্বরূপ বলে এবং বহু জানছে এককে নিজেদের স্বরূপ বলে—এই যেখানে চেতনার অখণ্ড প্রকৃতি : শক্তিও সেখানে তারি অনুরূপ হয়ে নিজকে ফুটিয়ে তুলবে বিশ্বপ্রাণের ছন্দলীলায়—যার মাঝে একের প্রশাসনকে সচেতনভাবে মেনে নিয়েই বহুর বৈচিত্র্যকে রূপ দেবে সে প্রতি ব্যক্তির স্বভাব ও স্বধর্মের পরিশীলনে। সেই শক্তির আবেশে উন্মেষিত মহাজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির নিষ্কাম আত্মরতি বিশ্বাত্মভাবনার সঙ্গে হবে যোগযুক্ত ; অর্থাৎ বহু জীবে একই চিন্ময় পুরুষের অনুভব, বহু মনে একই চেতনার বিচ্ছুরণ বহু জীবনে একই শক্তির উল্লাস, বহু হৃদয়ে ও আধারে

একই আনন্দের মূর্ছন—এই অপরোক্ষ উপলব্ধিতে ব্যক্তির চেতনা হবে প্রদীপ্ত।

চিৎশক্তির এই চারটি বিভাবের মধ্যে প্রথমটি হল সচ্চিদানন্দের স্বরূপ; চৈতন্য ও শক্তির মাঝে সামরস্যের স্ফূর্তি হচ্ছে তাকেই আশ্রয় করে। সচ্চিদানন্দের মাঝে চৈতন্য ও শক্তি অবিনাভূত, তদাত্মক; কেননা শক্তি সেখানে সত্তারই চিন্ময় স্ফুরণ, অথচ চিৎস্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটছে না সে-স্ফুরণে; তেমনি চৈতন্যও সেখানে সত্তারই জ্যোতির্ময়ী শক্তি,—নিত্য প্রদীপ্ত যার আত্মসংবিৎ ও স্বরূপানন্দের অনুভব, নিত্য অকুণ্ঠিত যার এই অনুত্তর জ্যোতি ও স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্য। দ্বিতীয় বিভাবটি হল জড়প্রকৃতির রূপ: এমনিতর আত্মপ্রতিষেধ দ্বারাই সচ্চিদানন্দ জড়বিশ্বে আপনাকে করেছেন বিভাবিত; আপাতদৃষ্টিতে শক্তি আর চৈতন্যের পূর্ণ বিচ্ছেদ এখানে, অথচ অচিতির প্রমাদহীন প্রশাসনের বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রজাল মুগ্ধ করে আমাদের বুদ্ধিকে; তাই আধুনিক জড়বিজ্ঞান একেই ভেবেছে বিশ্বদেবতার তত্ত্বরূপ বলে, যদিও এ তাঁর একটা মুখোস শুধু। তৃতীয় বিভাবটি ফুটেছে বিশ্ব-সতের প্রাণ ও মনের লীলায়: জড়ত্বের সুপ্তি-ঘোর কাটিয়ে ধীরে-ধীরে জাগছে তারা আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে; জড়তার কাছে নিজকে সঁপে দিয়ে আত্মবিলোপ ঘটানো যেমন অসম্ভব তাদের পক্ষে, তেমনি তিমির-বিদার উদার-অভ্যুদয়ের কল্পনাও অস্পষ্ট তাদের চেতনায়,—তাই সহস্র সমস্যায় সঙ্কুল তাদের সাধনা; যে-জড়প্রকৃতির মাঝে অচিতির শাসন অকুণ্ঠিত, তারি বুকে কুণ্ঠিত শক্তির দৈন্য নিয়ে জাগল চেতন মানুষ একটা হতবুদ্ধিকর প্রহেলিকার মত—তাইতে প্রাণ ও মনের সমস্যা হয়ে উঠল আরো ঘোরালো। তারও পরে আছে চিৎশক্তির চতুর্থ বিভাব, যার স্থিতি অতিমানস ভূমিতে। জীবনের পূর্ণসিদ্ধি সেইখানে, কেননা সেইখানেই হবে সকল সমস্যার সমাধান,—জড়ত্বের মাঝে বিলুপ্ত চিৎশক্তির আংশিক প্রতিষ্ঠায় আজ যারা সঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাণ ও মনের ভূমিতে। সে-সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে অতিমানসের কাছে: জড়ের গহনে চিৎশক্তির মহাবিলুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তার যত কিছু বীর্য, অথচ পরিণামের ধারাবাহিকতায় অবশ্য-সম্ভাবিত ছিল যাদের স্ফুরণ, চিৎশক্তির পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় তাদের নির্মুক্ত প্রকাশ ঘটানো এই আধারে—অতিমানসের এই ব্রত। ঐ তো সত্য মানুষের সত্য জীবন, যার পানে চলেছে তার এই অসিদ্ধ জীবনে অচরিতার্থ মানবতার অক্লান্ত অভিযান। আমরা যাকে জানি অচিতি বলে, সে কিন্তু পুরোপুরিই রাখে এই পথের

খবর ; শুধু আমাদের ব্যক্তচেতনায় আছে তার দ্বন্দ্ববিধুর অস্পষ্ট স্বপ্নলেখা— অপরোক্ষ অনুভবের কুচিৎ-কিরণে, আদর্শের অতর্কিত ঝলকে, দিব্যশ্রুতির বিদ্যুৎ-বিকাশে যার দীপনী। তারি স্ফুরণ দেখি সিদ্ধ ও কবির অন্তর্দৃষ্টিতে, ঋষির তুরীয় অনুভবে, ভাবকের দিব্যোন্মাদে, চিন্তাবীরের দর্শন-প্রতিভায়, মহামনীষী ও মহাপুরুষের দিব্য-ভাবনায়।

প্রাণ ও মনের যে-ভূমিতে মানুষ পৌঁছেছে আজ, চৈতন্য আর শক্তির অসামঞ্জস্যের দরুন তিনটি সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেখানে—এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। প্রথম কথা, মানুষ সামান্য অংশই জানে তার স্বরূপ-সত্তার ; দেহ-প্রাণ-মনের বহিশ্চর ব্যবহারিক-সত্তার সঙ্গে শুধু পরিচয় তার। আবার তারও পুরোপুরি খবর রাখে না সে ; চেতনার অব্যক্ত গহনে রয়েছে তার মাঝে অবচেতন ও অধিচেতন প্রাণ-প্রবৃত্তির উত্তালতা, অবচেতন দৈহ্য-সত্তা। আত্মসত্তার এই বিপুল পরিধি তার অগোচর ও শাসনের বাইরে ; বরং তাকেই চলতে হয় ঐ অপ্রাকৃত সত্তার নিগূঢ় প্রজ্ঞার শাসন মেনে। অসীম শক্তির মাঝে সীমিত জ্ঞানের প্রকাশে দেখা দেয় এই সঙ্কট। কারণ, সত্তা চৈতন্য ও শক্তি যদি হয় এক, তাহলে আত্মসত্তার যতটুকু আমরা আত্মসংবিৎ দিয়ে গ্রাস করতে পেরেছি ততটুকুর 'পরেই আমাদের অধিকার হবে অক্ষুণ্ণ ; বাকিটুকু শাসিত হবে তার নিজস্ব চিৎ-শক্তি দ্বারা, যা আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের নাগালের বাইরে। অথচ এই বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ শক্তি স্বরূপত এক অবিভাজ্য শক্তি ব'লে তার প্রবল ও বৃহৎ অংশই স্বভাবত শাসন করবে দুর্বল ও ক্ষুদ্র অংশকে। তাই জাগ্রৎ-চেতনাতেও আমাদের মেনে চলতে হয় অবচেতনা ও অধিচেতনার শাসন ; এমন-কি আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বেলাতেও আমরা যেন অন্তর্গূঢ় অচিতিরই ক্রীড়নকমাত্র।

এইজন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলতেন : মানুষ নিজকে স্বতন্ত্র কর্তা ভাবে, কিন্তু বাস্তবিক তার কর্ম চলছে প্রকৃতির বশে—এমন-কি জ্ঞানীকেও চলতে হয় নিজের প্রকৃতির শাসন মেনে। কিন্তু প্রকৃতি তো আমাদেরই অন্তর্যামী পরম-পুরুষের চিন্ময়ী সিসৃক্ষা ; আত্মনিগূহনের আপাত-লীলায় তার মাঝে নিজকে ঢেকেছেন তিনি নিজেরই প্রতীপ-বৃত্তির অন্তরালে। তাই প্রাচীনেরা চিন্ময়ী সিসৃক্ষার এই প্রতীপ-বৃত্তিকে বলতেন ব্রহ্মের মায়াশক্তি। তাঁদের ভাষায় : 'ভ্রামিত হচ্ছে সর্বভূত যন্ত্রারূঢ় হয়ে যেন তাঁরি মায়ায়, যিনি ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠিত আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে'। অতএব এ-কথা নিশ্চিত,

মানুষ যদি মনেরও সীমা ছাড়িয়ে আত্মসংবিতের পরমচেতনায় এক হয়ে যায় ঈশ্বরের সঙ্গে, তবেই সে পায় নিজের আধারের 'পরে পুরো দখল। কিন্তু অচেতনা বা অবচেতনার ভূমিতে থাকতে তা হবে না ; এমন-কি এর জন্যে আধারের গহনে ডুব দিয়ে অচিতির দিকে তলিয়ে গিয়েও কোনও লাভ নাই। তাদাত্ম্যবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তখনই হয় যখন আমরা অন্তরাবৃত্ত হয়ে ছুঁই হৃদয়গুহায় পাতা তাঁর আসনখানি এবং ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে উত্তীর্ণ হই অতিমানসের অতিচেতন ভূমিতে। কারণ ঐ ভূমিতেই দিব্য-মায়ার অধিকারে আছে ঋতভৃৎ সত্যের সেই পরমবিজ্ঞান, অদিব্য-মায়ার শাসনে চলছে যার খেলা এই অবচেতনার মাঝে—চিন্ময় আস্তিক্যের এষণাকে জাগিয়ে দিয়ে জড়ময় নাস্তিক্যের বুকে। বস্তুত অপরা-প্রকৃতি এখানে মূর্ত করে তুলছে ঐ পরা-প্রকৃতিরই সত্যসঙ্কল্প ও বিজ্ঞানকে। ব্রহ্মের মায়াশক্তি সৃষ্টি করছে বটে এই জগতের প্রাতিভাসিক সত্য যত, কিন্তু সে-শক্তি বিধৃত রয়েছে তাঁরি ঋত-শক্তির প্রশাসনে। দুয়ের মূলে আছে একই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দেববীর্য, যা প্রতিভাসের মাঝে জানে তার অন্তর্গূঢ় পরমার্থতত্ত্বকে এবং তারি উত্তরায়ণের অভিযানকে একদিন যা সার্থক করবে ব্রহ্মসদ্ভাবের পরম প্রত্যয় দিয়ে। আজ যে-মানুষ একটা অর্ধস্ফুট আভাস এখানে, একদিন দিব্য-মায়ার জ্যোতির্লোকে খুঁজে পাবে সে সত্যিকার পুরো মানুষটিকে ; সেখানে দেখবে সে নিজেরই নরোত্তম রূপ—যা আত্মসংবিতের পূর্ণ জ্যোতিতে প্রভাস্বর, পরম-সাম্যে তদ্‌গত রয়েছে যা সেই স্বয়ম্ভূ-পুরুষের সঙ্গে, নিজেরই বিশ্বরূপী আত্ম-পরিণামের নটলীলার যিনি সর্ববিৎ সূত্রধার।

নিজকে মানুষ জানে না, এই তার প্রথম সঙ্কট। তার দ্বিতীয় সঙ্কট, দেহে প্রাণে এবং মনে বিশ্ব হতেও বিযুক্ত সে। তাই নিজের সম্পর্কে অজ্ঞানতা তার যতখানি, ততখানি কিংবা তারও চেয়ে বেশি অজ্ঞানতা তার অপরের সম্পর্কে। খানিকটা পর্যবেক্ষণ অনুমান ও সংস্কার এবং খানিকটা আবছা-গোছের সহানুভূতি দিয়ে অপরের একটা মনগড়া আদল সে খাড়া করতে পারে —কিন্তু তাকে জ্ঞান বলা চলে কি? একমাত্র তাদাত্ম্য-বোধেই জ্ঞান সম্ভব, কেননা সত্তার আত্মসংবিৎই জ্ঞানের সত্য রূপ। সচেতনভাবে নিজকে অনুভব করতে পারি যতটুকু, ততটুকু আমাদের স্বরূপজ্ঞানের সীমা, তার বাইরে সবই আঁধার ; তেমনি নিজের বাইরে তাকেই জানি সত্য করে, অনুভবে এক হতে পারি যার সঙ্গে—সেখানেও তাদাত্ম্যবোধের সীমাই জ্ঞানের সীমা।

জ্ঞানের সাধন যদি হয় পরোক্ষ এবং অপূর্ণ, তাহলে তার সিদ্ধিও হবে তাই। সে-জ্ঞান দিয়ে চরিতার্থ হয় ব্যবহারিক জীবনের কতকগুলি সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন ও সুযোগ, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার একটা অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত সৌষম্যের সম্বন্ধও স্থাপিত হয় তাতে; এমন-কি অনেক আনাড়িপনা ও গোঁজামিল সত্ত্বেও মন এ-ব্যবস্থাকে মেনেও নেয় নিখুঁত বলে ;—তবু জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা দেয় একমাত্র তাদাত্ম্যবোধের ফলেই। এইজন্যই জীবনকে পূর্ণ সার্থক করতে হলে অপরের সঙ্গে চাই তাদাত্ম্যের নীরন্ধ্র চেতনা,—শুধু মমত্ববোধ দিয়ে অপরের দরদী হওয়া বা মন দিয়ে মন বোঝাই যথেষ্ট নয়। কারণ এমনি করে আমরা অপরের সদর-মহলেরই খবর জানি ; কিন্তু সে-জ্ঞান কখনও পূর্ণায়ত হয় না বলে তার সাধনা ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয় উভয়ের অবচেতনা অথবা অধিচেতনা হতে উৎসারিত অজানা বিপ্লবের দুর্বার বন্যায়। তাদাত্ম্যের অনুভব সুপ্রতিষ্ঠ হয় একমাত্র বিশ্বচেতনার মাঝে অবগাহনে, যেখানে স্বভাবত আমরা এক হয়ে রয়েছি সবার সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বাত্মভাবের চেতনাও পূর্ণ বিকশিত হয়ে আছে অতিমানসেরই অতিচেতন ভূমিতে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অতিমানসের বেশির ভাগই অবচেতন, তাই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের সাধন দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না তাকে। অপরা-প্রকৃতির সকল বৃত্তি জড়িয়ে গেছে সঙ্কীর্ণ অহন্তার জালে—বিবিক্ত ব্যষ্টি-ভাবের ত্রিগুণিত বন্ধনে বাঁধা সে। একমাত্র অতিমানস ভূমিতেই দিব্যচেতনার ঐক্যসূত্রে গাঁথা রয়েছে বৈচিত্র্যের মণিমালা।

তৃতীয় সঙ্কট হল, প্রকৃতি-পরিণামের পর্বে-পর্বে শক্তি ও চেতনার বিচ্ছেদ। প্রথম বিচ্ছেদ পরিণাম-শক্তিরই কীর্তি ; জড়, প্রাণ ও মন এই তিনটি পর্বের পরম্পরায় ফুটেছে সে—প্রত্যেক পর্বের বৃত্তি ও ধর্মকে স্বতন্ত্র রেখে। তাই দেখি, প্রাণের বিরোধ দেহের সঙ্গে : নিজের দুর্দম বাসনা ও প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে জোর করে দেহকে সে নিয়োজিত করতে চায়, তার পঙ্গু সামর্থ্যের কাছে দাবি করে অজর-অমর দিব্যদেহের ঐশ্বর্য ; শৃঙ্খলিত উৎপীড়িত দেহ সে-জুলুম সয়ে নির্বাক বিদ্রোহে ধূমায়িত হতে থাকে প্রাণের অসম্ভব দাবির বিরুদ্ধে। মনের লড়াই দেহ আর প্রাণ দুয়েরই সঙ্গে : কখনও দেহকে তাড়না করে সে প্রাণের পক্ষ নিয়ে, কখনও-বা প্রাণোচ্ছ্বাসের সংযম দ্বারা দেহকে আগলে রাখে প্রাণের উত্তাল বাসনার দুর্নিবার প্লাবন হতে। আবার কখনও প্রাণকে কবলিত ক'রে শক্তিকে তার নিয়োজিত করতে চায় সে

নিজের ইষ্টসাধনায়—মানবজীবনে বুদ্ধি হৃদয় ও রসচেতনার বহুমুখী পরিতর্পণে খোঁজে সে নিজেরই নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির পরম উল্লাস প্রাণের সহায়ে। শৃঙ্খলিত প্রাণ সে-জুলুম না সইতে পেরে যখন-তখন বিদ্রোহ করে বসে অজ্ঞান অবুঝ অত্যাচারী মনিবের বিরুদ্ধে। প্রাকৃত জীবনে অহরহ চলছে এই কুরুক্ষেত্র, মন খুঁজে পায় না যার সার্থক সমাধান; অমর্ত্যের অভীপ্সা লেলিহান হয়ে ওঠে যদি মর্ত্য দেহে ও প্রাণে, কী করে সে শান্ত করবে তার উত্তালতা? যুগ-যুগ ধরে শুধু আপোসরফার দীর্ঘ একটা পরম্পরা—এই একটিমাত্র পথ তার। নয়তো আর-একটা পথ: সমাধানের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হয় মর্ত্যভাবের কাছে নতি স্বীকার করা জড়বাদীর মত, নয়তো অধ্যাত্মবাদী বৈরাগীর মত পার্থিব জীবনকে ধিক্কৃত করে অন্তরের নিভৃতে আবিষ্কার করা নিরায়াস জীবনের নন্দনকানন।···কিন্তু সমস্যার সত্যিকার সমাধান হবে একমাত্র সেই উন্মনী-তত্ত্বের আবিষ্কারে, অমৃতত্বই যার শাশ্বত ধর্ম; এবং সেই অমৃতবোধদ্বারাই নির্জিত করতে হবে মর্ত্যভাবের সকল দৈন্য।

কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনের অন্যোন্য-সংঘর্ষেই নয় শুধু,—শক্তি আর চেতনার বিচ্ছেদ ঘটেছে আরও গভীরে এবং তাইতে দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনের এই পঙ্গুতা। প্রাণ ও মনের বিরোধ তো আছেই দেহের সঙ্গে, তাছাড়া তাদের নিজেরও মাঝে আছে আত্মবিচ্ছেদের বীজ। দেহে অধিষ্ঠিত অন্নময় পুরুষ চলে সহজ-সংস্কারের বশে,—তার সামর্থ্যের অনুরূপ নয় দেহের নিজস্ব সামর্থ্য; তেমনি আধারস্থিত প্রাণশক্তির সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গেছে সংবেগ-প্রধান প্রাণময় পুরুষের সামর্থ্য, মনঃশক্তির সামর্থ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে বুদ্ধি- ও আবেগ-প্রধান মনোময় পুরুষের বীর্য। কারণ, প্রত্যেক আধারে অধিষ্ঠিত অন্তঃসংস্থ পুরুষের আছে নিজকে পুরোপুরি পাবার একটা অভীপ্সা; অতএব বর্তমান আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে চান তিনি সবসময়। তাই আধারের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তিকে কেবল তিনি ঠেলে চলেন সমুখপানে—অনভ্যস্ত পথে, অজানিতের অভিসারে। তাঁর এই নিরন্তর প্রৈতিতে সাড়া দেওয়া সহজ হয় না শক্তির পক্ষে, বিশেষত যখন বর্তমানের দৈন্য হতে মুক্ত হয়ে বিপুলতর সামর্থ্যের মাঝে নিজকে তুলে ধরবার ডাক আসে তার। পুরুষের ত্রয়ীর সঙ্গে কোশের ত্রয়ীর এই দ্বন্দ্বে আধারশক্তি হয়ে পড়ে দিশেহারা; পুরুষের দাবি মেটাতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের, সংবেগের সঙ্গে সংবেগের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, আবেগের সঙ্গে আবেগের তুমুল সংঘাত বাধিয়ে দেয়

সে ; একজনকে খুশী করতে আর-একজনকে করে বঞ্চিত এবং তাতে ব্যাপার যখন ঘোরালো হয়ে ওঠে আরও, তখন অনুতপ্ত হয়ে কৃতকর্মের ত্রুটি শোধরাতে চালায় কেবল অবিশ্রান্ত গোঁজামিল আর আপোসরফা—কিন্তু এক সূত্রে সব-কিছুকে গেঁথে তোলবার হদিশ পায় না কোনমতেই ! মনের মাঝে নিগূঢ় আছে যে-চিদ্বীর্য, এই বিক্ষোভ আর বিপর্যয়ের মাঝে ঐক্যের ছন্দসুষমাকে আবিষ্কার করা ছিল তারি কাজ ; কিন্তু তার বিজ্ঞান আর সঙ্কল্পের সামর্থ্যও যেমন সঙ্কুচিত, তেমনি ও-দুয়ের মাঝে শুধু তারতম্য নয়, আছে একটা রেষারেষিও। ঐক্যের সূত্র নিহিত রয়েছে অতিমানসের উত্তরভূমিতে, কেননা সমস্ত বৈচিত্র্য তারি মাঝে বিধৃত হয়ে আছে অদ্বৈত-চেতনার নর্মবৃন্তে। সেখানে সঙ্কল্প বিজ্ঞানেরই অনুরূপ, অতএব দুয়ের মাঝে আছে পরিপূর্ণ সৌষম্য ; চৈতন্য আর শক্তি সামরস্যের দিব্যমহিমায় নিত্যসঙ্গত সেইখানেই।

মানুষ যত আত্মসচেতন হয়, মননের শক্তি যত সত্য হয়ে ওঠে তার মাঝে, এই বিরোধ ও বৈষম্যের চেতনাও ততই তীব্র হয়ে পীড়িত করে তাকে। তখন সে চায়,—তার দেহ প্রাণ ও মনের মাঝে, জ্ঞান সঙ্কল্প ও বেদনার মাঝে নেমে আসুক সৌষম্যের অপরাজিত ছন্দ, আধারের তন্ত্রে-তন্ত্রে বেজে উঠুক ঐক্যের রাগিণী। কখনও-কখনও একটা কাজচলা-গোছের আপোসরফা দাঁড় করিয়েই হয় এ-আকৃতির নিবৃত্তি ; তার ফলে সাময়িক শান্তিও হয়তো দেখা দেয় বিরোধের অবসানে। কিন্তু রফামাত্রেই চলতিপথে থমকে দাঁড়ানো শুধু ; আমাদের অন্তর্যামী তাতে খুশী হতে পারেন না কিছুতেই। তিনি চান পূর্ণ সৌষম্যের সেই সহস্রদলটি, যার মাঝে আমাদের বহু-বিচিত্র সম্ভাবনার ঘটেছে ছন্দোময় সম্যক বিকাশ। এ-দাবিকে খাটো করলে সে হবে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া—তার সমাধান নয় ; বড় জোর তাকে বলা চলে সাময়িক একটা সমাধান মাত্র—আত্মার উদয়ন ও আত্মপ্রসারণের নিরন্ত অভিযানে ক্ষণিকের একটা বিশ্রামভূমি শুধু। পরিপূর্ণ সৌষম্যকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই মনের পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রাণশক্তির নিখুঁত লীলায়ন, দৈহ্যসত্তার অনবদ্য ছন্দন। কিন্তু অপূর্ণতা যার গোড়ার গলদ, কী করে তার মাঝে খুঁজে পাব পূর্ণতার তত্ত্ব এবং বীর্য ? সঙ্কোচ আর খণ্ডতা যে-মনের স্বধর্ম, অখণ্ড পূর্ণতার সন্ধান সে আমাদের দেবে কী করে ? প্রাণ আর দেহও নিরুপায় এখানে. কেননা খণ্ডন- ও বিভাজন-ধর্মী মনেরই বিভূতি এবং আয়তন তারা। পূর্ণতার তত্ত্ব ও বীর্য নিহিত আছে অবচেতনায়,—অবর-মায়ার আবরণে আবৃত

হয়ে, অসিদ্ধ পুরুষার্থের নির্বাক সূচনারূপে। অতিচেতনায় আছে তাদের নিত্য-সিদ্ধ প্রকটরূপ—চেতনায় অবতরণের প্রতীক্ষায়; কিন্তু অবিদ্যার আবরণে আজও তারা আড়াল হয়ে রয়েছে আমাদের কাছে। অতএব সমন্বয়সাধনার বীর্য ও বিজ্ঞানকে খুঁজতে হবে ঐ লোকোত্তর ভূমিতে—আমাদের এই প্রাকৃত ভূমিতেও নয়, অবচেতনাতেও নয়।

তেমনি, আত্মপরিণতির সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষ তীব্রভাবে অনুভব করে, কী করে অজ্ঞান ও বৈষম্যের দ্বন্দ্ব জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধকে করেছে বিকৃত। তীব্র অসহন এ-দ্বন্দ্ব, তাই এর সমাধান খোঁজে সে শান্তি সৌষম্য ঐক্য ও আনন্দের সহজ সিদ্ধিতে। কিন্তু সে-সিদ্ধির সঙ্কেতও আসবে উপর থেকে। কারণ বিশ্বাত্মভাবকে এই চেতনাতেই সিদ্ধ করতে হলে চাই দেহ প্রাণ ও মন সবারই প্রসারণ ও রূপান্তর। মন তখন নিজের সঙ্গে-সঙ্গে জানবে অপর মনেরও তত্ত্ব—পরস্পরকে না-জানার এবং ভুল করে জানার বিভ্রাট হতে মুক্ত হবে সে; একত্বভাবনার ফলে নিজের সঙ্কল্পের সঙ্গে অপরের সঙ্কল্পের ঘটবে না বিরোধ; হৃদয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে নিজের ভাবের সঙ্গে মিশবে এসে সবার ভাব। প্রাণশক্তি তখন অপর প্রাণের বীর্যকে অনুভব করবে আপন বলে এবং তাদেরও সিদ্ধি খুঁজবে নিজের মত করেই; দেহও তখন হবে না আর জগৎ হতে নিজকে ঠেকিয়ে রাখবার একটা কারাপ্রাচীর শুধু। এক সত্য ও জ্যোতির সিদ্ধ-বিধান তখন ছাপিয়ে যাবে—ঘরে-বাইরে যত ভ্রম ও প্রমাদ, মিথ্যা ও কলুষ ছেয়ে আছে মানুষের হৃদয় মন প্রাণ ও আকৃতিকে। এমনি করে মানুষের সিদ্ধজীবন শুধু চিন্ময় ভাবনাতেই নয়, প্রাকৃত ব্যবহারেও এক হয়ে যেতে পারে সবার সঙ্গে—এমনি করেই জীবাত্মা ফিরে পেতে পারে তার বিশ্বাত্মভাবের নিরঙ্কুশ মহিমা। এই সর্বাত্মভাব আছে অবচেতনায়, আছে অতি-চেতনায়; কিন্তু তার জন্যে উত্তরায়ণের পথেই চলতে হবে আমাদের—এই হল বিধির বিধান। কারণ, যে অনাদি প্রৈতি চেতনার বিচিত্র পরিণামকে আজ উত্তীর্ণ করেছে মনুষ্যলোকে, তার অভিযান নয় অব্যক্ত-ব্রহ্মের পানে, নিগূঢ় হয়ে আছেন যিনি 'অপ্রকেত সলিলে, তম যেখানে গূঢ় হয়ে আছে তমের দ্বারা'; * সে ধাবিত

* ঋগ্বেদ (১০।১২৯।৩)

হয়েছে সেই ব্যক্ত-ব্রহ্মের পানে, অনন্ত জ্যোতির সমুদ্রে সমাসীন যিনি পরম ব্যোমে। †

এতদূর এসে আজ যদি না মানবজাতি লুটিয়ে পড়ে মহাপ্রস্থানের পথের ধুলোয়, আকূতিচঞ্চলা বেদনাবিধুরা বিশ্বজননীর যোগ্যতর সন্তানের হাতে যদি না তুলে দিতে হয় তাকে জয়শ্রীর উত্তরাধিকার, তাহলে উদয়নের এই জ্যোতিঃসরণি ধরে চলতেই হবে তাকে প্রেম ও দীপ্তবুদ্ধির প্রেরণা নিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে পরকে পাবার প্রাণময় আকূতি বহন করে। কিন্তু তারও পরে উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে অতিমানসের অদ্বৈতভূমিতে, উন্মনীর আলোকে যেখানে সার্থক হয়েছে প্রাণ মন ও প্রেমের আরতি। মানুষের জীবন যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে অতিমানস অদ্বৈতচেতনার লোকোত্তর অনুভবে—যার মাঝে তার সমগ্র সত্তার প্রতি তন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে 'একং সৎ' ও বিশ্বের পরম-সামরস্যের সাম-ঝঙ্কারে, সেইদিন হবে তার পুরুষার্থের পরমা সিদ্ধি, আসবে তার চিরাভীপ্সিত প্রমুক্তি। এই 'দিব্য জন্ম ও কর্মে'র সাধনাকেই আমরা বলেছি 'ব্রহ্মণঃ পথি বিততঃ' বিশ্ব-প্রাণের উদয়নীয়-যজ্ঞের তুরীয় পর্ব।

† সূর্যের ওপারে রয়েছে যে অপ্-এরা জ্যোতির্লোকে, আর অবর লোকেও রয়েছে যারা।—ঋগ্বেদ (৩।২২।৩)

২৩

# চৈত্য-পুরুষ

পুরুষ—অন্তরাত্মা—অঙ্গুষ্ঠমাত্র যিনি।

—কঠোপনিষদ (৪।১২ ; ৬।১৭) ; শ্বেতাশ্বতর (৩।১৩)

জীবনের মধুভোজী এই আত্মাকে জানে যে, ভূত ও ভব্যের ঈশান যিনি,—তার আর জুগুপ্সা থাকে না এর পরে।

—কঠোপনিষদ (৪।৫)

কী-ই বা মোহ, কী-ই বা শোক তার—একত্বকে দেখছে যে সকল ঠাঁই ?

—ঈশোপনিষদ (৭)

যে জেনেছে ব্রহ্মের আনন্দ, তার ভয় নাই আর কোথা থেকেও।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ (২।৯)

'প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ'।—এই উদয়নের প্রথম পর্বে প্রাণকে দেখেছি আমরা মূঢ় অচেতন একটা অন্ধ প্রবেগরূপে ; জড়ের মাঝে কুণ্ডলিত আকূতির নিগূঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত সে, আচ্ছন্ন পরমাণু-চেতনার গর্ভাশয়ে সে যেন ব্যক্তিত্বের ভ্রূণ ; তার নাই আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্য, নাই জড়-পরিণামকে আত্মসাৎ করবার বীর্য—বিশ্ববিধানের একান্ত কবলিত ক্রীড়নক সে, এই তার নিয়তি। দ্বিতীয় পর্বে প্রাণ দেখা দিল আত্মসাৎ করবার উদগ্র কামনা রূপে, কিন্তু সামর্থ্য তার তখনও কুণ্ঠিত। তৃতীয় পর্বে জাগল প্রেমের কোরক—যুগপৎ আত্মসাৎ আর আত্মদান করবার প্রবৃত্তিতে সমঞ্জসা রতি ফুটল যার মধ্যে। সেই কোরকই তুরীয় পর্বে ফুটবে অতিমানস সরোবরে সহস্রদল কমল হয়ে : তার মাঝে বিশ্বের মর্মে নিগূঢ় অনাদি আকূতি নিরঞ্জন সিদ্ধমহিমায় হবে রূপায়িত ; উদয়নের মধ্যপর্বে দেখা দিয়েছিল যে ক্ষুব্ধ কামনা, তার ঘটবে জ্যোতির্ময় পরি-তর্পণ ; দ্যুলোকের মহারাসমঞ্চে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের পরম-সামরস্যে প্রেমের

চিন্ময় আত্মবিনিময় লোকোত্তর সুগভীর তৃপ্তিতে হবে নন্দিত। গভীর অনুধ্যানের ফলে দেখতে পাব, পর্বে-পর্বে প্রাণের এই উদয়নে রূপায়িত হয়েছে পুরুষেরই ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতিতে নিগূঢ় আনন্দের এষণা। এ-উদয়ন বিশ্বে অনুস্যূত ব্রহ্মানন্দের উদয়ন : জড়ের গভীর গহনে তার অব্যক্ত সূচনা, তারপর রসাভাস ও রসবৈচিত্র্যের দীর্ঘ পরম্পরা অতিক্রম করে পরম পর্যবসান তার চিন্ময় স্বরূপানন্দের প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটায়!

বিশ্বের তত্ত্ব যে পেয়েছে, সে জানে এ-লীলার অন্যথা হতে পারে না কিছুতেই। এ-জগৎ সৎ-চিৎ-আনন্দেরই ছদ্মরূপ; যে-ব্রহ্মচৈতন্যের মাঝে ব্রহ্মশক্তির নিত্যস্থিতি ও বিলাস, আনন্দ তার স্বরূপ এবং সে-আনন্দ সর্বগত আত্মরতিরই আনন্দ। প্রাণ যখন ব্রহ্মের চিৎশক্তির তপোবীর্য, তখন তার সকল স্পন্দনের মূলে থাকবে এক নিগূঢ় সর্বগত আনন্দের প্রৈতি; নিখিল প্রাণপ্রবৃত্তির সে-ই হবে উৎস প্রবর্তক ও পরিণাম। অহঙ্কারের খণ্ডলীলায় সে-আনন্দ যদি হয় পরাভূত, তিরস্কৃত; এমন-কি সে যদি নিরানন্দ হয়েও দেখা দেয় কখনও—শাশ্বত আত্মভাব যেমন দেখা দেয় মৃত্যুর ছদ্মবেশে, চেতনা ফোটে অচিতি হয়ে, শক্তি আপনাকে সংবৃত করে অশক্তির ছন্নলীলায়;— তাহলেও ঐ বিশ্বানন্দের আবেশ ছাড়া কোনও জীবই হতে পারে না পরিতৃপ্ত— প্রাণের ধারায় উজিয়ে চলা কি ভাটিয়ে যাওয়া দুইই তখন হয় অসম্ভব তার পক্ষে। কেননা আনন্দ যে তারি সত্তার অন্তর্গূঢ় অখণ্ডানন্দ,—বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক সচ্চিদানন্দের সর্বগত সর্বানুস্যূত সর্বাধার অনাদি আনন্দ। তাই আনন্দের এষণাই বিশ্বপ্রাণের প্রথম প্রৈতি, তার মর্মকথা; তাই তো বাসনার ব্যাকুলতা, ভোগের তর্পণ ও ঐশ্বর্যের সাধনা ছেয়ে আছে তার সকল প্রবর্তনা।

আনন্দের এষণাই প্রাণের স্বধর্ম; কিন্তু এ-আধারে কোথায় খুঁজে পাব সেই আনন্দরূপটি? বিশ্বলীলার সাধনরূপে চিৎ-শক্তি প্রাণকে ফুটিয়েছে, অতি-মানস ফুটিয়েছে মনকে; কিন্তু এই আধারের কোন্ তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশ্বে হিল্লোলিত হল তাঁর আনন্দলীলা? বিশ্বভাবন দিব্যপুরুষের চারটি বিভাব দেখেছি আমরা : তিনি সন্মাত্র, চিৎশক্তি, আনন্দরূপ এবং অতিমানস। এও দেখেছি, জড়বিশ্বে অতিমানস আছে সর্বগত অথচ প্রচ্ছন্ন হয়ে; প্রত্যেক বাস্তব-প্রতিভাসে রয়েছে তার আবেশ অন্তর্গূঢ় রহস্যশক্তির বিচ্ছুরণরূপে, কিন্তু প্রাকৃত-পরিণামের লীলায় নিজের গৌণবিভূতি মনকে সে করেছে তার সাধন। তেমনি ব্রহ্মের চিৎশক্তি জড়বিশ্বে অনুস্যূত প্রচ্ছন্ন ও বিশ্বলীলায়

নিগূঢ়-স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েও ফুটে উঠছে বিশেষ করে নিজেরই গৌণবিভূতি প্রাণের রূপে। এখনও পৃথক করে আলোচিত হয়নি জড়ের তত্ত্ব, তবুও বোঝা যায় ব্রহ্মের সদ্‌ভাবও বিশ্বপ্রতিভাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আকারে সর্বগত হয়ে আছে জড়-বিশ্বে,—বিশ্বের উপাদান, রূপ-ধাতু বা সদ্‌ব্রহ্মের জড়রূপী আত্মবিভূতিতে সেখানে তার প্রথম প্রকাশ। এমনি করে তাহলে ব্রহ্মের আনন্দও আছে বিশ্বে সর্বগত হয়ে; নিখিল প্রতিভাসের অন্তরালে নিগূঢ় তার প্রতিষ্ঠা, তবু কোনও আত্ম-বিভূতির ছদ্ম-লীলায় এই আধারেও সে হয়েছে রূপায়িত। ঐ ছন্ন-বিভূতির সহায়ে সে-আনন্দকে আবিষ্কার করে বিশ্বের কর্মে সার্থক করতে হবে তাকে, এই আমাদের জীবন-ব্রত।

এই আনন্দ-বিভূতিকে প্রাচীন ঔপনিষদিক অর্থে আমরা বলতে পারি 'পুরুষ'। আধারে গুহাহিত হয়ে আছে এই পুরুষ জীবচেতনারূপে; সে প্রাণ নয়, মন নয়—দেহ তো নয়ই; অথচ এ তিনের মর্মকোষে নিগূঢ় যে-রসচেতনা আত্মরতির উল্লাস হয়ে ফুটতে চাইছে প্রীতি জ্যোতি কান্তি ও শুদ্ধসত্ত্বের মাধুরীতে, আমাদের হৃৎ-শয় পুরুষ তারি ঘনবিগ্রহ। বস্তুত পুরুষের দুটি রূপ আমাদের মাঝে, যেমন প্রাকৃত আধারে আছে প্রত্যেক বিশ্বতত্ত্বেরই যুগনদ্ধ রূপ। সত্যি বলতে দুটি মন আমাদের: একটি সাধারণ বহিশ্চর মন, যা আমাদের পরিণম্যমান অহং-এরই বিসৃষ্টি,—জড়ের কবল হতে প্রমুক্ত চেতনার বহির্ভাসরূপে গড়েছি যাকে; আর-একটি আমাদের অধিচেতন মন, যা মনোময় ব্যবহার-জীবনের কুঠ-চার হতে নির্মুক্ত এক বিশাল বীর্যময় জ্যোতিষ্মান তত্ত্ব; যে বহিশ্চর মনোময় পুরুষবিগ্রহ তাকে আমরা ভুল করি নিজের স্বরূপ বলে, এ-মন আছে তারও অন্তরালে সত্যিকার মনোময় পুরুষরূপে। তেমনি আছে দুটি প্রাণ এই আধারে: একটি বহির্বৃত্ত, অন্নময় বিগ্রহের সঙ্গে জড়িত, প্রাক্তন জড়-পরিণামের সঙ্কোচ দ্বারা পীড়িত—একদিন জন্মেছিল, আজ বেঁচে আছে, আবার একদিন মরবে সে; আর-একটি প্রাণ এক অধিচেতন শক্তির সংবেগ,—জীবন-মরণের বন্ধনী দ্বারা বেষ্টিত নয় সে: সে-ই আমাদের সত্যিকার প্রাণময় পুরুষ; যে-প্রাণলীলাকে ভুল করি জীবনের সত্যরূপ বলে, তার পিছনে রয়েছে তার অধিষ্ঠান। এমন-কি আমাদের অন্নময় সত্তাতেও আছে এই দ্বৈতলীলা: এই স্থূলদেহের অন্তরে আছে এক ভূতসূক্ষ্মময় সত্তা, যা শুধু অন্নময় কোশের নয়, প্রাণময় ও মনোময় কোশেরও শাশ্বত উপাদান; ভুল করে যে-স্থূলবিগ্রহকে ভাবি আত্মার সমগ্র ভোগায়তন, অন্নময় পুরুষরূপে তারও সে

অধিষ্ঠাতা। তেমনি আবার জীবচেতনারও রয়েছে দুটি রূপ : একটিকে জানি বহিশ্চর কামপুরুষ বলে, যে এষণা-বেদনায় নিত্য উদ্বেলিত, সুখসঙ্গ জ্ঞানসঙ্গ ও ঐশ্বর্যের আকৃতিতে চঞ্চল ; আর-একটি আমাদের অধিচেতন জীবসত্তা, প্রীতি জ্যোতি আনন্দ ও সত্ত্বশুদ্ধির দিব্যবীর্যে যে জ্যোতিষ্মান ; সাধারণত আমরা যাকে জীবচেতনার মর্যাদা দিই, তারও অন্তর্গূঢ় ঐ শুদ্ধসত্ত্বই তো আমাদের জীবাত্মার সত্য-স্বরূপ। এই শুদ্ধ বিপুল জ্যোতির্ময় জীবচেতনার ছটা কারও বাইরে প্রতিফলিত হলে আমরা বলি, 'হৃদয় আছে মানুষটার' ; আর বাইরে তার প্রকাশ স্তিমিত দেখলেই বলি, 'মানুষটা হৃদয়হীন'।

আধারের বহিরঙ্গ হয়ে ফুটেছে সঙ্কীর্ণ অহন্তার বিকার শুধু ; কিন্তু অধিচেতন ভূমিতে পাই আমাদের ব্যষ্টিভাবের সত্য ও বৃহৎ ব্যাকৃতির মর্ম-পরিচয়। আধারে গুহাহিত হয়ে আছে এই বিপুল ব্যাকৃতি ; অথচ এই-খানে আমাদের ব্যক্তিচেতনাও আছে বিশ্বচেতনার কাছ ঘেঁষে—তাকে ছুঁয়ে, নিরন্তর মাখামাখি হয়ে তার সঙ্গে। তাই আমাদের অধিচেতন মনে পড়ে বিরাট মনের বিশ্ববিজ্ঞানের আলো, অধিচেতন প্রাণে সঞ্চারিত হয় বিরাট প্রাণের বিশ্বব্যাপী সংবেগ, অধিচেতন তনুতে লাগে অন্নময় বিরাটের বিশ্ব-ব্যাপ্ত শক্তিব্যূহের দোলা। কিন্তু অধিচেতনা হতে বিবিক্ত হয়ে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের চারদিকে গড়ে উঠেছে কতগুলি নিরেট দেয়াল ; বিশ্ব-প্রকৃতি তাদের ভেদ করে অতিকষ্টে, অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে—সুনিপুণ অথচ আনাড়ি কতগুলি স্থূল উপায়ে ; অধিচেতনায় এ-ব্যবধান নিতান্ত ফিকে, তাই সেখানে তা একই সময়ে বিচ্ছেদ ও যোগাযোগের সাধন। আমাদের হৃৎ-শয় অধিচেতন পুরুষের 'পরেও তেমনি ঝরছে বিরাট পুরুষের জগদানন্দ —যে-আনন্দ উপচে ওঠে তাঁর স্বরূপ-সত্তায়, তাঁর ভূতভাবন 'জীবঘন' বিভাবনায়, যে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের খেলা নিখিলব্যাপী তাঁর জীবলীলার বাহন তারি উচ্ছলনে। অহঙ্কারের অতিস্থূল প্রাকার দ্বারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে কামপুরুষ জগদানন্দের এই উল্লাস হতে, যদিও সে-প্রাকারের মাঝে-মাঝে আছে জ্যোতির দুয়ার ; কিন্তু বিরাটের আনন্দচ্ছটা স্তিমিত ও বিকৃত হয়ে যায় সে-নিগমপথে নামতে গিয়ে, কিংবা দেখা দেয় 'বিপর্যয়ের' ছদ্মবেশে।

অতএব মানতেই হয়, এই বহিশ্চর কামময় জীবচেতনায় কখনও মেলে না জীবস্বরূপের সত্য পরিচয় ; এর মাঝে দেখি শুধু জীবসত্ত্বের বিকৃতি, পাই বিশ্বযোগের একটা প্রতীপ অনুভব মাত্র। জীব যে সত্যস্বরূপ খুঁজে পায় না

তার, তাকেই তো বলি ভবরোগ। সে-রোগের নিদান তার কুণ্ঠিত অনুভব : বহির্জগৎকে বাহুবন্ধনে বেঁধেও সে পায় না তার অন্তরাত্মার নিবিড় স্পর্শটুকু। জগতের বুকে খুঁজছে সে সত্তা চৈতন্য বীর্য ও আনন্দের রসঘন অনুভব, অথচ প্রতিনিয়ত চেতনা তার হয়ে উঠছে বিরুদ্ধ স্পর্শ ও প্রত্যয়ের কন্টক-শয়ন। ঐ রসসান্দ্র অনুভবটি একবার পেলে এই শরশয্যাতেও তার জাগত সৎ-চিৎ-আনন্দ-বীর্যের মুগ্ধ শিহরন : সমস্ত আপাতবিরোধ অখণ্ড-সত্যের বৃহৎ-সামে রণিত হয়ে উঠত এই মাত্রাস্পর্শেরই স্বরগ্রামের ভিতর দিয়ে। সেই সঙ্গে পেত সে জীবসত্ত্বের সত্য পরিচয় এবং সেই পরিচয়ে জানত তার আত্মাকে —কেননা জীবভাব তার আত্মস্বরূপেরই প্রতিভূ এবং তার আত্মাই যে বিশ্বাত্মা। কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ় বলে এ-অনুভব হতে বঞ্চিত সে। মূঢ় অহমিকা ছেয়ে আছে তার সকল মনন, হৃদয়ের সকল ভাব—এমন-কি ইন্দ্রিয়বোধকে পর্যন্ত। তাই বিষয়-সংস্পর্শে ইন্দ্রিয় তার নন্দিত হয়ে জড়িয়ে ধরে না জগৎকে উল্লসিত বীর্যের নিবিড় আলিঙ্গনে। বিশ্বের স্পর্শে কখনও তার মাঝে জাগে খুশি, কখনও বিরক্তি, কখনও তৃপ্তি, কখনও-বা অতৃপ্তি ; তাই তার সাড়াও হয় বিচিত্র। বিশ্বের পানে কম্পিত আকূতি নিয়ে কখনও এগিয়ে যায় সে সতর্ক পদক্ষেপে, অথবা অধীর উদ্দামতায় ; আবার কখনও জুগুপ্সায় ছিটকে পড়ে তার কাছ থেকে ক্রোধে ত্রাসে মূঢ় বিরাগে বা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তিতে। জীবনকে এমনি করে ভুল বুঝে কামপুরুষই নিখিলের রসঘন অনুভবকে করে বিকৃত ; তার ফলে সত্তার নিরঞ্জন স্বরূপানন্দ সুখ-দুঃখ-মোহের সাঙ্কর্যে ছড়িয়ে পড়ে চেতনায় বি-ষম হয়ে।

বিশ্বে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, সুখ-দুঃখ-ঔদাসীন্যের যে ব্যবহারিক অনুভব, তার ঐকান্তিকতা বা স্বারসিক প্রামাণ্য নাই কোনও। গ্রাহক-চেতনার প্রত্যক্-বৃত্তি দিয়েই নিরূপিত হয় তাদের তারতম্য ; তাই সুখ-দুঃখের অনুভবকে তারার নিখাদে চড়ানো যায় যেমন, তেমনি আবার নামিয়ে আনা যায় উদারার খরজে,—এমন-কি তাদের আপাত-প্রতিভাসকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলাও চলে। এমনি করে সুখকে দুঃখে অথবা দুঃখকে সুখে করা যায় রূপান্তরিত ; কেননা স্বরূপত তারা যে একই রসচেতনা, শুধু বোধে ও বেদনায় বেজে ওঠে ভিন্ন সুরে—এই না তাদের মর্মরহস্য। ঔদাসীন্যেরও আছে তেমনি তিনটি রূপ : কামপুরুষের চিত্ত কখনও থাকে অনবহিত কি অসামর্থ্যবশত অসাড়, তখন বিষয়-রসের বোধ

বেদনা ও পিপাসা সুপ্ত অথবা লুপ্ত থাকে তার মাঝে; কখনও-বা রসের সংস্পর্শেও সাড়া দিতে চায় না সে বহিশ্চর চিত্ত দিয়ে; আবার কখনও ইচ্ছাশক্তির জোরে সুখ-দুঃখের অনুভবকে উৎখাত করে চিত্তে ফুটিয়ে তোলে সে অপরিগ্রহের নির্বর্ণতা। তিনটি ব্যাপারেই, রসবোধ উদ্রিক্ত থাকে অধিচেতনায়—শুধু থাকে না কাম-পুরুষের বহিশ্চেতনায় তাকে ব্যক্তরূপে ফুটিয়ে তোলবার ইচ্ছা আয়োজন বা সামর্থ্য।

আধুনিক মনোবিদের অবেক্ষা ও পরীক্ষার কল্যাণে আমরা এখন জানি, বহিশ্চেতন মন যে-স্পর্শযোগের খবর রাখে না, তারও অনুভব ও স্মৃতি সঞ্চিত থাকে অধিচেতন মনে। তেমনি অধিচেতন পুরুষেরও রসানুভব রয়েছে নিত্য সজাগ; বহিশ্চেতন কামপুরুষ যাকে বর্জন করে বিরক্ত হয়ে বা বিরস জ্ঞানে, অথবা তটস্থ অপরিগ্রহের ভানে করে উপেক্ষা, অধিচেতন পুরুষ সেই পিপ্পলের মাঝেও আস্বাদন করেন স্বাদু রস। বস্তুত নিজেকে পুরোপুরি জানতে হলে ডুবতে হবে এই পরাক্-চেতনার অন্তরালে, কারণ এ তো আমাদের ব্যবহারিক অনুভবের একটা চয়নিকা শুধু—চেতনার সকল সুর তো ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠেনা এর তারে-তারে; এর ত্রস্ত অপটু খণ্ডিত তর্জমায় বিপুল জীবন-রহস্যের কতটুকুই-বা পায় রূপ? তাই পরাক্-চেতনা পার হয়ে এষণাকে যদি না তলিয়ে দিই অবচেতনার অতল গহ্বরে, নিজকে যদি না মেলে ধরি অতিচেতনার বৈপুল্যের পানে, তাহলে জানতেও পারব না প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে কী তাদের সম্বন্ধ। আত্মবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করতে পরাক্-চেতনার সঙ্গে-সঙ্গে জানতে হবে অবচেতনা ও অতিচেতনার রহস্য; কারণ এই তিনটি লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে আমাদের সমগ্র জীবন, তাই এই ত্রয়ীর পরিচিতিতেই ধরা পড়ে তার অখণ্ডরূপ। প্রাকৃত আধারে যা অতিচেতন, বিশ্বম্ভর বিশ্বাত্মার সঙ্গে আছে তা এক হয়ে—প্রাতিভাসিক বৈচিত্র্যের শাসন মেনে চলে না সে; তাই বস্তুর স্বরূপ-সত্য ও স্বরূপ-আনন্দের পেয়েছে সে পূর্ণ অধিকার। আমরা যাকে বলি অবচেতনা, তারি জ্যোতির্মুখ রূপটি হল অধিচেতনা; কিন্তু অধি-চেতনার আবেশে থেকেও বিশ্বানুভবের সাধনই সে, ভর্তা নয়; বিশ্বম্ভর বিশ্বাত্মার সঙ্গে কার্যত একাত্মক না হয়েও বিশ্বানুভবের ভিতর দিয়েই নিজকে সে মেলে রেখেছে তাঁর পানে। অধিচেতন পুরুষ অন্তরে-অন্তরে জানেন বিশ্বের রস-রূপটি, তাই তার সকল স্পর্শেই সমান রতি তাঁর। আবার বহিশ্চর কাম-পুরুষের অনুভবের অর্থ ও অধিকারও জানেন তিনি, তাই সুখ-দুঃখ-ঔদাসীন্যের

স্পর্শকে উপরে-উপরে স্বীকার করেও সমান আনন্দই ভোগ করেন সবার মাঝে। অর্থাৎ আমাদের অন্তর-পুরুষ সকল অনুভবেই থাকেন উল্লসিত, সব-কিছু হতেই জ্ঞান বল ও সুখ আহরণ করে রসের উপচয়ে ভরে তোলেন তাঁর মধুচক্র। এই অন্তর-পুরুষের প্রচোদনাতে আমাদের কাম-চিত্ত দুঃখ-আঘাত সয়েও তার মাঝে খুঁজে পায় সুখ, অভ্যস্ত সুখকে করে বর্জন, তার অর্থের ঘটায় রূপান্তর কি বিপর্যয়, উপেক্ষার সাধনায় অর্জন করে সমত্ববোধ অথবা বিশ্ববৈচিত্র্যের উল্লাসে সব-কিছুতেই পায় সমান আনন্দ। তার এ-সাধনার মূলে আছে সেই বিরাটের প্রৈতি, যিনি বিচিত্র অনুভবের রসায়নে পুষ্ট করতে চান তার প্রকৃতিকে। এইখানেই মানব-চেতনার বৈশিষ্ট্য। শুধু কাম-পুরুষ যদি প্রভু হত তার, তাহলে স্থাণু হয়ে তাকে থাকতে হত গাছপালা কি পাথরের মত: প্রাণ তাদের বহিঃসংজ্ঞ নয় বলে স্থাণুত্ব বা গতানুগতিকতার আড়ষ্টতার মাঝে অন্তর্যামী আজও খুঁজে পাননি এমন-কোনও সাধন, যা জাতি-ধর্মের বাঁধা-পর্দা ছাড়িয়ে মুক্তি দিতে পারে প্রাণের সুরকে। কামপুরুষও আপন চালে চলতে পেলে ওদের মত শুধু একই খাতে পাক খেয়ে মরত চিরকাল।

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে সুখ-দুঃখের অন্যোন্যসম্বন্ধ অনতিবর্তনীয়—সত্য-মিথ্যা, শক্তি-অশক্তি, জীবন-মরণের মত। তাই তাদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ সম্পূর্ণ উপেক্ষা,—অর্থাৎ নিঃসাড় হয়ে থাকা বিশ্বসত্তার অভিঘাতে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর পর্যালোচনায় বোঝা যায়, বিশ্বের বহিরঙ্গ তথ্যের 'পরে এ-মতের প্রতিষ্ঠা বলে সমস্যা-সমাধানের পুরো সঙ্কেতটি মেলে না এর মাঝে। অন্তর-পুরুষকে বহিশ্চেতনার পুরোধা করে অহং-শাসিত সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বকেও রূপান্তরিত করা চলে এক সমরস, সর্বাবগাহী, সবিশেষ-নির্বিশেষ আনন্দচেতনায়। এমনিতর নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আবেশ আছে নিসর্গ-প্রেমিকের মাঝে; তাই প্রকৃতির সকল রূপেই তার সমান আনন্দ; তার মাঝে নাই ভয় বা জুগুপ্সা, নাই সংস্কারবশে ভাল-লাগা আর না-লাগার মূঢ়তা; অপরের কাছে যা তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর, নগ্ন এবং অমার্জিত, জুগুপ্সিত এবং ভয়ঙ্কর, তারও মাঝে দেখে সে সুন্দরকে। এই চেতনার আবেশেই শিল্পী এবং কবি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসের সন্ধান পায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে, বহিঃসৌন্দর্যের রূপরেখায় অথবা মানস-রূপের মাধুরীতে; প্রাকৃত জনগণ জুগুপ্সায় যাকে ছেড়ে যায়, অথবা জড়িয়ে ধরে বর্ণরতির আকর্ষণে, তারও সত্তার নিগূঢ় বীর্যে খোঁজে তারা সেই রসেরই আস্বাদন। সর্বত্র ইষ্টদর্শী ঈশ্বর-

প্রেমিক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বুদ্ধিজীবী, রসিক অথবা ভোগী—সাধনার ধারা পৃথক হলেও এই পথেরই সাধক সবাই। বস্তুত প্রজ্ঞা, শ্রী, আনন্দ অথবা ব্রহ্মভাবের এষণা তাদের সার্থক হবার এ ছাড়া আর পথ নাই কোনও। সর্বত্র দিব্যভাবের আরোপ হয় একান্ত দুঃসাধ্য, অথবা অনেকের কাছে অসম্ভব বা উৎকট ও জুগুপ্সিত মনে হয় এইজন্য যে, আধারের অনেকখানি আমাদের জুড়ে আছে ক্ষুদ্র অহমিকার নানা জুলুম, দেহের কিংবা মূঢ় হৃদয়ের সুখ-দুঃখের বেদনা, অথবা প্রাণবাসনার রতি-বিরতির সংঘাত ; তাদের প্রমত্ততাকে ঠেকিয়ে রাখবার বীর্য বা সামর্থ্য নাই কামপুরুষের। অবিদ্যাচ্ছন্ন মূঢ় অহমিকা ভয় পায় সাক্ষিভাবের নৈর্ব্যক্তিকতাকে জীবনসাধনার গভীরে নিয়ে যেতে, যদিও বিজ্ঞান- কি শিল্প-সাধনায় তার প্রয়োগে কুণ্ঠা নাই তার ; এমন-কি কোনও-কোনও অসিদ্ধ সাধকের জীবনে খানিকটা অভ্যস্ত হয়েও যায় এই নৈর্ব্যক্তিকতা, যদি তা বহিশ্চর জীবচেতনার যত্নলালিত বাসনার সঞ্চয়কে বা প্রাকৃত-মনের সমর্থিত কামনার তর্পণকে আঘাত না করে,—কেননা ঐ বাসনার কুণ্ডলীর 'পরেই রয়েছে ব্যবহারিক জীবনের একান্ত নির্ভর। অধ্যাত্মচেতনার অপেক্ষাকৃত নির্মুক্ত প্রকাশ যেখানে, সেখানেও প্রয়োজন হয় সমত্ববোধ ও নৈর্ব্যক্তিকতার অংশকলা, যা চেতনা ও সাধনার সেই ভূমিরই উপযোগী ; কিন্তু অহং-শাসিত ব্যবহারিক জীবনের কোনও রূপান্তর ঘটে না তাতে।···সাক্ষী-চেতনাকে নীচে নামিয়ে আনতে হলে চাই জীবনধারার আমূল পরিবর্তন, কিন্তু কামপুরুষের পক্ষে তা অসাধ্যসাধনেরই শামিল।

যে অন্তর্গূঢ় পুরুষ আমাদের জীবনসত্য ও জীবনাধার, তাঁকে বলেছি 'অধিচেতন' (subliminal)। কিন্তু একটু গোল হতে পারে কথাটা নিয়ে, কেননা সে-পুরুষের অধিষ্ঠান আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার অবরভূমিতে নয়, যদিও subliminal শব্দটির ব্যঞ্জনা সেইদিকে। মূঢ় দেহ-প্রাণ-মনের স্থূল কঞ্চুকের অন্তরালে হৃদয়ের মণিকোঠায় জ্বলছে চেতনার দীপ-কলিকা ; এই অন্তর্গূঢ় জীবচেতনাই ব্রহ্মজ্যোতির নিত্যদীপ্ত অধূমক শিখা আমাদের মধ্যে—অধ্যাত্মবোধের যে নিবিড় অচেতনা ছেয়ে আছে অপরা প্রকৃতিকে, তারও মাঝে সে জেগে আছে অম্লান, অনির্বাণ। ব্রহ্মজ্যোতি হতে জাত এই জাতবেদা, অবিদ্যার কুহরকে উদ্দ্যোতিত করে রয়েছেন শয়ান—'বর্ধমানঃ স্বে দমে'—উপচে চলেছেন আপন ঘরে এবং পরিশেষে অবিদ্যাকে বিদ্যায় করছেন রূপান্তরিত নিজের বীর্যে। ইনিই আমাদের গুহাহিত সাক্ষী

ও শাস্তা, আমাদের অন্তর্যামী, সক্রেটিসের Daemon, ভাবকের অন্তর্জ্যোতি বা অন্তশ্চারিণী দিব্যবাক্। ব্রহ্মের অনির্বাণ চিৎকণরূপে ইনিই আছেন জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের মাঝে অবিনশ্বর—মৃত্যু, ক্ষয় বা বিকার দ্বারা অপরামৃষ্ট। অজ কূটস্থ আত্মা নন তিনি যদিও, কেননা কূটস্থ পুরুষ জীবচেতনার অধিষ্ঠাতা হয়েও বিশ্বচেতনা ও অতিচেতনার সংবিতে নিত্যদীপ্ত; তবু তিনি তাঁরি প্রকৃতি-স্থ প্রতিভূ ও প্রতিরূপ—চৈত্য-পুরুষরূপে সূক্ষ্ম-অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় পুরুষের ভর্তা এবং সাক্ষী, তাদের পুষ্টি ও উপচয়ের ভোক্তা। এ তিনটি পুরুষের স্বরূপ যদিও আধারের মাঝে আবৃত, তবু তাদের একটা সাময়িক প্রতিভাস বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে গড়ে তোলে আমাদের প্রাকৃত জীবভাব; তাদের বহিরঙ্গ বৃত্তি ও স্থিতির সমাহারকে আমরা জানি নিজের স্বরূপ বলে। কিন্তু ঐ গুহাশয় অধূমক জ্যোতিই চৈত্য-পুরুষরূপে আধারে আবির্ভূত হয়ে উপক্ষিপ্ত করেন আমাদের জীব-সত্ত্বকে, জন্ম হতে জন্মান্তরে চলে যা বিপরিণাম উপচয় ও পুষ্টির ধারা বেয়ে। জন্ম হতে মরণে, আবার মরণ হতে নবজন্মে চলেছে এই 'অহদ্ মুসাফির'—প্রাকৃত কঞ্চুকের বিচিত্র সাজ বদলে বারে-বারে। মন প্রাণ ও দেহের পবেই চলে চৈত্যপুরুষের প্রথম কাজ গোপনে-গোপনে, আংশিক এবং পরোক্ষ উপায়ে,—কেননা আত্মপ্রকৃতির এই দিকটাকেই তার প্রথমে গড়ে তুলতে হয় আত্মস্ফুরণের সাধনরূপে। তাই দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণ-পরিণামের অপেক্ষায় দীর্ঘযুগ তাকে বন্দী থাকতে হয় তাদের আবেষ্টনে। কিন্তু এ-প্রতীক্ষাও ব্যর্থ হয় না তার, কেননা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষকে ব্রাহ্মী-চেতনার জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করাই তার ব্রত, অতএব অবিদ্যাভূমির সকল অনুভবেরই সারটুকু আহরণ করে তাই দিয়ে সে গড়ে তোলে চৈত্যসত্তার একটি কন্দ প্রকৃতিরই মাঝে; অনুভবের অবশেষটুকু হয় তার ভবিষ্য সাধন-সম্পত্তির উপাদান, যতদিন না দেহ-প্রাণ-মনের সকল সাধন ভাস্বর হয়ে ওঠে পরমপুরুষের দিব্য নিমিত্তরূপে। এই নিগূঢ় চৈত্য-পুরুষই আমাদের স্বধর্মের যথার্থ বেত্তা—নীতিবাদীর কল্পিত গতানুগতিক ধর্মবোধের চেয়েও সত্য এবং নিগূঢ় তাঁর প্রৈতি; কারণ এই হৃৎশয় পুরুষই আমাদের নিত্য প্রচো-দিত করছেন সত্য ঋত ও শ্রীর পানে, প্রেম ও সৌষম্যের পানে—ফুটিয়ে তুলছেন আধারের অন্তর্গূঢ় দৈবী-সম্পদ যত। যতক্ষণ পর্যন্ত দিব্য-প্রকৃতির এষণা বরিষ্ঠ না হয়ে ওঠে এই চেতনায়, ততক্ষণ সাধনার তাঁর বিরাম নাই। এই চৈত্য-পুরুষই সাধক, ঋষি ও কবি আমাদের মধ্যে। 'অর্চন্নু স্বারাজ্যং'—

স্বারাজ্যের পূর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর ইনিই 'হিরণ্যবর্ত্তনি' হয়ে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেন আত্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার পানে—পরম সত্য, পরম শিব ও পরমা শ্রী প্রীতি ও রতির পানে, উত্তীর্ণ করেন আমাদের পরম ব্যোমে, অদ্বৈতভাব-নিবিড় বিশ্বমৈত্রীর পরশমণি বুলিয়ে দেন চেতনায়। পক্ষান্তরে চৈত্য-পুরুষের ভাব অপরিণত বিকৃত এবং দুর্বল যেখানে, সেখানে হয় আধারের সূক্ষ্মতর অংশের বিকাশ হয় না, কিংবা তার সামর্থ্য ও প্রকাশ হয় কুণ্ঠিত,—যদিও বাইরে থেকে মনে হয় সাধকের মন দীপ্ত এবং ওজস্বী, হৃদয়বাসনার আবেগ প্রবল অকুণ্ঠ এবং দুর্ধর্ষ, প্রাণশক্তি সর্বজয়া, কায়-সম্পৎ সর্বতোভাবে অনুকূল এবং বাহ্যজীবনও ঐশ্বর্য আর জয়শ্রীতে ঝলমল। তখনই জীবনে শুরু হয় কাম-পুরুষের তাণ্ডব চৈত্য-পুরুষের মুখোস প'রে; তার ইঙ্গিত ও অভীপ্সা, ভাব ও আদর্শ, কামনা ও আকৃতিকে আমরা তখন ভুল বুঝি অন্তর-পুরুষের নির্দেশ এবং অধ্যাত্মজীবনের সম্পদ বলে।* গুহাহিত চৈত্য-পুরুষ যদি জীবনের পুরোধা হয়ে কাম-পুরুষকে করেন নির্জিত, প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের কঞ্চুকের আড়াল থেকে আধারকে অংশত না শাসন করে প্রকট মহিমায় নেন তার পূর্ণ প্রশাসনের ভার, তাহলে জীবনের সমস্ত অভীপ্সা আকৃতি ও আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে সত্য ঋত ও শ্রীর চিন্ময় বিগ্রহে এবং তারি ফলে সমগ্র অপরা-প্রকৃতির মোড় ফিরে যায় মানুষের পরম-পুরুষার্থের পানে,—মৃত্যু মর্ত্যভাবের চরম পরাভবে চিন্ময় জীবনের মহাবিষুবের পানে।

* Psychic শব্দটি চলতি কথায় সাধারণত বোঝায় কাম-পুরুষের বৃত্তিকে, চৈত্য-পুরুষের ধর্মকে নয়। বিশেষত শব্দটির প্রয়োগ হয় আরও শিথিল, যখন চিত্তের বিভিন্ন ভূমির নানা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে আমরা ঐ আখ্যা দিই। এ-সমস্ত ব্যাপার বাস্তবিক অধিচেতন ভূমিতে অন্তর্মন, অন্তঃপ্রাণ বা সূক্ষ্ম অন্তর্দেহের সঙ্গেই যুক্ত; চৈত্য-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে কোনও যোগ নাই তাদের। Spiritistরা এমন কথাও বলেন, বিদেহ সত্তা মূর্ত হয়, আবার অমূর্ত-ভাবে মিলিয়ে যায়—এগুলি "psychic" ঘটনা। ব্যাপারটা সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাকে চৈত্য-পুরুষের লীলা বলা উচিত হবে না; চৈত্য-সত্তার অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে কোনও আলোকও পাওয়া যাবে না তাহতে। একে বড় জোর বলা চলে অলৌকিক সূক্ষ্ম ভূত-প্রকৃতিরই একটা অসাধারণ বিভূতি; প্রাকৃত জগতে স্থূল আধারে আবির্ভূত হয়ে স্থূলকে সে নিজেরই অনুরূপ সূক্ষ্ম সত্তায় রূপান্তরিত করে, আবার তাকে রূপ দেয় স্থূল ভূতের বিগ্রহে—ব্যাপারটা আসলে এই।

## চৈত্য-পুরুষ

মনে হতে পারে, চৈত্য-পুরুষকে জীবনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্তারূপে চেতনার পুরোভাগে স্থাপন করতে পারলেই বুঝি আমাদের স্বভাবের সকল এষণা হবে চরিতার্থ, উন্মুক্ত হবে আমাদের সম্মুখে দিব্যধামের জ্যোতির দুয়ার। এমনও মনে হতে পারে, এর পর ব্রাহ্মীস্থিতিতে অথবা পূর্ণসিদ্ধির দিব্যভূমিতে উত্তীর্ণ হবার জন্য ঋত-চিৎ বা অতিমানসের উত্তরলোক হতে শক্তিপাতের আর প্রয়োজনই থাকবে না কোনও। যদিও তৈজস রূপান্তর জীবনের পূর্ণ রূপান্তর-সিদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ, তবু এতেই সাধিত হয় না আধারের সর্বোত্তম চিন্ময় পরিণাম। চৈত্য-পুরুষ প্রকৃতি-স্থ ব্যষ্টিপুরুষ বলে আধারের নিগূঢ় দিব্যবিভূতির ধারণা অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে এবং সে-অনুভবের জ্যোতির্ময় বীর্যকে স্ফুরিত করতেও পারেন তিনি চেতনায়; কিন্তু তবু আত্মার বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ মহিমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উত্তর-লোক হতে শক্তিপাতের ফলে একটা চিন্ময় রূপান্তর। অধ্যাত্মজীবনের বিশেষ-কোনও পর্বে চৈত্য-পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে সত্য-শিব-সুন্দরের একটা অন্তশ্চর্চিত-স্বাধীন লোক সৃষ্টি করে তাতেই থাকতে পারেন তৃপ্ত এবং সমাহিত: কিংবা আরও-একটু এগিয়ে, নিস্পন্দভাবে বিশ্বাত্মার পরবশ হয়ে বিশ্বের সত্য চেতনা বীর্য ও আনন্দকে গ্রহণ করতে পারেন দর্পণের মত, যদিও তাতে তাদের অখণ্ড সম্ভোগের অধিকার মিলবে না তাঁর। বিশ্বচেতনার সুনিবিড় আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে হৃদয়ে মনে ইন্দ্রিয়-চেতনায় পর্যন্ত সে-আবেশের উন্মাদনাকে অনুভব করেও শুধু মুগ্ধ বিবশতায় তাকে ধারণই করতে পারবেন তিনি, কিন্তু অকুণ্ঠ ঈশনায় সঞ্চারিত করতে পারবেন না তার প্রবেগকে বহির্জগতে। অথবা বিশ্বোত্তর ভূমিতে আত্মার স্থাণুস্বভাবে সম্যক সমাহিত হয়ে, অন্তশ্চেতনায় জগৎ হতে বিবিক্ত থেকে ব্যষ্টিভাবের পরিনির্বাণে আবার তিনি ফিরে যেতে পারেন স্বরূপের অনাদি উৎস-মূলে; সেখানে, অপরা প্রকৃতিকে দিব্য করে তোলবার যে-সাধনা ছিল তাঁর বিধাতার কাছে পাওয়া চরম দায়, তাকে সার্থক করবার কোনও সঙ্কল্প বা শক্তিও থাকবে না তাঁর। কারণ আত্মা হতে, ব্রহ্ম হতে প্রকৃতিতে ঘটেছিল চৈত্য-পুরুষের আবির্ভাব, অতএব প্রকৃতি হতে আবার তিনি ফিরেও যেতে পারেন অক্ষর-ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতায়—আত্মার পরম নৈঃশব্দ্য ও আধ্যাত্মিক স্থাণুত্বের চরম গহনে সমাহিত হয়ে! গীতার ভাষায় চৈত্য-পুরুষ দিব্য-পুরুষেরই সনাতন অংশ, সুতরাং আনন্ত্যের অতর্ক্য বিধান অনুসারে অংশ হয়েও অংশীর অবিনাভূত তিনি; এমন-

কি তাঁর প্রকৃতি-স্থ আংশিক বিভাব বিবিক্ত আত্মানুভবেরই বহির্ব্যঞ্জনা মাত্র, অতএব স্বরূপত অংশীই তিনি—অংশ হলেও। স্বরূপসত্তার এই অনুভবে শোষিত হয়ে যেতে পারে চেতনা তাঁর 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু জনু'—মহানির্বাণে ঘটতেও পারে তাঁর আপাত-প্রলয়। আবার অবিদ্যা-প্রকৃতির তমঃপুঞ্জের মাঝে একটি জ্যোতিঃকন্দ হয়েও ( এইজন্যই উপনিষদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলে বর্ণিত তিনি ), অধ্যাত্মচেতনার আপূরণে নিজকে আপ্যায়িত করে ছড়িয়ে দিতে পারেন তিনি বিশ্বময়—হৃদয়-মনের পরিব্যাপ্তিতে অনুভব করতে পারেন জগতের সাযুজ্য কিংবা তাদাত্ম্য। অথবা নিত্য-সহচরের সন্ধান পেযে তাঁর অবিচ্ছেদ সান্নিধ্য কামনা করতে পারেন তিনি—পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতি হয়ে ডুবে যেতে পারেন প্রেম-সেবোত্তরা গতির অন্তহীন মাধুরীতে; বলা বাহুল্য, সকল অধ্যাত্ম-অনুভবের মাঝে ভাব-কান্তিতে এই অনুভবই অনুত্তম। এমনি করে নানা-ভাবেই ঘটতে পারে আমাদের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার বিপুল ও লোকোত্তর সিদ্ধি; তবু এইখানেই মানুষের এষণার চরম ও পরম সার্থকতা না-ও ফুটতে পারে। সত্যভাবক হয়তো এখানে দাঁড়িয়েও বলবেন, 'এহো বাহ্য—আগে কহ আর!'

কারণ, এ-সমস্ত মানুষের অধ্যাত্ম-মনেরই সিদ্ধি। মন এদের মাঝে উন্মনী ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েও, চিদাকাশের জ্যোতিরৈশ্বর্যে ঝলমল হয়েও ছাড়িয়ে যেতে পারেনি নিজের সংস্কার। প্রাকৃত মনের এলাকাকে পেরিয়ে গেছে সে বহুদূরে—লোকোত্তরের উপান্তভূমিতে, তবু দূর হয়নি তার খণ্ডন-প্রবৃত্তি। তাই শাশ্বত সন্মাত্রের একটি বিভাবকেই সে জানছে ঐকান্তিক বলে। ভাবছে, একটি খণ্ডবিভাবেই বুঝি তাঁর অখণ্ডস্বরূপের পর্যবসান, বুঝি নিজের মাঝেই নিজে সম্পূর্ণ তাঁর প্রত্যেকটি বিভাব। অতীন্দ্রিয় অনুভবের রাজ্যেও মনের প্রচ্ছন্ন দ্বৈত-সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে বিরুদ্ধ-বিশেষণের পরম্পরা : পর্যায়ক্রমে ভেসে চলে তার কল্পনায় ব্রহ্মের নৈঃশব্দ্য এবং ব্রহ্মের শক্তি-চাঞ্চল্য, প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং মহেশ্বররূপী সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম, সত্তা এবং সম্ভূতি, দিব্য-পুরুষ এবং অপুরুষবিধ শুদ্ধ-সন্মাত্র। এই বিরোধাভাসের একটি কোটিকে প্রত্যাখ্যান করে আর-এক কোটিকে শাশ্বত স্বরূপ-সত্য জেনে নিমজ্জিত হতে পারে সে তারি মাঝে। কখনও তার কাছে পুরুষই একমাত্র তত্ত্ব, কখনও-বা অপুরুষবিধ সন্মাত্রই সত্য

শুধু; তার দৃষ্টিতে প্রেমিক কখনও নিত্যপ্রেমের ঘনবিগ্রহ কখনও-বা প্রেমিকই বস্তু, প্রেম তার অঙ্গকান্তি মাত্র; ভূতে-ভূতে কখনও দেখে সে অপুরুষবিধ সন্মাত্রের পৌরুষেয় বিভূতি, কখনও-বা অপুরুষবিধ সত্তা শাশ্বত দিব্য-পুরুষেরই একটা ভঙ্গিমাত্র তার কাছে। এমনি করে মনের একটি বাতায়নপথে অনন্ত আকাশের সীমাহীন দর্শন অকল্পনীয় সার্থকতায় যখন অভিভূত করে সাধককে, তখন ঐ একটি পথকেই পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে না ধরে সে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্ম-মনের এই সঞ্চরণের ওপারেও আছে অতিমানস ঋতচিতের লোকোত্তর অনুভব: সেখানে লুপ্ত হয়ে যায় যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আনন্ত্যের চরম ও সম্যক অনুভবে সকল খণ্ডভাব সংহত হয় এক সহস্রদল অখণ্ডের সুষমায়। একেই জানি পুরুষার্থ বলে; এইখানে থেকেই অতিমানস ঋতচিতে অধিরূঢ় হওয়া এবং শক্তিকে তার নামিয়ে আনা এই আধারে—এই তো আমাদের মর্ত্যজীবনের সাধ্যাবধি। তৈজস-রূপান্তরের পরে তাই চাই চিন্ময়-রূপান্তর এবং তারও উত্তরণ উদয়ন ও পূর্ণ সমাহরণ চাই অতিমানস রূপান্তরের সহায়ে—যার মাঝে আমাদের উত্তরায়ণের চরম সীমা।

চিন্ময় নিত্যস্থিতি আর জগন্ময় সম্ভূতি, এ-দুয়ের মাঝে শুধু অবিদ্যার ছলনায় একটা আপাত-বিরোধ দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনে। সৌষম্যের সত্যমন্ত্রে এ-বিরোধের সম্যক সমাধান করতে পারে একমাত্র অতিমানসী চিৎ-শক্তিই, যেমন বিশ্বসম্ভূতির অনেক অসামকেই রূপান্তরিত করেছে সে বৃহৎ-সামে। অবিদ্যার জগতে প্রকৃতি তার মনোময়ী প্রবৃত্তির অক্ষরূপে কল্পনা করে—অন্তরাত্মাকে নয়, তাঁরি প্রতিভূ অহন্তাকে। আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভিত্তি করেই আমরা গড়ে তুলেছি বিচিত্র অনুভব ও সম্বন্ধের একটা ব্যূহ—দ্বন্দ্ব বিরোধ ও অসঙ্গতিতে সঙ্কুল জগৎজোড়া মাত্রাস্পর্শের জটিলতার মাঝে। এই অহং-এর দুর্গপ্রাকারের আড়ালে থেকে নিজকে আমরা ঠেকিয়ে রেখেছি বিশ্ব এবং আনন্ত্যের অভিঘাত হতে। কিন্তু চিন্ময়-রূপান্তরে সে-প্রাকার ভেঙে পড়ে যখন, তখন সাধকের অহং হয় বিলুপ্ত, নুনের পুতুল গলে যায় এক নির্বিশেষ অনুভবের অকূল পাথারে, বিনাশের চোখ-ধাঁধানো আলোতে কোথায় মিলিয়ে যায় সম্ভূতির বর্ণচ্ছটা; তাই দিশাহারা চেতনা আর অবকাশ পায় না সূনৃতের ছন্দে তার বৃত্তিকে বাঁধবার। প্রায়ই তখন সাধকের আত্মচেতনা হয়ে যায় দ্বিধা-বিভক্ত—ভিতরে সে চিন্ময়, কিন্তু বাইরে প্রাকৃত। সাধকের প্রত্যক্

অনুভবে থাকে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে সমাসীন ব্রহ্মানুভবের অচল প্রতিষ্ঠা, অথচ তার পরাক্ চেতনা করে অভ্যস্ত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্তন—'অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ'; আধারে সঞ্চারিত প্রাক্তন বেগের প্রবর্তনা যন্ত্রের মতই আবর্তিত করে তাকে তত্ত্বলাভের পরেও। এই হতেই দেখা দেয় বিভিন্ন কোটির সাধক। ব্যক্তিভাবের সম্পূর্ণ প্রলয়ে অহং-তন্ত্র ভিতরে-ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়লেও বহিঃপ্রকৃতির অব্যাহত গতিতে দেখা দেয় নানা আপাত-অসঙ্গতি, যদিও সাধকের অন্তশ্চেতনা থাকে আত্মজ্যোতিতে ভাস্বর। এমনি করে সাধক কখনও হন জড়বৎ—বাইরে অসাড় এবং নিষ্ক্রিয়, বাহ্যিক পরিস্থিতি বা শক্তির বশে চালিত কিন্তু নিজে চলৎশক্তিহীন, অথচ অন্তরে 'অন্তর্জ্যোতিরন্তরারামঃ'; কখনও ভিতরে পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাইরে তিনি বালবৎ; কখনও অন্তরে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে ডুবে থেকেও বাইরে উন্মত্তবৎ, চিন্তায় ও আচরণে উচ্ছৃঙ্খল; আবার কখনও অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব ও আত্মসমাহিত হয়েও ব্যবহারে তিনি পিশাচবৎ প্রমত্ত, সংস্কারহীন। কখনও বহিঃপ্রবৃত্তিতে অন্তরের ছন্দ প্রকাশ পেলেও অভ্যস্ত অহং-এর সংবেগই হয় তার বাহন এবং উদাসীন দ্রষ্টারূপে সাধক শুধু দেখে যান সংস্কারের খেলা—প্রারব্ধক্ষয়ের প্রতীক্ষায়। তখন দিব্যানুভবের বীর্য মনকে সচল করলেও অন্তরের অনুভবের সবখানি ফোটেনা তার মাঝে—চিন্ময় স্থিতি আর মনের চলনের মাঝে সুর বাঁধা হয়নি বলে। এমন-কি অন্তর্জ্যোতির সহজ দীপ্তিও যদি হয় সাধক-জীবনের দিশারী, তবু কর্মের ছন্দে তার প্রকাশের ধারায় থাকতে পারে দেহ-প্রাণ-মনের নানা কুণ্ঠা ও অপূর্ণতার ছাপ; সে-ক্ষেত্রে সাধকের দশা হয় অযোগ্য মন্ত্রিসভার দ্বারা বিড়ম্বিত রাজার মত, কেননা অন্তরের বিজ্ঞানকে তখন রূপ দিতে হয় তার অজ্ঞানের প্রপঞ্চে। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্য-সঙ্কল্পের পরম সাযুজ্য যে অতিমানসের মাঝে, একমাত্র তারি অবতরণে আধারের অন্তরে-বাইরে ঘটতে পারে চিৎস্বরূপের পরম-সাম্যের প্রতিষ্ঠা; কেননা অজ্ঞানের প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের সৌষম্যে রূপান্তরিত করবার দিব্য সামর্থ্য আছে কেবল অতিমানসেরই।

প্রাণ ও মনের প্রাকৃত-সত্তাকে স্বরূপ-সত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত করে যেমন ঘটে তাদের চরম আপ্যায়ন, তেমনি চৈত্য-পুরুষেরও পরম অভ্যুদয় সাধিত হয় পরম-ব্রহ্মে নিহিত তাঁর দিব্য স্বরূপ-সত্যের 'সমাপত্তি' অথবা 'সমাবেশে'। উভয়-ক্ষেত্রে অতিমানসের শক্তিই দিব্য-সম্প্রয়োগের দূতী—সামরস্যের পরিপূর্ণতাকে সে-ই পর্যবসিত করে নিরঙ্কুশ তাদাত্ম্য-সঙ্গমে; কারণ, অখণ্ড-অদ্বয়

# চৈত্য-পুরুষ

সত্তার পরাবর কোটির মাঝে অতিমানসই 'অমৃতস্য সেতুঃ'। অতিমানসেই আছে অখণ্ডভাবিনী দ্যুলোকের দ্যুতি, আছে সর্বার্থসাধিকা মহাশক্তি, আছে পরমানন্দের পানে অপাবৃত জ্যোতির দুয়ার। ঐ দ্যুলোকের দ্যুতি ও শক্তি-দ্বারা সমুদ্ধৃত হয়েই চৈত্য-পুরুষ আবার সমাবিষ্ট হয় সদ্-ব্রহ্মের আনন্দ-গঙ্গোত্রীতে ; সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বকে পরাভূত ক'রে, ভয় ও জুগুপ্সার কবল হতে চিরনির্মুক্ত ক'রে দেহ-প্রাণ-মনকে, ঐ দিব্যধাম হতেই তখন মর্ত্যের মাত্রাস্পর্শকে রূপান্তরিত করে সে ব্রহ্মানন্দের বিদ্যুন্ময় শিহরনে।

## ২৪

# জড়

অন্ন ব্রহ্ম—এই বিজ্ঞানে পৌঁছলেন তিনি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।২)।

যুক্তি দিয়েও তাহলে আমরা এইটুকু বুঝেছি যে, প্রাণ নয় এমন-একটা অনির্বাচ্য স্বপ্ন-মায়া বা অসম্ভাব্য একটা অনর্থ-কল্পনা, যা ধরেছে বেদনাময় বাস্তবের রূপ; কিন্তু বস্তুত সর্ব-সৎ ব্রহ্মেরই বিপুল চিৎ-স্পন্দন সে। কোথায় প্রতিষ্ঠা তার, কী তার তত্ত্ব, তারও পেয়েছি খানিকটা পরিচয়; তাই চেয়ে আছি সেই অনাগত মাহেন্দ্রক্ষণের পানে, যখন তার অন্তর্গূঢ় মহাবীর্য চরম পরিণামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে দ্যুলোকের নন্দন-মঞ্জরীতে। কিন্তু সকল তত্ত্বের অবম একটি তত্ত্বের সম্যক আলোচনা এখনও করিনি আমরা; সে হল জড়ের তত্ত্ব, যার 'পরে প্রাণ রচেছে পাদপীঠ তার, কিংবা যার বীজ-দলকে বিদীর্ণ করে বিশ্বে নিজেকে ফুটিয়েছে সে বহুশাখ বনস্পতির মত। এই জড়তত্ত্বের 'পরেই মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া, চেতনার মনোময়-পরিণামের ফলে যদি-বা দেখা দিয়ে থাকে প্রাণের এই বাসন্ত-পুষ্পোচ্ছ্বাস; অতিমানসের উদারলোকে স্বরূপসত্যের সন্ধানে মনের যে সম্প্রসারণ ও উদয়ন, বিশ্বে উপচিত প্রাণের ঐশ্বর্য যদি হয়েও থাকে তার স্বাভাবিক পরিণতি,—তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে এই দেহের আধারে, এই মাটির বুকেই চড়ানো রয়েছে প্রাণের মূল। দেহেরও গৌরব আছে একটা, সে তো বলাই বাহুল্য। মনের জ্যোতির্ময় প্রগতিকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগী দেহ ও মস্তিষ্ক পেয়েছে কি গড়ে তুলেছে বলেই মানুষ ছাড়িয়ে গেছে পশুকে। তেমনি আবার উন্মনীলোকের জ্যোতিকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগী দিব্য দেহ কিংবা তারি অনুরূপ দৈহ্য-সাধন যদি গড়ে তুলতে পারে সে, তাহলে পৃথিবীর বুকে থেকেই নিজকে যাবে সে ছাড়িয়ে এবং শুধু অন্তরের বিবিক্ত লোকে নয়, এই প্রাকৃত জীবনেই পাবে দেব-মানবতার নিরঙ্কুশ অধিকার। তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে

হবে : বিশ্বপ্রাণের উদয়ন ব্যর্থ ব্যাহত হয়ে গেল বর্তমানের এই সান্ধ্যচেতনাতে পৌঁছেই ; তাই মর্ত্যের মানুষ সচ্চিদানন্দকে লাভ করবে শুধু আত্মবিলোপের সাধনায়—এই দেহ-প্রাণ-মনের কঞ্চুক খসিয়ে আনন্ত্যের নিরঞ্জন মহিমায় ফিরে গিয়ে। অথবা বুঝতে হবে : নারায়ণের দিব্য নিমিত্ত নয় নর ; চিন্ময়ী মহাশক্তির যে-প্রগতি পৃথিবীর আর-সকল ভূত হতে পৃথক করেছে তাকে, তারও আছে একটা নিয়তিকৃত নিয়ম ; অতএব আজ যেমন জগতের সবাইকে ছাড়িয়ে মানুষ হয়েছে পুরোধা, তেমনি একদিন তাকেও ছাড়িয়ে আর-কেউ এসে গ্রহণ করবে তার উত্তরাধিকার।

বাস্তবিক, আত্মার মুশকিল যত দেহকে নিয়ে ; দেহই চিরন্তন বাধা তার প্রগতির পথে, দেহের জুলুমই তাকে সইতে হয়েছে বরাবর। তাই অধ্যাত্মসিদ্ধির ব্যাকুল সাধক দেহকেই ধিক্কার দিয়েছে চিরকাল—সবার চাইতে এই বস্তুটির 'পরেই যেন বিতৃষ্ণা তার বিশেষ করে।...দেহের এই মৃৎভার আর বইতে পারে না সে ; এর অন্ধ সংসক্ত স্থূলতা যেন অন্তরের শ্বাস-রোধ করে আনে পলে-পলে, তাই বৈরাগ্যের উদার আকাশে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার মন। এই আপদ হতে বাঁচবার জন্যে দেহকে এবং দেহাত্মবুদ্ধির প্রতীক জগৎকে পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সে মিথ্যা বলে।...অধিকাংশ ধর্মেই জড় ধিক্কৃত, অভিশপ্ত ; তাই বৈরাগীর নেতিবাদ অথবা পার্থিবজীবনের প্রতি একটা অসহায় সাময়িক তিতিক্ষার ভাব—এই হল সত্যধর্মের এবং আধ্যাত্মিকতার কষ্টিপাথর তাদের মতে। কিন্তু প্রাচীন যুগের ধর্মে অসহিষ্ণুতা ছিল না এত ; তার মননের গভীরতা স্পর্শ করেছিল বিশ্বের মর্মসত্যকে। কলি-সন্তাপে সন্তপ্ত হয়ে সাধকের চিত্ত খিন্ন ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি তখনও, তাই দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে বিচ্ছেদও এত প্রবল হয়নি। প্রাচীন ঋষিদের কাছে দ্যুলোক যেমন পিতা, পৃথিবীও তেমনি মাতা—অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি উভয়কেই বেঁটে দিয়েছেন তাঁরা সমানভাবে। কিন্তু অতীতের বাণীর রহস্য আজ আচ্ছন্ন এবং অনবগাহ আমাদের কাছে ; সুতরাং অধ্যাত্মবাদীই হই আর জড়বাদীই হই, কৃপাণের আঘাতেই আমরা করতে চাই জীবনের গ্রন্থি-মোচন ; মর্ত্যজীবনের চরম পরিণতিকে তাই কল্পনা করি এক মহানিষ্ক্রমণ-রূপে—এখন সে-নিষ্ক্রমণ অনন্ত আনন্দ, অনন্ত বিনষ্টি বা অনন্ত নির্বাণ—যে-রূপ ধরেই আসুক না কেন।

অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের সঙ্গেই কিন্তু এই দেহ-বিতৃষ্ণা জাগে না। প্রাণের আবির্ভাব হতে এ-বিরোধের শুরু, কেননা সৃষ্টির গোড়াতেই দেখা দিয়েছে জড়ের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব। জড় যেন প্রাণ ও চেতনার মূর্ত প্রতিষেধ : প্রাণ প্রবৃত্তিতে চঞ্চল, জড় অসাড় ; প্রাণের প্রবেগ চিন্ময়, জড়ের শক্তি মূঢ়, অচেতন : প্রাণ জীববিগ্রহ গড়তে চায় সঙ্কলন-বৃত্তি দিয়ে, জড় আণবিক বিকলনে ব্যর্থ করতে চায় সে-প্রয়াস। এমনি করে জড়ের বুকে প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল আয়াস পর্যবসিত হয় আপাত-পরাভবে—প্রাণ তাই মরণ-মূর্ছায় বারবার ঢলে পড়ে জড়ের বুকে। মনের আবির্ভাবে এই দ্বন্দ্ব আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, কেননা মনের ঝগড়া প্রাণ এবং জড় দুয়েরই সঙ্গে। তাদের সঙ্কীর্ণতাকে কিছুতেই সইতে পারে না সে : জড়ের অসাড় স্থূলতা আর প্রাণের বিক্ষুব্ধ বেদনার নিত্যশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার বরাবর। এই অবিরাম সংগ্রামের ফলে মনে হয় বিজয়লক্ষ্মী ঝোঁকেন যেন মনেরই দিকে, যদিও তাঁর অপূর্ণ ও অনিশ্চিত প্রসাদের অসম্ভব মূল্য দিতে হয় তাকে। স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় দেহ আর প্রাণকে শুধু-যে জয়ই করে মন, তা নয় : প্রাণের তৃষ্ণাকে, দেহের বীর্যকে অবদমিত নিগৃহীত এমন-কি বিনষ্ট ক'রে প্রাণকে পঙ্গু ও দেহকে বিকল করতেও কুণ্ঠিত হয় না সে। মনের এই আয়াসই ধরে প্রাণের প্রতি অরতি ও দেহের প্রতি বিতৃষ্ণার রূপ—উভয়ের প্রতি জুগুপ্সায় মানুষ ছুটে যায় নিকলুষ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধর্মবোধের কল্পলোকের পানে। উন্মনীভূমির আভাস পেয়ে মানুষ এই বিরোধকে করে আরও প্রবল। তখন মন শরীব আর প্রাণ লাঞ্ছিত হয় 'ভব', দেহাত্মবোধ এবং মারের ত্রি-লাঞ্ছনে। ভব-ব্যাধির সকল নিদান মানুষ খুঁজে পায় তখন মনে। চিৎ আর অচিতের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে দেখা দেয় বলে, অচিৎ আর চিতের সাধন নয় তার কাছে ; অতএব হৃৎশয় চিন্ময় পুরুষের বিজয় সুনিশ্চিত হয় তাঁর সঙ্কীর্ণ আযতনের প্রত্যাখ্যানে, দেহ-প্রাণ-মনের নিরাকৃতিতে, স্বরূপের আনন্ত্যে তাঁর আত্মসংবরণে।...এ-জগৎ দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল ; সুতরাং তার সকল দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই দ্বন্দ্বনীতিকেই চরমে তুলে জগৎকে ছেঁটে ফেলা—অখণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা !

কিন্তু এই জয়-পরাজয় একটা আপাত-প্রতিভাস মাত্র ; এতে সমস্যার সমাধান না করে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু। বাস্তবিক জড় তো পরাভূত করতে পারেনি প্রাণকে ; এরি মাঝে জড়ের সঙ্গে রফা করেছে সে

মৃত্যুকে তার অগ্রগতির সাধন করে। মনও তেমনি সর্বজয়ী হতে পারেনি দেহ আর প্রাণকে নির্জিত করে—তার বহু নিগূঢ় সম্ভাবনাকে বন্ধ্যা করে কতক-গুলিকে সে অর্ধেক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে মাত্র; দেহ ও প্রাণের সম্যক অনুশীলনে সেসব কুঁড়ি ফুল হয়ে হয়তো ফুটত একদিন। জীব-চিৎও বিজয়ী হতে পারেনি অচিৎ-ত্রয়ীর 'পরে; শুধু তাদের দাবিকে অস্বীকার করে পিছু হটেছে সে আপন ব্রত থেকে—বিশ্বরূপ চিৎপুরুষের আদ্য প্রবর্তনার নিগূঢ় দায় থেকে। সুতরাং অচিৎকে অস্বীকার করলেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হয় না, কেননা বিশ্বনাথের প্রবর্তিত চক্র তো থেমে যায়নি আত্মোদ্বোধনের এই নেতি-সাধনাতেই এসে। বস্তুত নেতিবাদ সূচিত করে ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপনকে নয়, তার বর্জনকেই। সচ্চিদানন্দই বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত, এই আমাদের মৌলিক দর্শন হলে বিরোধকে কখনও বলতে পারি না তাঁর স্বরূপের অনাদি ও শাশ্বত তত্ত্ব। বিরোধ আছে বলেই দেখা দিয়েছে সার্বভৌম সম্যক-সমাধানের তপস্যা, জেগেছে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের আকূতি। জীবন-সমস্যার সমাধান হবে,—প্রাণ যখন সত্যি-সত্যি জড়ের 'পরে জয়ী হবে দেহকে আপন অকুণ্ঠ সৌষম্যের বাহন করে, দেহ আর প্রাণের 'পরে মনের হবে সত্য বিজয় এ-দুটিকে রূপান্তরিত করে তার আত্মপ্রকাশের স্ববশ সাধনে, এবং দেহ-প্রাণ-মনকে স্বচ্ছন্দ চিদাবেশে ভাবিত করে অচিতের 'পরে ঘোষিত হবে চিতের বিজয়; আর এই শেষের বিজয়েই সম্ভব হবে প্রাণ ও মনের তপস্যার বাস্তব সিদ্ধি। কী করে এই জয়শ্রী মূর্ত হবে আমাদের জীবনে, তারি উপায় খুঁজতে গিয়ে জানতে হবে জড়ের তত্ত্ব,—যেমন নাকি মূল-বিদ্যার এষণাতেই আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রাণ, মন ও জীব-চেতনার তত্ত্ব।

ধরতে গেলে জড় আমাদের কাছে অবাস্তব এবং অসৎ; অর্থাৎ আমা-দের বর্তমান জ্ঞান সংস্কার বা অনুভব হতে জড়ের সত্য পরিচয় আমরা পাই না। বিশ্ব জুড়ে এক সর্বময় সত্তা আছে আমাদের আয়তনরূপে, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংবিতের একটা বিশেষ সম্পর্ককে আমরা জানি জড় বলে। জড়কে শুধু শক্তির বিভূতিতে পর্যবসিত দেখে বৈজ্ঞানিক পান বিশ্বের একটা মূলতত্ত্বের সন্ধান। আবার দার্শনিক যখন দেখেন, জড় চেতনার একটা বাস্তব প্রতিভাস মাত্র এবং অখণ্ড শুদ্ধ-চিন্মাত্রই একমাত্র তত্ত্ব-বস্তু, তখন বৈজ্ঞানিকের চেয়েও পূর্ণ বৃহৎ ও নিগূঢ় সত্যকে পান তিনি হাতের মুঠোয়। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়: শক্তি কেন ধরল জড়ের রূপ, কেন রইল না সে শুধু প্রবেগের শতমুখী ধারা হয়ে?

চিৎ-স্বরূপ যিনি, তিনি কেন চিদ্-বিলাসের নিবিড় আনন্দে বিশ্রান্ত না থেকে খেলতে গেলেন এই জড়ের খেলা ? কেউ বলেন, এ-সমস্তই মনের লীলা ; আবার কারও মতে, জড়রূপের অপরোক্ষ স্থষ্টি, এমন-কি তাদের অনুভবও মনের ধর্ম নয় যখন, তখন এ-সমস্তই ইন্দ্রিয়বোধের খেলা। গ্রহণ-মন আপাত-অনুভব দ্বারা রূপ-স্থষ্টি ক'রে সামনে ধরলে গ্রহীতৃ-মন নাড়াচাড়া করে তাদের নিয়ে। কিন্তু জড় কখনও শরীরী ব্যষ্টি-মনের স্থষ্টি হতে পারে না ; ক্ষিতি-তত্ত্ব তো মানবমনের পরিণাম নয়, বরং মানবমনই যে তার পরিণাম। যদি বলি জগৎ তো আমাদেরই মনে, তাহলে সেটা হয় অতাত্ত্বিক জল্পনা শুধু ; কেননা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগেও জড়জগৎ যেমন ছিল, পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, এমন-কি অনন্তের মাঝে ব্যষ্টিমনের প্রলয় হলেও সে তেমনিই থাকবে। অতএব বাধ্য হয়ে মানতে হয়, এই মনেরই অন্তরালে আছে এক বিরাট মন *—যার বিশ্বরূপ অবচেতন এবং যার চিন্ময়-রূপ অতিচেতন আমাদের কাছে ; নিজের আধার বা আয়তনরূপে সে-ই করেছে রূপের স্থষ্টি। স্রষ্টা যখন স্বভাবত স্থষ্টির প্রাগ্‌ভাবী হয়ে ছাড়িয়ে যায় তাকে, তখন মানতে হয় এক অতিচেতন মনই তার সার্বভৌম করণশক্তির সহায়ে নিজের মাঝে ফুটিয়ে চলেছে এই রূপের মেলা জড়বিশ্বের ছন্দদোলায়। তবু এও সম্যক সমাধান নয় ; কেননা এতে জড়কে জানি শুধু চেতনার বিভূতি বলে, কিন্তু বিশ্বলীলার উপাদানরূপে কী করে হল জড়ের স্থষ্টি, তার কোনও জবাব পাই না।

একেবারে বিশ্বসত্তার মূলে গেলে হয়তো কথাটা পরিষ্কার হবে। শুদ্ধ-সন্মাত্র চিৎশক্তিরূপে ফুটিয়ে তুলছেন নিজেকে তাঁর স্পন্দবিভূতিতে ; সেই চিৎশক্তি আবার তার আত্মকৃতিকে তারি আত্মচেতনায় ফুটিয়ে তুলছে আত্ম-রূপায়ণের ছন্দে। শক্তি যখন 'একং সৎ' চিৎ-পুরুষের স্পন্দমাত্র, তখন তার

---

* প্রাকৃত মনের স্থষ্টিসামর্থ্য আপেক্ষিক, কেননা অপরের সাধনরূপেই তার স্থষ্টি। যোগাযোগ ঘটানোর শক্তি অফুরন্ত হলেও তার রূপকলার আদর্শ আসে উপর থেকে ; সমস্ত স্থষ্ট রূপের প্রতিষ্ঠা হল অনন্তের মাঝে—মন প্রাণ ও জড়ের ওপারে ; এখানে ফোটে তার নতুন-গড়া—এবং বেশীর ভাগই বিকৃত করে গড়া—একটা আভাস শুধু। ঋগ্বেদ বলেন, তারা 'ঊর্ধ্ববুধ্ন নীচীন-শাখ',—মূল তাদের উপরে, কিন্তু ডালাপালা ছড়িয়ে পড়েছে নীচের দিকে। অতিচেতন মনকে বরং বলা চলে অধিমানস ; চিৎশক্তির প্রস্তারে তার স্থান হবে অতিমানস চেতনারই সমাশ্রিত কোনও ভূমিতে।

পরিণাম তো কিছুই হতে পারে না তাঁর আত্মরূপায়ণ ছাড়া। অতএব রূপধাতু 'দ্রব্য' বা অচিৎ চিতেরই বিভূতিমাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে ফোটে এই চিদ্‌বিভূতির যে বিশেষ রূপ, তার মূলে আছে মনের খণ্ডন-বৃত্তি, যা হতে বিশ্ব-প্রতিভাসের পরিপূর্ণ ছকটি আমরা গুছিয়ে পেয়েছি। এখন জানি, প্রাণ চিৎ-শক্তিরই লীলা,--জড়রূপ তার পরিণাম। রূপের গুহায় কুণ্ডলিত প্রাণ প্রথম দেখা দেয় অচেতন শক্তিরূপে; তারপর ধীরে-ধীরে নিজেকে বিকশিত ক'রে মনের আকারে ফুটিয়ে তোলে শক্তির নিগূঢ় স্বরূপ-চেতনাকে, যা শক্তির অব্যাকৃত দশাতেও ছিল তার অবিনাভূত। আরও জানি, অতিমানস বা চিন্ময়ী মহাবিদ্যার একটি অবর-বিভূতি হল মন, এবং প্রাণ সে-অতিমানসেরই সাধন-বীর্য। অতিমানস বা চিৎ-তপসের ভিতর দিয়ে নামতে গিয়ে চিৎ-শক্তির চিৎ ফোটে মন হয়ে, আর তার শক্তি বা তপঃ ফোটে প্রাণ হয়ে। মন তার অতিমানসী স্বরূপসত্তা হতে বিচ্যুত হয়ে প্রাণকেও দেয় খণ্ডরূপ; শুধু তাই নয়, নিজেরই প্রাণ-শক্তিতে কুণ্ডলিত হয়ে বিশ্বপ্রাণে ফোটে সে অবচেতন হয়ে; তার ফলে প্রাণের জড়লীলায় জগৎ জুড়ে প্রকাশ পায় একটা অন্ধশক্তির প্রবর্তনা। অতএব জড়ের মাঝে এই-যে অচিতি অসাড়তা ও আণবিক বিকলন, তার মূলে রয়েছে বিশ্বম্ভর মনেরই বিভাজনী ও কুণ্ডলনী বৃত্তি; বিশ্বের বিসৃষ্টি হয়েছে এমনি করেই। অতিমানসের আত্ম-বিসৃষ্টির চরম সাধন যেমন মন, এবং সেই মনের কল্পিত অবিদ্যার ক্ষেত্রে চিৎ-তপসের স্পন্দনই যেমন প্রাণ, তেমনি আমাদের পরিচিত জড়ও চিৎ-সত্তার চরম স্পন্দ-পরিণাম। বিরাট মনের* নিগূঢ় ব্যাপারবশত অখণ্ড চিৎ-সত্তার মাঝে যে স্বগত-ভেদের আভাসন, তাই হল চৈতন্যের জড়-বিভূতি। ব্যষ্টি-মনের কাছে এই ভেদই দেখা দেয় একান্ত হয়ে,—কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে চিৎ, শক্তি ও অচিতের অখণ্ডভাব লুপ্ত বা ব্যাহত হয় না তা বলে।

কিন্তু অখণ্ড সন্মাত্রের কেন এই প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক খণ্ডলীলা? ...কারণ আর-কিছুই নয়; মনের মাঝে রয়েছে যে বহুধা-ভবনের সংবেগ, তার চরম কোটিতে পৌঁছতে গেলে আত্মভেদ ও আত্মবিভাজনকেই করতে হয় মুখ্য সাধন। তাই বহুভাবনার জন্যে আধার সৃষ্টি করতে সে যখন নেমে এল প্রাণের মাঝে, তখন বিশ্বগত সদাখ্য-তত্ত্বকে তার দিতে হল স্থূল জড়ধাতুর

* 'মনের' অর্থ ব্যাপক এখানে, অতএব অধিমানসের বৃত্তিও তার অন্তর্গত। অধিমানস অতিমানসী ঋত-চিতের অব্যবহিত; এখান হতেই আসে অবিদ্যা-কল্পিত সৃষ্টির আদি প্রবর্তনা।

রূপ, বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম-ধাতুর রূপ না দিয়ে। অর্থাৎ মনের আকৃতিতে সদাখ্য-তত্ত্ব ফুটল স্থাণু রূপধাতু হয়ে—বহুধা-বিচিত্র বস্তু-লীলার আধাররূপে। অরূপ-ধাতুর মত এ নয় শুদ্ধ-চেতনার শাশ্বত স্বরূপ-সত্তার আত্মগত বিভূতি মাত্র,—অথবা সূক্ষ্মস্পর্শগোচর চিন্ময় রূপায়ণের তরল ছন্দময় উপাদানও নয় এ। মনের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষে জেগে ওঠে আমরা যাকে বলি ইন্দ্রিয়বোধ; কিন্তু এখানে চাই একটা অস্পষ্ট পবাক্ বোধ, যা সন্নিকর্ষের বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে হবে নিঃসংশয়। অতএব শুদ্ধধাতুর জড়ধাতুতে অবতরণ সম্ভব হয় তখনই, যখন অতিমানসের ভিতর দিয়ে সচ্চিদানন্দ নেমে আসেন মনে ও প্রাণে বহুধা-ভবনের ঈক্ষা নিয়ে: তখন বিবিক্ত চিৎ-কেন্দ্র হতে বিষয়ের সংবেদন হয় তাঁর এই আত্মসম্ভাব অনুভবের প্রধান উপায়। বিশ্বমূল চিন্ময়তত্ত্বে অবগাহন করলে দেখি, শুদ্ধ নিরঞ্জন-ধাতুই হয়েছে স্বয়ম্ভূ বিশুদ্ধ-চিন্ময় সত্তা, আত্ম-তাদাত্ম্যের স্বয়ংপ্রভা সংবিৎ যার স্বভাব; তখনও তার মাঝে জাগেনি নিজেকে নিজের বিষয় করবার বৃত্তি। অতিমানসেরও মাঝে অক্ষুণ্ন থাকে এই আত্ম-তাদাত্ম্যের স্বগত-সংবিৎ তার আত্মবিজ্ঞানের ধাতুরূপে এবং আত্ম-বিসৃষ্টির জ্যোতিরূপে; কিন্তু ঐ বিসৃষ্টির জন্যেই শুদ্ধ-সত্তাকে নিজের কাছে উপস্থাপিত করে সে নিজেরই জ্ঞানা-শক্তির অবিনাভূত বিষয়-বিষয়ীরূপে। তখন শুদ্ধ-সত্তা হয় এক পরা-প্রজ্ঞার বিষয়, যার মাঝে আছে সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের যুগল বৃত্তি। সংজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের মাঝে দেখা—নিজের রূপে; আর প্রজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের পরিধির মাঝে দেখা নিজের বিবিক্ত অংশরূপে.—অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্তাব মর্মদৃষ্টি যে-চিৎকেন্দ্রে ফুটে উঠেছে সাক্ষী পুরুষের প্রজ্ঞানঘন বিন্দুরূপে, সেই দ্রষ্টার আসন থেকেই দেখে সে বিষয়কে। অতি-মানসের পরা-প্রজ্ঞায় আছে এই সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের দ্বিদল-চণক। আমরা দেখেছি, প্রজ্ঞান হতে শুরু হয় মনের প্রবৃত্তি, যে-প্রবৃত্তির ফলে ব্যষ্টি প্রমাতা নিজের বিরাট সত্তার বিচিত্র বিভূতিকে দর্শন করে অনাত্মরূপে। কিন্তু দিব্য-মনে—অব্যবহিত ক্ষণে অথবা বলতে গেলে যুগপৎ—জাগে আর-একটি প্রবৃত্তি কিংবা ঐ প্রবৃত্তিরই একটা বিপরীত ধারা, যা অখণ্ড সত্তার সঙ্গে যোগ-যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত করে প্রাতিভাসিক খণ্ডতার বিভ্রমকে; তাইতে ব্যষ্টি প্রমাতার জ্ঞানেও ভেদ-দর্শন ঐকান্তিক সত্য হয়ে ওঠে না মুহূর্তের তরেও। এই চিন্ময়ী যোগযুক্তিকেই বিভজ্যবৃত্তি মনের মাঝে আমরা পাই বহুধা-বিভক্ত আধার ও বিষয়ের অন্তরাতে চেতনার সন্নিকর্ষরূপে। বিভক্ত-চেতনার এই

সন্নিকর্ষ আবার আমাদের মাঝে দেখা দিয়েছে ইন্দ্রিয়বোধের আকারে, যেখানে ভেদ-প্রত্যয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অভেদের প্রত্যয় নিগূঢ় হয়ে। আমাদের গ্রহীতৃ-মনের প্রবৃত্তি দাঁড়িয়ে আছে এই ইন্দ্রিয়বোধের উপর। এর মাঝে যে তাদাত্ম্য-সন্নিকর্ষ আছে, তা খণ্ডভাবের অধীন। কিন্তু তাকেই ভিত্তি করে মন চলেছে উত্তরভূমির তাদাত্ম্যবোধের পানে, যেখানে খণ্ডভাব তাদাত্ম্যের গৌণ বিভূতি মাত্র। অতএব আমাদের নিত্যপরিচিত জড়ধাতু স্বরূপসত্তারই একটা রূপায়ণ, যার মাঝে ইন্দ্রিয়ের সহায়ে মন পায় চিন্ময় সত্তার সন্নিকর্ষ; অথচ মন স্বয়ং সেই চিৎসত্তার একটা বিজ্ঞানময় স্পন্দ।

অথচ মনের যা স্বভাব, তাতে চিৎসত্তার স্বরূপধাতুকে সে জানে এবং অনুভব করে অখণ্ড বা সমগ্রভাবে নয়, কিন্তু বিভাজন-বৃত্তির সহায়ে খণ্ড-খণ্ড করে। তাই অখণ্ড চিৎসত্তাকে দেখে সে আণবিক বিন্দুতে বিকীর্ণপ্রায় এবং ঐ অনন্তকণিকার সমুচ্চয়ে গড়ে তুলতে চায় সমগ্রতার রূপ। অগণিত প্রেক্ষাবিন্দু ও তাদের সমুচ্চয়ের মাঝে বিশ্ব-মন নিজেকে ঢেলে দিয়ে সন্নিবিষ্ট হয় তাদের অন্তরে। কিন্তু বিশ্ব-মন সদ্ভূত-বিজ্ঞানের নিমিত্ত মাত্র, অতএব তার স্বরূপ-শক্তিতে রয়েছে সিসৃক্ষার প্রবর্তনা; তাই স্বভাবের বশেই তার সমস্ত প্রত্যয়কে রূপান্তরিত করে সে প্রাণের উচ্ছলনে,—যেমন সর্ব-সৎ তাঁর সমস্ত আত্মবিভাবনাকে রূপান্তরিত করেন চিন্ময়ী সিসৃক্ষার বিচিত্র বীর্যে। এমনি করে বিশ্ব-মন বিরাটের ঐ বিচিত্র প্রেক্ষাবিন্দুকে ফুটিয়ে তোলে সহস্র-রশ্মি বিশ্বপ্রাণের সংবেগরূপে। তার প্রবর্তনায় জড়ের মাঝে ঐ বিন্দুই ধরে পরমাণুর রূপ; অথচ সে-পরমাণু নিষ্প্রাণ বা নিশ্চেতন নয়—তারও মাঝে নিগূঢ় আছে রূপকৃৎ প্রাণের লীলা, আছে মন ও সঙ্কল্পের প্রশাসন, আছে তাদের রূপসৃষ্টির প্রৈতি। এমনি করে বিশ্ব-মন গড়ে তোলে যে ভূত-পরমাণু, স্ব-ধর্মের বশে তাদেরও আবার ঘটে সমুচ্চয় এবং সমূহন। কিন্তু প্রত্যেকটি সমূহে বা পিণ্ডে নিগূঢ় থাকে রূপকৃৎ প্রাণের স্পন্দন, মন ও সঙ্কল্পের প্রচ্ছন্ন প্রৈতি এবং তাইতে তাদের মাঝে দেখা দেয় বিবিক্ত ব্যষ্টি-সত্তার একটা অবাস্তব অভিমান। শুধু তাই নয়: মনোবীজ যদি থাকে সংবৃত এবং অব্যক্ত, তাহলে তাদের মাঝে যন্ত্রমূঢ় শক্তির প্রবেগ নিয়ে ফোটে একটা অহ-মিকা, যা বহন করে নির্জ্ঞান অবরুদ্ধ অথচ দুর্ধর্ষ একটা অভিনিবেশ বা অব্যাহত আত্ম-ভাবের আকূতি; আর মন যদি হয় বিবৃত এবং সুব্যক্ত, তাহলে দেখা

দেয় একটা আত্মসচেতন মনোময় অহমিকা, যার মাঝে অভিনিবেশ জাগ্রত, প্রমুক্ত এবং আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সক্রিয়।

অতএব জড় নয় একটা অনাদি সিদ্ধসত্তা ; কিংবা একটা শাশ্বত অনাদি স্বধর্মও তার নাই। তত্ত্বদৃষ্টিতে, বিশ্ব-মনেরই প্রবৃত্তি-বিশেষ ধরেছে পরমাণুর রূপ, জড়ও সন্মাত্রেরই বিসৃষ্টি ; তার জন্য প্রয়োজন ছিল অনন্ত-স্বরূপের চরম বিভাজন অথবা অণুভাবের একটা আধার বা আদিবিন্দু। আকাশ হয়তো আছে জড়ের অস্পর্শ-নীরূপ, প্রায়-চিন্ময় আধার হয়ে, কিন্তু প্রতিভাস হিসাবে ঠিক জড়ের কোঠায় নামিয়ে আনা যায় না তাকে। দৃশ্য আণব-পিণ্ড কিংবা অদৃশ্য অথচ ব্যাকৃত পরমাণুকে ভেঙে অতিপরমাণুও করা যায় যদি, এমন-কি সত্তার অণিষ্ঠ রজঃকণাতেও পরিণত করা যায় তাকে, তবু রূপকৃৎ প্রাণ ও মনের স্বধর্মবশেই আমরা পাব আণবিক সত্তারই একটা চরম কল্প। হয়তো স্থিতিধর্মী নয় সে, কিন্তু তবু তার প্রাতিভাসিক ধর্ম হবে শাশ্বত শক্তি-স্পন্দনের মাঝে ক্ষণে-ক্ষণে একটা আকার দেওয়া নিজকে ; সে যে অণুভাব-শূন্য একটা নির্ধর্মক শুদ্ধ ব্যাপ্তি বা অবকাশ মাত্র, এ-কল্পনা তখনও অচল। শুদ্ধ-ধাতু বা দ্রব্য-সত্তার অণুভাব-বর্জিত অবকাশধর্ম—যার মাঝে নাই কোনও সমূহনের ব্যাপার, সহভাবের অসঙ্কীর্ণ প্রত্যয় থাকলেও যার মাঝে নাই অন্তহীন দেশে অগণিত বস্তু-সংস্থানের কল্পনা : এমন-একটা তত্ত্বকে বলা যায় শুদ্ধ সন্মাত্রেরই বিভাব, তার নিরুপাধিক দ্রব্য-রূপ। কিন্তু এই ধর্মিভাব-শূন্য সত্তার বিজ্ঞান আছে অতিমানসেই—তারি স্পন্দলীলার বাহনরূপে ; তাকে বিভাজক মনের সিসৃক্ষার সাধনরূপে কল্পনা করা যায় না কিছুতেই, যদিও মনঃ-প্রবৃত্তির অন্তরালে জেগে থাকতেও পারে তার চেতনা। জড়ের অতিগূঢ় স্বরূপতত্ত্ব সে-ই, যদিও যে-প্রতিভাসকে আমরা বলি জড়, সে কিন্তু তা নয়। মন প্রাণ জড় একাত্মক হয়ে যেতে পারে ঐ শুদ্ধ সন্মাত্র এবং চিন্ময় অবকাশের সঙ্গে তাদের স্বাণুস্বভাবের স্বরূপ-জ্ঞানে, কিন্তু সে-আত্মপ্রত্যয়কে ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে আনা তাদের স্পন্দলীলায়, আত্মানুভবে ও আত্মরূপায়ণে—এ তখনও সম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের কাছে এই দাঁড়াল জড়ের তত্ত্ব : শুদ্ধ-সন্মাত্রে আছে যে অন্তশ্চিন্ময় আত্মপ্রসারণের সহজ ধর্ম, বিশ্বলীলায় তাই ফোটে আধার-ধাতু বা চিদ্বিলাসরূপে ; এবং বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের সিসৃক্ষার সংবেগে তাই দেখা দেয় আণবিক বিভাজন ও সমূহনের আকারে ;—আমরা তাকেই জানি

জড় বলে। কিন্তু প্রাণ ও মনের মত এই জড়ও শুদ্ধ-সন্মাত্র বা ব্রহ্মভূত—অতএব আত্ম-বিসৃষ্টির আবেগে স্পন্দমান। এ-ও চিৎপুরুষের শক্তির একটা বিভূতি—মন যাকে দিয়েছে ভাবরূপ এবং প্রাণ দিয়েছে বস্তুরূপ। তার স্বরূপ-তত্ত্ব নিজেরই মাঝে নিগূঢ় হয়ে আছে চেতনারূপে ; সে-চেতনা সংবৃত, আত্ম-রূপায়ণের লীলায় পূর্ণগ্রস্ত অতএব আত্মবিস্মৃত। যতই মূঢ়, যতই বোধহীন বলে মনে করি জড়কে, তবুও তার মাঝে সংবৃত হয়ে আছে যে-চেতনা, তার নিগূঢ় অনুভবে সে কিন্তু সন্মাত্রেরই রসোল্লাস : ইন্দ্রিয়-সংবিতের বিষয়রূপে নিজকে ধরছে সে নিগূঢ় চেতনার কাছে—অন্তর্গূঢ় তার দিব্যভাবকে ফুটিয়ে তুলতে প্রকটলীলায়। সত্তাকে জড়ের মাঝে ফুটতে দেখছি রূপধাতু হয়ে, দেখছি সন্ধিনী-শক্তির রূপায়ণ নিগূঢ় আত্মচেতনার আত্ম-ব্যাকৃতিরূপে,—দেখছি আনন্দ নিজের চেতনার কাছে নিজেকেই ধরছে সেখানে নিবেদনের ডালি করে ; তাই জড়কেও সৎ-চিৎ-আনন্দ না বলে কী বলব আর? অতএব 'অন্নং ব্রহ্ম ;'—তাঁর মনোময় অনুভবে জড় ফুটেছে তাঁরি পরাক্ জ্ঞান ক্রিয়া ও আনন্দের রূপময় আয়তন হয়ে।

২৫

# জড়ের গ্রন্থি

পারছি না আমি যেতে নিজের জোরে বা দ্বৈত নিয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষের ঋতের মাঝে।...কারা অনৃতের প্রতিষ্ঠাকে রেখেছে আগলে? কারা আছে অসতী বাণীর রক্ষক হয়ে?

—ঋগ্বেদ (৫।১২।২,৪)

ছিল না অসৎ, না ছিল সৎ তখন, না ছিল অন্তরিক্ষ—না ব্যোম, না তারও পরে যা। কিসে ছিল ঢেকে সব? কোথায় ছিল? কার শরণে? কী ছিল সে অম্ভোধি—গহন গভীর? না ছিল মৃত্যু, না অমৃত তখন, না ছিল রাত্রি বা দিনের প্রচেতনা। নিবাত নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন স্বধার বীর্যে সেই এক; তারও পরে ছিল না তো আর-কিছুই। আঁধার ছিল আঁধারে নিগূঢ় হয়ে সবার আগে, অপ্রকেত সলিল ছিল এই যা-কিছু সব। তুচ্ছ্য দিয়ে বিশ্ব-ভূ ঢাকা যখন ছিল, তপের মহিমায় তখন আবির্ভূত হলেন সেই এক। সেই এক প্রথম করলেন বিচরণ কাম হয়ে—যা ছিল মনেরই আদিবীজ। সতের বাঁধুনিকে অসতে পেলেন নিবিড়ভাবে কবিরা—দিয়ে হৃদয়ের এষণা আর মনীষা। তির্যক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রশ্মি এঁদের; কিন্তু নীচে ছিল কী? উপরেই-বা ছিল কী? ছিল রেতোধা যারা, ছিল মহিমারা; স্বধা ছিল নীচে, আর প্রযতি ছিল উপরে।

—ঋগ্বেদ (১০।১২৯।১-৫)

যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, সে যদি সত্য হয় (যে-তথ্যের আশ্রয়ে গবেষণা চলছে, তা হতে অন্য-কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভবও নয়), তাহলে ব্যবহারের প্রয়োজনে এবং চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশে চিৎ ও জড়ের মাঝে যে তীক্ষ্ণ বিরোধের সৃষ্টি করেছে মন, তার স্বতঃসিদ্ধ কোনও বাস্তবতা থাকে না আর। এ-জগৎ অন্তহীন বৈচিত্র্যে লীলায়িত এক অখণ্ড চেতনার বিলাস—শুধু শাশ্বত অসামের মাঝে বিকল সুরসাধনার অবিরাম প্রয়াস নয়, অথবা অনপনেয় বিরোধের একটা চিরন্তন সংঘাত নয়। অন্তহীন বৈচিত্র্যে উৎসারিত এক অব্যভিচরিত অখণ্ড-ভাব—এই তার আদি ও প্রতিষ্ঠা। তারপর আপাতিক সংঘাত ও খণ্ডভাবের

অন্তরালে, সমন্বয়ের নিরন্তর প্রয়াসে সমস্ত অনৈক্যকে গেঁথে তোলা এক মহতী সম্ভাবনার জন্ম দিতে—এই তার মধ্যপর্বের সত্য পরিচয়। এই মধ্যলীলার মাঝে নিগূঢ় হয়ে আছে এক অখণ্ড কবি-ক্রতুর অকুণ্ঠিত ঈশনা, যার সিদ্ধবীর্য একদিন পূর্ণোন্মেষিত হয়ে ফোটাবে বিশ্বজিৎ সৌষম্যের বিকচ কমল : সেই হবে বিশ্বলীলার অন্ত্যপর্ব। রূপ-ধাতু এই চিৎ-শক্তিরই আত্মবিভূতি—তার এক কোটি জড়, আর-এক কোটি চিৎ। দুয়ে বস্তুত ভেদ নাই কোনও : আমরা যাকে অনুভব করি জড় বলে, তার সত্ত্ব ও তত্ত্ব হল চিৎ; আর আমাদের অনুভবে যা চিৎ, তারি রূপ ও কায়া হল জড়।

অবশ্য ব্যবহারদশায় চিৎ আর জড়ের মাঝে আছে প্রকাণ্ড একটা ফাঁক এবং তারি 'পরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার পর্বে-পর্বে জগতীর ক্রমোদয়। পূর্বেই বলেছি, চিৎ-সত্তা যখন ইন্দ্রিয়ের কাছে নিজকে উপস্থাপিত করে বিষয়রূপে, তখনই সে ধরে রূপধাতু বা দ্রব্যের আকার; যে-কোনও ধরনের ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকে ভিত্তি করে প্রবর্তিত হবে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি এবং বিশ্ব-প্রগতির লীলায়ন, এই হল তার প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে জগদ্ব্যাপারের আছে একটি মাত্র আধার, ইন্দ্রিয় এবং রূপধাতুর মাঝে সন্নিকর্ষের একটি অনাদি-অব্যয় রীতিই আছে শুধু,—এমন-কোনও নিয়ম নাই। বরং করণ-শক্তিরও আছে ক্রমসূক্ষ্ম রূপ, আছে ক্রমবিকাশের পরম্পরা। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় যাকে জানে জড়-ধাতু বলে, তারও চেয়ে বহুগুণ সূক্ষ্ম সুনম্য ও সাবলীল এমন রূপধাতুও আছে, শুদ্ধ-মন যার পরিমণ্ডলে বিচরণ করে স্বভাবের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। যখন দেখি, একটা সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলে ভেসে উঠছে মনোময় রূপ, চলছে মনের সূক্ষ্ম লীলায়ন,—তখন সূক্ষ্ম মনোধাতুও যে আছে, তার পাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তেমনি জানি, এমন প্রাণধাতুও আছে, বিশুদ্ধ প্রাণস্পন্দের যা বাহন—সূক্ষ্মতম জড়ধাতু এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তিপ্রবেগের চেয়েও যার লীলা সূক্ষ্মতর। চিৎকেও তেমনি বলতে পারি সন্মাত্রেরই শুদ্ধধাতু—কিন্তু রূপধাতুর মত অন্নময় প্রাণময় অথবা মনোময় করণ-শক্তির গ্রাহ্য নয় সে; এক শুদ্ধ চিন্ময় লোকোত্তর প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের জ্যোতিতে ভাসে তার রূপ, যেখানে অলৌকিক অনুব্যবসায়ের ফলে বিষয়ী নিজেই হয় নিজের বিষয়; অর্থাৎ যেখানে, দেশ-কালের অতীত যিনি, নিজেকে তিনি জানেন বিশুদ্ধচিন্ময় আত্মপ্রসারণের প্রত্যক্-কল্পনে—সর্বভূতের আদি নিমিত্ত ও উপাদানরূপে। এই হল বিশ্বের 'সন্মূল, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠা'—তার

ওপারে একাত্মপ্রত্যয়সার পরমচেতনায় তলিয়ে গেছে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ-প্রত্যয়—রূপ- বা অরূপ- কোনও ধাতুর কথাই আর ওঠে না সেখানে।

অতএব এক চিন্ময় (মনোময় নয়) ভেদ-কল্পন হতে নেমে এসেছে চিৎ হতে জড় পর্যন্ত একটি ধারা মনের ভিতর দিয়ে; আবার তেমনি জড় হতে মনের ভিতর দিয়েই চিৎ পর্যন্ত চলেছে সে-ধারার উত্তরায়ণ। কিন্তু এই বিকল্পনেও অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপহানি ঘটে না কখনও; সম্যক-দর্শনে যখন ফোটে বিশ্বের অনাদি তত্ত্বরূপ, তখন দেখি জড়ের তমোঘন স্থূল বিবর্তনের মাঝেও পরমার্থসতের অদ্বয় মহিমা রয়েছে তেমনি অপ্রচ্যুত এবং অবিকৃত। ব্রহ্ম বিশ্বের বিধৃতি ও অন্তর্যামী নিমিত্তই নন শুধু, তিনি তার উপাদানও; বরং তিনিই তার একমাত্র উপাদান। বেদান্তের ভাষায় এ-জগতের 'অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান' তিনি। তাই 'অন্নং ব্রহ্ম'—ধর্মে ও স্বরূপে অন্ন বা জড় ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নয় কখনও। সৃষ্টি-বিকল্পনে জড় যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত চিৎ হতে, তাহলে অবশ্য এই অভেদভাব সিদ্ধ হত না; কিন্তু দেখেছি, জড় ব্রহ্ম-সত্তারই অন্ত্যা পরাক্-বিভূতি—তাকে আবৃত করে ব্রহ্ম অখণ্ড স্বরূপে অন্তঃসূত তার মাঝে। এ-জগতের অসাড় ও আপাতমূঢ় জড়ের মাঝেও সর্বদেশে সর্বকালে অন্তঃসংজ্ঞ হয়ে আছে এক বিপুল প্রাণশক্তির আলোড়ন; প্রাণশক্তির আপাত-অচেতন আন্দোলনের মাঝে অনুস্যূত রয়েছে এক নিত্যস্পন্দিত অব্যক্ত মনের লীলা, যার নিগূঢ় প্রবৃত্তিই ব্যক্ত হয়েছে প্রাণের বিচ্ছুরণে; আবার জীবদেহে অধিষ্ঠিত অবিদ্যাচ্ছন্ন অনিশ্চিতবৃত্তি অভাস্বর মনের পিছনে রয়েছে তারি আত্ম-স্বরূপ অতিমানসের অটুট আশ্রয় এবং অকুণ্ঠ শাসন; এমন-কি এখনও মনোময় হয়ে ওঠেনি যে-জড়, তারও অন্তরে আছে অতিমানসের আবেশ। এমনি করে ব্রহ্মই আছেন নিখিল বিশ্বকে জারিত করে, কেননা জড় প্রাণ মন অতি-মানস সমস্তই শাশ্বত চিদ্রূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বৈভব মাত্র। তাদের মাঝে শুধু নিবিষ্ট নন তিনি—তিনিই হয়েছেন এই সব, অথচ এর কোনটিই নয় তাঁর 'পরা কাষ্ঠা'।

সবই এক,—তবু আছে কল্পনায় ভেদ এবং ব্যবহারে পার্থক্য। তাই জড় যদিও বস্তুত বিচ্ছিন্ন নয় চিৎ হতে, তবু ব্যবহারদশায় বিচ্ছেদের রেখাটা এতই উগ্রভাবে স্পষ্ট যে ভেদ সেখানে ফুটেছে বিপরীত ধর্ম হয়ে একে-বারে! জড়াশ্রয়ী জীবনকে তাই মনে হয় অধ্যাত্মজীবনের একান্ত-প্রতিষেধ বলে। এইজন্য জড়কে বেমালুম ছেঁটে ফেললেই সকল হাঙ্গামা অনায়াসে

ঢুকে যায়—এই অনেকের মত। কথাটা সত্য ; কিন্তু অনায়াসেই হোক আর আয়াসেই হোক, হাঙ্গামা ঢোকানোটাই তো সমস্যার সমাধান নয়। তবু জড়ই যে সকল সঙ্কটের মূল, তা অনস্বীকার্য ; বাস্তবিক জড়ের বাধাই তো ডেকে আনে আর-যত পথের বাধা। জড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই প্রাণ স্থূল সঙ্কুচিত পীড়াগ্রস্ত মৃত্যুলাঞ্ছিত ; মন অন্ধপ্রায়—ডানা ছেঁটে শিকল-পায় দাঁড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে—মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দবিহারের স্বপ্ন থাকলেও সাধ্য তার নাই! অতএব অধ্যাত্মপথের নিষ্ঠাবান যাত্রী যদি জড়ের পঙ্কিলতায় কুঞ্চিত-নাসিক হন, প্রাণের জান্তব স্থূলতাকে মনে করেন বীভৎস, অথবা নিজের মাঝে কুণ্ডলী-পাকানো মনের শুধু ভাগাড়ের-দিকে-দৃষ্টিতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, এবং অবশেষে সকল জঞ্জাল সবলে ছুঁড়ে ফেলে নিষ্ক্রিয় নৈঃশব্দ্যের সাধনায় ফিরে যেতে চান চিৎস্বরূপের অচলপ্রতিষ্ঠ কৈবল্যে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে কি—তাঁরি দিক থেকে বিচার করে? কিন্তু তাঁর এই কৈবল্য-দর্শনই তো একমাত্র দর্শন নয় ; অথবা বহু সিদ্ধ মহামানবের হিরণ্য-দ্যুতিতে এ-দর্শন আলোকিত বলেই তো মনে করতে পারি না সর্বতোভদ্র সম্যক বিজ্ঞানের এ-ই চরম রূপ। অতএব বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের উত্তাপ হতে মনকে মুক্ত করে আমাদের দেখা উচিত, বিশ্বের এই দেব-হিত বিধানের কী তাৎপর্য। জড়ের দুর্মোচন গ্রন্থি চিৎকে যদি নিরাকৃত করেই থাকে, তাহলেও তার প্রত্যেকটি সূত্রকে ধৈর্যসহকারে পৃথক করেই আমাদের খুঁজতে হবে গ্রন্থিমোচনের উপায়—উগ্র আঘাতে গ্রন্থিচ্ছেদন করলেই হবে না সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। কোথায় সঙ্কট, কোথায় বিরোধ, আগে চাই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ ; প্রয়োজন হলে বাধাকে লঘু না করে বরং বাড়িয়ে দেখেই খুঁজতে হবে তার উত্তরণের উপায়।

জড়ের সঙ্গে চিতের গোড়াকার বিরোধ এই : বলতে গেলে জড় অবিদ্যার ঘনবিগ্রহ ; জড়ের মাঝে চিৎ আত্মবিস্মৃত, নিজকে হারিয়ে ফেলেছে সে নিজেরই কর্মজালে—গভীর অভিনিবেশে মানুষ যেমন শুধু-যে নিজের কথাই ভুলে যায় তা নয়, নিজের সত্তাকে পর্যন্ত ভুলে ক্ষণেকের জন্য এক হয়ে যায় ক্রিয়মাণ কর্ম আর কৃতি-শক্তির সঙ্গে। চিৎ-বস্তু স্বয়ংজ্যোতি, নিখিল শক্তিলীলার পিছনে নিত্যজাগ্রত তাঁর আত্মসংবিৎ ও অকুণ্ঠ ঈশনা ; কিন্তু জড়ের মাঝে তিনি বিলুপ্ত,—তিনি যেন অসৎ। কোথাও তাঁর অস্তিত্ব থাকলেও এখানে রেখে গেছেন তিনি একটা অচেতন অন্ধশক্তির মূঢ়তা শুধু—যে-শক্তি

গড়ছে-ভাঙছে অনন্তকাল ধরে, কিন্তু জানেনা কে সে, কী গড়ছে, কেন গড়ছে, ভাঙছে কেনই-বা গড়ল যাকে! কিছুই সে জানে না, কেননা তার মন নাই; কোনও দরদও নাই তার, কেননা তার যে হৃদয়ও নাই। হয়তো জড়বিশ্বের এ-পরিচয় সত্য নয়, এই মিথ্যা প্রতিভাসের পিছনে কোথাও হয়তো আছে মন, সঙ্কল্প কি তারও চেয়ে বৃহৎ একটা তত্ত্ব;—তবু অচিতির অমানিশা হতে জেগেছে যে চেতনার খদ্যোতিকা, তার কাছে সত্য শুধু জড়-বিশ্বের এই তামসী মূর্তি। জড়প্রকৃতির এ-মূর্তি মিথ্যা হলেও এ-মিথ্যার মত মর্মা-ন্তিক সত্য বুঝি আর নাই;—কেননা এই মিথ্যাই আমাদের প্রাকৃত-জীবনের নিয়ন্তা, এরি নাগপাশে বাঁধা আমাদের সকল অভীপ্সা এবং সাধনা।

এই তো আমাদের করাল নিয়তি, জড়-বিশ্বের এই তো নির্মম রুদ্রলীলা: কী করে ঐ নির্মন হতে জাগে এক বিরাট মন, অথবা অগণিত ব্যষ্টি-মনের স্ফুলিঙ্গ—আলোকের কাঙাল আকৃতি নিয়ে? কী অসহায় তারা একা-একা! আত্মরক্ষার প্রয়াসে ব্যষ্টির ক্ষীণদীপ্তিকে সমবেত ও সংহত করে তাদের সে-অসহায়ভাব কতকটা কাটে হয়তো; কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিপুল অবিদ্যার অন্ধ-তমিস্রাকে কতটুকু আলোকিত করতে পারে তারা? এই হৃদয়হীনা অচিতির গহন হতে তারি কঠোর নিয়ন্ত্রণ মেনে জন্মেছে কত আকৃতি-ভরা হৃদয়—নিপীড়িত রক্তাক্ত তারা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অন্ধ নিশ্চেতন নির্মমতার ভয়াল নিষ্পেষণে, যে-নির্মমতা তাদেরই চেতনার স্পর্শে সচেতন হয়ে ধরে নৃশংস হিংস্রতার আতঙ্ক-কর রূপ!... কিন্তু এই বিভীষিকার অন্তরাল হতে উঁকি দেয় কোন্ রহস্যের প্রচ্ছন্ন আভাস? বুঝি আত্মহারা চিতিশক্তিই এমনি করে আবার ফিরে পেতে চায় নিজেকে: বিপুল আত্মবিস্মৃতির গহন হতে উন্মেষ তার—ধীরে ধীরে, বেদনায় বিপ্লুত হয়ে—প্রাণের জ্যোতিরূপে; প্রথম দেখা দিল তার মাঝে বোধের স্তিমিত সম্ভাবনা; তারপর সে-বোধ অর্ধস্ফুট—অনতিস্ফুট—পূর্ণ-স্ফুট হয়ে অবশেষে চাইল প্রাকৃত সংবিতের সীমা লঙ্ঘন করে দিব্য আত্মসংবিতে প্রভাস্বর হয়ে উঠতে—উল্লসিত হতে অনন্ত অমৃতের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে। কিন্তু জড়ের প্রতীপ শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার প্রচেতনার অভিযান, তাই অবিদ্যার নাগপাশকে ক্ষণে-ক্ষণে শিথিল করে পথ চলতে হয় তার। অথচ এই মূঢ় স্বতঃখণ্ডিত জড়শক্তিই রচে তার পথ ও সাধন; তারি জন্যে প্রতি পদে অবিদ্যা ও সঙ্কোচের কুণ্ঠায় ব্যাহত হয় তার সাধনা।

# জড়ের গ্রন্থি

চিৎ আর জড়ে এই আর-একটা মৌলিক ভেদ : জড়ের মাঝে একেবারে চরমে পৌঁছেছে পরবশ যন্ত্রের মূঢ়তা ; তাই এতটুকু মুক্তির আকাঙক্ষা জাগে যেখানে, সেখানেই সে এনে হাজির করে পর্বতপ্রমাণ তামসিকতা। জড় যে স্বরূপত অসাড় ও নিস্পন্দ, তা নয় ; বরং তার মাঝে আছে অন্তহীন স্পন্দ, অকল্প্য শক্তি, নিরন্ত কর্মের নির্ঝর—তার স্পন্দলীলার বৈপুল্যে বিস্ময়-মুগ্ধ আমরা। কিন্তু চিৎ স্ব-তন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ, আত্মকৃতির বশ না হয়ে নিয়ন্তা তার, বিধি-তন্ত্রিত না হয়ে নিজেই বিধির বিধাতা ; আর এই জড়-দানব বাঁধা পড়েছে যন্ত্রমূঢ় নিয়মের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। নিয়মের কঠিন শাসন কে চাপাল তার 'পরে, তা সে জানে না ; অকল্পিত বলেই এ তার কাছে দুর্বোধ, তবু এর অন্ধ অনুবর্তন করে চলেছে সে যন্ত্রেরই মত ; যন্ত্রের মত সে-ও জানেনা, কী উপায়ে কে গড়েছে তাকে, কিসের জন্যে। এই যান্ত্রিকতার মাঝে প্রাণ জাগে যখন, স্থূল রূপ ও জড়শক্তির 'পরে নিজকে আরোপিত ক'রে স্বচ্ছন্দে প্রয়োজনের দাবি খাটাতে চায় সবার 'পরে ; মন জেগে যখন জানতে চায় নিজের ও সবার স্বরূপ নিদান ও স্বধর্ম এবং লব্ধজ্ঞানের সহায়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বতঃক্রিয়ার প্রবেগকে সঞ্চারিত করতে চায় সবার মধ্যে ; তখন জড়-প্রকৃতিও খানিকটা ধস্তাধস্তির পর অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রাণ ও মনের শাসন মেনে চলে কিছুদূর পর্যন্ত, এমন-কি তাদের সমর্থক ও সহায়ও হয় যেন। কিন্তু তার পরেই জড়ের মাঝে দেখা দেয় একটা প্রতিক্রিয়া, প্রগতিবিরোধী তামসিক নাস্তিক্যের একটা দুরাগ্রহ ; এমন-কি, প্রাণ ও মনের অগ্রসর অভিযান যে অসম্ভব, তাদের অপূর্ণ সাধনা যে কখনও উত্তীর্ণ হবে না সিদ্ধির চরমে—এমন একটা ক্লৈব্যের বোধও এনে দেয় সে তাদের মাঝে। প্রাণ চায় প্রসার, চায় আয়ু—এবং তা পায়ও সে ; কিন্তু তার মাঝে বিশ্বব্যাপ্তি ও অমৃতের পিপাসা জাগে যখন, তখন জড়ের লৌহমুষ্টি এসে করে তার কণ্ঠরোধ, সঙ্কীর্ণতা ও মৃত্যুর নিষ্পেষণে পঙ্গু হয় তার সকল সাধনা। মন চায় প্রাণের দোসর হতে, চায় তার সর্বজ্ঞান ও সর্বজ্যোতির নন্দন-কল্পনাকে সার্থক করতে ; সত্য প্রেম ও আনন্দের নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সে হতে চায় সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ;—কিন্তু প্রমাদে ভ্রান্তিতে তামসী প্রবৃত্তির স্থূল হস্তাবলেপে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আড়ষ্টতা ও নাস্তিক্যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে তার সকল কল্পনা। চিরকাল তাই ভ্রান্তি জড়িয়ে থাকে তার জ্ঞানের সঙ্গে, আঁধার হয় তার আলোর পটভূমি ও নিত্যসহচর ; সত্যের এষণা তার সার্থক হলেও হাতের মুঠোয় এসে সে-সত্যের রং যায় বদলে—

তখন আবার তাকে নতুন করে ছুটতে হয় তার সন্ধানে। প্রেম আছে, কিন্তু নাই তার তর্পণ; আছে আনন্দ, নাই তার সার্থকতা; দুয়েরই সাথে বেড়ি হয়ে ছায়া হয়ে জড়িয়ে আছে তাদের প্রতিপক্ষ যত—ক্রোধ বিদ্বেষ ও উপেক্ষা-রূপে, দুঃখ শোক ও নির্বেদের আকারে। প্রাণ ও মনের আকুল আকূতিতেও টলতে চায় না জড়ের অসাড় মূঢ়তা, তাই অবিদ্যা আর তার প্রমত্ত তামসী-শক্তিও যেন পরাভব মানতে চায় না কিছুতেই।

কেন এমন হয় খুঁজতে গিয়ে দেখি, এই তামসী বাধার বীর্য নিহিত আছে জড়ের তৃতীয় ধর্মে: খণ্ডভাব আর সংঘাত একেবারে চরমে উঠেছে জড়ের মাঝে, চিতের সঙ্গে এই তৃতীয় দফা মৌলিক বিরোধ তার। জড়-প্রকৃতি তত্ত্বত একটা অখণ্ড সত্তা হলেও খণ্ডভাবই তার সকল ক্রিয়ার আশ্রয়, তাকে ছেড়ে একচুল এদিক-ওদিক যাবার হুকুম নাই তার। কারণ অবযবের সঙ্কলন, অথবা অন্যোন্যগ্রাস দ্বারা অবয়বের সমানয়ন, এই দুটি হল তার অবয়ব-যোজনার মুখ্য কৌশল; কিন্তু খণ্ডভাবের শাশ্বত লীলা দুয়েরই মাঝে সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে একত্বের সাধনার চেয়ে সংযোজনের সাধনা বড় বলে স্বভাবতই সেখানে আছে বিযোজনের নিত্য সম্ভাবনা এবং তারি দরুন চরম প্রধ্বংসের অনিবার্যতা। দুটি কৌশলই মৃত্যুশাসিত; একটিতে মৃত্যু জীবনের সাধন, আর-একটিতে তার নিমিত্ত-পরিবেশ। উভয়ত্র, বিভক্ত অবয়বের অন্যোন্যসংঘাতের 'পরে নির্ভর করছে জগতের অস্তিত্ব: প্রত্যেকটি অবয়ব নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজছে যেমন, তেমনি চাইছে নিজের পরিমণ্ডলকে বজায় রাখতে, বাধাকে আয়ত্তে আনতে কি ধ্বংস করতে, অপরকে আহরণ করে কবলিত করতে অন্নরূপে; অথচ নিজে সে বিদ্রোহ করবে, এড়িয়ে যেতে চাইবে সকল জুলুম, ধ্বংসের সম্ভাবনাকে করবে না স্বীকার, অপরের অন্ন হতে চাইবে না কিছুতেই। প্রাণ জড়ের মাঝে নিজকে স্ফুরিত করতে গিয়ে এই খণ্ড-ভাবের সংঘাতকে পায় তার সকল প্রবৃত্তির পীঠরূপে; তাই এর জুলুমকে না মেনে উপায় থাকে না তার। বাধ্য হয়ে তাকে তখন স্বীকার করতে হয় মৃত্যু কামনা ও সঙ্কোচের শাসন; প্রাণের প্রথম অঙ্ক তাই সঙ্কুল হয়ে ওঠে বুভুক্ষা লিপ্সা ও জিগীষার অবিরাম প্রমত্ততায়। তেমনি, মন ফোটে যখন জড়ের মাঝে, তখন তাকেও স্বীকার করতে হয় ঐ মাটির ছাঁচ আর মাটির মালমশলার মূঢ় সঙ্কোচ; তাই তার চাওয়া কখনও সার্থক হয় না নিশ্চিত পাওয়াতে,—তার সকল সঞ্চয়নে, কাজের সকল খুঁটি-নাটিতে চলে ঐ ভাঙা-গড়ার নিত্য সংঘাত। এইজন্যই মনোময় মানুষের

# জড়ের গ্রন্থি

জ্ঞানের সঞ্চয় চরম নৈশ্চিত্যে নিঃসংশয় হয় না কখনও ; ঘাত-প্রতিঘাত আর ভাঙাগড়ার হিন্দোলাতে দুলবে তার সাধনা যত—এই বুঝি নিয়তি তার। সৃষ্টির ক্ষণিক পুষ্টি তলিয়ে যাবে বিনষ্টিতে, কোথাও থাকবে না ধ্রুব প্রগতির নিশানা—এই মায়ার খেলাই চলবে তার জীবনের রঙ্গমঞ্চে বারে-বারে।

জড়প্রকৃতির অবিদ্যা অসাড়তা ও খণ্ডভাব তার ঐ মূঢ় খণ্ডিত তামসী স্থিতির দুরাগ্রহে উন্মিষৎ প্রাণ ও মনের পরে চাপায় দুঃখ-সন্তাপ ও অতৃপ্তির অসোয়াস্তি,—এই বিপত্তিই তো সর্বনাশা। মনশ্চেতনা একেবারে অবিদ্যা-চ্ছন্ন হত যদি, তাহলে অবিদ্যা জাগাত না অতৃপ্তির বেদনা ; অভ্যস্ত আচারের খোলার মাঝে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করত সে—তার নিজের মূঢ়তা কিংবা তাকে ঘিরে চেতনা ও জ্ঞানের যে অন্তহীন পারাবার, দুয়েরই সম্পর্কে থাকত সে নিঃসাড়। কিন্তু জড়ের বুকে স্ফুরন্ত চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে ঠিক এইখানটায় : প্রথম সে জানে, এ-জগতের কিছুই সে জানে না, অথচ একে জেনে বশ করে তার সুখ ; তারপর সে জানে, শেষ পর্যন্ত তার এ-জানাও সঙ্কীর্ণ এবং বন্ধ্যা, এতে যে সুখ ও শক্তি মেলে, সে-ও শীর্ণ এবং অনিশ্চিত,—অথচ তার নিজের মাঝে আছে অনন্ত চেতনা জ্ঞান ও স্বরূপসিদ্ধির সম্ভাবনা, যা তার জীবনে আনতে পারে অন্তহীন সর্বজয়ী আনন্দ। তেমনি জড়প্রকৃতির অসাড়তাও অতৃপ্তি ও অস্বস্তিতে পীড়িত করত না প্রাণকে, যদি তার স্বভাব হত একেবারে নিঃসাড় হয়ে থাকা : তখন হয়তো অর্ধচেতন প্রবৃত্তির সঙ্কোচ নিয়ে সে তৃপ্ত থাকত,—জানতও না এক অমিত বিক্রম ও অমর জীবনের অঙ্গীভূত অথচ বিবিক্ত অংশ হয়েই বেঁচে আছে সে ; তাই সত্যিকার কোনও প্রৈতিও সে অনুভব করত না ঐ অমৃত ও আনন্ত্যকে সম্ভোগ করবার।...কিন্তু ঠিক এই প্রৈতিই আকুল করেছে নিখিল প্রাণকে প্রথম থেকে : তার টলমল ভাব, তার আত্মরক্ষার এবং টিকে থাকবার প্রয়োজন ও প্রয়াস—এ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন সে ; তাই নিজের সঙ্কোচ সম্বন্ধে ক্রমে সজাগ হয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে স্থায়িত্ব ও বৈপুল্যের উন্মাদনায়—শাশ্বত অনন্তের পথে ধাবিত হয় তার দুর্নিবার আকূতি।

মানুষের মাঝে প্রাণ পরিপূর্ণ আত্মসচেতন হয়ে উঠলে এই অনিবার্য সংঘাত প্রয়াস ও অভীপ্সাও পৌঁছয় চরমে, এবং সেই সঙ্গে জগতের বিক্ষোভ ও বেদনা তীব্র অসহন হয়ে ওঠে প্রাণের কাছে। দীর্ঘযুগ নিজকে শান্ত রাখতে পারে মানুষ সীমার সঙ্কোচকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে, অথবা স্থূল জগৎকে

বশে আনবার সাধনাতে আংশিক সিদ্ধিলাভ করেই ; হয়তো কোনও-কোনও ক্ষেত্রে জড়প্রকৃতির অচেতন নিয়ম-নিগ্রের 'পরে অন্তরে-বাইরে বিজয়ী হয় তার উপচীয়মান জ্ঞান, বিপুল তামসী শক্তির মূঢ়তাকে নির্জিত করে তার সীমিত অথচ সচেতন সঙ্কল্পের একাগ্র প্রবেগ। কিন্তু তবু সে অনুভব করে, তার পরমা সিদ্ধিও এ-ক্ষেত্রে কত অনিশ্চিত, কত অকিঞ্চিৎকর। তখন বাধ্য হয়ে তাকে তাকাতে হয় ব্যাকুল বেদনা নিয়ে সুদূর দিগন্তের পানে। সসীম কি চিরতৃপ্ত থাকতে পারে কখনও যদি সে জানে এরও পরে আছে এক বৃহত্তর সসীম, অথবা এক লোকোত্তর অসীম যার মাঝে নিঃশেষ হবে না কখনও তার অভীপ্সার অভিযান? সসীমতা যদিই-বা তৃপ্তি মানে কখনও, আপাত-সসীম সত্ত্বের মাঝে কিন্তু জ্বলে অতৃপ্তির নিত্যদাহ ; কেননা ক্ষণে-ক্ষণে তাকে উন্মনা করে তোলে অনন্ত আত্মস্বরূপের তাত্ত্বিক অনুভব, গুহাহিত আনন্ত্যের অস্পষ্ট আভাস বা উদগ্র প্রৈতির বেদন। অতএব সসীমে-অসীমে সমন্বয় না ঘটিয়ে নিষ্কৃতি কোথায় তার?—হয় অসীমকে অধিকার করবে সে, নতুবা তারি মাঝে হবে আত্মহারা : যেমন করে হোক, যতটুকুই হোক—এই সাযুজ্য ছাড়া আর কিসে তার তৃপ্তি? এমনিতর আপাত-সান্ত আনন্ত্যই মানুষের স্বরূপ বলে অনন্তের এষণা তার চরম সার্থকতায় পৌঁছবেই একদিন। সে-ই প্রথম 'পুত্রঃ পৃথিব্যাঃ', যার মাঝে জেগেছে দ্যুসংশয় পুরুষের অস্পষ্ট চেতনা, জেগেছে অমৃতত্বের অব্যক্ত অনুভব ও পিপাসা ; তাই অশ্রান্ত জিজ্ঞাসাই তার প্রাজনী, তার আত্মবলির যূপ,—যতদিন না এই জিজ্ঞাসাকেই রূপান্তরিত করতে পারে সে অনন্ত জ্যোতি আনন্দ ও বীর্যের গঙ্গোত্রীতে।

জড়ের বিমূঢ় অসাড়তায় অবলুপ্ত দিব্য চেতনা ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের এই-যে উদয়ন এবং ক্রমিক স্ফুরণ, এ হতে পারত বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসের মত আনন্দ হতে উত্তর আনন্দে—অন্তহীন অনুত্তম আনন্দে উত্তরণের একটা জ্যোতি-রুৎসব, যদি জড়প্রকৃতির মূলে না থাকত খণ্ডভাবের আড়ষ্ট কাঠিন্য। বিবিক্ত ও সঙ্কীর্ণ দেহ-প্রাণ-মনের ব্যষ্টি-চেতনায় যখন বন্দী হল জীব, তখনই তার আত্মপরিণামের স্বভাব-ছন্দ হল ব্যাহত। তখন তার দেহ হল রাগ দ্বেষ জিগীষা তিতিক্ষা বিক্ষোভ ও সন্তাপের একটা কুরুক্ষেত্র। কেননা চিৎশক্তির একটি ক্ষুদ্র আয়তন বলে প্রত্যেকটি দেহকে উদ্যত থাকতে হয় অপর আয়তন কিংবা বিশ্বশক্তির অভিঘাত আক্রমণ ও অনীপ্সিত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে ; যখন বাইরের চাপে ভেঙে পড়ে সে, অথবা ক্ষোভক এবং ক্ষুভিত চেতনার মাঝে

যখন হয় ছন্দঃপতন, তখনই তার মাঝে জাগে অস্বস্তি এবং পীড়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সংঘাত, জিঘাংসা অথবা আত্মরক্ষার প্রয়াস। হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়-মানসের ভূমিতেও খণ্ডভাব নিয়ে আসে ঐ একই সংঘাতের বেদনা: সেখানেও দেখা দেয় হর্ষ-শোক, অনুরাগ-বিরাগ, উত্তেজনা-অবসাদের দ্বন্দ্ব। এ-সমস্তই বাসনার ছাঁচে ঢালা, এবং বাসনাকে উপলক্ষ্য করে জাগে উদগ্র প্রয়াসের ব্যাকুলতা; আবার প্রাণপাতী প্রয়াসের উত্তেজনাতে দেখা দেয়—সামর্থ্যের জোয়ার-ভাটা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ও লাভ-অলাভের দ্বন্দ্ব, অশক্তি সংঘর্ষ পীড়া ও অস্বস্তির একটা অবিরাম আলোড়ন। মনের জগতেও দেখি তাই। বিশ্বের চিন্ময় বিধান হল: সঙ্কীর্ণ সত্য মিশবে বৃহৎ সত্যের মুক্তধারায়, ক্ষুদ্রশিখা মিলিয়ে যাবে বৃহৎ জ্যোতির বিপুলতায়, অপরা-ইচ্ছা নিজকে সঁপে দেবে পরা-ইচ্ছার রূপায়ণী মায়ার কাছে, তৃপ্তির ক্ষুদ্র সাধনা উত্তীর্ণ হবে মহাপরি-তর্পণের আনন্দলোকে। কিন্তু জড়প্রকৃতি মনোলোকেও জাগায় সত্য আর মিথ্যার, আলো আর আঁধারের, শক্তি আর অশক্তির সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব; এখানেও দেখি, এষণা ও তার চরিতার্থতা যদি-বা আনে সুখ, লব্ধবিত্তের সম্ভোগ সেই সঙ্গেই নিয়ে আসে বিতৃষ্ণা ও অতৃপ্তির দুঃখ। নিজের বিকলতার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ ও প্রাণের বিকলতাও মনকে করে পীড়িত—প্রাকৃত জীবনের দৈন্য ও পঙ্গুত্বের ত্রিস্রোতায় তার চেতনা হয় বিপ্লুত। তার অর্থই হল আনন্দের নিরাকরণ—সৎ-চিৎ-আনন্দরূপী মহাত্রিপুটীর নিরাকরণ। এ নিরাকরণ অনতিবর্তনীয় হলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে জীবলীলা। কারণ, চেতনা ও শক্তির বিচিত্র লীলায়নে নিজেকে সঁপে দিয়েছে যে-জীবন, সে তো অন্তরাবৃত্ত হয়েই থাকবে না শুধু—ঐ লীলারসের মাঝেও সে খুঁজবে আত্মার তর্পণ। কিন্তু বিশ্বলীলায় সত্যিকার কোনও তৃপ্তি না থাকলে এই মনে করেই ছাড়তে হবে তার মায়া যে, এ শুধু দেহে অবতীর্ণ চিৎ-সত্তার একটা নিষ্ফল সাধনা, একটা অতিকায় প্রমাদ, একটা অর্থহীন প্রলাপ!

দুঃখবাদী সকল দর্শনেরই গোড়ার কথাটা এই। লোকান্তর অথবা লোকোত্তর ভূমি সম্পর্কে সুখবাদী হলেও পার্থিব জীবন সম্পর্কে তাদের দুঃখবাদ বস্তুতই দুরপনেয়: অন্নময় জগতে মনোময় জীবের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই যে নিয়তি, এ-সম্পর্কে তারা নিঃসংশয়। তারা বলে: খণ্ডভাব যখন জড়প্রকৃতির স্বধর্ম, আর আত্মসঙ্কোচ অবিদ্যা এবং অহমিকা দেহীমাত্রের মনোবীজ,—তখন পৃথিবীতে থেকে আত্মার পরিতর্পণ অথবা বিশ্বলীলাতে

দিব্য আকৃতি ও সিদ্ধির কোনও নিদর্শন আবিষ্কার করবার প্রয়াস একটা আত্ম-প্রবঞ্চনা শুধু। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের সঙ্গে জীবসত্তা ও জীবচেতনার যোগযুক্তি সম্ভব একমাত্র চিন্ময় দিব্যধামে—এই মর্ত্যলোকে নয়, অথবা আত্মার প্রপঞ্চোপশম স্তব্ধতায়—তার মায়িক প্রবৃত্তিতে নয়। অনন্ত তাঁর আত্মস্বরূপে ফিরে যেতে পারেন, যদি সান্তের মাঝে নিজকে খোঁজার দুরাগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি ভ্রান্তি ও প্রমাদ জ্ঞানে। মানি, মনশ্চেতনার উন্মেষ হয়েছে জড়ের মাঝে; কিন্তু তাতেই কি মিলবে দিব্যসিদ্ধির কোনও সূচনা? কেননা, সত্যি বলতে খণ্ডভাব তো ঠিক জড়ের ধর্ম নয়, বস্তুত সে মনেরই ধর্ম; জড় তো মনেরই একটা মায়া মাত্র, মন তার মাঝে আরোপ করেছে নিজেরই খণ্ডভাব এবং অবিদ্যা। অতএব এই মনোমায়ার জগতে সকল এষণায় মন শুধু নিজকেই পাবে ফিরে-ফিরে: তার আপন-গড়া খণ্ডভাবনার ত্রয়ীর মাঝে চলবে তার আনাগোনা; তাদের ছাড়িয়ে চিৎ-সত্তার অখণ্ডতা অথবা চিন্ময়-ধামের দিব্য সত্যকে কোথায় খুঁজে পাবে সে এই মায়াপুরীতে?

জড়ের খণ্ডভাব যে জড়সত্তায় অবতীর্ণ সখণ্ড মনের বিসৃষ্টি, সেকথা মিথ্যা নয়। কারণ সত্যি বলতে জড়ের স্বরূপসত্তাই নাই; তাকে বলা চলে না অনাদি একটা বিশ্ববিভূতি। এক সর্ব-বিভাজক মনের কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে সর্ব-বিভাজক প্রাণশক্তিই ব্যাকৃত করেছে এই জড়ের রূপ। শুদ্ধ-সন্মাত্রকে জড়ত্বের অবিদ্যা অসাড়তা আর খণ্ডভাবের বিকল্পনায় নামিয়ে এনে বিভাজক-মন আপনাকে হারিয়ে বন্দী হয়েছে নিজের গড়া কারাগারে, নিজেরই রচা শিকল পরেছে নিজের পায়ে। তাই, বিভাজক-মনই সৃষ্টির আদিবীজ হলে, ভবচক্রের মাঝে ঘুরে-ফিরে শুধু তাকেই আমরা পাব চরমতত্ত্বরূপে। সুতরাং মনোময় জীব যতই যুঝুক প্রাণ আর জড়ের সঙ্গে, তাদের হাতের মুঠোয় এনেও আবার তাকে তাদেরই কবলিত হতে হবে। এমনি করে জয়-পরাজয়ের আবর্তনে বিশ্বচক্র আবর্তিত হবে অনন্ত-কাল ধরে;—এই ব্যর্থতাই জীবের চরম ও পরম নিয়তি!...কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয়, যদি জানি—অনন্ত অমৃত চিৎস্বরূপই জড়-ধাতুর ঘন-কঞ্চুকে নিজেকে করেছেন আবৃত; অতিমানসী সিসৃক্ষার লোকোত্তর বীর্যই ফুটছে তাঁর এই জড়ের লীলায়; মনের মাঝে খণ্ডভাব জাগিয়ে জড়কে দিয়েছেন তিনি অক্ষুণ্ণ অধিকার বিশ্বের অবম তত্ত্বরূপে—শুধু বহুর মাঝে একেকে ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনে। তাঁর সহস্র-দল লীলার একটি দল এই চিন্ময় পরিণামের খেলা। তাই বিশ্বরূপের কঞ্চুকে

নিজেকে ঢেকেছে যে, মনোময় পুরুষ না হয়ে সে যদি হয় শাশ্বত দিব্য-পুরুষের কবি-ক্রতু; প্রথমে প্রাণরূপে, তার পরে মনরূপে সে-ই যদি উঁকি দিয়ে থাকে জড়ের আড়াল থেকে, আরও বিপুল সম্ভাবনা যদি এখনও গোপন থেকে থাকে তার মধ্যে ;—তাহলে আপাত-অচেতনা হতে চেতনার আবির্ভাবেই শেষ হয়ে যাবে না এই পরিণামের লীলা, তার নিগূঢ় প্রৈতি খুঁজবে মহত্তর সার্থকতার পথ।···এই জড়ের বুকেই এক অতিমানস চিন্ময়-পুরুষ আবির্ভূত হয়ে দেহ-প্রাণ-মনের প্রবৃত্তিতে সঞ্চারিত করবেন উন্মনী-ভাবনার বীর্য বিভাজক-মনের বৃত্তিকে ছাপিয়ে—এ কি অসম্ভব কিছু? বরং বিশ্বপ্রকৃতির স্বধর্মের এই কি নয় অপরিহার্য পরিণাম?

পূর্বেই বলেছি, এই অতিমানস পুরুষই করবেন মানসিক খণ্ডভাবের গ্রন্থি-মোচন; তাঁর কাছে মনের ব্যষ্টিভাব হবে সর্বাবগাহী অতিমানসের একটা সপ্রয়োজন অথচ গৌণ বৃত্তি মাত্র। তেমনি ব্যষ্টি-প্রাণের গ্রন্থিভেদ করেও তার ব্যষ্টিত্বকে মুক্তি দেবেন তিনি চিৎশক্তির সার্থক লীলায়নে—অখণ্ডেরই আনন্দোচ্ছল বহুভাবনার সমুল্লাসে। এমনি করে প্রাণ ও মনের গ্রন্থিভেদ সম্ভব হয় যদি, তাহলে দৈহ্যসত্তার গ্রন্থিভেদও কি সম্ভব হবে না তাঁর বীর্যে? এই দেহকেও কি মুক্ত করবেন না তিনি মৃত্যু খণ্ডভাব ও অন্যোন্যগ্রসনের শাসন হতে? এই ব্যষ্টিদেহই কি হবে না তখন এক অখণ্ড চিন্ময় দিব্য-সত্তার সার্থক-বিভূতি—সান্ত আধারে অনন্তের অফুরন্ত রসোল্লাসের দিব্য সাধন?··· অথবা এমনও কি হতে পারে না, চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ স্বারাজ্যসিদ্ধি রূপধাতুকে পাবে পূর্ণ-স্ববশ ভোগায়তনরূপে, অতএব জড়ের কঞ্চুক-পরিবর্তনেও তার অমৃত চেতনা রইবে অম্লান—তার জগৎ হবে রতি শ্রী ও সাযুজ্যবোধের অন্তহীন ব্যঞ্জনায় উল্লসিত আত্মারামের এক মহারাসমঞ্চ? পৃথিবীতে মানুষ এসেছে মানস হতে অতিমানসের দিব্যরূপান্তরের মহা-আধার হয়ে; অতএব এই মাটির বুকে থেকেই দিব্যমন ও দিব্যপ্রাণের মত এক দিব্যদেহও যে গড়ে তুলবে সে, এ কি অসম্ভব? 'দিব্য দেহ!'—শুনে হয়তো আঁৎকে উঠব আমরা বর্তমানের দিকে তাকিয়ে, মানুষের ভবিষ্য-সম্ভাবনার দীনতা কল্পনা করে। তাহলেও আত্মস্বরূপকে পূর্ণমহিমায় ফুটিয়ে তুলে, তার আনন্দ জ্যোতি ও বীর্যের অকুণ্ঠিত স্ফুরণে মানুষ কি দেহ-মন-প্রাণকেই দিব্যভাবের সাধনে করবে না রূপান্তরিত, যাতে রূপের মাঝে অরূপের আবেশ সার্থক হবে একই আধারে নর-নারায়ণের যুগললীলায়?

পার্থিব-পরিণামের এই চরম সিদ্ধির একমাত্র প্রতিবাদ রয়েছে জড় ও জড়-ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বর্তমান কল্পনাতে। ইন্দ্রিয় ও রূপধাতুর মাঝে, প্রমাতা-ব্রহ্ম আর প্রমেয়-ব্রহ্মের মাঝে আমাদের অধুনা কল্পিত সম্বন্ধই যদি হয় একমাত্র সত্য; অথবা অন্য-কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হলেও আজও তার প্রকাশ অসম্ভব যদি হয় এই জগতে; সিদ্ধির এষণায় লোকোত্তর ভূমিতে উত্তরণ ছাড়া আর-কোনও উপায় না থাকে যদি :—তাহলে প্রচলিত সকল ধর্মের সঙ্গে সায় দিয়ে বলতেই হয়, একমাত্র লোকান্তরিত দিব্যধামেই আছে আমাদের অধ্যাত্মসাধনার সম্যক চরিতার্থতা। কিন্তু এসব ধর্মই যে আবার বলে এই পৃথিবীতেই বৈকুণ্ঠ অথবা সিদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা, সে-কল্পনাকে তাহলে বলতে হয় একটা আত্মবঞ্চনা শুধু!···এ-জগতে চলতে পারে একমাত্র অন্তরের প্রস্তুতি অথবা তাকে বিজয়ী করবার সাধনা এবং সিদ্ধি; অন্তরের নিরালায় বসে প্রাণ মন চেতনার বাঁধন খসিয়ে অনির্জিত ও অজেয় জড়ের মায়া হতে বিমুখ হতে হবে আমাদের, এই কার্পণ্যোপহত দুঃশীলা পৃথিবীর নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে আর-কোথাও খুঁজতে হবে সত্তনুর উপাদান।··· কিন্তু এই অল্পের দর্শনকে কেনই-বা মানব আমরা ভূমার সত্য বলে? জড়কে যা বলে জানি আজ, সেই কি তার পূর্ণ পরিচয়?···নিশ্চয় নয়। জড়েরও আছে সূক্ষ্মতর বিভূতি; রূপ-ধাতুর দিব্য-পরিণামের আছে একটা ঊর্ধ্বগ-পরম্পরা। অতএব অন্নময় আধারেরও রূপান্তর সম্ভব এক লোকাতীত ধর্মের আবেশে; পরতর ধর্ম হলেও সেই তার স্বধর্ম, কেননা তার অন্তরের গহনে এখনও নিগূঢ় হয়ে আছে ঐ পরমধর্মেরই অব্যক্ত বীর্য।

২৬

# রূপধাতুর উৎক্রমণ

এক অন্নরসময় আত্মা আছেন—তারও অন্তরে রয়েছেন আর-এক প্রাণময় আত্মা, যিনি পূর্ণ করে আছেন তাকে—তারও অন্তরে আর-এক মনোময় আত্মা—তারও অন্তরে আর-এক বিজ্ঞানময় আত্মা—তারও অন্তরে আর-এক আনন্দময় আত্মা।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।২-৫

শতক্রতুকে বেয়ে ওঠে তারা বংশদণ্ডের মত। যখন সানু হতে সানুতে করে আরোহণ, তখন ফুটে ওঠে চোখের সামনে কত-যে রয়েছে করণীয়। ইন্দ্র আনেন সেই 'তৎ'-এর চেতনা লক্ষ্যরূপে।

—ঋগ্বেদ (১।১০।১-২)

আধারে নিষণ্ণ হন তিনি শ্যেনের মত, শকুনের মত—তুলে ধরেন তাকে; কিরণরাজি খুঁজে পান তাঁর ধারাসারে, কেননা চলেন যে তিনি আয়ুধ নিয়ে; অপ্-এর সমুদ্র-ঊর্মিকে আঁকড়ে ধরেন তিনি—মহেশ্বর হয়ে প্রকাশ করেন তুরীয় ধাম। মর্ত্য যেমন তনুকে করে মার্জিত, যুদ্ধে তুরঙ্গ যেমন ছুটে চলে জিনে নিতে বিপুল ধন, তেমনি চালেন তিনি আপনাকে ঘোর গর্জনে সকল কোশের ভিতর দিয়ে—আবিষ্ট হন ঐ আধার দুটিতে।

—ঋগ্বেদ (৯।৯৬।১৯,২০)

বিচার করে দেখলে জড়ের জড়ত্ব আমাদের কাছে সূচিত হয় তার নীরন্ধ্র ঘনত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, উপচীয়মান প্রতিরোধশক্তি ও স্থির-কঠিন স্পর্শদ্বারা। রূপধাতু যতই সৃষ্টি করে একটা নিরেট প্রতিরোধের ভাব এবং তার ফলে চেতনার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে দেয় একটা অর্থক্রিয়াকারী স্থায়িত্ব, ততই আমরা তাকে মনে করি বাস্তব এবং জড় বলে। তেমনি রূপধাতু যদি হয় সূক্ষ্মতর, প্রতিরোধের শক্তি যদি হয় তার ক্ষীণ, ইন্দ্রিয়-বোধের মুষ্টি শিথিল যদি হয় তার 'পরে, তাহলে তার জড়ত্বও ফিকে হয়ে আসে আমাদের চেতনায়। প্রাকৃত-

চেতনার কাছে জড়-ধর্মের এই-যে নিরিখ, তা হতেই ধরা পড়ে জড়-সৃষ্টির মুখ্য প্রয়োজন কী। রূপধাতু নেমে আসে জড়ের কোঠায়—আঁকড়ে ধরবার মত একটা স্থায়ী মূর্তভাবের পসরা চেতনার কাছে মেলে ধরবার জন্য, যাতে মন তার মাঝে পায় মানসপ্রবৃত্তির নির্ভরযোগ্য একটা অধিষ্ঠান, এবং প্রাণ তার রূপায়ণের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব-সম্পর্কেও হতে পারে আশ্বস্ত। এইজন্যই প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে মেনেছিলেন জড়ের প্রতীকরূপে, কেননা দ্রব্যের কাঠিন্য পৃথিবীতেই সবার চেয়ে স্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আসল ভিত্তি স্পর্শ কিংবা সন্নিকর্ষের উপর ; রসন ঘ্রাণ শ্রবণ ও দর্শনরূপী অন্যান্য স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধেরও প্রতিষ্ঠা বিষয়-বিষয়ীর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পরোক্ষ সন্নিকর্ষের 'পরেই। ব্যোম হতে ক্ষিতি পর্যন্ত রূপ-ধাতুর সাংখ্যসম্মত পাঞ্চভৌতিক পরিণামেও দেখি, অতিসূক্ষ্ম হতে ক্রমস্থূলের দিকেই তার অভিযান : তাই পঞ্চভূতের চূড়ায় আছে আকাশের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কম্পন, আর তার গোড়ায় নিরেট পৃথিবীর অতিস্থূল ঘনিমা। অতএব শুদ্ধ-ধাতুর অবসর্পিণী ধারার শেষ পর্বে দেখা দেবে জড়—অচিৎ বিশ্ববিভূতির উপাদানরূপে ; তার মাঝে অরূপ-চিতের চেয়ে অচিৎ-রূপের লীলাই হবে মুখ্য এবং সে-রূপের মাঝেও ঘটবে ঘনীভাব ও প্রতিরোধ-শক্তির চরম বিকাশ, দেখা দেবে মূর্তভাবের স্থৈর্য ও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা ;—অর্থাৎ ভেদ বিবিক্ততা ও খণ্ডভাবের সেই হবে আদিবিন্দু। এই হল জড়বিশ্বের প্রকৃতি ও তাৎপর্য ; তাকে বলতে পারি পরিনিষ্ঠিত খণ্ডভাবের আদর্শ।

জড় হতে চিৎ পর্যন্ত রূপধাতুর আরোহক্রমে উৎসর্পণ যদি হয় বিশ্ব-প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহলে তার প্রতি পর্বে জড়ধর্মের হ্রাস হয়ে দেখা দেবে বিপরীত ধর্মের ক্রমিক উপচয়—যার চরম পর্যবসান হবে বিশুদ্ধ-চিন্ময় আত্মপ্রসারণে। অর্থাৎ পর্বে-পর্বে ক্রমেই শিথিল হবে রূপের বন্ধন, রূপের বীর্য ও উপাদান ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে হারাবে তাদের অনম্য আড়ষ্টতা, বিভিন্ন বিগ্রহের মাঝে ক্রমেই সহজ হবে সামরস্য ও অন্যোন্যসঙ্গম, স্বচ্ছন্দ হবে সমানয়ন ও আত্মবিনিময়ের সামর্থ্য, দেখা দেবে বৈচিত্র্য রূপান্তর ও একাত্ম-ভাবনার বীর্য। রূপের মাঝে ছিল যে স্থৈর্যের আভাস, ক্রমেই তার স্থান অধি-কার করবে স্বভাবের নিত্যতা। বিবিক্তভাব ও অন্যব্যাবৃত্তির যে মূঢ় অভি-নিবেশ ছিল জড়ভূতের মাঝে, অখণ্ড অনন্ত তাদাত্ম্যানুভূতির চিন্ময় রসে তা হবে বিগলিত। স্থূল রূপ-ধাতু আর বিশুদ্ধ চিন্ময়-ধাতুর মাঝে মৌলিক

বৈধর্ম্যের সূত্র হবে এই : জড়ের মাঝে চিৎশক্তি সংপিণ্ডিত হয় একই চিৎশক্তির অন্যান্য পিণ্ডভাবকে ক্রমে ঠেকিয়ে রাখতে কি ছাপিয়ে উঠতে ; কিন্তু চিন্ময় ধাতুতে শুদ্ধচৈতন্য আত্মবোধের ভূমিকাতেই ফুটিয়ে তোলে তার আত্মরূপায়ণের স্বাতন্ত্র্যলীলা অখণ্ডের সিদ্ধ অনুভবকে অব্যাহত রেখে, অথচ নিত্যসামরস্য-জারিত আত্মবিনিময়ের ভাবনা হয় তার আত্মশক্তির বিচিত্রতম বিচ্ছুরণের প্রতিষ্ঠা-মন্ত্র। এই দুটি অন্ত্যকোটির মাঝে রয়েছে এক অন্তহীন বর্ণচ্ছত্রের অপরূপ মায়া।

এসব আলোচনার গুরুত্ব তখনই ধরা পড়ে, যখন বিচার করি সিদ্ধমানবের দিব্য-জীবন ও দিব্য-মনের সঙ্গে আপাত-অদিব্য প্রাকৃত-দেহ বা জড়-সত্তার কী সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ হতেই জড়বিশ্বের গোড়াপত্তন—আমাদের প্রাকৃত-জীবনের মূলে রয়েছে এই তত্ত্ব। কিন্তু এ-সম্বন্ধও ঐকান্তিক নয় যেমন, তেমনি এ-তত্ত্বও নয় অনতিবর্তনীয়। রূপধাতুর সঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ প্রকাশ পেতে পারে অন্য আকারেও ; তাতে জড়ের মাঝে হয়তো দেখা দেবে অন্য নিয়মের খেলা—প্রাণ ও মনের আরও উদার বৃত্তির লীলা ; এমন-কি এই দেহধাতুরই পরিবর্তনে ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের প্রবৃত্তি হবে আরও স্বচ্ছন্দ। আমাদের জড়াশ্রয়ী জীবনে আছে মৃত্যু ও খণ্ডতার পীড়া, একই চিন্ময়ী প্রাণশক্তির বিভিন্ন বিগ্রহে আছে অন্যোন্য-প্রতিরোধ ও ব্যাবৃত্তির দ্বন্দ্ব। ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য এখানে সীমিত, জীবনের সাধনাও আয়ু পরিবেশ ও সামর্থ্যের সঙ্কোচে পীড়িত, মনের প্রবৃত্তি পঙ্গু তমসাচ্ছন্ন ব্যাহত ও পর্যুদস্ত। শুধু তাই নয়, পশুদেহোচিত এই সীমার সঙ্কোচ মানুষের উত্তরায়ণের পথেও ফেলেছে তার করাল ছায়া।...কিন্তু এই তো নয় বিশ্ব-প্রকৃতির একমাত্র ছন্দ। এরও পরে আছে কত লোকাতীত ভূমি, কত ঊর্ধ্ব-লোকের পরম্পরা। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বর্তমান ন্যূনতার লাঞ্ছন হতে নির্মুক্ত হয়ে ধাতুপ্রসাদের দীপ্তি যদি ফুটে ওঠে মানুষের মাঝে, তাহলে এই স্থূল আধারেই সংক্রামিত হবে সে-সব লোকের ঋতম্ভরা প্রবর্তনা ; তখন এইখানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রকট হবে দিব্য মন ও ইন্দ্রিয়ের বীর্য, এই মানুষের দেহে চলবে দিব্যপ্রাণের প্রাকৃত লীলায়ন—এমন-কি এই পৃথিবীরই বুকে একদিন আবির্ভূত হবে দেবমানবের সত্ত্বতনু প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক ছন্দেই।...হয়তো এক দিন মানুষের এই মর্ত্য দেহেরও ঘটবে দিব্যরূপান্তর ; হয়তো সেদিন মাতা পৃথিবীই দেখা দেবেন হিরণ্যবক্ষা অদিতি হয়ে।

জড়ীয় বিশ্ববিধানেও দেখি, জড়বিভূতির আছে একটা আরোহক্রম, যা আমাদের নিয়ে যায় স্থূল হতে সূক্ষ্মে—সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরে। কিন্তু কোথায় সে ক্রমসূক্ষ্ম আরোহ-সোপানাবলির চরম ধাপ—জড়-ধাতু বা শক্তি-রূপায়ণের অতি-ব্যোম সূক্ষ্মতা ? কী আছে তারও ওপারে ?—মহাশূন্য ? পরম নাস্তিত্ব ?… কিন্তু পরমশূন্য বা সত্যিকার নাস্তির বলে তো কোথাও কিছু নাই ; আমাদের ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধিরও সূক্ষ্মতম ব্যাপার নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসছে যেখান থেকে, তাকেই না বলি পরম শূন্য ? এ-ও সত্য নয় যে ব্যোম-ভূতই, বিশ্বের শাশ্বত আদিপর্ব, তার ওপারে কিছুই নাই ; আমরা জানি, জড়-ধাতু আর জড়-শক্তি শুদ্ধ-ধাতু ও শুদ্ধ-শক্তিরই চরম পরিণাম—যার মাঝে আত্মসংবিৎ ও আত্মৈশ্বর্যে ভাস্বর হয়ে আছে চেতনা, অচেতন সুষুপ্তি ও নিঃসাড় স্পন্দনে আত্মবিলুপ্তি ঘটেনি তার জড়ত্বের কবলিত হয়ে।…তখনই প্রশ্ন হয়, কী আছে তাহলে জড়-ধাতু আর শুদ্ধ-ধাতুর মাঝখানটিতে ? কেননা সত্তার এক কোটি হতে আমরা তো ঝাঁপিয়ে পড়ি না তার অন্য কোটিতে, অচিতি হতে একেবারেই তো চলে যাই না চিতি-স্বরূপে। সুতরাং অচিৎ-ধাতু আর অবিলুপ্ত-স্বচিৎ আত্মপ্রস্থতির মাঝে থাকা উচিত আরোহ-সোপানের পরম্পরা এবং তা আছেও—যেমন আছে জড় আর চিতের মাঝে।

এই অন্তরিক্ষের মহাগহনে অবগাহন করেছেন যাঁরা, তাঁরা সবাই সমস্বরে বলেন, জড়বিশ্বের ওপারে তার সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে রূপধাতুর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পরিণামের একটা পরম্পরা। ব্যাপারটা পড়ে রহস্য-বিদ্যার এলাকায়, তাই বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা হবে জটিল এবং দুর্বোধ। অতএব এ-বিষয়ে এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা না করে এইটুকুই বলতে পারি আমাদের অঙ্গীকৃত দর্শনের ধারা ধরে যে, রূপধাতুর উদয়নের সোপানমালায় যে-একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে এই : জড় প্রাণ মন অতি-মানস ও তারও পরে সৎ-চিৎ-আনন্দের মহাত্রিপুটীর সে-আরোহক্রমের কথা জানি আমরা, রূপধাতুও চলেছে ঠিক তারি অনুসরণে। অর্থাৎ উদয়নের প্রত্যেক পর্বে ঐ তত্ত্বগুলিকে আশ্রয় এবং আধার করে তাদেরই উৎসর্পিণী ধারায় আপনাকে ফুটিয়ে তুলেছে সে তাদের বিশ্বব্যাপ্ত আত্মরূপায়ণের বিশিষ্ট বাহনরূপে।

জড়ের জগতে জড়ধাতুই সবার প্রতিষ্ঠা। এখানকার ইন্দ্রিয়বোধ প্রাণন বা মনন সমস্তই নির্ভর করছে প্রাচীনদের ক্ষিতি-তত্ত্ব বা পৃথিবী-শক্তির

'পরে। ক্ষিতি-তত্ত্ব হতে জাত সবাই, মেনে চলছে তারি শাসন; সর্বতোভাবে তার অনুকূলে চ'লে তারি অভিব্যক্তির সীমাদ্বারা সীমিত হয়েছে তাদের প্রগতি। এমন-কি অপার্থিব কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গেলেও মাটির হিসাবকে এড়িয়ে যাবার উপায় নাই; দিব্য-পরিণামের ধারাতেও মর্ত্যের প্রয়োজন ও দাবিকে জেনে এবং মেনেই সবাইকে পা বাড়াতে হয় প্রগতির পথে। তাই দেখি, পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়শক্তি কাজ করছে স্থূল ইন্দ্রিয়গোলক নিয়ে; প্রাণের বাহন হ'ল জড় নাড়ী-তন্ত্র ও 'জীবিতেন্দ্রিয়'; মন চলছে স্থূল দেহকে আশ্রয় করে; এমন-কি বিশুদ্ধ মননক্রিয়াও জড়াশ্রিত তথ্যকেই গ্রহণ করে তার ক্ষেত্র ও উপাদানরূপে। কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরিহার্য হয়ে নাই মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বভাবে: কারণ, স্থূল ইন্দ্রিয়-গোলক তো সৃষ্টি করে না ইন্দ্রিয়-বোধ; তারাই বরং বিশ্বগত ইন্দ্রিয়-শক্তির বিসৃষ্টি ও সাধন—এ-জগতে ফুটেছে বিশিষ্ট-বোধের একটা সপ্রয়োজন কৌশলরূপে। তেমনি নাড়ী-তন্ত্র এবং জীবিতেন্দ্রিয় সৃষ্টি করে না প্রাণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া: কিন্তু বিশ্বগত প্রাণশক্তিই অভিব্যক্ত করে তাদের এ জগতে—প্রাণনের অপরিহার্য সুকৌশল সাধনরূপে। মস্তিকও নয় মননের স্রষ্টা; বরং বিশ্বমনেরই বিসৃষ্টি ও সাধন সে, তারি কার্য-সিদ্ধির কৌশলরূপে এখানে তার আবির্ভাব।...এই বিধান অপরিহার্য হলেও ঐকান্তিক নয়, কেননা তার মূলে আছে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যের পানে প্রবর্তনা। জড়বিশ্বে নিহিত আছে এক বিরাট দিব্য-ক্রতু; সে চায় বিষয় ও ইন্দ্রিয়-বোধের মাঝে স্থূলসম্পর্ক ঘটাতে; অতএব চিৎশক্তির ঋতময় জড়বিভূতিকে এখানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাই দিয়ে রচে সে চিৎ-সত্তারই স্থূল বিগ্রহ। তার এই মূর্তিভাবনা আমাদের প্রাকৃত জগতের গোড়ার কথা এবং তারি ঈশনা দেখা দেয় সঙ্কুচিত জড়প্রকৃতির অপরিহার্য বিধানরূপে—ঐ দিব্যক্রতুরই বিশেষ প্রয়োজনে। অতএব জড়জগতের নিয়তি-কৃত নিয়মকে বলতে পারি না সন্মাত্রের অনাদি শাশ্বত-ধর্ম; চিৎ জড়ের জগতে ফুটতে চাইছে বলেই দেখা দিয়েছে সৃষ্টির এই বিশিষ্ট বিধান।

রূপধাতুর দ্বিতীয় পর্বের প্রবর্তক ও নিয়ন্তা হল প্রাণ ও আকৃতি-চেতনা—মূর্তিভাবনার লীলা এখানে গৌণ। তাই জড়ভূমির ঊর্ধ্বে যে-জগৎ, তার প্রতিষ্ঠা হল এক সচেতন বিরাট প্রাণনের বীর্যে; প্রাণের এষণা ও বাসনার সংবেগ সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণে। অচেতন বা অবচেতন সঙ্কল্পের অন্ধআকূতি শক্তির জড়-বিভূতিতে লীলায়িত হয় শুধু

এই ভূলোকেই—সেখানে নয়। সেখানে যত শক্তি রূপ ও বিগ্রহ, যত প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মননের লীলা, পরিণতি সিদ্ধি ও আত্মসম্পূর্তির যত বিভূতি, সবার মূলে আছে চিন্ময়-প্রাণেরই প্রশাসন। এমন-কি জড় বা মনকেও সেখানে চলতে হয় প্রাণের ছন্দ মেনে, কেননা প্রাণই সেখানে তাদের উৎস এবং প্রতিষ্ঠা—প্রাণের ধর্ম ও বীর্য, সঙ্কোচ ও সামর্থ্যই নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সঙ্কোচ অথবা প্রসার। এমন-কি প্রাণোত্তর কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে প্রাণময় আকৃতির হিসাবকে এড়িয়ে যেতে মনও সেখানে পারে না ; দিব্য, পরিণামের ধারায় প্রাণের প্রয়োজন ও দাবিকে জেনে এবং মেনেই তাকে খুঁজতে হয় প্রগতির পথ।

এমনি করে দিব্যধামের পানে চলেছে উর্ধ্বলোকের পরম্পরা। তৃতীয় পর্বের প্রবর্তনা ও নিয়ন্ত্রণ আসে মন হতে। রূপধাতু সেখানে অতিসূক্ষ্ম ও সুনম্য, তাই তার মাঝে সদ্য রূপায়িত হয়ে ওঠে মনের কল্পন ;—তার আত্ম-প্রকাশ ও আত্মসম্পূর্তির প্রৈতি অব্যাহত প্রবৃত্তিতে সার্থক হয় রূপধাতুর আত্ম-নিবেদনে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়বোধের অন্যোন্য-সম্বন্ধও তেমনি সূক্ষ্ম ও সুনম্য সেখানে, কেননা সূক্ষ্ম মানস-ধাতু নিয়ে মনের কারবার বলে স্থূল বিষয়ের সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নিষ্প্রয়োজন তার পক্ষে। মানস-জগতে প্রাণ সম্পূর্ণ মনের অনুগত। ভূলোকে মানস-প্রবৃত্তি পঙ্গু, প্রাণ-বৃত্তি স্থূল সঙ্কীর্ণ অথচ উদ্ধত ; তাই ওখানকার মনের নিরঙ্কুশ স্বারাজ্য বলতে গেলে এখানকার প্রাণ-মনের কল্পনারও অগোচর। মনই লোক-ধাতু সে-লোকে, অতএব অকুণ্ঠ তার শাসন, সর্বজয়া তার আকৃতি,—দ্যুলোকের প্রকাশলীলায় তার দাবিই সকল দাবির অগ্রগণ্য।···তারও ওপারে রয়েছে অতিমানসের আশ্রিত চিন্ময় তত্ত্বসমূহ—তারপরে অতিমানস—তারও পরে বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তি অথবা শুদ্ধ-সন্মাত্র—এই হল লোক-ধাতুর পরম্পরা। এমনি করে পাই আমরা বিশ্বের অপ্রাকৃত লোকসংস্থানের সন্ধান, প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যাদের বলতেন—জ্যোতির্ময় 'ধামানি দিব্যানি.' অমৃতের প্রতিষ্ঠা তাদের মাঝে ; পরবর্তী যুগের পৌরাণিক ধর্মে এদের সংজ্ঞা হল গোলোক বা ব্রহ্মলোক। এই তো 'বিষ্ণুর পরম পদ'—শুদ্ধ-সন্মাত্রের স্বরূপবিভূতির চিন্ময় পরমপ্রকাশ—মুক্তজীব যার মাঝে সিদ্ধদশার চরম কোটিতে আস্বাদন করে শাশ্বতী ব্রাহ্মী-স্থিতির আনন্ত্য এবং রসোল্লাস।

এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন ও অনুভবের উর্ধ্বগধারা চলেছে জড়-রূপায়ণের

সীমা ছাড়িয়ে, তার তত্ত্ব কিন্তু রয়েছে বিশ্ব জুড়ে এক বিচিত্র-জটিল সুরসঙ্গতির লীলায়নে। চেতনার যে সঙ্কীর্ণ আয়তনে তৃপ্তিতে শয়ান আছে আমাদের প্রাকৃত প্রাণ-মন, তার অপরিসর স্বরগ্রামের মাঝেই ঘটেনি সে-সুরমূর্ছনার অবসান। সত্তা, চেতনা, শক্তি, রূপধাতু নামছে উঠছে এক মহাতন্ত্রীর ঘাটে-ঘাটে যেন : তার প্রত্যেক পর্দায়, সত্তা ছড়িয়ে পড়ছে বিপুলতর আত্মব্যাপ্তিতে, ভূমানন্দে উল্লসিত চেতনা অনুভব করছে তার উদারতর মহিমা, শক্তির অন্তরে উপচে উঠছে আনন্দময় সামর্থ্যের তীব্রতর সংবেগ, রূপধাতু তার সত্ত্বকে করছে আরও সূক্ষ্ম লঘু সুনম্য ও সাবলীল। যে যত সূক্ষ্ম, তত বেশী তার বীর্য— অতএব সত্য বলতে তত বেশী বাস্তব সে ; কেননা স্থূলতার আড়ষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত বলেই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অধিক তার এবং সেইজন্য তার রূপায়ণেও দেখা দেয় অধিকতর ব্যাপ্তি সামর্থ্য ও সাবলীলতা। উত্তরায়ণের পথে এক-একটি গিরি-সানুতে আরোহণ করে আমাদের অনুভব প্রসারিত হয় চেতনার বিস্তৃততর ভূমিতে, জীবনের বিপুলতর ঐশ্বর্যে।

কিন্তু পর্বে-পর্বে এই উত্তরায়ণের সঙ্গে আমাদের পার্থিব প্রগতির কী সম্পর্ক? অবশ্য চেতনার প্রত্যেকটি ভূমি, প্রত্যেকটি লোক, রূপধাতুর প্রত্যেকটি স্তর, বিশ্বশক্তির প্রত্যেকটি ঝলক যদি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হত পূর্বাপর হতে, তাহলে ঊর্ধ্বলোকের কোনও প্রভাবই পড়ত না আমাদের প্রাকৃত ভূমির 'পরে।···কিন্তু ঠিক উলটো কথাটাই সত্য। চিৎ-স্বরূপের অভিব্যক্তি যেন একটা বিচিত্র বুনানি—তার অখণ্ড রূপটি ফুটিয়ে তুলতে প্রত্যেকটি তত্ত্বের ভাব ও ছন্দ ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে সবার সঙ্গে। আমাদের জড়জগৎও তাই বিশ্বের সকল তত্ত্বের চিত্র-পরিণাম, কেননা জড়বিশ্বের রূপায়ণে সকল তত্ত্বই নেমে এসেছে জড়ের মাঝে—জড়ের প্রত্যেকটি কণাতে নিষিক্ত আছে তাদের বীর্য ; তাই জড়ের প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেকটি স্পন্দনে আছে তাদের নিগূঢ় শক্তির প্রৈতি। জড় যেমন অবরোহের শেষ ধাপে, তেমনি সে আরোহের প্রথম ধাপেও। সমস্ত ভূমি, লোক, স্তর এবং ঝলকের বীর্য যেমন সংবৃত হয়ে আছে জড়ের মধ্যে, তেমনি জড় হতে বিবৃত হবারও সামর্থ্য রয়েছে তাদের। এইজন্যই তো জড়ের বিভূতি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি শুধু জড়শক্তির লীলায়, জড়-উপাদানের সংযোগ-বিয়োগে—গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার বিসৃষ্টিতে ; তারও পরে তার বুকে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন, ফুটেছে মনের আলো ; অতএব এরও পরে জাগবে তার মাঝে অতিমানসের দীপ্তি—চিন্ময় সত্তার উত্তর-জ্যোতি।

তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বীর্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জড়াতীত ভূমি হতে জড়ের 'পরে চাপ পড়ছে অবিরত—এই তো বিশ্ব-পরিণামের রীতি; এ নইলে জড়ত্বের আড়ষ্ট বন্ধনে চিরকাল ঘুমিয়ে থাকত তারা—যদিও সে একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার, কেননা জড়ের মাঝে পরতত্ত্বের স্থিতিই সূচিত করছে তার প্রমুক্তি। কিন্তু প্রমুক্তি অপরিহার্য হলেও তার জন্য উপর হতে প্রয়োজন হয় একটা সজাতীয় অনুকূল শক্তির চাপ।

অনিচ্ছুক জড়শক্তির কার্পণ্যবশত জড়ের মাঝে প্রাণ মন অতিমানস ও সচ্চিদানন্দের একটা ক্ষীণশিখার প্রথম উন্মেষেই যে হবে চিন্ময়-পরিণামের অবসান, এ-ও কিন্তু সত্য নয়। জড়ের মাঝে উর্ধ্বশক্তি যতই ফুটবে, আত্ম-সামর্থ্যের চেতনায় তাদের আকৃতি ও প্রবৃত্তি যতই হবে তীব্র, ততই উর্ধ্বলোক হতে তাদের 'পরে চাপও হবে প্রবল অব্যাহত এবং অব্যর্থ—কেননা এই চাপ জড়িয়ে আছে বিশ্বভুবনের ওতপ্রোত সত্তার সঙ্গে মণির মালায় সুতোর মত। শুধু জড় হতেই যে উদ্ভিন্ন হবে এই-সব পরতত্ত্ব গোপালিক প্রকাশের শীর্ণতায় কুণ্ঠিত হয়ে, তা নয়;—উপর হতেও নেমে আসবে তারা স্বরূপ-শক্তির দীপ্ত-চ্ছটা নিয়ে জ্যোতিরুৎসবের বিপুল সমারোহে। তখন জড় আধারে সেই শক্তির নিরঙ্কুশ লীলার জন্য মর্ত্য জীবও নিজকে করবে উন্মীলিত ও প্রসারিত। চাই শক্তির উপযুক্ত আধার বাহন ও সাধন: পার্থিব প্রকৃতিতে তারি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মানুষের দেহে প্রাণে ও চেতনায়।

আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় আর স্থূল মন স্থূল দেহের সঙ্কীর্ণ সামর্থ্যকেই জানে চরম বলে। এরি মাঝে যদি নিঃশেষিত হত মানুষের দেহ-প্রাণ-চেতনার সকল সার্থকতা, তাহলে প্রকৃতি-পরিণামের আয়ুকালও হত খর্ব—মানুষের বর্তমান সিদ্ধিকে ছাপিয়ে কোনও মহত্তর সিদ্ধিতে পৌঁছনোর কল্পনা মিথ্যা হত তার কাছে। কিন্তু প্রাচীন রহস্য-বেত্তারা জানতেন, আমাদের অন্নময় আধারেরও সবখানি নয় জড় দেহ—শুধু এই স্থূল পিণ্ডভাবই নয় আমাদের রূপ-ধাতুর একমাত্র পরিণাম। প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা বলছে পাঁচটি পুরুষের কথা: অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় বা আনন্দময়। প্রত্যেক পুরুষের উপযোগী আছে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট পরিণাম, রূপকের ভাষায় প্রাচীনেরা যাকে বলতেন কোশ। পরের যুগের বিজ্ঞানীরা দেখলেন পাঁচটি কোশ আবার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটি শরীরের উপাদান—জীব যুগপৎ প্রত্যেক শরীরে বাস করেও, প্রাকৃত চেতনায় রাখে শুধু স্থূল শরীরেরই একটা

উপরভাসা পরিচয়। কিন্তু অন্যান্য শরীর সম্পর্কেও সচেতন হওয়া অসম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। স্থূল শরীরের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে অন্নময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষের নির্মুক্ত প্রকাশ যদি ঘটে চেতনায়, তাহলেই দেখা দেয় তথাকথিত "অলৌকিক রহস্য" যত। এসব রহস্য নিয়ে জোর গবেষণা শুরু হয়েছে আজকাল ; এখন পর্যন্ত তার ক্ষেত্র যেমন সঙ্কীর্ণ, গবেষণার পদ্ধতি-তেও তেমনি চূড়ান্ত আনাড়িপনা, যদিও এই নিয়ে চালবাজি গেছে মাত্রা ছাড়িয়ে। এদেশের প্রাচীন হঠযোগী ও তান্ত্রিকেরা রীতিমত বিদ্যায় ফলিত করেছিলেন মানুষের দেহ ও প্রাণের অলৌকিক ব্যাপারগুলিকে। সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ ও মনের ছয়টি চক্রের অনুরূপ এই স্থূল দেহের মাঝেও পেয়েছিলেন তাঁরা ছয়টি প্রাণময় নাড়ী-চক্রের সন্ধান ; সেই সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সূক্ষ্ম কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া, যা দিয়ে চক্রে চক্রে নিমীলিত 'পদ্ম'গুলিকে করা যায় উন্মীলিত ;—তখন মানুষ পায় সূক্ষ্মলোকের উপযোগী সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জীবনের অধিকার, এমন-কি দেহ ও প্রাণের যে স্থূল বাধা বিজ্ঞানময় ও চিন্ময়-ভূমির অনুভবকে রেখেছিল ব্যাহত করে, তারাও তখন হয় অপসারিত। হঠযোগীরা বলেন (অনেকক্ষেত্রে প্রমাণও দিয়েছেন তার) যে, আধুনিক বিজ্ঞান যাদের মনে করে প্রাকৃত প্রাণব্যাপারের অপরিহার্য অঙ্গ, এমন অনেক স্থূল অভ্যাসের অথবা শারীর ক্রিয়ার দাসত্ব হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন তাঁরা স্থূল প্রাণশক্তিকে স্ববশে এনে।

এইসব প্রাচীন 'দেহ-তত্ত্বের' গবেষণা হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনের একটা মর্মসত্য : জড়-পরিণামের বর্তমান পর্বে শক্তি চেতনা ও আধারের যে-রূপই ফুটুক আমাদের মাঝে, তা কখনও শাশ্বত নয় ; তারও পেছনে আছে এক বিপুল স্বরূপশক্তির নিগূঢ় আবেশ, আমাদের জীবন যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বহির্ব্যক্তি মাত্র। স্থূল দেহকে সৃষ্টি করেই নিঃশেষিত হয়নি আমাদের রূপধাতুর সামর্থ্য ; এ তো শুধু চিৎশক্তির মৃন্ময় পীঠ, তার মূলাধার, তার প্রবর্তনার আদিবিন্দু। জাগ্রৎ-চেতনার পিছনে আছে যেমন অবচেতন ও অতি-চেতন ভূমির বিপুল প্রসার, যার অপ্রাকৃত দীপ্তি কখনও ঝিলিক হানে আমাদের চিত্তে ; তেমনি স্থূল অন্নময় আধারের পিছনেও প্রচ্ছন্ন আছে রূপধাতুর আরও কত সূক্ষ্ম স্তর, যাদের বিপুল বীর্য ও নিগূঢ়চ্ছন্দে বিধৃত রয়েছে এই দেহপিণ্ড। যে চিদ্‌ভূমিতে রয়েছে তারা, তার মাঝে অবগাহন করলে প্রাকৃত জড়পিণ্ডেও

আমরা নামিয়ে আনতে পারি তাদের বীর্য এবং ছন্দ, মর্ত্য জীবনের মূঢ় সংবেগ ও সংস্কারের স্থূল সঙ্কোচকে পরাভূত করে ফুটিয়ে তুলতে পারি ঊর্ধ্বলোকের পরিশুদ্ধ ও নিবিড় চেতনা। তাই যদি হয়, তাহলে পশুরই মত জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্বশাসিত অচরিতার্থ প্রাণবাসনার তাড়নায় ক্ষুব্ধ-বিকল এই-যে সাধারণ জীবন আমাদের—যার মাঝে পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য দুর্লভ কিন্তু একান্ত সুলভ ব্যাধি ও বিপর্যয়, তাকে অতিক্রম করেই সার্থক হবে এক মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা এই পৃথিবীর বুকে। যুক্তিসিদ্ধ সত্যদর্শনের 'পরে সে-সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা; অতএব তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না স্বপ্ন বা মরীচিকা বলে। এতকাল ধরে যা ভেবেছি জেনেছি কি অনুভব করেছি আমরা জীবনের ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত রহস্যের সম্পর্কে, এই অভাবনীয়ের সম্ভাবনার পানেই তাদের সুস্পষ্ট ইশারা।

বাস্তবিক এ তো অযৌক্তিক নয় কিছুই। বিশ্বতত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা এমনি ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের আধারে যে, তাদের একটিকেও অনর্থজ্ঞানে বর্জন করে অপরকে করা যায় না প্রমুক্তির দিব্যচ্ছন্দে লীলায়িত। জড় হতে অতিমানসভূমিতে মানুষের উত্তরায়ণ সম্ভব হলে তার রূপধাতুতেও দেখা দেবে অনুরূপ ঊর্ধ্ব-পরিণাম: এই দেহই রূপান্তরিত হবে বিজ্ঞানময় অথবা হিরণ্ময় দেহে, যা অতিমানসী চেতনার যোগ্য আধার। সত্তার অবর বিভূতিসমূহকে জয় করে অতিমানস যদি দিব্যপ্রাণন ও দিব্যমননের নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের দেয় মুক্তি, তাহলে অতিমানস-ধাতুর বীর্যে জড়ত্বের সমস্ত সঙ্কোচ পরাভূত হয়ে এই দেহই কেন জ্বলে উঠবে না ধাতু-প্রসাদের মহিমায়? তার অর্থ: শুধু-যে নিরঙ্কুশ চেতনার উন্মেষ হবে এই আধারে, অথবা স্থূল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অপূর্ণ সঞ্চয়ের 'পরে নির্ভর ক'রে যে মন ও ইন্দ্রিয়চেতনা রুদ্ধ হয়ে আছে জড়ময় অহঙ্কারের কারাগারে, তারাই যে শুধু মুক্তি পাবে, তা নয়; —প্রাণ-শক্তিও জড়ের আড়ষ্টবন্ধন হতে ছাড়া পেয়ে স্ফুরিত হবে নবীন বীর্যে, দিব্যপুরুষের উপযুক্ত ভোগায়তনরূপে এই পার্থিব আধারেই উন্মেষিত হবে এক নবীন জীবন, মৃত্যুঞ্জয় মানব এইখানেই অর্জন করবে পার্থিব অমৃতত্বের অধিকার—বর্তমান দেহের প্রতি আসক্তিতে নয় কিংবা তারি মাঝে আবদ্ধ থেকে নয়, কিন্তু স্থূলদেহের নিয়তি-কৃত নিয়মকে স্বাতন্ত্র্যের মহিমাতেই অতিক্রম করে।...এ শুধু স্বপ্ন নয়, এ সত্য; কেননা দ্যুলোকের 'মধ্ব উৎসঃ' হতে, অনাদি স্বরূপানন্দের নিরন্ত নির্ঝর হতে 'অমৃতত্বের

# রূপধাতুর উৎক্রমণ

ঈশান' সেই পরম-দেবতা অবিরাম এই মনোময় প্রাণভৃৎ মর্ত্যতনুতে ঢালছেন পবমান সোমের দিব্যধারা,—যা প্রতি কোশের অণুতে-অণুতে সঞ্চারিত হয়ে এই অন্নময় আধারকেই রূপান্তরিত করছে হিরণ্ময়ী সত্ত্বতনুতে।

২৭

# সত্তার সপ্ততন্ত্রী

মন দিয়ে ধরতে পারি না, তাই তো শুধাই অন্তরে নিহিত দেবতাদের এই পদের কথা। একবছরের শিশুকে ঘিরে সাতটি তন্তু জড়িয়ে দিলেন কবিরা এই বুনানিতে।
—ঋগ্বেদ ( ১।১৬৪।৫ )

সন্মাত্রের যে-সপ্তবিভূতিকে প্রাচীন ঋষিরা জানতেন বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও সপ্তধা ব্যাকৃতিরূপে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় এতক্ষণে আমরা ধরতে পেরেছি চিৎশক্তির সংবৃতি ও বিবৃতির সকল ক্রম এবং তারি মাঝে খুঁজে পেয়েছি আমাদের ঈপ্সিত জ্ঞানের প্রথম সূত্র। আরও জেনেছি, এক বিশ্বোত্তীর্ণ এবং অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহাত্রিপুটীই ব্রহ্মের স্ব-ভাব,—এবং তাই বিশ্বের সকল বস্তুর নিদান ও আধার, আদিতে ও অবসানে তাই তাদের তত্ত্বরূপ। চৈতন্যের দুটি বিভাব : একটি তার ভা-রূপ, আর-একটি কৃতি-রূপ ; একটি আত্মসংবিতের প্রতিষ্ঠা ও বীর্য, আর-একটি আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও বীর্য। স্বরূপ-স্থিতিতেই হোক অথবা স্পন্দ-বৃত্তিতেই হোক, চৈতন্যের এই দুটি বিভাবই থাকে ব্রহ্মসত্তায় অন্তর্গূঢ়। তাই বিসৃষ্টিতে সর্বেশনাময়ী আত্মসংবিৎ দ্বারা যেমন তিনি জানেন আত্মনিহিত বীজভাবকে, তেমনি আবার সর্ববিৎ আত্মশক্তির দ্বারা উৎপাদন ও শাসন করেন বিশ্বসম্ভূতির লীলায়নকে। সর্ব-সতের এই সিসৃক্ষার চিৎ-কন্দ নিহিত রয়েছে সম্ভূত-বিজ্ঞান বা অতিমানসের তুরীয় পর্বে। সেইখানে স্বয়ম্ভাব ও স্বয়ং-সংবিতের সঙ্গে এক হয়ে আছে এক দিব্য প্রজ্ঞা এবং ঐ প্রজ্ঞারই ছন্দে গাঁথা এক সত্য-সঙ্কল্প—ধাতু এবং প্রকৃতিতে যা আত্মচেতন স্বয়ম্ভাবেরই জ্যোতির্ময়ী সিসৃক্ষার প্রাণচঞ্চল রূপ। এই প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের যুগললীলাই নিখিল বিশ্বের গতি রূপ ও ধর্মকে বিধান করছে স্বরূপ-সত্যের ঋতময় প্রশাসনে—সর্বভূতের ভাবরূপকে অটুট রেখে।

## সত্তার সপ্ততন্ত্রী

একত্ব আর বহুত্বের দ্বিদলে একটা ছন্দের হিল্লোল যেন এই বিশ্বলীলা। এক অনাদি অখণ্ড চেতনার বিভূতিরূপে এ যেমন ভাব শক্তি ও রূপের অন্তহীন বিচিত্র পসরা, তেমনি এক শাশ্বত একত্বই এর স্বরূপ,—যার বৃন্তে ফুটে উঠেছে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রদল লীলাকমল 'সন্মূল, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ' হয়ে। অতিমানসেরও মাঝে তাই দেখা দিয়েছে সংজ্ঞান আর প্রজ্ঞানের যুগল ছন্দ : অখণ্ড-স্বরূপের প্রত্যয় হতে বহুধা-রূপায়ণের ভাবনায় পরিকীর্ণ হয় তার সংবিতের সহস্ররশ্মি ; সে-আলোকে তার সংজ্ঞান তাদাত্ম্যানুভবের আবেশে বিশ্বকে অনুভব করে বহুধা-বিচিত্র অদ্বয় তত্ত্বরূপে, আবার তার প্রজ্ঞান নিজের মাঝেই বিবিক্তরূপে দর্শন করে নিখিল পদার্থকে নিজেরই প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের বিষয়রূপে। তার অনাদি আত্মসংবিতে এই বিশ্বনিখিল এক সত্তা এক চৈতন্য এক দিব্যক্রতু এক স্বরূপানন্দের উল্লাসে স্তব্ধ,—তার মাঝে সমগ্র বিশ্বলীলা একটি অখণ্ড স্পন্দ মাত্র ; অথচ সেই ভূমিকাতেই চলছে এক হতে বহুতে, আবার বহু হতে একে অবরোহ এবং আরোহের খেলা—ঋতম্ভরা কৃতির দৈবী মায়ায়। তার মাঝে আছে খণ্ডভাবের আভাসমাত্র—এখনও যা ধরেনি অপরিহার্য বাস্তবের রূপ :—তাকে বলা যেতে পারে একটা অতিসূক্ষ্ম স্বগতভেদের লীলা অথবা অখণ্ডেরই মাঝে আত্মবিশ্লেষণের একটা কল্পরেখা শুধু। অতিমানসই সেই দিব্যবিজ্ঞান, যাতে ব্রহ্মাণ্ডের বিসৃষ্টি বিধৃতি ও প্রশাসন ; এ সেই অন্তর্গূঢ় পুরাণী প্রজ্ঞা—যা হতে আমাদের বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই হয়েছে প্রসৃত।

আমরা এও জেনেছি : মন প্রাণ আর জড় লোকোত্তর দিব্যচেতনারই একটা ত্রিধা বিকল্প ; বিশ্বে অবিদ্যার আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি ; —অখণ্ডের বহুধাবিচিত্র খণ্ডলীলায় তারা আপাতিক আত্মবিস্মরণের একটা ভান মাত্র। অদিব্য হলেও স্বরূপত দিব্য-চতুষ্টয়েরই অবর-বিভূতি তারা। এই যেমন : মন অতিমানসের একটা অবর-বিভূতি—খণ্ডভাবনার প্রয়োজনে ব্যবহারদশায় ভুলেছে সে অন্তর্গূঢ় অখণ্ডতাকে, যদিও অতিমানসের প্রদ্যোতনায় আবার সে ফিরে যেতেও পারে অখণ্ডভাবের মাঝে। প্রাণও তেমনি সচ্চিদানন্দেরই তেজোবিভূতির অবর প্রকাশ ; মনের খণ্ডকল্পনাকে আশ্রয় করে চিৎতপসের বিভূতিকে ফুটিয়ে তুলছে সে রূপে-রূপে—এই তার শক্তিলীলা। আবার আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তির এ-প্রতিভাসকে সিদ্ধ করতে সচ্চিদানন্দ যখন তাঁর আত্ম-সত্তাকে ঘনীভূত করেন দ্রব্য-সত্তাতে, তখন তাই ধরে জড়ের রূপ।

তারও পরে দেহ-প্রাণ-মনের চিৎ-কন্দে দেখা দেয় চতুর্থ একটি তত্ত্ব, আমরা জানি যাকে পুরুষ বলে। তার দুটি রূপ : একটি ফুটেছে বাইরে কাম-পুরুষ হয়ে—রসের পিপাসায় নিরন্তর সে আকুল ; আর-একটি আছে অনেক-খানি বা পুরোপুরি তারি আড়ালে চৈত্য-পুরুষরূপে—চিৎ-পুরুষের সারগ্রাহী অনুভব সঞ্চিত হয় যার মধ্যে। এই তুরীয় মানুষ-তত্ত্বকে আমরা গ্রহণ করেছি সচ্চিদানন্দেরই আনন্দব্যক্তিরূপে—যদিও তার প্রকাশ ঘটে আমাদের প্রাকৃত-চেতনার ধারা ধরে, জগতের জীবপরিণামের ছন্দ মেনে। ব্রহ্মের সদ্-ভাব স্বরূপত এক অনন্ত চৈতন্য ও তারি স্বধার বীর্য ; তেমনি তাঁর অনন্ত চৈতন্যও স্বরূপত এক অন্তহীন বিশুদ্ধ আনন্দমাত্র—স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বগত-সংবিৎ যার তত্ত্ব। বিশ্ব ব্রহ্মের 'আনন্দরূপং যদ্ বি-ভাতি,' তাঁর স্বরূপানন্দের উল্লাস। বিরাট-পুরুষ এই উল্লাসের সম্যক ভর্তা ও ভোক্তা, কিন্তু ব্যষ্টি-নরে অবিদ্যা ও খণ্ড-ভাবের প্ররোচনায় তা উপসংহৃত হয়ে আছে অধিচেতনা ও অতিচেতনার মাঝে ; তাই তাকে খুঁজে পেতে ও ভোগ করতে হলে উত্তারের পথে জীব-চেতনাকে চলতে হয় বিশ্বাত্মিকা ও বিশ্বোত্তীর্ণা চেতনার সমুদ্র-সঙ্গমের পানে।

তাহলে আটটি* বিশ্বতত্ত্ব পাই আমরা সাতটির জায়গায়। যদি এই ভাবে সাজাই তাদের—

| | |
|---|---|
| সৎ | জড় ( অন্ন ) |
| চিৎ-শক্তি | প্রাণ |
| আনন্দ | পুরুষ |
| অতিমানস | মন |

তবে তার প্রথম সারিটি হবে দিব্যচেতনা ; আমাদের প্রাকৃত চেতনা হবে তারি বিচ্ছুরণ—দ্বিতীয় সারিতে। এমনি করে আমাদের মাঝে দিব্যচেতনার অব-তরণ এবং দিব্যচেতনার মাঝে আমাদের উত্তরণ—এই তো বিশ্বলীলার ছন্দ।

বিশুদ্ধ সদ্-ভাব হতে বিশ্ব-ভাবে নেমে আসছেন ব্রহ্ম সংবিৎ-শক্তি ও হ্লাদিনী-শক্তির লীলায়, তাঁর অতিমানসী সিসৃক্ষাকে বাহন করে ; আমরাও তেমনি জড়-ভাব হতে উঠছি ব্রহ্ম-ভাবের পানে প্রাণ পুরুষভাব ও মনের ক্রমিক উন্মেষে, অতিমানসের প্রচেতনাকে আশ্রয় করে। পরার্ধ আর অপরার্ধ দুয়ের গ্রন্থি মন আর অতিমানসের সঙ্গমতীর্থে—সেইখানেই আছে কঞ্চুকের

---

* সাধারণত সাতটি রশ্মির কথা বলেছেন বৈদিক ঋষিরা ; কিন্তু আটটি, নয়টি, দশটি এমন-কি বারটি রশ্মিরও উল্লেখ আছে বেদে।

এক আবরণ। এই কঞ্চুকের বিদারণেই মানুষের মাঝে ফোটে দিব্যজীবনের সিদ্ধবীর্য। তখন অবর-সত্তার লেলিহান অগ্নিশিখা বিপুল সংবেগে উত্তীর্ণ হয় যেমন দ্যুলোকের পরম-ব্যোমে, তেমনি পর-সত্তার সোমধারা সপ্তসিন্ধুর কলকল্লোলে নেমে আসে এই চেতনাতে ;—এই মানুষই তখন মহাভৈরবরূপে সে-অলকানন্দাকে ধারণ করে তার জটাজালে, এই মাটির বুকেই বইয়ে দেয় তার উদ্দাম প্রবাহ মহাসমুদ্রের সঙ্গম ব্যাকুলতায়। এই মন তখন অতিমানসের মাঝে খুঁজে পায় সম্ভূতি-সংবিতের বিপুলতা, সর্বাত্মভাবের উচ্ছলিত আনন্দে পুরুষ ফিরে পায় তার দিব্যসম্ভোগের সামর্থ্য, চিৎশক্তির অকুণ্ঠ বিচ্ছুরণে প্রাণ পায় তার দিব্যবীর্যের স্বাধিকার, দিব্য সদ্‌ভাবের স্বচ্ছ আধাররূপে চিন্ময় স্বাচ্ছন্দ্যে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে এই জড় দেহ। এই তো বিশ্ব-বিবর্তনের পরম তাৎপর্য। আজ প্রকৃতির যুগব্যাপী সাধনা মঞ্জরিত হয়েছে মানুষের মাঝে ; সে কি পর্যবসিত হবে অস্তিত্বের অর্থহীন আবর্তনে এবং নিয়তির মূঢ়-চক্র হতে ব্যক্তির কৃচিৎ-মুক্তিতে ? চিৎ আর জড়ের মাঝে আজ মানুষই দাঁড়িয়ে আছে তপস্যা-শক্তির বিপুল বীর্য ও বৃহৎসামের অনির্বাণ আকূতি নিয়ে। তার এই বিরাট স্বপ্ন কি ভেঙে যাবে হতাশ্বাসের রূঢ় আঘাতে ? একদিন জেগে উঠে সে কি দেখবে—সমস্ত জীবন একটা মায়ার ছলনা, বিশ্বের সাধনা নিরর্থক একটা আয়াস মাত্র,—অতএব বিশ্বের সম্পূর্ণ নিরাকৃতিতেই আছে একমাত্র সত্য ও সান্ত্বনা ?···কিন্তু এ তো শুধু মনের মায়া আমাদের। অখণ্ড দর্শনে, চেতনার অনন্ত ব্যাপ্তিতে সমস্তই যে প্রাণময়, চিন্ময়, আনন্দময়,—বিশ্বের প্রমুক্ত প্রাণের হিল্লোলে কোথায় বন্ধন ? ব্যক্তির ক্বচিৎ-মুক্তির কল্পনা মনের নিরূঢ় পঙ্গুতাজন্য সংস্কার মাত্র। তাই বিশ্বকে পরিহার করে নয়, তার হিরণ্ময় রূপান্তরেই প্রকাশ পায় মানুষের সাধনবীর্য এবং তাতেই বিশ্বলীলার চরম ও পরম পর্যবসান।

কিন্তু মনন ও সাধনার যে অনুকূল পরিবেশে এই দিব্য রূপান্তর তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হতে বাস্তব সম্ভূতির বীর্যে হবে স্ফুরিত, তার সম্যক আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের ভাবতে হবে অনেক-কিছুই। সচ্চিদানন্দের বিশ্বরূপে অবতরণের তত্ত্বটিই আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি এতক্ষণ ; কিন্তু আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে সে-অবতরণ সার্থক হয়েছে কোন বিপুল ঋতায়নে, কী-ই বা তাঁর চিৎশক্তির প্রকটলীলার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, তার আলোচনা আমরা করিনি এখনও।···প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আলোচিত সাতটি

বা আটটি তত্ত্বের প্রত্যেকটিই অনুস্যূত হয়ে আছে বিশ্ব-বিসৃষ্টির সর্বত্র, অতএব আমাদের মাঝেও রয়েছে তারা ব্যক্ত কিংবা অব্যক্তরূপে; কেননা বেদের ভাষায় এখনও আমরা "একবছরের শিশু মাত্র"—পরা-প্রকৃতির পূর্ণ-যুবক সন্তান হতে এখনও আমাদের ঢের দেরি। সৎ-চিৎ-আনন্দের পরা-ত্রিপুটীই সর্বভূতের উৎস ও প্রতিষ্ঠা—তাঁরি মাঝে লীলায়িত তারা; এই নিখিল বিশ্ব তাঁর স্বরূপসত্তার প্রকাশ এবং বিসৃষ্টি। সর্বশূন্য অসৎ হতে ফুটেছে বিশ্বের রূপরেখা এবং তারি মাঝে ভাসছে সে পরম নাস্তিত্বের বুদ্বুদরূপে—একথা অশ্রদ্ধেয়। এ-বিশ্ব হয় অনন্ত অরূপ-সতের বিলাস, নয়তো সেই সর্ব-সতেরই আত্মরূপায়ণ। বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে আমরা অনুভব করি, তার এ-দুটি রূপই যুগপৎ সত্য; অর্থাৎ সেই সর্বসৎই হয়েছেন এই বিশ্বরূপ অন্তহীন ছন্দলীলায়—দেশ ও কালের দোলায় দুলিয়ে দিয়ে তাঁর আত্মপ্রসারণের চিন্ময় বিলাস। আধার ছাড়া ক্রিয়া অসম্ভব; তাই বিশ্বলীলার আধাররূপে স্ফুরিত হল তাঁর সন্ধিনীশক্তি—উপনিষদের ভাষায় যা 'অমৃতস্য সেতুঃ লোকা-নাম্ অসংভেদায়।' আবার এই সন্ধিনীশক্তির মূলে রয়েছে এক অনন্ত সংবিৎ-শক্তির বিলাস, কেননা এক সর্বনিয়ামক বিশ্বম্ভর ক্রতুই সে-শক্তির স্বরূপ, যা বিশ্বের সকল বিভূতিকে গ্রহণ করে আত্মচেতনার পর্যায়রূপে। বিশ্বক্রতুর এই গ্রহণ ও নিয়মন সম্ভব হত না, যদি তার বিশ্বসংবেদনের অধিষ্ঠানরূপে না থাকত এক সর্বাবগাহী সম্ভূতি-সংবিৎ। শুদ্ধ-সন্মাত্রের আত্মবিভাবনারূপী যে বিচিত্র কলনাকে জানি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বলে, এই সম্ভূতি-সংবিৎ হতেই তার উদ্ভব, তারি মাঝে তার ধৃতি স্থিতি ও বিচ্ছুরণ।

শেষ কথা: চৈতন্য যখন সর্ববিৎ ও সর্বেশ্বর—অকুণ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার জ্যোতিতে প্রভাস্বর, আর এই জ্যোতির্ময় আত্মপ্রতিষ্ঠা নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপবিশ্রান্তি বলে স্বভাবতই আনন্দরূপ যখন, তখন এক বৃহৎ সর্বগত স্বরূপানন্দই বিশ্বভাবের নিদান স্বরূপ এবং তাৎপর্য। উপনিষদের ঋষি তাই বলেন, 'যদি এই সদা-নন্দের সর্বাবগাহী আকাশ না থাকত আমাদের আয়তনরূপে, এই আনন্দই যদি না হত আমাদের চিদাকাশ, তাহলে কে বাঁচত, কে-ই বা ফেলত নিঃশ্বাস?' এই আত্মানন্দ হতে পারে প্রাকৃত চেতনায় অব্যক্ত—অবচেতনায় নিগূঢ়; কিন্তু তবু সত্তার মর্মমূলে চাই তার অধিষ্ঠান, সমস্ত জীবন হওয়া চাই তার এষণায় তারি সম্ভোগের আকূতিতে চঞ্চল। তাই তো দেখি, বিশ্বের যে-কোনও জীব যতই নিবিড় করে নিজেকে পায় অবন্ধ্য সঙ্কল্পে ও বীর্যে, প্রদীপ্ত জ্যোতিতে

বিজ্ঞানে, উদার স্থিতিতে ও ব্যাপ্তিতে, উচ্ছ্বসিত প্রেমে ও আনন্দে,—ঐ গুহাহিত আনন্দসংবিতের স্পর্শ ততই তাকে করে উন্মনা। সত্তার উল্লাস, তত্ত্বদর্শনের আনন্দ, সিদ্ধ সঙ্কল্প বীর্য ও সিসৃক্ষার উন্মাদনা, প্রেম-সামরস্যের আত্মহারা রসোদ্গার—প্রাণ-প্রসারের এই তো রীতি বিশ্ব জুড়ে; কেননা বিশ্ব-সত্তার মর্মমূলে—তার অনালোকিত তুঙ্গশিখরে, কাঁপছে এই আনন্দ-বেদনারই মুগ্ধ শিহরন। অতএব যেখানে ফুটেছে বিশ্বের রূপ, সেখানেই তার অন্তরে ও অন্তরালে আছে এই দিব্যত্রয়ীর লীলায়ন।

কিন্তু অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ কেন প্রতিভাসরূপে আপনাকে করবে বিসৃষ্ট? আর যদিই-বা করে, সে তো ধরবে না কখনও বিশ্ব-রূপ—তার অন্ত-হীন অভিব্যঞ্জনায় থাকবে না কোনও ঋতের শাসন অথবা সম্বন্ধের যোগাযোগ। তাই মহাত্রিপুটীর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় চতুর্থ একটি বিভাব,—আমরা বলেছি যাকে অতিমানস অথবা দিব্য প্রজ্ঞা। প্রত্যেক বিশ্বে থাকবে এক দৈব বিজ্ঞান ও সঙ্কল্পের বীর্য, যা অন্তহীন সম্ভূতির অব্যাকৃতিকে বিশিষ্ট সম্বন্ধে করবে ব্যাকৃত, বীজভাব হতে ফুটিয়ে তুলবে ফলিত পরিণাম, বিশ্ব-বিধানের বিপুল ছন্দসমূহকে করবে লীলায়িত, অনন্ত-অমৃত কবি ও শাস্তারূপে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসন করবে দিব্যদৃষ্টির প্রদ্যোতনায়।* এই বীর্য সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপশক্তি। যা নিহিত নাই তার স্বয়ম্ভূ-সত্তায়, এমন-কিছু সে সৃষ্টি করে না কখনও। তাই বিশ্বের সকল ঋতময় বিধানই প্রবর্তিত হয় অন্তর হতে,—কেউ তারা আগন্তুক নয়; সমস্ত পরিণতিই আত্মস্ফুরণ মাত্র। বস্তুর বীজে আছে তার স্বরূপসত্যের ভ্রূণ, বস্তুর পরিণামে স্ফুরিত হয় সেই বীজেরই নিগূঢ় সামর্থ্য। বিধিমাত্রেই 'ব্রত' অর্থাৎ অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির একটি স্বাভীষ্ট-ধারা, অতএব সমস্ত বিধিই অনৈকান্তিক অর্থাৎ সত্তার অন্তহীন সম্ভূতির একটি মাত্র বিভূতি। প্রত্যেক বস্তুতে নিহিত আছে অনবশেষ সম্ভাবনা—নিরূপিত রূপ ও রীতিকে ছাপিয়ে; অন্তর্গূঢ় অন্তহীন স্বাতন্ত্র্যের বশে বিজ্ঞানের যে আত্মসঙ্কোচ, তাই ফোটে বস্তুধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়ে। এই আত্মসঙ্কোচের সামর্থ্য স্বভাবরূপে নিহিত আছে অসীম সর্ব-সতের মাঝে। অনন্ত যদি অন্তহীন বৈচিত্র্যে না রূপায়িত করতে পারেন নিজেকে, তাহলে অনন্ত বলা চলে না তাঁকে; তেমনি নির্বিশেষের প্রজ্ঞা বীর্য সঙ্কল্প ও বিসৃষ্টিতে যদি না থাকে

* কবি, মনীষী, স্বয়ম্ভূ তিনি—পরিভূরূপে হয়েছেন সব-কিছু সকল ঠাঁই।

—ঈশোপনিষদ ৮

অন্তহীন আত্মবিশেষণের সামর্থ্য, তবে তাকেই-বা কী করে মানি নির্বিশেষ বলে? এইজন্য বলি, বিশ্বের সমস্ত শক্তি ও সত্তায় অনুস্যূত রয়েছে এই অতি-মানসঋত-চিৎ বা সম্ভূত-বিজ্ঞানরূপে; স্বয়ং অনন্ত হয়েও সান্তলীলার প্রযোজক সে—মহা বিশ্ববিভূতির ঋতময় বিচিত্র সম্বন্ধজালকে সে-ই করছে নিরূপিত, তাদের বিধৃতি ও যোগাযোগ ঘটছে তারি প্রশাসনে। বৈদিক ঋষিদের ভাষায়,—অনন্ত সত্তা, চিতি ও আনন্দ যেমন নামহীনের গুহ্য ও পরম নাম, তেমনি এই অতিমানসও তুরীয় নাম* তাঁর—তৎ-স্বরূপের অবতরণের পথে যেমন তুরীয় সে, তেমনি তুরীয় আমাদের উত্তরণের পথেও।

কিন্তু মন-প্রাণ-জড়ের অবর-ত্রিপুটীও অপরিহার্য বিশ্ব-ভাবনার পক্ষে—পৃথিবীতে অথবা জড়বিশ্বে নিত্যদৃষ্ট কুণ্ঠিত রূপ ও বৃত্তি নিয়ে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তাদের জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মবীর্য অপরূপ লীলায়নে। কারণ, মন স্বরূপত অতিমানসেরই বৃত্তি; বস্তুকে সে করে মিত এবং সীমিত, একটি বিশেষ কেন্দ্র হতে দেখে বিশ্বলীলার ঘাতপ্রতিঘাত। এমন ভূমি অথবা লোক, কিংবা বিশ্ব-ব্যাপারে এমন ব্যবস্থাও আছে, মন যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সীমার বাঁধন; হয়তো সেখানে মনকে গৌণ-বৃত্তিরূপে ব্যবহার করছে যে-পুরুষ, তার আছে অন্য কেন্দ্র বা ভূমি হতেও দেখবার সামর্থ্য—এমন-কি বিশ্বের পরবিন্দু হতে অথবা বিশ্বব্যাপ্ত আত্মবিকিরণের বৃহৎ ভাবনায় বিশ্বকে দর্শন করাও অসম্ভব নয় তার পক্ষে। কিন্তু তবু 'দিব্যকর্মে'র বিশেষ প্রয়োজনে তার যদি না থাকে একটা নিজস্ব ভূমিতে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করবার সামর্থ্য, অমনীভাবের ভূমিতে যদি থাকে শুধু বিরাট আত্মবিকিরণের জ্যোতিরুচ্ছ্বাস, অনন্ত চিদ্‌বিন্দুর বিচ্ছুরণে যদি না থাকে স্ব-তন্ত্র আত্মবিশেষণের অথবা আত্মসংহরণের সম্ভাবনা,—তাহলে বিশ্বের বিসৃষ্টি সম্ভব হয় না সেখানে। আমরা সে-ভূমিতে পাই শুধু এক দিব্য-পুরুষের আত্মগত অন্তহীন ভাবনা—শিল্পী বা কবির স্ব-তন্ত্র অথচ অরূপ ভাবনার মত, যার মাঝে এখনও ফোটেনি বিশিষ্ট সৃষ্টির কোনও কল্পনা। সত্তার অন্তহীন প্রসারে কোথাও-না-কোথাও এমন-একটা ভূমি থাকলেও আমরা 'বিশ্ব' বলতে পারি না তাকে; ঋতের যে-ছন্দই থাকুক সে-নিরুপাখ্যের মাঝে, তাতে নাই নিয়ম, নাই বাঁধুনি। অতিমানসের এমন মুক্তচ্ছন্দ ঋতায়ন সম্ভব শুধু তখনই, যখন তার অব্যাকৃত জ্যোতির্বাষ্পময় প্রসরণে দেখা দেয়নি পরি-ণতির বিশিষ্ট ধারা, পরিমিতির রূপরেখা এবং অন্যোন্যসম্বন্ধের চিত্রলীলা।

* "তুরীয়ং স্বিদ্"—তুরীয় একটা-কিছু; 'তুরীয়ং ধাম'ও বলা হয়েছে একে।

এই পরিমিতি ও ক্রিয়া-ব্যতিহারের জন্যই প্রয়োজন হয় মনের—যদিও সে-মন তখনও নিজকে জানবে অতিমানসের গৌণবৃত্তি বলে, তার অন্যোন্য-সম্বন্ধের লীলা তখনও হবে না মর্ত্যপ্রকৃতিতে অবরুদ্ধ সীমিত অহন্তার আশ্রিত।

এমনি করে অতিমানসের সঙ্কল্পে মন দেখা দিলে ফুটবে প্রাণ, ফুটবে রূপধাতুর ব্যাকৃতি। কারণ, শক্তি ও ক্রিয়ার সবিশেষ নিরূপণই প্রাণের ধর্ম—অগণিত নিয়ত চিৎ-কেন্দ্র হতে তেজোবিচ্ছুরণের ব্যতিহারকে নিয়ন্ত্রিত করাই স্বভাব তার। অবশ্য চিৎ-কেন্দ্র নিয়ত হলেও দেশে অথবা কালে নিয়ত নয় তারা ; জগতীচ্ছন্দের সহস্রদলকে ধরে আছেন যে শাশ্বতপুরুষ, তাঁর হিরণ্য-জ্যোতিতে ভাসছে তারা নিত্যসহচরিত অনন্ত চিৎ-কণের সিদ্ধসত্তারূপে। আমাদের পরিচিত বা কল্পিত প্রাণলীলার সঙ্গে এই দিব্য প্রাণলীলার কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও দুয়ের মূলতত্ত্ব একই। প্রাচীন ঋষিরা একেই বলেছেন 'বায়ু' ; বিশ্বের সে-ই প্রাণধাতু বা দিব্যক্রতুর তেজোঘনরূপ—যা রূপে কর্মে চিত্ত-লীলায় নিজেকে ব্যাকৃত করছে বিশ্বময়। তেমনি স্থূলদেহের অনুভব হতে যে-রূপধাতুর কল্পনা করি আমরা, সেও যথার্থ নয় ; কেননা রূপধাতুর প্রকৃতি আরও সূক্ষ্ম,—জড়ভূতের মত আড়ষ্ট কঠিন নয় তার আত্ম-বিভাজন ও অন্যোন্য-প্রতিরোধের বৃত্তি। তত্ত্বত দেহ আর রূপ চিৎশক্তির সাধনমাত্র—কারাগার নয় তার ; তবু বিশ্বময় ক্রিয়াব্যতিহারে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট সংহনন একান্ত প্রয়োজন—এমন-কি সে-সংহনন যদি প্রকাশ পায় মনোময় তনুতে, অথবা তারও চেয়ে সুসূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় সত্ত্বতনুতে—যার বীর্য ও স্বাতন্ত্র্যের চিন্ময় বিলাস কামচারী মনের সূক্ষ্মতম লীলাকেও গেছে ছাপিয়ে—তাতেই-বা ক্ষতি কী।

অতএব যেখানেই বিশ্ব আছে, সেখানেই আছে পরমার্থসতের ঐ সপ্ত-রশ্মি বর্ণালির বিচ্ছুরণ। পরস্পর তারা ওতপ্রোত হলেও কখনও কোথাও দেখা দেয় একটি তত্ত্ব স্বপ্রধান হয়ে প্রথমত ; তারপর আর যা-কিছু ফোটে, মনে হয় ঐ প্রধানেরই রূপায়ণ এবং পরিণাম তারা, বিশ্বব্যাপারে কোনও স্বয়ং-সিদ্ধ সত্তাই যেন তাদের নাই। কিন্তু এ-ধারণা ভুল ; মায়ার মুখোসে তত্ত্বের রূপটি ঢেকে বিশ্বের এ একটা লুকোচুরির খেলা শুধু। একটি তত্ত্বের প্রকাশ যেখানে, জানতে হবে আর-সব তত্ত্বই তার পিছনে আছে—নিশ্চেষ্টভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে নয় শুধু, নিগূঢ় শক্তিসঞ্চারের ব্রতকে বহন করেই। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে হয়তো সত্তার সাতটি তন্ত্র স্বরমূর্ছনায় বেজে উঠেছে তীব্র অথবা কোমল ঝঙ্কারে ; কোথাও হয়তো একটি তন্ত্রের ঝঙ্কার ছাপিয়ে উঠেছে আর-সবাইকে—সেখানে

আর-সব সুর স্তিমিত, সংবৃত। কিন্তু যা সংবৃত তা বিবৃত হবেই—এই তো বিশ্বের শাশ্বত বিধান। একটি তত্ত্বের মাঝে আর-সব তত্ত্বকে সংবৃত রেখে যে-ব্রহ্মাণ্ডে যাত্রা শুরু, সেখানেও একদিন উন্মেষিত হবে সত্তার সপ্তধা বীর্য, ঝঙ্কৃত হবে তার সাতটি নাম।* তাই এই জড়বিশ্বকেও স্বভাবের বশে অন্তর্গূঢ় প্রাণ হতে ফোটাতে হয়েছে ব্যক্ত প্রাণের লীলা, সংবৃত মনকে বিবৃত করতে হয়েছে ব্যক্ত-মনের রূপায়ণে; অতএব এই ধারাতেই অব্যক্ত অতিমানস হতে এর পরে জাগবে তার মাঝে অতিমানসের ব্যক্ত-জ্যোতি, প্রচ্ছন্ন চিৎ-স্বরূপ উদ্ভাসিত হবে সৎ-চিৎ-আনন্দের ভাস্বর মহিমায়। শুধু এই প্রশ্ন: এই পৃথিবীই কি হবে সেই জ্যোতিরুৎসবের রঙ্গভূমি? এই পৃথিবীতে কিংবা অন্য-কোনও পৃথিবীতে, এই যুগে কিংবা মহাকালচক্রের অন্য-কোনও আবর্তনে, এই মানুষই কি হবে তার সাধন এবং আধার? প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বাস করতেন মানুষের এই মহতী সম্ভাবনাকে, একে জানতেন তার দিব্য নিয়তি বলে। আধুনিক মনীষী এর কল্পনাকেও ঠাঁই দেননা মনের কোণে.—ঠাঁই দিলেও তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় হয় নাস্তিক্য নয়তো সংশয়। তাঁর কল্পিত অতিমানব প্রাণময় অথবা মনোময় মানবেরই রাজসংস্করণ মাত্র; কেননা প্রাণ-মনের সীমার কুণ্ডলীকে ছাড়িয়ে তার ওপারে চলে না তাঁর দৃষ্টি। জগতের প্রগতি-অভিযানে এই মানুষের মাঝে যখন সমিদ্ধিত হয়েছে বৃহৎ জ্যোতির দিব্য স্ফুলিঙ্গ, তখন অভীপ্সাকে খর্ব অথবা নির্জিত না করে তাকে উদ্দীপিত করাই তো সুবুদ্ধির পরিচয়। মানুষের অন্তর্গূঢ় বিপুল সামর্থ্যের এই-যে কুণ্ঠাহত আপাত-প্রকাশ, তার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মাঝেই কেন রুদ্ধ থাকবে আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা? জীবনের এ-পর্বকে কেন মনে করব না শুধু গুরুগৃহ-বাসের পর্বরূপে? দৃষ্টিকে যতই করব প্রসারিত, অভীপ্সাকে যতই করব উদগ্র, ততই বিপুলতর সত্যের নিরন্ত নির্ঝর নেমে আসবে এই আধারে, ঋত-ম্ভরা চিৎশক্তির এই তো বিধান; কেননা অনাদিকাল হতে সে-সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের মাঝে—ব্যক্ত প্রকৃতির ছদ্ম আবরণ হতে প্রমুক্তির অনির্বাণ আকূতি তার জ্বলছে এই আধারেরই অণুতে-অণুতে।

* প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই তত্ত্বসংবরণের প্রয়োজন যে আছে, তা নয়: একটি তত্ত্ব মুখ্য, আর-সব গৌণ, অথবা একটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত আর-সব তত্ত্ব, এমন ছন্দও সম্ভব। সুতরাং বিশ্ববিসৃষ্টির ব্যাপারে পরিণামের লীলা অপরিহার্য নয় একেবারে।

## ২৮

# অতিমানস, মানস ও অধিমানসী মায়া

ঋতের দ্বারা সংবৃত আছে এক ধ্রুব, এক ঋত, সূর্য যার মাঝে বিমুক্ত করেন তাঁর অশ্বদের। দশ-শত (রশ্মি তাঁর) একত্র হল—সেই তো অদ্বিতীয় তৎ। দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি।

—ঋগ্বেদ (৫।৬২।১)

হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সংবৃত রয়েছে সত্যের মুখ, তাকে হে পূষা, কর অপাবৃত—সত্যধর্মের তরে, দৃষ্টির তরে। হে সূর্য, হে একর্ষি, ব্যূহিত কর তোমার রশ্মি যত, সমূহিত কর তাদের; তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাই দেখব আমি···ঐ—ঐ যে পুরুষ—সেই তো আমি।

—ঈশোপনিষদ (১৫,১৬)

সত্য—ঋত—বৃহৎ!

—অথর্ববেদ (১২।১।১)

তা হল সত্য এবং অনৃত দুই-ই। তা হল সত্য—এমন-কি এই যা-কিছু।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

একটা বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে আমাদের আলোচনায়—এইবার তাকে স্পষ্ট করতে হবে।—বিশ্বজগৎ কী করে নেমে এল অবিদ্যার অবরলোকে? মন প্রাণ বা জড়ের নিরূঢ় স্বভাবে এমন কিছুই তো ছিল না, যা বিদ্যা হতে তাদের করবে ভ্রষ্ট। অবশ্য এটুকু বুঝেছি আমরা: অবিদ্যার মূলে আছে চেতনার খণ্ডভাব—বিশ্ব- ও তুরীয়-চেতনার অঙ্গীভূত হয়েও, তত্ত্বত তাদের অবিনাভূত হয়েও ব্যষ্টিচেতনা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার উৎস হতে; অতি-মানস সত্যের গৌণবৃত্তি হয়েও মন বিযুক্ত হয়েছে তার থেকে, আদ্যাশক্তির বীর্যবিভূতি হয়েও প্রাণ হয়েছে স্বাধিকারচ্যুত, শুদ্ধ-সতের রূপায়ণ হয়েও জড়

রয়েছে বিবিক্ত হয়ে। খণ্ডভাব আছে জানি; কিন্তু অখণ্ডের মাঝে কী করে দেখা দিল তার বিদার-রেখা, শুদ্ধ-সন্মাত্রে কী করে এল চিৎ-শক্তির এই আত্ম-সঙ্কোচ বা আত্মবিলুপ্তির মায়া, সেকথা স্পষ্ট হয়নি এখনও আমাদের কাছে। নিখিল বিশ্ব যখন কিছুই নয় চিৎশক্তির স্পন্দ ছাড়া, তখন তার পূর্ণ জ্যোতি ও অখণ্ড বীর্যকে কোনও উপায়ে আচ্ছন্ন করেই দেখা দিতে পারে অবিদ্যার এই প্রবেগ ও সাধক পরিণাম। কিন্তু বিদ্যা-অবিদ্যার আলোআঁধারিতে যে গোধূলিলোকের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চেতনায়, অতিমানস সত্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি আর জড় অচিতির অমানিশার মাঝে সেই-যে অনতিব্যক্ত সন্ধিচেতনা, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া অবশ্য এ-সমস্যার সমাধান হবে না। এখন সংক্ষেপে এইটুকুই বলা চলে, চিৎ-পুরুষের বিশেষ-একটি স্থিতি এবং স্পন্দের 'পরে ঐকান্তিক অভিনিবেশই অবিদ্যার স্বরূপ; তারি আড়ালে সত্তা আর চৈতন্যের বাকী অংশ ঢাকা প'ড়ে শুধু ঐ একদেশী খণ্ডজ্ঞানই দেখা দেয় একান্ত হয়ে।

কিন্তু সমস্যার একটা দিকের আলোচনা এখনই করা দরকার। পূর্বে বলেছি, অতিমানস ঋত-চিতের গৌণ-প্রবৃত্তি হতে সৃষ্ট আমাদের মন; অথচ প্রাকৃত মনের সঙ্গে অতিমানসের কী দুস্তর ব্যবধান! চেতনার এই দুটি ভূমির মাঝে যদি না থাকে আরোহ-অবরোহের কোনও সোপানমালা, তাহলে জড়ের মাঝে চিতের নেমে আসা সংবৃত হয়ে, কিংবা উত্তরণের সংগোপন সোপান বেয়ে বিবৃত জড়ের ফিরে যাওয়া চিতের মাঝে—এই দুটি ক্রম শুধু সংশয়িত নয়—হয় অসম্ভব। প্রাকৃত মন অবিদ্যারই বিভূতি—সত্যের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে অন্ধকারে: হাতে ঠেকছে তার মনোময় বিকল্প শুধু এবং তারি নানা ছবি—ভাবে, ভাষায়, সংস্কার আর ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট তুলির টানে;—যেন কোন্ সুদূরের দুর্জ্ঞেয় জ্যোতির্লোকের ছায়াতপের মায়া ওরা!···কিন্তু অতিমানসের আছে সত্যের মাঝে স্বচ্ছন্দ ও বাস্তব প্রতিষ্ঠা; তার রূপায়ণ তত্ত্বেরই সত্য পরিণাম—খেয়াল নয়, ছবি নয়, ছায়া নয় অসিদ্ধ বিকল্পের। অবশ্য মনের পরিণাম আজও শেষ পর্বে পৌঁছয়নি আমাদের মাঝে; অন্নময় ও প্রাণময় কোশের কুহেলিকায় আজও সে রয়েছে আচ্ছন্ন ও পঙ্গু হয়ে। এই প্রাকৃত মনের উৎসরূপী যে-শুদ্ধমন তত্ত্বরূপে নেমে এসেছে জড়ের মাঝে, তার বিপুল বীর্যের সন্ধান আজও পাইনি আমরা। আপন ভূমিতে স্বাধিকারের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য তার, দ্যুলোকের ঝলক তার কৃতিতে, প্রেরণায় তার সূক্ষ্ম-

ছন্দের লীলা, অনাবরণ সত্যের দ্যুতিতে ঝলমল তার রূপায়ণ। কিন্তু তবু তার স্বভাব-ধর্মে কোনও তাত্ত্বিক বৈলক্ষণ্য নাই প্রাকৃত-মন হতে, কেননা এ-মনও অবিদ্যাস্পৃষ্ট, ঋত-চিতের অবিনাভূত বিভাব নয় এ। শুদ্ধ-সন্মাত্রের এই আরোহ-অবরোহের মাঝে নিশ্চয় কোথাও আছে চিদ্‌বীর্যের একটা অন্তরিক্ষ-লোক—এমন-কি দিব্য-সিসৃক্ষারই একটা অনাদি সংবেগ, যার ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে বিদ্যা-মন হতে অবিদ্যা-মনে সংবৃতির ধারা, অতএব যাকে ধরে আবার সম্ভব হবে বিবৃতির উজান-বওয়া। এমন-একটা অন্তরিক্ষলোক থাকা নামবার বেলায় যেমন যুক্তিসিদ্ধ, তেমনি ওঠবার বেলাতেও তার প্রয়োজন পদে পদে। অবশ্য প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামে অন্যোন্য-বিচ্ছিন্ন পর্বভেদ অনেক আছে;—এই যেমন, অব্যাকৃত শক্তি হতে জেগেছে জড়ের ব্যূহ-ভাব, নিষ্প্রাণ জড় হয়েছে প্রাণে সঞ্জীবিত, অবচেতন বা অবমানস প্রাণ হতে ফুটেছে চেতনা বেদনা ও প্রবৃত্তির লীলা, মূঢ় পশুমন মঞ্জরিত হয়েছে মানুষের মাঝে যুক্তি ও কল্পনায়,—শুধু প্রাণেরই নয়, নিজেরও সাক্ষী ও শাস্তা সে, এমন-কি অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের সামর্থ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার সচেতন প্রয়াসও দুষ্কর নয় তার। এসব দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন লাফিয়ে চলেছে এক পর্ব হতে আর-এক পর্বে; তবু দুটি পর্বের মাঝে আছে রূপান্তরের একটা সূক্ষ্ম ক্রম, যার জন্যে কোনও পর্বভেদকেই মনে হয় না অসম্ভব কি অকল্পনীয়। অতএব অতিমানসী ঋত-চিৎ আর অবিদ্যামনের মাঝেও একটা দুস্তর ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়।

দুয়ের মাঝে ক্রমভাবনার একটা অন্তরিক্ষলোক অসম্ভব না হলেও-স্বভাবতই তার স্থিতি হবে কিন্তু প্রাকৃত-মনের এলাকা ছাড়িয়ে, কেননা ব্যবহারিক জীবনে আজ পর্যন্ত তার কোনও আভাস আমরা পেয়েছি একথা তো বলতে পারি না। মানুষের চেতনা সীমিত তার মন দিয়ে; তাও মনের তন্ত্রীর সব পর্দা সে চেনেনা। অবমানস হয়ে যা আছে মনের তলায়, কিংবা মনোধর্মী হয়েও যা তার অগোচর, স্বচ্ছন্দে তাকে মেনে নেয় সে অবচেতন বলে—এমন-কি নিভাঁজ অচেতনা হতেও তফাৎ বোঝে না তার। তেমনি, যা আছে মনের ওপারে, মানুষের প্রাকৃত অনুভবে তা অতিচেতন—এমন-কি তাকে অনুভবশূন্য ভাবতেও দ্বিধা নাই তার; অথবা তার স্তব্ধ চেতনায় সে যেন অচিতির জ্যোতির্ময় তিমির-গুণ্ঠন। যেমন রং বা সুরের অনুভব মানুষের এতই সঙ্কীর্ণ যে বাঁধা কতগুলি পর্দার উপরে-নীচে কিছুই সে ধরতে পারে না, ধরতে গেলে

সব একসা ঠেকে তার কাছে; তেমনি ঘাটবাঁধা তার মনের চেতনা, তার দুই প্রান্তে রয়েছে অসামর্থ্যের অবরোধ, তাকে ডিঙিয়ে উপরে ওঠবার কি নীচে নামবার কৌশল সে জানে না। পশু মানুষের সগোত্র এবং চেতনার পর্যায়ে ঠিক তার নীচের ধাপে, অথচ পশুচেতনার সঙ্গেও যোগাযোগ তার কত সামান্য; পরিচিত মনোলীলার সঙ্গে খাপ খায়না বলেই, পশুর নাই মন বা সত্যিকার চেতনা—এমন কথাও বলতে বাধে না তার। মনোময় চেতনার নীচে যে রয়েছে, তাকে সে দেখতে পায় বাইরে থেকেই, তাই তার সঙ্গে যোগা-যোগ ঘটানো বা তার মর্মে অনুপ্রবেশ করা অসাধ্য তার। অতিচেতন ভূমিও তেমনি মানুষের কাছে বন্ধ-করা বইএর মত—তার পাতাগুলি সাদা কি না তাই বা জানে কে! চেতনার উত্তর-ভূমির সম্পর্কে সচেতন হবার কোনও উপায় নাই, এই কথাই মনে হয় শুরুতে; তাই যদি হয়, তবে আরোহের সোপান-রূপে তাকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। অতএব বর্তমান মনোময় ভূমিতে এসেই ঘটেছে মানুষের প্রগতির ইতি; তার উর্ধ্বমুখী সকল প্রয়াসের 'পরে বিশ্বপ্রকৃতি এইখানেই টেনে দিয়েছে যবনিকা।···

কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি, এ-অবস্থাকে স্বভাবস্থিতি মনে করা আমাদের ভুল। এই প্রাকৃত মনের মাঝেই আছে কত দিগন্তের হাতছানি, যার আহ্বানে মানুষ ছাড়িয়ে যায় নিজেকে, ছুটে যায় কোন্ অজানিতের প্রান্তমূলে। এরাই তো যোগসূত্র তার স্বয়ম্ভূ-চেতনার উত্তরভূমির সঙ্গে—এই তো তার ছায়া-তপে ঢাকা দেবযানের পথ।···দেখেছি, জ্ঞানের সাধনের কতখানি জুড়ে আছে মানুষের বোধি; অথচ বোধি তো ঐ উত্তরভূমিরই স্বভাবধর্মের প্রকাশ—ঝিলিক হানছে অবিদ্যা-মনের অন্ধ-কারায়। সত্য বটে, প্রাকৃত বুদ্ধি মাঝ-খানে পড়ে প্রকাশকে তার অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের চেতনায়, তাই মানুষের মনোজগতে বিশুদ্ধ বোধির দেখা পাওয়া দুর্ঘট এত। আমরা বোধি বলি যাকে, তা অপরোক্ষ-জ্ঞানের একটি স্বচ্ছবিন্দু হলেও দেখতে-না-দেখতেই তাকে ছেয়ে ফেলে প্রাকৃত মনের সংস্কার; তাই মনোময় বা বুদ্ধিময় অনুভবপিণ্ডে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে লুকিয়ে থাকে সে স্বচ্ছ-ভাবনার অতিসূক্ষ্ম একটি অঙ্কুররূপে। আবার কখনও ফুটতে-না-ফুটতেই বোধির ঝলককে গ্রাস করে দ্রুত-বিসর্পী অনুরূপ কোনও মনোবৃত্তি—অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষিপ্র অনুভব বা বিদ্যুৎ-গতি মননের আকারে; আগন্তুক বোধির প্রেতি হতে জন্ম হলেও সে-ই করে তার গতিরোধ, অথবা সত্য-মিথ্যা একটা মনের বিকল্প দিয়ে আচ্ছন্ন করে তার

স্বরূপ। এমনিতর মনের বঞ্চনাকে বোধি বলা চলে না কিছুতেই; তবু উপর হতে ঐ যে নামে আলোর ঝলক, আমাদের প্রত্যেক মৌলিক চিন্তা অথবা যথাযথ দর্শনের পিছনে থাকে যে আচ্ছন্ন অর্ধচ্ছন্ন বা বিদ্যুৎ-চমকের মত স্বপ্রকাশ একটা সম্বুদ্ধ প্রত্যয়, তা হতেই প্রমাণ হয়—একটা সেতু আছে মন আর উন্মনী-ভূমির মাঝে;—বোধির ঐ ক্ষণদীপ্তিতেই খুলে যায় আমাদের সামনে লোকোত্তরের 'দেবীঃ দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ার।...তাছাড়াও মনের মাঝে আছে অতিস্থিতির একটা প্রয়াস,—ব্যষ্টি-অহং-এর সঙ্কোচ কাটিয়ে বিশ্বকে দেখা নৈর্ব্যক্তিক একটা সামান্য-প্রত্যয়ের ভিতর দিয়ে। নৈর্ব্যক্তিকতাই বিশ্বাত্মার 'প্রথম ধর্ম'; যে সর্বগত সামান্য-প্রত্যয়ে নাই একদেশী খণ্ডদৃষ্টির অবচ্ছেদ, তাই হল বিরাটের অনুভব ও বিজ্ঞানের স্বধর্ম। অতএব এই বিরাট-স্বভাবেরই আবেশে সঙ্কুচিত মনের কুঁড়ি ধীরে-ধীরে ফুটতে চাইছে বিরাট-মনের সহস্রদল কমল হয়ে;—কে যেন ঠেলছে তাকে উত্তরমানসের কল্পলোকে, দূর হতে আসছে ভেসে অতিচেতন বিশ্বমনের বাঁশির ডাক—এই অবর-মনেরই স্বরূপ-জ্যোতির অনবগুণ্ঠিত প্রকাশ যার মাঝে।...আবার উপর হতেও সঙ্কুচিত মনের 'পরে নেমে আসে শক্তির আবেশ। আমরা যাকে বলি প্রতিভা, এই আবেশেরই ফল সে। অবশ্য প্রতিভার মাঝে সে-আবেশ থাকে প্রচ্ছন্ন, কেননা উন্মনীভূমির জ্যোতিকে কাজ করতে হয় সীমার সঙ্কোচ মেনে নিয়েই—মনোভূমির বিশেষ-কোনও একটা ক্ষেত্রে। সেখানে তার 'শক্তি-বিশেষ' পায় না ছন্দোবদ্ধ বিবিক্ত কোনও রূপ, তাই প্রায়ই তার কাজ হয় এলোমেলো এবং খাপছাড়া—একটা অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রমত্ত প্ররোচনায়! শুধু তাই নয়, মনের রাজ্যে এসে প্রতিভার আবেশ হয় মনোধাতুরই পরবশ এবং অনুরূপ, তাই তার সঙ্কীর্ণ স্তিমিত সংবেগে থাকে না সহস্রার পরাসংবিতের দিব্য-জ্যোতির্ময় সামর্থ্য।... তারও পরে দেখা দেয় মানুষের মাঝে ঐশী প্রেরণা, অলৌকিক দিব্যদর্শন অথবা প্রাতিভ অনুভব—বহুগুণ ছাড়িয়ে যায় যারা প্রাকৃত-মনের অভাস্বর ও হীনবীর্য বৃত্তিকে। কোথা হতে আসে তারা, কোনও সংশয় আছে কি তা নিয়ে?...পরিশেষে, ভাবক ও অধ্যাত্মচেতার ঐ-যে অগণিত লোকোত্তর-অনুভবের বিচিত্র পসরা, তাকে উপেক্ষা করা চলে কি কোনমতেই? মানুষের সামনে কোন্ সুদূর অতীত হতে খুলে রেখেছে তারা জ্যোতির দুয়ার, যার ভিতর দিয়ে অশেষের দিগন্তে চলে যেতে পারে মর্ত্যচেতনা বর্তমান সঙ্কোচের বাঁধন ছিঁড়ে। কেউ পারে না ঠেকিয়ে রাখতে

আমাদের এই জ্যোতিরভিযান—শুধু জিজ্ঞাসার প্রৈতিহীন অন্ধসংস্কারের মূঢ়তা কিংবা প্রাকৃত-মনের প্রগতিহীন চক্রাবর্তনের দুরাগ্রহ ছাড়া। কিন্তু মানুষের যুগান্তব্যাপী সাধনা লোকোত্তরের কত সম্ভাবিতকে নিয়ে এসেছে আমাদের ঘরের কাছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার কত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত করেছে আমাদের চেতনায়; ঐ অনুত্তর বিজ্ঞানের দিব্য-সম্পদই পূর্বসাধকের সাধনাকে করেছে উত্তরসাধকের গুরু;—আমাদের এই এষণায় সে-বিজ্ঞানের অবিকল্পিত বীর্যকে উপেক্ষা করব—এ-ও কি সম্ভব বা সমীচীন?

চেতনার ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হবার আছে দুটি উপায়; সহজ না হলেও তাদের অসাধ্য বলা চলে না একেবারে। প্রথম উপায়: চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত ক'রে, বহির্মুখ মন আর অধিচেতন অন্তরাত্মার মাঝের আবরণটিকে দীর্ণ করা। এ-কাজটি করা যায় ধীরে-ধীরে—সুকৌশল সাধনায় কিংবা বিপ্লবীর দুর্ধর্ষ প্রবেগ নিয়ে, কখনও-বা হঠধর্মীর অতর্কিত বলাৎকারে। শেষোক্ত পথটি নিরাপদ নয় বলাই বাহুল্য, কেননা মানুষের সঙ্কীর্ণ চিত্ত সুস্থ থাকে অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডির মাঝে, হঠাৎ সে-গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবার বিপদ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিপদ থাকুক আর নাই থাকুক, গণ্ডি যে ছাড়ানো যায়, তাতে ভুল নাই কোনও। অন্তরাত্মার ঐ গহন পুরীতে প্রবেশ করে দেখতে পাই এক অন্তর-পুরুষকে—এক অন্তশ্চর মন, অন্তশ্চর প্রাণ, অন্তশ্চর ভূত-সূক্ষ্ম—আমাদের বহিশ্চর মন প্রাণ দেহের চেয়েও বিপুল যার সামর্থ্য, সাবলীল যার শক্তি, বিচিত্র যার জ্ঞান-বল-ক্রিয়া। বিশেষত এই অন্তশ্চেতনার আছে বিশ্বশক্তির সঙ্গে ভাবে ও কর্মে যোগযুক্ত হবার সহজ সিদ্ধি; ব্যষ্টি দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্কোচকে পরিহার করে আত্মব্যাপ্তির নিরঙ্কুশ মহিমায় নিজেকে অনুভব করতে পারে সে বিশ্বরূপ বলে। আত্মপ্রসারণের ফলে বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সম্যক সাযুজ্য—এমন-কি বিশ্বজড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধও অসম্ভব নয় তার পক্ষে। ···তবু এ-সাযুজ্য মূলা-অবিদ্যারই সাযুজ্য।

এমনি করে অন্তর্লোকে অবগাহন করে দেখি, অন্তরাত্মার আছে উন্মনী-ভূমির জ্যোতির পানে উন্মীলন ও উত্তরায়ণের একটা সহজ সামর্থ্য।—এই হল আমাদের অধ্যাত্মযোগের দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণত তার ফলে আমরা পাই এক স্থাণু নির্বিকার 'বিভুর্ব্যাপী' শান্ত-আত্মার সাক্ষাৎকার, যাঁকে জানি আমাদের অধিষ্ঠানতত্ত্ব ও সর্ববিধ প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি বলে। এইখানে সকল ব্যব-হারের উপশমে, এমন-কি আত্মবোধেরও প্রলয়ে এক অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য তত্ত্ব-

ভাবেও আমাদের ঘটতে পারে পরিনির্বাণ। কিন্তু এই শান্ত-আত্মাকে শুধু আত্মস্বরূপ বলে না জেনে উপলব্ধি করা যায় সর্বভূতাত্মভূতাত্মারূপেও ; তখন বিশ্বসত্তার স্বরূপসত্যরূপে আমরা পাই তাঁর লোকোত্তর অনুভব।···ব্যষ্টি-ভাবের নিঃশেষ পরিনির্বাণে এক কূটস্থ অনুভবের অপ্রকেত নৈঃশব্দ্যে আমরা যেমন পারি নিত্যবিলীন হতে, তেমনি বিশ্বলীলাকে অসঙ্গ পুরুষে অধ্যস্ত-জ্ঞানে এক বিশ্বাতীত অবিচল অক্ষর-স্থিতিতেও পারি প্রতিষ্ঠিত হতে।··· কিন্তু এছাড়াও আছে অতিপ্রাকৃত অনুভবের আর-একটি ধারা, সর্বনিরোধ যার লক্ষ্য নয়। সে-ধারায় চলতে গিয়ে অনুভব করি, লোকোত্তর ভূমি হতে এক বিশাল জ্যোতিঃপ্রপাত জ্ঞান বীর্য আনন্দ বা অলৌকিক বিভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঝরে পড়ছে আমাদের শান্ত-আত্মার 'পরে ; অথচ চিৎস্বরূপের যে লোকো-ত্তর ধামে এই 'বৃহৎ জ্যোতির' উৎসরূপে স্তব্ধ হয়ে আছে তাঁর স্থাণু-স্বভাব, শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার সেই মহিমাতেও উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হয় না আমাদের।··· অনুভবের যে-ধারাই ধরি না কেন, অবিদ্যাচেতনার গণ্ডি ছাড়িয়ে অধ্যাত্ম-চেতনাতেই যে উত্তীর্ণ হই আমরা এমনি করে, একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু সর্বনিরোধের বিপরীত যে-প্রচেতনার কথা বললাম এইমাত্র, তারও আবার থাকতে পারে দুটি ধারা। একটিতে চিৎ-শক্তির উপচীয়মান স্ফুরণকে আমরা অনুভব করতে পারি অব্যাকৃত সামান্য-স্পন্দরূপে ; আর-একটি ধারায় রূপান্তরিত মনশ্চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পারি চিন্ময় মনেরই একটা পর্ব-পরম্পরা। মন অবিদ্যার স্পর্শ হতে নির্মুক্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শুদ্ধ-বিদ্যা বা সদ্বিদ্যার সাধনরূপে। এই শুদ্ধবিদ্যাকে অতিমানস না বললেও বলতে পারি তারি প্রশাসনে বিধৃত এবং তারি জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অলৌকিক ভূমি।

প্রচেতনার সাধনাতেই আমরা পাই ঈপ্সিত রহস্যের সন্ধান—প্রাকৃত-মন হতে অতিমানস-রূপান্তরের পথের খবর। দেখি, মনের ওপারে উত্ত-রায়ণের পথে ধীরে-ধীরে উঠে গেছে সোপানমালা, প্রতি পর্বে উপর হতে আসছে নেমে আরও বিপুল আরও গভীর জ্যোতি ও শক্তির নিঝর, চেতনার তন্ত্রে-তন্ত্রে তীব্রতর আঘাতে রণিত হচ্ছে মনের উদয়নের ছন্দ অথবা উন্মনী ভূমি হতে এই মনের মাঝে তৎ-স্বরূপের শক্তিপাতের বৈদ্যুতী।···প্রথমে অনু-ভব করি, কল্লোলিত সমুদ্রের বিপুল প্লাবনে নেমে আসছে এক স্বয়ম্ভূ-জ্ঞানের বন্যা, মননধর্মী হলেও আমাদের অভ্যস্ত মননের সঙ্গে নাই যার কোনও সাদৃশ্য ;

কারণ এই মননে নাই বস্তুকে খুঁজে-খুঁজে ফেরা, নাই মনগড়া কল্পনার কোনও আভাস, নাই জল্পনা বা কষ্ট করে পাবার এতটুকু আয়াস। এই দিব্য মননে স্বতো-নির্ঝরণে ঝরে পড়ে জ্ঞানের ধারা উত্তর-মনের উৎস হতে,—যার মাঝে আছে সত্যের সুনিশ্চিত লব্ধি, অন্তর্গূঢ় এবং পরাঙমুখ তত্ত্বের তরে নাই ব্যাকুল এষণা। আরও অনুভব করি, এই দিব্য মননের আছে একটি ক্ষেপে জ্ঞানের বিপুল সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করবার এক অপ্রাকৃত সামর্থ্য, আছে এক ঋতময় বিশ্বরূপ—যা সত্যানৃতের মিথুন নয় ব্যষ্টি-মননের মত।· এই ঋতময় মননেরও পরে আছে এক বৃহৎ জ্যোতিঃ—তীব্রসংবেগে উপচিত বীর্য ও অপরা-হত প্রৈতিতে যা টলমল, এক ঋতময় দর্শনের ভাস্বর মহিমা—মনন যার উদার বক্ষে বীচি-বিভঙ্গের লীলামাত্র। বেদ একে বর্ণনা করেছেন ঋতের সূর্য বলে; বস্তুত সূর্যের উপমা অপরোক্ষ-অনুভবে সত্য হয়ে দেখা দেয় এই ভূমিতে। উত্তর-মনের লীলাকে তুলনা করি যদি তপন-দ্যুতির প্রশান্ত প্রভাসের সঙ্গে, তাহলে এই জ্যোতির্মনকে বলতে পারি উদ্ভাস্বর আদিত্যমণ্ডলে যেন পুঞ্জিত বিদ্যুতের প্রভা-তরল বিচ্ছুরণ।···তারও ওপারে দেখি ঋতম্ভরা চিৎশক্তির এক বিপুলতর বীর্যের প্রকাশ—যেখানে দৃষ্টি অনুভব মনন বেদনা ও কৃতি সমস্তই ঋতময়—এক অন্তরঙ্গ ও অবিকল্পিত প্রত্যয়ে সমস্তই সমুজ্জ্বল। তাকে আমরা নাম দিতে পারি বোধি-মন। বুদ্ধির অতীত অপরোক্ষ-অনুভবের সাধনকে আমরা বলেছি 'বোধি'; আমাদের প্রাকৃত প্রাতিভ-জ্ঞান এই স্বয়ম্ভূ-বিজ্ঞানেরই একটা ছন্দলীলা। এই ঋতম্ভরা ঋতাবরী প্রজ্ঞার অরুণচ্ছটায় দীপ্ত হয়ে অবর-মনের মাঝেও কখনও-কখনও ফুটে ওঠে করণহীন সংবিত্তির এক ঝলক। স্পষ্টই বোঝা যায়, এক বিপুলতর ঋতজ্যোতির বাহন এই প্রজ্ঞা, যে-জ্যোতির সঙ্গে আমাদের মনের নাই সাক্ষাৎ যোগাযোগ।···আবার বোধি-মনেরও উৎসমূলে আছে এক অতিচেতন বিরাট মন—অতিমানস ঋত-চিতের সঙ্গে যা নিত্যযোগে যুক্ত। সে বিরাট মনই বিশ্বের চিন্ময় মনোধাতু—অতিমানসের অনাদিপুঞ্জিত সংবেগরূপে নিখিল বিশ্বস্পন্দ ও মনোবীর্যের প্রশাস্তা, অন্তহীন সৃষ্টি-ব্যঞ্জনার সহস্রকিরণে প্রভাস্বর। প্রচলিত মনের সঙ্গে তুলনা হয় না তার; তবুও তাকে বলতে পারি 'অধিমানস'। রেতোধা অধিপুরুষের মত তার জ্যোতির্বিশাল পক্ষপুটে আবৃত করে রেখেছে সে বিদ্যা-অবিদ্যার এই অপরার্ধ—আবার যুক্ত করেছে তাকে ঋতচিতের বিপুল জ্যোতি-র্মহিমার সঙ্গে। পরম সত্যের মুখকে সেই সঙ্গে অপিহিত করেছে সে আমাদের

দৃষ্টি হতে তার হিরণ্ময়-পাত্রের আবরণ দিয়ে—অন্তহীন সম্ভূতির বিপুলব্যঞ্জনায় রচেছে এক আলোর আড়াল, যা যুগপৎ প্রতিকূল এবং অনুকূল আমাদের তত্ত্ব-সন্ধানী মনের অধ্যাত্ম-এষণা ও পুরুষার্থ-সাধনার পক্ষে। এই অধিমানসই তাহলে মন ও অতিমানসের মাঝে আমাদের ঈপ্সিত রহস্য-গ্রন্থি; এই অধি-মানসী শক্তিই পরা-বিদ্যা ও বিশ্বগত অবিদ্যার মাঝে যুগপৎ সংযোগ-বিয়োগের সাধন।

অধিমানস অবিদ্যার ক্ষেত্রে অতিমানসী চেতনার প্রতিভূ—এই তার স্বভাব ও স্বধর্ম। অথবা এ যেন অতিমানসেরই সজাতীয় অথচ বিজাতীয় একটা তিরস্করণী, যার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে তার ক্রিয়া সংক্রামিত হতে পারে অবিদ্যার 'পরে—নইলে পরজ্যোতির সাক্ষাৎ আবেশ গ্রহণ বা সহন করা সম্ভব হয় না তার। অধিমানসের এই ছটাগুলের বিক্ষেপেই দিব্যজ্যোতির স্তিমিত বিচ্ছুরণে দেখা দিয়েছে অবিদ্যার আলো-আঁধারি, দেখা দিয়েছে অচিতির সর্বগ্রাসী অন্ধকারের প্রতীপলীলা। অতিমানস তার সমস্ত সত্যই সংক্রামিত করে অধিমানসে, কিন্তু তার রূপায়ণের ছন্দে ও বিজ্ঞানে থাকে ঋতময়ী দৃষ্টির সঙ্গে অবিদ্যার একটা অস্ফুট অথচ সপ্রয়োজন সূচনা। অতিমানস আর অধিমানসের মাঝে আছে সূক্ষ্ম একটা বিভাজন-রেখা, যার জন্যে অধিমানসের সকল বিত্ত ও সকল দর্শন অতিমানস হতে স্বচ্ছন্দে সংক্রামিত হয়েও চলার পথে একটু যেন বাঁক ধরে আপনা হতেই। অতিমানসের মাঝে আছে বস্তুর স্বরূপ-সত্যের এক অখণ্ড প্রত্যয়—তারি মাঝে সমষ্টি-ভাবনার সঙ্গে নিবিষ্ট হয়ে আছে স্বগত-বৈশিষ্ট্যের বিভূতি-বিজ্ঞান; তাই ব্যষ্টি-ভাবনাও সেখানে অন্যোন্য-চেতনায় অসংভিন্ন এবং ওতপ্রোত। কিন্তু অধিমানসে নাই সমষ্টি-প্রত্যয়ের এই অখণ্ডতা। অথচ বস্তুর স্বরূপসত্যের জ্ঞান অধিমানসেরও আছে; ব্যষ্টিকে সেও জানে সমষ্টির ভূমিকায়; স্বগত-বৈশিষ্ট্যের বিভূতির প্রযোজনাতেও আছে তার অব্যাহত স্বাতন্ত্র্য, কেননা বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান নির্বিশেষ সংবিৎকে ব্যাহত ও পরাভূত করে না তার মাঝে। কিন্তু অধ্যাত্ম-চেতনায় যা অখণ্ড, ক্রিয়াতে তাই যেন অখণ্ডচেতনার সাক্ষাৎ-শাসন হতে বিচ্যুত হয় তার কাছে, যদিও ঐ চেতনার পরেই থাকে তার ক্রিয়ার নির্ভর। অখণ্ড-অদ্বয়ের সম্ভূতি-সংবিতে নিরূঢ় হয়ে আছে যে বিচিত্র বৈভবের মেলা, তার অন্তহীন সংযোগ-বিয়োগের নিরঙ্কুশ প্রতিভাই হল অধিমানসের তপোবীর্য। এই দিব্য-প্রতিভা অনন্ত বৈভবের প্রত্যেকটিতে সঞ্চারিত করে একটি স্বতন্ত্র প্রৈতি, এবং তারি ফলে একান্ত

স্বাতন্ত্র্যের প্রযোজনায় তারা যেন গড়ে তোলে এক একটি বিশেষ জগৎ। অতিমানসী চেতনায় পুরুষ আর প্রকৃতি একই সত্যের দুটি বিভাব মাত্র; এক অদ্বয়-তত্ত্বেরই সত্তা ও স্পন্দরূপে অবিনাভূত তারা, অতএব দুয়ের মাঝে নাই কোনও বৈষম্য অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব। কিন্তু অধিমানসী চেতনায় প্রথম দেখা দিল বিবেকের সুস্পষ্ট বিদার-রেখা; সাংখ্যদর্শনে তাই পরিণত হল অনপনেয় বিভেদের গভীর ক্ষতে। প্রকৃতি আর পুরুষ সেখানে দুটি স্ব-তন্ত্র তত্ত্ব: পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও বীর্যকে স্তিমিত ও পরাভূত করে প্রকৃতি আনতে পারে তাকে আপন বশে, তখন পুরুষ হয় তার রূপ-ক্রিয়ার অনীশ্বর সাক্ষী ও গ্রহীতা শুধু; আবার পুরুষও ফিরে যেতে পারে তার বিবিক্ত স্বরূপাবস্থানে, প্রকৃতির অনাদি জড়ত্বের আবরণকে তিরস্কৃত করে সমাহিত থাকতে পারে স্বারাজ্যের স্ব-তন্ত্র মহিমায়। ব্রহ্মের সমস্ত বৈভব সম্পর্কেই এই কথা: এক আর বহু, সগুণ আর নির্গুণ, ক্ষর আর অক্ষর— সকল দ্বন্দ্বই অতিমানসে সু-ষম, কিন্তু অধিমানসে তারা বি-ষমপ্রায়। এক অদ্বয়তত্ত্বের বিচিত্র বৈভব হয়েও অধিমানসে পায় তারা সমষ্টির স্ব-তন্ত্র কলা-রূপে নিজকে ফুটিয়ে তোলবার প্রৈতি এবং এই বিবিক্ত প্রকাশের চরম পরিণামকে দেয় তারা অবিকল্পিত একটা রূপ। তবু অধিমানসে বিবিক্তভাবের প্রতিষ্ঠা কিন্তু এক অন্তর্গূঢ় পরমসাম্যের 'পরেই; তাই বিভিন্ন বৈভবের মাঝে আছে যত সংযোগ ও প্রস্তারের সম্ভাবনা, যত অন্যোন্যবিনিময় ও ব্যতিষঙ্গের লীলা, তাদের সকলেরই বাস্তব রূপায়ণ নিরঙ্কুশ সে-ভূমিতে।

ব্রহ্মের প্রত্যেকটি বিভূতিকে দেবতা কল্পনা করে বলতে পারি, অধিমানস হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কোটি-কোটি দেবশক্তি; তাদের প্রত্যেকের আছে একটা নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করবার অধিকার, অথচ প্রত্যেক জগতের আছে অপর জগতের সঙ্গে ব্যতিষঙ্গ ও যোগাযোগের সামর্থ্য। বেদে আছে দেব-প্রকৃতির নানারকম বিবৃতি: 'একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এক সৎ, কিন্তু বিপ্রেরা বহু নামে প্রকাশ করেন তাকে, এই হল তার গোড়ার কথা; অথচ, প্রত্যেক দেবতা স্বয়ং যেন সেই সৎ-স্বরূপ, তাঁরি মাঝে আছে সকল দেবতা, তিনিই 'বিশ্বে দেবাঃ'—এমন উপাসনাও আছে; তাছাড়া প্রত্যেক দেবতাই বিবিক্ত—কখনও তিনি দেবতাদ্বন্দ্বে সম্মিলিত, কখনও-বা অপর দেবতার বিরুদ্ধচারী, এমন কথাও আছে। অতিমানসে এই তিনটি পর্যায় বিধৃত রয়েছে এক অখণ্ড-সংবিতেরসৌষম্যে। কিন্তু অধিমানসে তারা বিবিক্ত অথবা বিবিক্ত

তাদের লীলায়ন ; প্রত্যেকের আছে পুষ্টি ও পরিণামের একটা নিজস্ব ধারা, অথচ সুরসঙ্গতির বৃহৎ সুষমায় সম্মিলিত হবার সামর্থ্যও আছে তাদের।... যেমন এক পরমার্থসতের অন্তহীন সদ্-বিভূতি তারা, তেমনি এক অখণ্ড-চেতনার অনন্ত চিদ্বিলাসরূপে প্রত্যেকে চলেছে তারা নিগূঢ় বীজভাবের নিরঙ্কুশ পরিণামের ছন্দে হিল্লোলিত হয়ে। এক অখণ্ড অথচ বিশ্বতোমুখ সম্ভূত-বিজ্ঞানেরই ঘটছে বহুধা-বিকিরণ ; তার প্রত্যেকটি রশ্মি একটি স্ব-তন্ত্র বিজ্ঞান-শক্তি, যার মাঝে আছে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলবার বীর্য। এক অখণ্ড চিৎশক্তিই হয়েছে কোটি-কোটি শক্তি-ধারায় বিচ্ছুরিত ; প্রত্যেক ধারার যেমন আছে আত্মসম্পূর্তির অব্যাহত অধিকার, তেমনি প্রয়োজন হলে অন্যান্য ধারাকে আপন শাসনে এনে বৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সে করতে পারে।...আবার এক ভূমানন্দই উচ্ছসিত হয়ে ওঠে আনন্দের অনন্ত-বিচিত্র প্রবাহে, যার প্রত্যেক ধারায় রয়েছে স্বারাজ্যের পরিপূর্ণতা কিংবা বৈরাজ্যের পরমা-সিদ্ধির সংবেগ। .. এমনি করে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের মাঝে অতিমানসের অধিমানসী মায়া গুঞ্জরিত করে তোলে অন্তহীন সম্ভূতির সুরমূর্ছনা—যা অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রাগিণীতে হ'য়ে ওঠে অনুরণিত, অথবা এক বিপুল বিশ্বের মহারাগে হয় ঝঙ্কৃত—যে-বিশ্বের বিসৃষ্টি ও প্রবৃত্তি, গতি ও পরিণতির মূলে থাকে ঐ সম্ভূতিরই অনন্ত-বিচিত্র সুরের লীলা।

শাশ্বত সন্মাত্রের চিৎ-শক্তিই বিশ্ববিধাত্রী যখন, তখন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিতে ফুটবে সেই মূলা বিদ্যাশক্তির আত্মরূপায়ণের একটি বিশেষ ছন্দ। তেমনি, প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবে চিৎ-শক্তি যে-ভঙ্গিতে আপনাকে করবে বিভাবিত, জীবের জগৎ-দর্শন ও জীবন-দর্শনও হবে তারি অনুরূপ। মানুষের মনোময়ী চেতনা জগৎকে দেখে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কল্পিত বহু-খণ্ডের একটা সঙ্কলন রূপে ; সে-সঙ্কলনও আবার একটা সমগ্রসত্তার একদেশ শুধু। এই খণ্ড-দর্শন দিয়ে যে-ঘর বাঁধে মন, তার মাঝে সত্যের একটিমাত্র সামান্য-বিভাবের ঠাঁই হতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে আর-সবাইকে থাকতে হয় ঘরের বাইরে ; কালে-ভদ্রে আশ্রিত কি অভ্যাগত হিসাবে যদি-বা কারও জায়গা হয় একটু-খানি! কিন্তু অধিমানসী চেতনায় আছে সমূহের প্রত্যয়, অতএব খণ্ডিত নয়—সংবর্তুল তার জ্ঞান ; তাই আপাতভিন্ন বহু মৌলিক-দর্শনই তার মাঝে সংহত হতে পারে একটি সহস্রদল দর্শনের সুষমায়। মনোময়ী বুদ্ধির কাছে পুরুষ-বিশেষ আর নির্বিশেষের মাঝে আছে অন্যোন্যবিরোধ : তাই নির্বিশেষ

সন্মাত্রের মাঝে পুরুষবিশেষ বা পুরুষবিধতার কল্পনা তার দৃষ্টিতে অবিদ্যার বঞ্চনা বা সাময়িক বিকল্প মাত্র; অথবা পুরুষবিশেষ যদি হয় তার কাছে বিশ্বমূল তত্ত্ব, তাহলে নির্বিশেষকে জানে সে একটা আচ্ছিন্ন মানস-বিকল্প কিংবা বিসৃষ্টির উপাদান বা সাধন ব'লে। কিন্তু অধিমানসী বুদ্ধি সেখানে দেখে, পুরুষবিশেষ ও নির্বিশেষ একই সন্মাত্রের বিভাজ্য বিভূতি; আত্মপ্রতিষ্ঠায় তারা স্ব-তন্ত্র হতে পারে যেমন, তেমনি তাদের বিভিন্ন ধারার সঙ্গমও ঘটতে পারে। স্বাতন্ত্র্য আর সঙ্গমের এই লীলায় সত্তা ও চেতনার যে বিচিত্র দশা অনুভবে জাগে, তারা কেউ নয় অপ্রমাণ, অথবা তাদের সহচারও নয় অকল্প্-নীয়। নির্বিশেষ সত্তা ও চেতনা সত্য এবং সম্ভবপর; কিন্তু শুদ্ধ পুরুষবিশেষের সত্তা ও চেতনাও তাই। নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম অধিমানসী চেতনায় অনন্তেরই সম ও সহচরিত বিভূতি। সগুণভাবকে বিভূতিরূপে গুণীভূত করে যেমন হতে পারে নির্গুণভাবের প্রকাশ, তেমনি সগুণভাবও ফুটতে পারে তত্ত্বরূপে—নির্গুণ তার স্বরূপের একটা দিকমাত্র তখন। চিৎ-সত্তার অনন্ত-বৈচিত্র্যের মাঝে প্রকাশের দুটি বিভাবই আছে মুখোমুখি হয়ে। যেসব তত্ত্ব মনোময়ী বুদ্ধির বিচারে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত, অধিমানসী বুদ্ধির দর্শনে তারা ব্যতি-ষক্ত ও সহচরিত; মন যেখানে দেখে বৈধর্ম্য, অধিমানস দেখে সেখানে আপূরণ। মন দেখে, অন্ন হতে জাত হয়ে অন্নেই সঞ্জীবিত সব, আবার অন্নে সবার লয়; তাই সিদ্ধান্ত করে সে, অন্নই শাশ্বত তত্ত্ব, অন্নই ব্রহ্ম। অথবা দেখে, প্রাণ কিংবা মন হতে জাত হয়ে প্রাণ বা মন দ্বারা সঞ্জীবিত সবাই, আবার বিশ্বপ্রাণ বা বিরাট মনে সবার লয়; তাই ধারণা হয় তার, এক বিশ্বন্তর প্রাণশক্তি অথবা বিরাট মন বা শব্দ-ব্রহ্ম হতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের বিসৃষ্টি। আবার যখন দেখে, সম্ভূত-বিজ্ঞান কি চিৎ-স্বরূপের কবি-ক্রতু অথবা চিৎ-স্বরূপই জগতের আদি-স্থিতি ও অবসান, তখন বিশ্বকে ধারণা করে সে বিজ্ঞানময় বা চিন্ময় বলে। এসব দর্শনের যে-কোনও একটি একান্ত হয়ে উঠতে পারে মনের কাছে, কিন্তু তার স্বাভাবিক বিভজ্য-দৃষ্টি একটিকে আঁকড়ে ধরলে আর-সবাইকে দেয় ছেঁটে। অথচ অধিমানসী চেতনা দেখে, মূলভাবের অনুগত প্রত্যয়রূপে প্রত্যেকটি দর্শন সত্য; যেমন আছে অন্নময় জগৎ, তেমনি আছে প্রাণময়, মনোময় এবং চিন্ময় জগৎ। আপন-আপন জগতে প্রত্যেক তত্ত্বই স্ব-তন্ত্র যেমন, তেমনি সবার সমাবেশেও তারা গড়তে পারে একটা নতুন জগৎ। চিন্ময়ী মহাশক্তির আত্মরূপায়ণের যে-ছন্দ ফুটেছে এই মর্ত্যলীলায়, তার প্রকাশ অচিতির

আপাত-প্রতিভাসে—যার মাঝে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে এক পরমা চিৎ-সত্তা ; সত্তার সকল বিভূতিই গোপন আছে ঐ অচিৎ রহস্য-যবনিকার অন্তরালে। তাই তো অন্নময় বিশ্বের বুকে ফুটছে প্রাণ, মন, অধিমানস, অতিমানস ও সচ্চিদানন্দ—পর-বিভূতি অবর-বিভূতিকে আত্মসাৎ করছে প্রকাশের সাধনরূপে ; তাই তো অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অন্ন ও চিদ্-বিভূতি শাশ্বত কাল ধরে। অধিমানসী দৃষ্টিতে চিৎশক্তির এই আত্মরূপায়ণের মাঝে নাই কোনও অপ্রাকৃত দুর্বোধ-রহস্যময় পরিকল্পনা। অধিমানসে নিহিত রয়েছে যে ক্রতু ও সিসৃক্ষার প্রবর্তনা, তার সামর্থ্যবশত সন্মাত্রের বহুবিচিত্র সম্ভাবনাকে যেমন সে রূপায়িত করে তোলে পৃথক-পৃথক মর্যাদা দিয়ে, তেমনি যুগপৎ অথচ বহুধা বিকল্পনায় তাদের সমন্বয়কেও করে সে ছন্দিত ; তাই তার শিল্পমায়ায় অখণ্ড-সত্তার শুভ্রজ্যোতিতে দেখা দেয় অপরূপ এক ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা।

এমনি করে স্ব-তন্ত্র অথবা ব্যূহিত বহুবিচিত্র বিভূতির যুগপৎ বিভাবনাতেও অধিমানসের মাঝে দেখা দেয় না—অন্তত এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি কোনও নির্ঋতি বা সংঘাত, ঋত এবং প্রজ্ঞা হতে কোনও অবস্খলন। অধিমানস সৃষ্টি করে সত্যকেই—বিভ্রম বা অনৃতকে নয়। তার একাগ্র তপস্যায় রূপায়িত হয় সচ্চিদানন্দেরই কোনও সত্য বিভাব বীর্য বিজ্ঞান ও আনন্দ স্ব-তন্ত্র প্রবৃত্তির প্রমুক্ত ঋতায়নে, এবং সে-স্বাতন্ত্র্যে দেখা দেয় তত্ত্বেরই সত্য পরিণাম। সে-পরিণামে নাই কোনও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা, যাতে একটি বিভাবকেই পরম-সত্য মেনে আর-সকল বিভাবকে অবর-সত্য জ্ঞানে করা হবে নিরাকৃত : অধিমানসী ভূমিতে প্রত্যেক দেবতাই জানেন ও মানেন অপর দেবতাকে, কোনও ভাবই নয় কোনও ভাবের প্রতিকূল কি প্রতিষেধক, প্রত্যেক শক্তিলীলাতেই আছে অপর শক্তির সত্য ও পরিণামের ঠাঁই, বিবিক্ত আত্মসম্পূর্তি বা বিবিক্ত অনুভবের কোনও আনন্দরূপই ব্যাহত কি লাঞ্ছিত করে না আনন্দের অন্য রূপকে। অধিমানসী চেতনা বিশ্বসত্যেরই প্রকাশ, তাই এক বিপুল অকুণ্ঠ ঔদার্যের ছন্দদোলা তার মর্মে-মর্মে ; তার বিভাবনার তপস্যা যেমন সর্ব-তন্ত্র, তেমনি স্ব-তন্ত্র। সে যেন অতিমানসের একটা অবর কল্প, যদিও তার মুখ্য কারবার নয় নির্বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে। পরমার্থসতের অর্থক্রিয়াকারী সত্যবিভূতি অথবা শক্তির স্ফুরত্তা নিয়েই ব্যাপার তার ; তাই নির্বিশেষ তত্ত্ব আ-ভাসিত হয় তার মাঝে সিসৃক্ষা এবং অর্থক্রিয়ার জনকরূপে। এইজন্যে তার সম্ভূতি-সংবিৎকে অভঙ্গ না বলে বরং বলা চলে সংবর্তুল, কেননা তার সমষ্টিভাব বহু

পিণ্ডের একটা পরিমণ্ডল কিংবা একাধিক বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র তত্ত্বের একটা সমাহার বা সমাবেশ। অখণ্ডভাবকে যদিও সে মানে বিশ্বের মর্মসত্য ও অধিষ্ঠান বলে, নিখিল বিসৃষ্টিতে যদিও সে দেখে অখণ্ডভাবেরই পরিব্যাপ্তি, তবু অতিমানসের মত তাকে অনুভব করে না বিশ্বের মর্মচর নিত্যরহস্য ও অন্তর্যামী আধাররূপে—তার স্বভাব ও স্বধর্মের বৈচিত্র্যে বৃহৎসামের চিরন্তন উদ্‌গাতারূপে।

অধিমানসী চেতনা সংবর্তুল ; কিন্তু আমাদের মনোময়ী চেতনা বিবিক্ত-দর্শী বলে সামান্যজ্ঞান আচ্ছন্ন তার কাছে। দুয়ের তফাৎ স্পষ্ট চোখে পড়ে, যদি বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে অধিমানসের রায়কে তুলনা করি প্রাকৃত মনের রায়ের সঙ্গে। এই যেমন: অধিমানসের কাছে সকল ধর্মই সত্য, কেননা একই শাশ্বত-ধর্মের পরিণাম তারা ; সকল দর্শনই প্রামাণিক, কেননা আপন-আপন ভূমি হতে তারা একই বিশ্বের সত্য দর্শন ; রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত নীতি ও রীতি এক বিজ্ঞান-শক্তিরই ন্যায্য বিধান, অতএব প্রকৃতির তপস্যার একটা বিশেষ দিক হিসাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হবার অধিকার নিশ্চয়ই তাদের আছে। কিন্তু আমাদের খণ্ডদর্শী চেতনায় কৃচিৎ ফোটে ঔদার্য ও বিশ্বজনীনতার ভাবনা ; তাই এই ভাববৈচিত্র্যের মাঝে সে দেখে অন্যোন্য-বিরোধ শুধু। তার দৃষ্টিতে একটি ভাব সত্য হলে আর-সব ভাব মিথ্যা এবং প্রমাদগ্রস্ত ; অতএব একমাত্র সত্য হয়ে বাঁচতে গিয়ে আর-সব ভাবকে খণ্ডিত ও বিধ্বস্ত করতে বাধ্য সে ;—নিদানপক্ষে মানতে হবে, ঐ একটি ভাবই মুখ্য-সত্য, আর-সব গৌণ-সত্য। মনোময়ী চেতনার দৃষ্টিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষের এমন দাবি আছে প্রত্যেকেরই। কিন্তু অধিমানসী বুদ্ধি কখনও সায় দেবে না এই একাঙ্গী-দর্শনে ; ব্যষ্টির সকল বিভাবকেই অপক্ষপাতে স্থান দেবে সে সমষ্টির প্রয়োজনে, প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠিত করবে আপন-আপন অধিকারে সমষ্টিরই অঙ্গরূপে। আমাদের মাঝে চেতনা নেমে এসেছে অবিদ্যার খণ্ডভাবনার রাজ্যে ; তাই আমরা দেখতে পাই না বহুধা-ব্যাকৃতির আকূতিতে স্পন্দমান সত্যের অনন্ত বা বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্ররূপ। এইজন্যে একের অস্তিত্ব মানতে গিয়ে অপরের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয় আমাদের যুক্তিতে, কেননা মনের সহজ ধর্ম নয় বিজাতীয় বা ভিন্ন-ধর্মাক্রান্ত দুটি বস্তুকে যুগপৎ সত্য ও সমঞ্জস বলে স্বীকার করা। একটা অখণ্ড-উদার সম্ভূতি-সংবিতের পানে ভাবনার দিক দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় মনোময়ী চেতনার পক্ষে ; কিন্তু তাকে কর্মে ও জীবনে রূপ দেওয়া অসাধ্য তার বলতে গেলে।

ব্যষ্টি-আধারে অথবা ব্যূহের মাঝে ফুটেছে যে পরিণামী মন, দৃষ্টি ও কৃতির বহুমুখী ধারাকে ছড়িয়ে দেয় সে দিকে-দিকে ; তারা তখন চলতে থাকে কখনও পাশাপাশি, কখনও ঠেলাঠেলি ক'রে, কখনও-বা খানিকটা মিলে-মিশে। তাদের বাছাই করে মন রচতে পারে একটা সুরের স্তবক, কিন্তু অখণ্ড সত্যের বৃহৎসামে পৌঁছতে পারে না কোনমতেই। অবিদ্যা-পরিণামের মাঝেও বিশ্বমনের আছে বিপুল সৌষম্যের একটা মূর্চ্ছনা—সংবাদী-বিবাদীর সুকৌশল প্রস্তারে যা মনোরম ; আছে তার মাঝে অখণ্ডের এক অন্তর্গূঢ় লীলায়ন : কিন্তু এ-সবের পরিপূর্ণ মহিমা প্রচ্ছন্ন থাকে তার গভীর গহনে—হয়তো অতিমানস-অধিমানসের কোনও সন্ধিভূমিতে ; পরিণম্যমান প্রাকৃত-মনে আজও সঞ্চারিত হয়নি তাদের বীর্য, রহস্য-সমুদ্রের মন্থনে আজও ঘটেনি মূর্তিমতী সিদ্ধিরূপিণী কমলার আবির্ভাব। অধিমানস জগৎ হত সৌষম্যের জগৎ ; কিন্তু যে অবিদ্যার জগতে আছি আমরা, বৈষম্য আর সংঘাতই উঠেছে সেখানে করাল হয়ে।

অথচ এই অধিমানসেরই মাঝে স্পষ্ট দেখতে পাই মায়ার আদিরূপটি। এ-মায়া বিদ্যামায়া—অবিদ্যামায়া নয় ; তবু অবিদ্যা শুধু সম্ভাবিত নয়, অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই মায়ারই লীলায়নে। কারণ অধিমানসের তপস্যায়, বিশ্বের প্রত্যেকটি তত্ত্ব যদি হয় স্ব-তন্ত্র ধারায় প্রবর্তিত এবং স্ব-তন্ত্ররূপেই সিদ্ধ হয় তাদের পূর্ণ পরিণাম, তাহলে সেই সঙ্গে ভেদ-ভাবের বিভাবনাও হবে পূর্ণ এবং অব্যাহত, অতএব তার পরিণামও নিশ্চয় পৌঁছবে চরমে। এই হল প্রকৃতির অবসর্পিণী ধারা ; খণ্ডভাবকে একবার স্বীকার করলে এই ধারা ধরে চেতনা অবশেষে অবগাহন করে জড়ময় অচিতিতে,—ঋগ্বেদের ভাষায় 'সেই অপ্রকেত সলিলে যেখানে তুচ্ছ্য অর্থাৎ অন্তহীন অণুবিভাজন দ্বারা অপিহিত রয়েছে সব-কিছু' (১০।১২৯।৩)। অখণ্ড যদিও-বা আপন মহিমায় প্রজাত হন এই 'তুচ্ছ্য' হতে, তবুও খণ্ডিত বিবিক্ত সত্তা ও চেতনার কঞ্চুকে প্রথমত আবৃত থাকে তাঁর রূপ : এই খণ্ডভাবের আবরণই আমাদের অপরা প্রকৃতি, এরি মাঝে ব্যষ্টিকে জুড়ে-জুড়ে পৌঁছই আমরা সমষ্টিতে। অতি মন্থর ও দুশ্চর এই উন্মেষের তপস্যা, যার মাঝে মনে হয় 'সংগ্রামই বিশ্বের জনক'—হিরাক্লিটাসের এই উক্তিই বুঝি সত্য। স্পষ্ট দেখছি, প্রাকৃত ভূমিতে প্রতিটি ভাব, শক্তি, বিবিক্ত চেতনা ও জীব-সত্ত্ব আত্ম-অবিদ্যার প্ররোচনাতেই অপরের সঙ্গে সৃষ্টি করে সংঘর্ষ ; অখণ্ড রাগিণীর সাধনায় নয়, উগ্র স্ব-তন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই খোঁজে তারা আপন পুষ্টি এবং উপচয়। অথচ এই অবিদ্যার

গহনে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে অখণ্ডের অজানা আবেশ, যা অবিরাম প্রচোদিত করে আমাদের সৌষম্য ও অন্যোন্য-নির্ভরের অস্পষ্ট-মন্থর সাধনার পানে—অসামের মাঝে সামের, খণ্ডের মাঝে অখণ্ডের দুশ্চর তপস্যার আনে প্রৈতি। কিন্তু ঐক্য ও সৌষম্যের এ-সাধনা সার্থক হতে পারে তবেই, যদি আমাদের মাঝে ঘটে বিশ্ব-সত্যের নিগূঢ় অতিচেতন বীর্যের উন্মেষ, যদি জাগে পরমার্থ-সতের অখণ্ডৈকরস প্রত্যয়। ঐ দিব্য অভিনিবেশের ফলে সত্তার অণুতে-অণুতে, তার আত্মরূপায়ণের তন্ত্রে-তন্ত্রে ঝঙ্কৃত হবে জ্যোতিষ্টোমের সেই অমর মূর্চ্ছনা—পরাহত হবে না সে সাম-সাধনা অসম্যক প্রয়াস, অপূর্ণ কৃতি এবং নিয়ত-চঞ্চল প্রায়িক-সিদ্ধির বৈকল্যে। চিন্ময় মনের ঊর্ধ্বভূমি হতে এই আধারে ও চেতনায় নেমে আসবে অলকনন্দার দিব্যধারা, তারও ওপারে রয়েছে যা গুহাহিত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটবে আমাদের মাঝে,—তবেই-না দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্মে সার্থক হবে বিশ্বলীলায় আমাদের এই অবতরণ।

অবসর্পিণী ধারা ধরে অধিমানস পৌঁছয় এসে বিশ্ব-সত্য আর বিশ্ব-অবিদ্যার সঙ্গমরেখায়। এইখানে চিৎ-শক্তি অধিমানসের প্রত্যেকটি স্ব-তন্ত্র প্রবর্তনার মাঝে বিবিক্ত-চেতনাকেই তোলে একান্ত করে—তাদের অন্তর্নিহিত অভেদ-চেতনা থাকে প্রচ্ছন্ন অথবা স্তিমিত; এবং তারি ফলে, অন্যব্যাবৃত্ত একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারা অধিমানসের উৎসমূল হতে মানসকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় তার। এমনি একটা বিচ্ছেদ পূর্বেই ঘটেছে অধিমানস আর অতি-মানসের মাঝে; কিন্তু তবুও সে যেন ছিল একটা আলোর আড়াল, অতএব অতিমানস হতে অধিমানসে সচেতন ভাব-সংক্রমণের ছিল না কোনও বাধা—দুয়ের একটা জ্যোতির্ময় সাজাত্যবোধও ছিল অক্ষুণ্ন। কিন্তু এবার অধিমানস আর মানসের মাঝে দেখা দিল অস্বচ্ছ একটা যবনিকা; সুতরাং মনের মাঝে অধিমানসী প্রৈতির সঞ্চরণও হল রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। আপাত-বিচ্ছিন্ন মানস তাই যেন চলে স্বাতন্ত্র্যের একটা অভিমান নিয়ে; তাই প্রত্যেক মনোময় জীবে, মনের প্রত্যেক মূল ভাব শক্তি ও সংবেগে ফুটে ওঠে একটা বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বিভাবনা। অপরের সঙ্গে কখনও তার যোগাযোগ সম্মেলন বা সন্নিকর্ষ ঘটলেও, তার মাঝে থাকে না অদ্বৈতবাসিত অধিমানসী প্রবৃত্তির বিশ্বতোমুখ ঔদার্য; তাই সেখানে স্ব-তন্ত্র কতগুলি অবয়বের সঙ্কলনে দেখা দেয় একটা কৃত্রিম বিবিক্ত অবয়বী মাত্র। মানসের এই প্রবৃত্তিকে ধরেই বিশ্ব-সত্য হতে আমরা নেমে আসি বিশ্ব-অবিদ্যায়। অবশ্য বিশ্ব-মানস এই

ভূমিতেও পায় স্বগত অখণ্ডভাবের উদার অনুভব—কিন্তু চিৎ-স্বরূপই যে উৎস এবং প্রতিষ্ঠা তার, এ-সংবিৎ থাকে আচ্ছন্ন ; অথবা বৌদ্ধ-চেতনার সামান্য-প্রত্যয় দ্বারা এ-তত্ত্বকে অনুভব করলেও ধ্রুবা-স্মৃতিতে তাকে ধরে রাখে না সে। নিরঙ্কুশ আত্মকর্তৃত্বের অভিমান নিয়ে চলে তার কাজ ; কর্মের উপকরণকে গ্রহণ করে সে স্বতঃসিদ্ধ বলে,—যে-উৎস হতে উৎসারিত তারা, তার সঙ্গে থাকে না তার কোনও যোগযুক্তি। মানসের বৃত্তিগুলিতেও থাকে পরস্পরের সম্পর্কে এবং সমষ্টি বিশ্বের সম্পর্কে এমনিতর অজ্ঞান—শুধু পরোক্ষ সন্নিকর্ষ ও যোগাযোগের ফলে ফুটে ওঠে জ্ঞানের একটুখানি আভাস ; কিন্তু তাদের মাঝে থাকে না তাদাত্ম্যবোধের মৌল প্রত্যয়, অতএব অন্যোন্যসঙ্গম-জনিত সামরস্যের অনুভবও জাগে না আর। এমনি করে অবিদ্যার আধারেই চলে মনের তপস্যা। যদিও একটা প্রদীপ্ত বিজ্ঞানের প্রৈতি আছে তার মূলে, তবুও সে-বিজ্ঞান খণ্ডিত,—কেননা সত্য ও সম্যক আত্মজ্ঞানও নয় সে যেমন, তেমনি সে নয় সত্য ও সম্যক জগৎ-জ্ঞান। এই খণ্ডবোধ সঞ্চারিত হয় প্রাণের রজঃশক্তিতে ও সূক্ষ্মভূতের তমঃশক্তিতে এবং পরিশেষে ফুটে ওঠে স্থূল জড়-বিশ্বের মাঝে—যার উদ্ভব অচিতির বুকে চিতিশক্তির চরম নিগূহনে।

অথচ আমাদের অধিচেতন বা আন্তর মনের মতই মানস-ভূমিতেও আছে যোগাযোগ ও ব্যতিষঙ্গের একটা বিপুলতর সামর্থ্য, মানস- ও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের আরও প্রমুক্ত একটা স্বাচ্ছন্দ্য—যা প্রাকৃত-মনের অগোচর। তাই অবিদ্যার প্রভাব এই মানসের 'পরে অখণ্ড নয় এখনও। সৌষম্যের একটা সচেতন সাধনা, ঋতময় সম্বন্ধের একটা অন্যোন্যসংস্পৃষ্ট যোগযুক্তি এখনও নয় অসম্ভব ; প্রাণ-সংবেগের অন্ধ প্রমত্ততা কি জড়ত্বের অসাড়তা এখনও মনকে করেনি আচ্ছন্ন। এই মানস-ভূমিকে অবিদ্যার ভূমি বললেও অনৃত বা প্রমাদের ভূমি বলা চলে না এখনও—অন্তত অনৃত- বা প্রমাদ-গ্রস্ত হওয়া এখনও অপরি-হার্য নয় তার পক্ষে : অবিদ্যা এখানে সঙ্কোচ এনেছে চেতনায়, কিন্তু ঘটায়নি বিপর্যয়। একদেশী সত্যের সমাহারে জ্ঞান সীমিত ও সঙ্কুচিত হলেও তার মাঝে নাই সত্যের প্রতিষেধ বা ব্যভিচার। বিবিক্তধর্মী জ্ঞানের ভিত্তিতে একদেশী সত্যের এমনি সমাহার আছে প্রাণ ও সূক্ষ্মভূতের লোকেও, কেননা চিৎশক্তির যে অন্যব্যাবৃত্ত অভিনিবেশ হবে এই বিবিক্ত প্রবৃত্তির স্রষ্টি, তা এখনও প্রাণ হতে মনকে অথবা জড় হতে প্রাণ ও মনকে করেনি বিচ্ছিন্ন বা আচ্ছন্ন। পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দেয় অচিতির পূর্ণ অধিকারেই,—সেই

'তমোগূঢ় অপ্রকেত সলিল' হতেই উদ্ভূত হয় অবিদ্যা-শবলিত আমাদের এই জগৎ। সংবৃতির ধাপে-ধাপে এমনি করে নেমে এসেছে যে চেতন-ভূমির পরম্পরা, বস্তুত তারা চিন্ময়ী মহাশক্তিরই বিসৃষ্টি। প্রত্যেক ভূমিতে আছে একটা আত্মকেন্দ্রিকতা, আছে আপন-আপন বীজভাবের অনুবর্তন; মন প্রাণ বা জড়—যাই হোক না কেন প্রত্যেক ভূমির মুখ্য তত্ত্ব, সে-ই কাজ করে যায় আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে। তবু তার কৃতি স্বরূপ-সত্যেরই বিসৃষ্টি—সে নয় বিভ্রম, নয় 'সত্যানৃতের মিথুন' বা বিদ্যা-অবিদ্যার সঙ্কর। কিন্তু শক্তি ও রূপের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে চিৎ-শক্তি যখন চিৎ হতে শক্তিকে করে আপাতবিচ্ছিন্ন, অথবা রূপ ও শক্তির বুকে আত্মহারা অন্ধ নিষুপ্তির ফলে চৈতন্যকে করে গ্রস্ত,—তখন বহু আয়াসে সেই চৈতন্যকে ফিরে পেতে হয় তার স্বাধিকার খণ্ড-পরিণামের ক্রটিত ধারা ধরে,—যার মাঝে প্রমাদ হয় নিয়তিকৃত, আর অনৃত হয় অপরিহার্য। তবুও তারা নয় অনাদি অসতের বুকে মঞ্জরিত বিভ্রমের মরীচিকা; বরং বলব, অচিতি হতে বিসৃষ্ট জগতের অভিব্যক্তিতে ঋতের অপরিহার্য বিধান তারা। কারণ, তত্ত্বত অবিদ্যা তো অচিতির অনাদিগুণ্ঠন মোচন ক'রে বিদ্যা-শক্তির আপনাকে ফিরে পাবার একটা নিরন্তর প্রয়াস—পাওয়া-না-পাওয়ার দোলায় দুলে; তাই অবিদ্যার পরিণামও স্বভাবচ্যুতিরই সত্য পরিণাম। এবং বলতে গেলে স্বভাবসিদ্ধির সত্য সাধনাও চলে ঐ পথ ধরেই, সৎ যেন গ্রস্ত হল অসতের মাঝে, চিতি আপাত-অচিতির মাঝে, স্বরূপের আনন্দ বিশ্বব্যাপ্ত এক বিপুল অসাড়তার মাঝে,—এই হল স্বরূপচ্যুতির প্রথম ফল। কিন্তু অন্তর্গূঢ় চিৎ-শক্তির প্রেরণায় এই অ-ভাবের তমিস্রাকে বিদীর্ণ করে ফুটল ভাবের রশ্মিরেখা, সান্ধ্য-চেতনার দ্বন্দ্ব নিয়ে দেখা দিল অপূর্ণ আদিম প্রকাশ: চৈতন্য খণ্ডিত হল প্রমা এবং অপ্রমায়, সত্যে এবং প্রমাদে; অখণ্ড সত্তার মাঝে এল জীবন আর মরণের পর্যায়; আনন্দ বিধুর হল সুখ-দুঃখের বেদনায়। নিজকে ফিরে পাবার দুশ্চর তপস্যায় এই দ্বন্দ্ব অপরিহার্য, কেননা অচিতির কবলিত থেকেই সত্য জ্ঞান আনন্দ ও অবিনাশী সদ্-ভাবের নিরঞ্জন অনুভব পাবার কল্পনায় আছে একটা স্বতো-বিরোধ। বিশ্ব-পরিণামে প্রত্যেক জীব যদি চৈত্য-সত্তার নিগূঢ় প্রৈতিতে স্বচ্ছন্দ হয়ে সাড়া দিত প্রকৃতির মর্মনিলীন অতিমানসের অলক্ষ্য প্রবর্তনায়, তাহলেই সম্ভব ছিল বর্তমান অবস্থার বিপর্যয়। কিন্তু এই-

খানেই দেখা দেয় অধিমানসের বিধান—প্রত্যেক শক্তিলীলার মাঝে আপন বীজভাবকে ফুটিয়ে তোলবার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যরূপে। অতএব অচিতি ও খণ্ডচেতনা যে-জগতের মূলতত্ত্ব, তার মাঝে স্বভাবতই স্ফুরিত হবে তমঃশক্তির স্বাতন্ত্র্য। অবিদ্যা তার আধার, অতএব অবিদ্যাকে সে চাইবে জিইয়ে রাখতে। অথচ স্বভাবের বশে সে-জগতে দেখা দেবে—জানবার-বোঝবার অবুঝ আয়াস হতে অনৃত ও প্রমাদ, বেঁচে থাকবার অন্ধ আকূতি হতে অন্যায় ও অনর্থের বিক্ষোভ, স্বার্থোদ্ধত ভোগলিপ্সা হতে সুখ-দুঃখ-সন্তাপের খণ্ডলীলা। কিন্তু এই দেবাসুরের দ্বন্দ্ব নয় বিশ্ব-পরিণামের একমাত্র তাৎপর্য—এ তার উদ-য়নের অপরিহার্য আদিকাণ্ড মাত্র। জানি, অসৎ সতেরই সংবৃত রূপায়ণ, অচিতি কিছুই নয় নিগূঢ় চিতিশক্তি ছাড়া, অসাড়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে আনন্দেরই অন্তঃশীল সংবেগ; অতএব এসব গুহাহিত সত্যের উন্মেষকেও জানি ধ্রুব বলে। তমোগূঢ় আনন্ত্য হতে বিসৃষ্টির এই প্রতীপলীলার মাঝেই ফুটবে একদিন অধিমানস ও অতিমানসের ষোড়শকল মহিমা।

এই পরমা-সিদ্ধির পক্ষে দুদিক দিয়ে প্রকৃতি আমাদের অনুকূল। প্রথমত অধিমানস অবরোহক্রমে জড়সৃষ্টির পানে নেমে আসবার সময়ে গড়ে তুলেছে নিজেরই এক-একটা পর্যায়: যেমন বোধি-মানস বিশেষ করে,—যার ঋতম্ভরা বৈদ্যুতীর তীক্ষ্ণ দীপ্তি উদ্ভাসিত চেতনার বিপুল প্রসারে ঝিকিয়ে তোলে কত-যে অজানার মণিবিন্দু। এমনি করে অধিমানসের কত-না পর্যায় নিগূঢ় সত্যের এক এক ঝলক ফুটিয়ে তোলে আমাদের হৃদয়ে।...উন্মেষিত অন্তরের অনুভাবে বিস্ফারিত বহিঃসত্তায় চেতনার ঊর্ধ্বলোক হতে নেমে আসে অনাহত বাণীর গুঞ্জরণ: তখন ঐ অধিমানসী সম্পদের অনুশীলনে চিন্ময় দিব্যধামে আমরা আবির্ভূত হতে পারি সম্বুদ্ধ ও অধিমানস নবজাতকরূপে—যার মাঝে নাই প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের কুণ্ঠা, কিন্তু সম্ভূতি-সংবিতের উদার সামর্থ্যে সত্যের সত্ত্বতনুর অপরোক্ষ স্পর্শে রোমাঞ্চিত যার চেতনা। বস্তুত পরম পরার্ধ হতে প্রজ্ঞার প্রভাস বারবার ঝিলিক দিয়ে যায় আমাদের মাঝে, কিন্তু তার চকিত দীপ্তি হয় অপরিসর, অনিয়ত, স্তিমিত; আত্মার কুণ্ঠাকে পরাহত ক'রে তার সারূপ্য লাভ করা, লোকোত্তর সত্যবীর্যের স্বাধিকারকে ফিরে পাওয়া এই আধারের সহজ প্রবৃত্তিতে—এ-সাধনায় এখনও সিদ্ধিলাভ হয়নি আমাদের। কিন্তু সে-সিদ্ধির পক্ষে প্রকৃতির দ্বিতীয় আনুকূল্য এই: বোধিমানস, অধিমানস, এমন-কি অতিমানসও অন্তর্গূঢ় ও সংবৃত হয়ে

আছে আমাদের নিয়তিকৃত পরিণামের আধাররূপিণী অচিতির মাঝে; শুধু তাই নয়,—বিশ্ব-মন বিশ্ব-প্রাণ ও বিশ্ব-জড়ের পরিস্পন্দনে তাদের নিগূঢ় স্থিতি সহজ-উন্মেষের বিদ্যুৎ-ঝলকে বারবার ফুটিয়ে তুলছে গূঢ়তপা আত্মস্ফুরণের অবন্ধ্য পরিচয়। সত্য বটে, আজও প্রচ্ছন্ন তাদের তপস্যা, প্রাকৃত মন-প্রাণ-জড়ের আধারে আজও কুণ্ঠিত ও বিকৃত তাদের প্রকাশ। এ-জগৎ আজও নয় অতিমানসের সাক্ষাৎ বিসৃষ্টি, কেননা তাহলে অচিতি এবং অবিদ্যার আবির্ভাবই হত অসম্ভব, অথবা প্রকৃতি-পরিণামের অপরিহার্য মন্থরতার স্থানে দেখা দিত রূপান্তরের বিদ্যুৎ-বিসর্প—ব্যক্তি অথবা জাতির জীবনের যুগসন্ধিতে কখনও-কখনও আমরা যার আভাস পাই। তবুও জড়শক্তির লীলায়নে যে ধ্রুব নিয়তির সন্ধান পাই পদে-পদে, সে-ও অতিমানসী সিসৃক্ষারই বিভূতি; প্রাণ ও মনের কত বিচিত্র আকৃতি, অফুরন্ত সম্ভাবনা, অকল্পনীয় সমাহার—এ-ও তো অধি-মানসেরই লীলা। প্রাণ ও মন যেমন ছাড়া পেয়েছে জড়ের গহন হতে, তেমনি মনের গহন হতে হবে নিগূঢ় দিব্যভাবের এই-সব বিপুল বীর্যের স্ফুরণ এবং দ্যুলোক হতে এই পার্থিব চেতনাতেই ঘটবে তাদের স্বরূপে অবতরণ।

অতএব এই মর্ত্য আধারেই অমর দিব্য-জীবনের উন্মেষে সার্থক হবে আমাদের বর্তমান অবিদ্যা-জীবনের প্রমুক্তি ও উত্তরায়ণের সাধনা। এ যে সম্ভব শুধু তাই নয়—মহাপ্রকৃতির ঊর্ধ্ব-পরিণামিণী তপশ্চর্যার এই তো অপরিহার্য নিয়তি ও পরমা সিদ্ধি।

**প্রথম খণ্ড**
**সমাপ্ত**

# শব্দ-পরিচয়

[ সঙ্কেত : জৈ—জৈনদর্শন। ন্যা—ন্যায়-বৈশেষিক। বে—বেদান্ত।
বৈ—বৈষ্ণবদর্শন। বৌ—বৌদ্ধদর্শন। মী—মীমাংসা।
শা—শাক্তদর্শন। শৈ—শৈবদর্শন। শ্রু—শ্রুতি।
সা—সাংখ্য-যোগ। স্মৃ—স্মৃতিপ্রস্থান। ]

অক্ষমালা—'অ' হতে 'ক্ষ' পর্যন্ত সমগ্র বর্ণমালা বা মাতৃকা যা বিশ্বে স্ফুরিত নিখিল-শক্তির প্রতীকরূপিণী (শা)।

অতিব্যাপ্তি—অলক্ষ্য বিষয়েও লক্ষণের সম্প্রসারণ (ন্যা)।

অতিমুক্তি—বন্ধ-মোক্ষভাবনার অতীত স্বাতন্ত্র্য।

অতি-ষ্ঠা—সব-কিছুকে অতিক্রম করে স্থিতি যার (শ্রু)। ['অতিস্থিতি']

অত্যন্ত-নিবৃত্তি—সমস্ত ভাব ও ক্রিয়ার নিঃশেষে প্রলয়।

অত্যন্তাভাব—অসত্তা।

অদক্ষ—অলজ্য্য (শ্রু)।

অধ্যাস—বিভিন্নধর্মী দুটি বস্তুর মধ্যে আরোপিত অভেদভাব; অবিবেক। আরোপ।

অধ্বরগতি—অকুটিল পথে চলা (শ্রু)।

অনন্তসমাপত্তি—আনন্ত্যের ভাবনায় তন্ময়তা (সা)।

অনাবৃত্তি—জগতে আর ফিরে না আসা (বে)।

অনিরুক্ত—বর্ণনার অতীত।

অনুকূলবেদনীয়—অনুভবের অনুকূল।

অনুত্তর—চরম ও পরমতত্ত্ব, যার পরে আর-কিছুই নাই (শৈ)।

অনুপাখ্য—সর্ববিধ প্রমাণের অগোচর; অনির্বচনীয়।

অনুব্যবসায়—'আমি জানছি' এই আকারে জ্ঞানেরও জ্ঞান।

অনুভাব—মনোগত ভাবের অভিব্যঞ্জক শারীরবিকার। বহিঃস্ফুরণ।

অনুষঙ্গ—সহচরিত বৃত্তি।

অনৈকান্তিক—বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাহীন, অবিকল্পিত (জৈ)।

অন্তরাবৃত্ত—ভিতর দিকে মোড়-ফেরানো।

অন্তর্দশা—ভাবের সর্ববিস্মারিণী চরমভূমি (বৈ)।

অন্ধতামিস্র—মোহাচ্ছন্নতার চরম ঘনিমা—অবস্থান্তরের কল্পনাও যেখানে আসে-না (সা)।

অন্যোন্য-অভাব—পরস্পরের একান্ত নিঃসম্পর্কতা।

অন্যোন্য-সংসৃষ্ট—পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ।

অন্যোন্য-সম্ভাবন—পরস্পরের আপ্যায়ন (স্মৃ)।

অপরামৃষ্ট—সম্পর্কশূন্য, ছোঁয়াচের বাইরে।

অবচ্ছিন্ন—সীমিত, বিশেষিত।

অবদান—নির্মলতা, স্বচ্ছতা।

অবয়বী—অবয়বের সমবায়ে গঠিত দ্রব্য, অংশী।

অবর—অধস্তন। [অবম—সর্বনিম্ন।]

অবষ্টম্ভ—স্বায়ত্তীকৃত বস্তুতে আত্মশক্তির আবেশন।

অবান্তর—প্রধান ব্যাপারের অন্তর্গত, মধ্যবর্তী (ন্যা); গৌণ।

অবিকৃত-পরিণাম—স্বরূপের বিকার বা ন্যূনতা না ঘটিয়েও বিচিত্র ও সত্য রূপে রূপায়িত হওয়া।

অবিনাভাব—নিত্যযোগ।

অবিবেক—একাত্মতার ভাবনা বা আরোপ। একাকারবোধ।

অব্যভিচারী—ব্যতিক্রমশূন্য, নিত্যযুক্ত।

অব্যবহার্য—ব্যবহারিক সম্বন্ধের বাহিরে।

অব্যাকৃত—বিশিষ্ট আকারে বা রূপে যা রূপায়িত নয়।

অভিনিবেশ—একান্তভাবে অনুপ্রবেশ। একাগ্র অভিমুখীনতা। আত্মহারা তন্ময়তা। চিত্তের মূঢ় দুরাগ্রহ বা তন্ময়তা; ভূতস্থিতিকে আঁকড়ে থাকবার অন্ধ প্রবণতা (সা)।

অভিন্ননিমিত্তোপাদান—সৃষ্টির প্রবর্তক ব্রহ্ম এবং তার উপাদানরূপিণী শক্তিতে ভেদ নাই যেখানে।

অভ্যুপগম—সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি (ন্যা)।

অমনীভাব—চেতনার যে-ভূমিতে প্রাকৃত-মনের ক্রিয়া স্তব্ধ।

অর্থক্রিয়াকারিতা—কোনও প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে কাজ করবার স্বভাব বা সামর্থ্য।

অসঙ্কীর্ণ—বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণশূন্য, পরিশুদ্ধ।

অসমোর্ধ্ব—যার সমান বা যার উপরে কিছুই নাই; রহস্যার্থ—লোকোত্তর অনুভবের পথে চেতনার ক্রমিক অভিযান যাতে (বৈ)।

অসম্ভূতি—সম্ভূতিরও ওপারে—কোনও ভাবের স্পন্দ নাই যেখানে, 'নেতি নেতি'র চরম অবস্থা।

আত্মবিশেষণ—নিজকে বিশিষ্ট আকারে স্ফুরিত করা।

আত্মভাব—সত্তার আত্মরূপে স্ফুরণ [ বৌদ্ধমতে তা অতাত্ত্বিক ]।

আদিক্ষান্ত—'অ' হতে আরম্ভ হয়ে 'ক্ষ'তে যার শেষ [ দ্রঃ 'অক্ষমালা' ]।

আবৃত—আবিষ্ট (শ্রু)।

আ-ভাস—তাত্ত্বিক বিচ্ছুরণ (শা) [ আভাস—অতাত্ত্বিক প্রতিবিম্ব (বে); অস্ফুট প্রকাশ ]।

আলম্বন—প্রত্যয় বা বোধের কারণ; বিষয়। ভাবের উদ্বোধক।

আশয়—স্ফুরণের প্রাক্‌কালীন আশ্রয়, বীজ-ভাবের আধার।

ইন্দ্রিয়সংবিৎ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত জ্ঞান।

ঈশনা—(ঈশ্বরীয়) অকুণ্ঠ সামর্থ্য (শৈ); আধিপত্য।

উদয়নীয়-যজ্ঞ—সংবৎসরব্যাপী সোমযাগের অন্ত্যপর্ব যা অমৃতচেতনায় যজমানের উত্তরণ ঘটায় (শ্রু)।

উন্মনী—পরা-সংবিতের উপান্তভূমিতে স্বাতন্ত্র্যশক্তির উল্লাসে স্ফুরিত দিব্য-মনন (শা)।

উপাধি—(স্বরূপের) সঙ্কোচসাধক ধর্ম।

ঋতায়ন—ঋতের বা বিশ্বের শাশ্বত-বিধানের ছন্দে সাজিয়ে নেওয়া (শ্রু)।

একবিজ্ঞান—একটি মৌল তত্ত্বকে জেনে তার সকল বৈচিত্র্যকে জানা (বে)।

কঞ্চুক—স্বরূপের আবরণ (শৈ)।

কবি-ক্রতু—দিব্যদর্শনের সঙ্গে যুক্ত অকুণ্ঠ সিসৃক্ষা বা সঙ্কল্পশক্তি (বৈ)।

কর্মকর্তৃত্ব—কর্তার নিজেরই 'পরে ক্রিয়ার পরাবর্তন।

কলনা—প্রচলন, প্রসরণ। ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ (শৈ)।

কলা—কৃতিশক্তির বিশিষ্ট স্ফুরণ (শৈ)।

কল্পন—ভাবময় রূপকৃতি ( শ্রু )।
কায়সম্পৎ—শরীরের রূপ লাবণ্য বল ও বজ্রদৃঢ়তা ( সা )।
কুহক—অমূল প্রত্যক্ষ।
কৈবল্য—আত্মার অসঙ্গ স্বরূপে অবস্থান।
কোটি—চরম প্রান্ত। আদর্শ।
ক্রতু—সিসৃক্ষা ; সৃষ্টিসামর্থ্য ; সঙ্কল্পশক্তি ( শ্রু )
ক্রিয়াদ্বৈত—অভেদ-ব্যবহার।
ক্ষণভঙ্গ—উৎপত্তির পরেই বিনাশহেতু ক্ষণস্থায়িতার পরম্পরা ( বৌ )।
চিদাভাস—রূপে বা বিগ্রহে চিৎসত্তার স্ফুরণ।
চ্যুতি—একটি জীবনপর্বের অন্তিম ক্ষয়-মুহূর্ত যা আর-একটি পর্বের আনে সূচনা ( বৌ )।
জগতী—জগৎ-সত্তার ছন্দ ( শ্রু )।
জাতি-ধর্ম—'জাতি' বা জন্মের সঙ্গে স্বীকৃত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।
জীবঘন—বিশ্বপ্রাণরূপে ঘনীভূত ( শ্রু )।
জীবনযোনি-প্রযত্ন—প্রাণের যে-ক্রিয়াকে আশ্রয় করে জীবন চলছে।
জীবিতেন্দ্রিয়—প্রাণলীলার বাহনরূপী ইন্দ্রিয় ( বৌ )।
জ্যোতিষ্টোম—আলোর সুরের স্তবক ( শ্রু )।
তটস্থ—নিরপেক্ষ। -শক্তি—মধ্যবর্তী শক্তি ( বৈ )।
তত্ত্বভাব—স্বরূপের সত্য ( এবং তার অনুভব )।
তাদাত্ম্য—( বিষয়-বিষয়ীর ) অভেদভাব ( বে )।
তুর্যাতীত—চেতনার জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিনটি প্রাকৃতভূমি, তার ওপারে তটস্থ তুরীয় ভূমি, তারও ওপারে তুর্যাতীত ভূমি ; পরমশিবের সহজভূমি ( শৈ )।
তৈজস রূপান্তর—চিন্ময়-তেজঃ বা চৈত্য-সত্ত্বের রূপান্তর।
ত্রিপুটী—তিনের সমাহার। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাহার ( বে )।

দিব্য-পুরুষ—উপনিষদ বর্ণিত পরম পুরুষ [ 'দিব্য পুরুষ' তাঁরই বিভূতি ]।
দিব্য রতি—দিব্য-পুরুষের আত্মসম্ভোগের উল্লাস।
দৃষ্টিবিরোধ—স্বাভাবিক অনুভবের সঙ্গে অসামঞ্জস্য।
দ্রব্য—গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়রূপী পদার্থ ( ন্যা )
দ্বিকোটিক—দুটি প্রান্তভূমিকে আশ্রয় করে মুখোমুখি হয়ে আছে যা।
দ্বৈধবাদী—জগৎ-কারণে অন্যোন্যবিরোধী ধর্মের আরোপকারী ইরাণীয় প্রাচীন সম্প্রদায়।
ধর্ম—যা-কিছুর সত্তা আছে, তাই ধর্ম ( বৌ ) [ পৃ ৫০।১৭ ]
ধর্মধুক্—নিখিল ধর্মের বা শাশ্বত-বিধানের প্রবর্তিকা ( শ্রু )।
ধর্মিভাবশূন্য—কোনও ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের আধার হবার প্রবণতা নাই যার।
ধাতু—মৌল উপাদান।
ধাতু প্রসাদ—উপাদান-সত্ত্বের স্বচ্ছতা ( শ্রু )।
ধূর্তি—কুটিল চলন ( শ্রু )।
নারায়ণ—নরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দ্বিদল-চণকের মত তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত পরম পুরুষ।
নাড়ী—নার্ভ।
নিমেষ—শুদ্ধসত্তায় শক্তির তল্লীনতা ( শা )।
নিরুপাধিক—বিশিষ্ট ধর্মশূন্য ; অসঙ্কুচিত।
নির্ঋতি—বিশ্বের ছন্দোময় বিধানের বিপরীত অবস্থা ( শ্রু )।
নির্বাণ—বিনাশ—অবশ্য সমগ্র সত্তার নয় ; শুধু আমাদের প্রাকৃত সত্তার ; অহন্তা, বাসনা ও অহংবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম ও মনোবৃত্তির প্রলয়।
নির্বিকল্প—বিশেষের প্রত্যয় নাই যাতে, বৃত্তিহীন।
নৈর্ঘৃণ্য—নিষ্ঠুরতা ( বে )।
পরবিন্দু—বিশ্বের মর্মনিহিত চিৎসত্তার আত্মকেন্দ্রিত অবস্থান ( শা )।
পরাক্—বাইরের দিকে যার মোড় ফেরানো।

পরা-বাক্—'বাক্' বা ব্রহ্মের প্রকাশশক্তির আদিভূমিকা ( শা )।

পরা-সংবিৎ—শৈবী-চেতনার অনুত্তর ভূমি—যা সবাইকে ছাড়িয়ে থেকে জড়িয়ে আছে ( শৈ )।

পরিণাম—মূল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ক্রমিক স্ফুরণ ( সা )।

পর্যায়—অবস্থাবিশেষের পরম্পরা ( জৈ )।

পশ্যন্তী—'বাক্' বা ব্রহ্মের প্রকাশজ্যোতির দ্বিতীয় ভূমিকা, যেখানে বহিঃস্ফুরণের প্রবর্তনা আছে, কিন্তু আত্মসংহৃত এবং দৃক্-দৃশ্যের ভেদশূন্য হয়ে ( শা )।

পুরুষবিধ—পুরুষের ধর্ম বা ব্যক্তিত্ব আছে যাঁর (শ্রু)। পুরুষবিধতা—ব্যক্তিত্বের ধর্ম বা আচরণ।

পূর্ণাহন্তা—ব্যক্তি-অহংএর বিশ্বময় বিস্তার (শৈ)।

পূর্বচিতি—আদি-বিজ্ঞান ( শ্রু )।

প্রকার—জ্ঞানের বিশিষ্ট রূপ।

প্রকাশ—স্বয়ংজ্যোতির ভাবময় স্ফুরণ ( শৈ )।

প্রচেতনা—চেতনার অগ্রাভিযান ( বৈ )।

প্রজ্ঞান—শুদ্ধবুদ্ধির ভূমি হতে বৈচিত্র্যকে বিষয় করে স্ফুরিত জ্ঞান ( শ্রু )।

প্রতিবোধ—বিজ্ঞান ( শ্রু )।

প্রতিভাস—আপাত-স্ফুরণ; প্রতীয়মান স্ফুরণ। প্রাতিভাসিক—আপাত-প্রতীয়মান ( বে )।

প্রতিযোগী—বিরোধী।

প্রতীত্যসমুৎপাদ—জগতের সব-কিছুই কোনও 'প্রত্যয়' বা কারণ হতে উৎপন্ন, অতএব কারও স্বয়ংসিদ্ধ কোনও সত্তা নাই, সব-কিছু অনিত্য সুতরাং দুঃখের হেতু—বৌদ্ধদর্শনের এই সিদ্ধান্ত।

প্রত্যক্—ভিতরের দিকে যার মোড় ফেরানো।

প্রত্যগাত্মা—অন্তর্মুখ অনুভবে ফোটে আত্মার যে-স্বরূপ।

প্রবৃত্তি—ক্রিয়া, প্রচেষ্টা; প্রসরণ। -সামর্থ্য—ক্রিয়ার চরিতার্থতা।

প্রমা—যথার্থ অনুভব।

প্রযতি—দিব-সঙ্কল্পের প্রবর্তনা ( শ্রু )।

প্রস্তার [ 'সংযোগ ও প্রস্তার' ]—ভিন্ন বস্তুকে যথাসম্ভব বিভিন্ন আকারে সাজানো [ অগ্রপশ্চাতের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাজালে 'প্রস্তার' নইলে 'সংযোগ' ] ( জৈ )।

প্রাতিভ—ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ অলৌকিক জ্ঞান।

প্রৈতি—সমুখপানে এগিয়ে যাবার বা এগিয়ে দেবার প্রেরণা।

প্রৈষমন্ত্র—আদেশ বা প্রেরণার বাণী ( শ্রু )।

বহিরাবৃত্ত—বাইরের দিকে মোড়-ফেরানো।

বহুধাবৃত্ত—নানা ভঙ্গিতে চলছে যা।

বাদী—তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য যুক্তির প্রযোক্তা (ন্যা)।

বিকল্প—শুধু কথা শুনে কোনও বিষয়ের অবাস্তব ও অস্ফুট প্রতীতি ( সা ), অবাস্তব কল্পনা [ 'বিকল্পনা' ]। একাধিক বা অন্যতর রূপ।

বিকল্পন—ভাবময় বিচিত্র রূপকৃতি।

বিক্ষেপ—শক্তির বিচ্ছুরণ ও ব্যবস্থাপন ( শা )।

বিজাতীয় ভেদ—ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পরের ভেদ।

বিজ্ঞান—মনের ওপারে চেতনার সর্বতোভাস্বর ভূমি। ভাব। চেতনা, চিত্তবৃত্তি, বোধ ( বৌ )। -সন্তান—ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তির প্রবাহ ( বৌ )।

বিনাশ—আত্মভাবের প্রলয়।

বিনিগমক—বিশিষ্ট ফলসিদ্ধিতে পর্যবসান যার; নিশ্চায়ক।

বিপরিণাম—তত্ত্বের বিকার বা অবস্থান্তর।

বিপর্যয়—বস্তুর অযথাভূত মিথ্যাজ্ঞান ( সা )।

বিবর্ত—তত্ত্ববস্তুর ভাবময় 'পরিণাম'। প্রতিভাস ( বে )।

বিবৃত—বীজভাব হতে ক্রমান্বয়ে স্ফুরিত ( শ্রু )।

বিভজ্যবাদী—তত্ত্বসন্ধানের বেলায় বিশ্লেষণপন্থী।

বিভজ্য-বৃত্তি—( বিষয়কে ) ভেঙে-ভেঙে দেখা যার ধরন।

বিভাব—একই তত্ত্বের নানা দিক।

বিভাবনা—বিচিত্র রূপে রূপায়িত করা।

বিভূতি—বিচিত্র রূপায়ণ; রূপায়ণের সামর্থ্য। ঐশ্বর্য। -সংবিৎ—চেতনার যে ভূমিতে দৃক্‌শক্তিরই অধিষ্ঠানে দৃশ্যরূপে ফুটে ওঠে রূপায়ণের বৈচিত্র্য।

বিভ্রম—অবাস্তবে বাস্তবতার আরোপ ( বে )।

বিমর্শ—স্বয়ংজ্যোতির রূপক্রিয়াময় বিচ্ছুরণ ( শৈ )

বিলাস-বিবর্ত—চিদ্‌বিভূতির তাত্ত্বিক স্ফুরণ।

বিশরণ—আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়া।

বিসৃষ্টি—( শক্তির ) বিচিত্র রূপকৃতি বহুমুখী প্রবর্তনা; শক্তির নির্ঝরণ ( শ্রু )।

বিস্রস্তি—আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়া।

বৃত্তি—ক্রিয়া, ব্যাপার; চলন; পরিণাম। চিত্তের ধর্ম বা সামর্থ্য ( সা )।

বৃন্দাবন—'গোলোক', অন্তহীন ভাবকান্তি ও আনন্দের নির্ঝররূপী দিব্যধাম (বৈ)।

বৃহৎ-সাম—দ্যুলোকের অন্তহীন সুরলীলা, যার মধ্যে সমস্ত বৈচিত্র্যের সমন্বয় ( শ্রু )।

বেদনা—সুখ-দুঃখ প্রভৃতি চিত্তের প্রক্ষোভময় বৃত্তি ( বৌ )

বৈখরী—বাক্‌-শক্তির চতুর্থভূমি—মানুষের ভাষায় যার প্রকাশ ( শা )।

বৈনাশিক—কোনও সৎ পদার্থ নয়, কিন্তু 'বিনাশ' বা শূন্যই চরম তত্ত্ব যাঁদের মতে (বৌ)।

বৈন্দবাসনা—ঘনীভূত অথচ স্ফুরণোন্মুখ পরম-চেতনায় অধিষ্ঠিত যিনি ( শা )।

বৈন্দবী-সত্তা—সংহত ও কেন্দ্রীভূত অবস্থা।

বৈভব—বীর্য ও বিভূতির লীলা ( বৈ )।

বৈরাজ-সাম—প্রজাপতির বিশ্বভাবন সুরের লীলা ( শ্রু )।

বৈরাজ্য—বিশ্বের 'পরে আধিপত্য ( শ্রু )।

বৈশারদ্য—শুদ্ধবুদ্ধির স্বচ্ছ প্রবাহ ( সা );

বৈশ্বানর—ব্যক্তিচেতনাতে স্ফুরিত বিশ্বচেতন সত্তা।

বোধি—প্রাকৃত মন-বুদ্ধির ঊর্ধ্বস্থিত চেতনার স্বচ্ছ ও সহজ প্রকাশ।

বৌদ্ধ-চেতনা—বুদ্ধির ভূমিতে স্ফুরিত চেতনা।

ব্যতিষঙ্গ—অন্যোন্যসম্পর্ক।

ব্যতিহার—অন্যোন্যবিনিময়।

ব্যবস্থিত—নিরূপিত, নির্দিষ্ট। বিচিত্র অবস্থানে সাজান।

ব্যাকৃতি—বিশিষ্ট রূপে রূপায়ণ।

ব্যাপার—ফলাভিমুখী প্রবৃত্তি।

ব্যাবৃত্ত—আলাদা-করে-নেওয়া, নিঃসম্পর্ক।

ব্যাহৃতি—সৃষ্টির বীজমন্ত্র।

ব্রত—বিশেষভাবে বরণ করে নেওয়া কর্ম বা গতির একটি ধারা ( শ্রু )।

ব্রহ্মলোক—শুদ্ধ সৎ চিৎ ও আনন্দের পরমভূমি—অনির্দেশ্য তৎস্বরূপের মধ্যে আত্মার পরিনির্বাণ না ঘটিয়ে যেখানে অবস্থান করা জীবের পরম পুরুষার্থ হতে পারে।

ভব—জন্মের আকাঙ্ক্ষা [ প্রতীত্যসমুৎপাদ-সিদ্ধান্তে বর্ণিত কার্য-কারণ শৃঙ্খলের দশম পর্ব ] ( বৌ )। -প্রত্যয়—জন্মের আকাঙ্ক্ষারূপ 'হেতু'—যা হতে জন্ম এবং তজ্জনিত বন্ধন। -সন্তান—কামনার প্ররোচনায় জন্মের পরম্পরা।

ভাবক—অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববস্তুর সন্ধানী ও রসিক (বৈ)।

ভাবনা—মানসিক অভ্যাস। রূপায়ণের অনুকূল ব্যাপার বা ক্রিয়া (মী); রূপায়ণ। চিন্তন।

ভাব-সামান্য—বিষয়ের বিশেষ-জ্ঞানের অধিষ্ঠান-রূপী সর্বাবগাহী জ্ঞান।

ভাবাদ্বৈত—'ভাব' বা স্বরূপসত্তার দিক থেকে অভেদ-বোধ।

ভূত-প্রকৃতি—স্থূলভূতের আধারভূত শক্তি।

ভোগায়তন—আত্মার ভোগের সাধন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর (স্তা)।

মধ্যমা বাক্—দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে অধিষ্ঠিতা অন্তরিক্ষচারিণী প্রকাশশক্তি (শ্রু)।

মহাবিন্দু—পরা-সংবিতের আত্মকেন্দ্রিত অবস্থান (শা)।

যোগ্যতা—কার্যবিশেষ উৎপাদনের সামর্থ্য (স্তা)।

রূপধাতু—রূপের উপাদান [বৌদ্ধদর্শনে 'রূপ ধাতু'=রূপলোক]।

রূপাবচর—ধ্যানচিত্তগম্য সূক্ষ্মলোক, যেখানে স্থূলদেহের ভার নাই (বৌ)।

লোকোত্তর—চেতনার সাধারণভূমিকে যা ছাড়িয়ে যায়; বৌদ্ধমতে রূপ-অরূপের ওপারে ধ্যান-চিত্তের চরম-ভূমি, নির্বাণ।

শাক্ত—শক্তিমান।

শীল—চরিত্র-বিশুদ্ধির সাধনা (বৌ)।

শুদ্ধবিদ্যা—মায়ার আবরণ উন্মোচনে আবির্ভূত শুদ্ধ-সত্তার জ্যোতিঃশক্তির প্রথম ছটা (শৈ)।

সংঘাতরূপ—বিচিত্র উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন আকারবিশেষ (স্তা)।

সংজ্ঞা—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগজনিত অনুভব (বৌ)।

সংজ্ঞান—সমগ্রের সম্যক ছন্দোময় জ্ঞান (শ্রু)।

সংবৃত—বীজাকারে অন্তর্গূঢ় (শ্রু)।

সংবেদন—প্রাথমিক অনুভব, সাড়া।

সংস্থান—অবয়ব বা উপাদানকে বিশেষ ধরনে সাজানো। অঙ্গ-সজ্জা; পরিকল্পনা।

সংহনন—জমাট বাঁধা।

স-কল—কলায় কলায় বিকসিত।

সঙ্কল্পনা—বস্তুনিষ্ঠ সঙ্গত কল্পনা।

সজাতীয়ভেদ—একই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদ।

সত্যধৃতি—সত্যসম্পর্কে চিত্তের অচঞ্চল বৃত্তি (শ্রু)।

সত্ত্ব—আত্মবস্তু। মৌল উপাদান (যেমন 'মনঃ-সত্ত্ব')। জীবভাব।

সত্ত্বতনু—শুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা রূপায়িত বিগ্রহ (স্মৃ)।

সদাখ্যতত্ত্ব—চিৎ-শক্তির আবেশে বিসৃষ্টির আদি-পর্বে স্ফুরিত শুদ্ধসত্তা (শৈ)।

সদৃশ-পরিণাম—যেখানে পরিণামের পরম্পরা আছে কিন্তু তার দুটি পর্বের মাঝে ভেদ নাই (সা)।

সদ্বিদ্যা—দ্রঃ 'শুদ্ধবিদ্যা'।

সদ্ভাব—শুদ্ধ-সত্তারূপে অবস্থান।

সদ্ভূত-বিজ্ঞান—যা যুগপৎ তাত্ত্বিক-বস্তু এবং ভাবের-সত্য দুইই।

সন্তান—অবিচ্ছিন্ন ধারা; পরম্পরা।

সন্ধাভাষা—নিগূঢ় ইঙ্গিতবাহী ভাষা।

সন্ধিনী-শক্তি—পরমপুরুষের যে স্বরূপশক্তি শুদ্ধসত্তারূপে আধার হয়ে আছে সবার (বৈ)।

সন্নিকর্ষ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ।

সবিকল্প—বিশেষের প্রত্যয়যুক্ত; বিচিত্র বৃত্তিতে স্ফুরিত।

সমঞ্জসা-রতি—যে-ভালবাসায় সম্ভোগতৃষ্ণাও জাগে কখনও [যেমন শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীর] (বৈ)।

সমনী—মহাশূন্যে অশেষতত্ত্বাবগাহী দিব্য-মননের ভূমিবিশেষ, 'উন্মনী'র নীচের ভূমি (শা)

সমর্থা-রতি—যে-ভালবাসায় সম্ভোগেচ্ছা পৃথক স্ফুরিত না হয়ে তাদাত্ম্যভাবে হয় পর্যবসিত [যেমন ব্রজগোপীর] (বৈ)।

সমাধান—একাগ্র ও সমাহিত ভাবনা।

সমাধি-পরিণাম—নির্বিষয় চিত্তের একতান প্রবহমানতা (সা)।

সমানয়ন—ভেদধর্মকে জীর্ণ করে একধর্মাক্রান্ত করা, আত্তীকরণ (শ্র)।

সমাপত্তি—ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্র চিত্তের তল্লীনতা (সা, বৌ)।

সমাবেশ—আধারে উধ্বর্সত্যের স্বচ্ছন্দ ও পরিপূর্ণ অবতরণ (শৈ)।

সমুচ্চয়—একত্র সমাবেশ।

সমীক্ষা—তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার (ন্যা)।

সমূঢ়—বহুর সমবায়ে গঠিত।

সম্প্রজ্ঞান—সর্বাবগাহী বিজ্ঞান (সা)।

সম্প্রয়োগ—বিশেষ যোগ [যেমন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের] (মী); নিবিড় মিলন।

সম্বন্ধতত্ত্ব—পরমপুরুষের আশ্রয়ে বিশ্বভূতের অন্যোন্য-সম্বন্ধের সত্যতা।

সম্বোধি—সর্বাবগাহী ও সর্বভাসক সহজ বিজ্ঞান।

সম্ভূতি—বিচিত্র রূপের সমাহারে অখণ্ড ও 'সম্যক্' রূপায়ণ (শ্র); এমনিতর রূপায়ণের প্রবৃত্তি। -সংবিৎ—চেতনার যে-ভূমিতে 'সম্ভূতি'র পূর্ণসত্যটি ফুটে ওঠে।

সম্মুগ্ধ—অস্ফুটরূপে অনুভূত [যেমন ইন্দ্রিয়বোধের আদিক্ষণে অনুভূত বিষয়ের প্রতীতি] (সা)।

সম্মূঢ়—অস্ফুট, আচ্ছন্ন।

সম্যক-দর্শন—সমস্ত আপাত-বিরোধের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বভৌম অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখা।

সম্যক-সম্বোধি—'সর্বধর্মের সম্যক্ বোধ', তত্ত্বজ্ঞানের চরমভূমি (বৌ)।

সরূপ—তুল্যরূপবিশিষ্ট।

সর্বাত্মভাব—'এই যা-কিছু, সমস্তই আত্মা!'—এই ভাব, আত্মসত্তার চরম ব্যাপ্তি।

সহভাব—একক্ষণে একত্র অবস্থান।

সাংবৃতিক সত্য—যা ব্যবহারেই সত্য শুধু—পরমার্থত সত্য নয় (বৌ)।

সাক্ষি-ভাস্যতা—দ্রষ্টৃ-পুরুষের চেতনায় ফুটে ওঠার যোগ্যতা (বে)।

সাধন—কার্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট 'কারণ', করণ; -সম্পদ—উধ্বর্চেতনার বাহনরূপী করণের সঞ্চয় (বে); -সামগ্রী—করণের সমূহ বা সঙ্কলন।

সাধর্ম্য—ধর্মগত সাদৃশ্য।

সাধর্ম্য-মুক্তি—পরমপুরুষের দিব্যস্বভাবের স্বীকরণ-জনিত মুক্তি।

সামরস্য—পরস্পরের ভাবনায় একই রসের উচ্ছলন এবং তজ্জনিত একাত্মতার বোধ (শা)।

সামাজিক—কলারসিক।

সামানাধিকরণ্য—একাধিক পদার্থের একই আধারে অবস্থান।

সামান্যগ্রাহী—বিশেষকে না নিয়ে শুধু সাধারণকে নিয়ে কারবার যার।

সাম্রাজ্য—বিশ্বচেতনায় নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য (শ্র)।

সাযুজ্য—অব্যবহিত যোগ, পরম সাম্য, অভেদ-ভাব ( শ্রু )।

সার্ষ্টিত্ব—সমান শক্তির অধিকার ( শ্রু )।

সালোক্যমুক্তি—যে-মুক্তিতে পরমপুরুষের অনুত্তর সত্তায় অবগাহন করে তাঁর সঙ্গে একই চিন্ময়লোকে অবস্থান ঘটে।

সূনৃত—সৌষম্যের কল্যাণী শক্তি ( শ্রু )।

স্কন্ধ—উপাদানের ব্যূহ বা সমবায় ( বৌ )।

স্ফুরত্তা—ধ্রুববিন্দু হতে বিচ্ছুরণের স্বভাব; পরিস্পন্দ ( শৈ )।

স্বকৃৎ—অন্যনিরপেক্ষ হয়ে আপনাকে রূপায়িত করে যে।

স্বগতভেদ—নিজেরই মাঝে অবয়বের বৈচিত্র্যহেতু ভেদভাব।

স্ব-তন্ত্র—নিরপেক্ষ, স্বাধীন [ স্বতন্ত্র—পৃথক্ ]।

স্বতোদেশনা—স্বতঃস্ফূর্ত পরিচালন।

স্বধা—স্বপ্রতিষ্ঠার ভাব ও ধর্ম ( শ্রু )।

স্বয়ম্ভাব—অন্যনিরপেক্ষ সত্তা।

স্বরূপ— -খ্যাতি—স্বরূপের বস্তুভূত জ্ঞান। -বিভূতি—অন্তর্নিহিত স্বরূপের সার্থক-রূপায়ণ। -যোগ্যতা—নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও স্বভাবনিহিত কার্যজনন শক্তি ( ন্যা )।

স্বাতন্ত্র্য—বন্ধন বা মুক্তির ভাবনার অতীত শিবত্বের সহজ-চেতনা, ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ যাতে অব্যাহতই থাকে ( শৈ )।

স্বারসিক—স্বাভাবিক, স্বত-উচ্ছল।

স্বারাজ্য—আত্মচেতনার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য ( শ্রু )।

স্বোত্তর—নিজেকে ছাপিয়ে।

হিরণ্যবর্ত্তণী—লোকোত্তর হিরণ্ময়-চেতনার দিশারী ( শ্রু )॥

হেতু-প্রত্যয়—মূলকারণ 'হেতু', আনুষঙ্গিক কারণ 'প্রত্যয়' ( বৌ )।

হ্লাদিনী—পরম-পুরুষের আনন্দরূপা স্বরূপশক্তি ( বৈ )

# সংশোধন*

| পৃষ্ঠা | ছত্র | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ৬ | ১২ | তূর্যাতীত | তুর্যাতীত |
| ৮ | ১০ | বিভ্রম, | বিভ্রম, অথবা |
| ১১ | ১৪ | নাস্তি-বা | নাস্তি- বা |
| ১৩ | ২ | অপরিশালিত | অপরিশীলিত |
| ১৫ | ২৮ | সামানাধিকরণ | সামানাধিকরণ্য |
| ১৬ | ২৭ | বহুনামেকং | বহূনামেকং |
| ২০ | ৪ | অব্যবহার্য-অলক্ষণ-অচিন্ত্য-প্রপঞ্চের | অব্যবহার্য—অলক্ষণ—অচিন্ত্য—প্রপঞ্চের |
| ২১ | ১ | স্থুল | স্থূল |
| ২১ | ১০ | নিরপেক্ষবাদীর | নিরপেক্ষ বাদীর |
| ২৩ | ২০ | নাড়ায় | নাড়ীর |
| ২৩ | ২৩ | বণাঢ্য | বর্ণাঢ্য |
| ২৫ | ৪ | সার্ষ্টীত্ব | সার্ষ্টিত্ব |
| ২৮ | ৬ | শ্রেয়ঙ্কর | শ্রেয়স্কর |
| ২৮ | ২৪ | শ্রেয়ঙ্কর | শ্রেয়স্কর |
| ২৮ | ২৫ | উণীকৃত | ঊনীকৃত |
| ৩২ | ৯ | প্যাচে | প্যাঁচে |
| ৩৩ | ১৫ | তার | তাঁর |

* বাংলা মনো টাইপে প্রয়োজনীয় যুক্তাক্ষর না-থাকায় এই পুস্তকে, মুদ্রণ কালে রেফ, উ-কার, ঊ-কার, ই কার, ঈ-কার, ঋ-ফলা ইত্যাদি বহু টাইপ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুণ অনেক ভুল থাকিয়া গিয়াছে। সংশোধনে সেই সব ভুলের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আশা করি ঐ সব শব্দ ঠিক মত বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। ইতি—

প্রকাশক

| | ছত্র | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ৩৫ | ১৪ | তার | তাঁর |
| ৩৭ | ৩ | মার শয়তান | মার, শয়তান |
| ৪০ | ৭ | রূপায়ন | রূপায়ণ |
| ৪০ | ১৬ | রূপায়ন | রূপায়ণ |
| ৪৪ | ১১ | অন্যোন্য সমৃদ্ধ | অন্যোন্য সম্বন্ধ |
| ৪৫ | ৬ | হয় না শুধু | হয়না—শুধু |
| ৪৭ | ২৬ | বহিরাবৃত্ত | বহিরাবৃত |
| ৪৯ | ২ | আবিস্কার | আবিষ্কার |
| ৪৯ | ৪ | যাঁকে | যাকে |
| ৫১ | ৬ | টানে | আহ্বানে |
| ৫২ | ১০ | দুর্ণিবার | দুর্নিবার |
| ৫২ | ২৬ | গেল | জাগল |
| ৫২ | ২৯ | চেতনায় | চেতনার |
| ৫৩ | ১৩ | ঐক্যতান | ঐকতান |
| ৫৪ | ২ | কিছুতে | কিছুতেই |
| ৫৬ | ৯ | উন্মেষিত | উন্মেষিত |
| ৫৬ | ১৯ | প্রকৃতির | প্রকৃতিতে |
| ৫৬ | ২৮ | প্রমুক্তি-প্রেম-ও-আনন্দ-স্বরূপ | প্রমুক্তি- প্রেম- ও আনন্দ-স্বরূপ |
| ৫৭ | ৩ | পরিচিতের | পরিচিতির |
| ৫৭ | ২৩ | কোনও, তাত্ত্বিক | কোনও তাত্ত্বিক |
| ৫৭ | ৩০ | উজ্জল | উজ্জ্বল |
| ৫৮ | ২৫ | সান্ধ্যভাষায় | সন্ধাভাষায় |
| ৬০ | ৯ | অতর্ক | অতর্ক্য |
| ৬০ | ২২ | উজ্জল | উজ্জ্বল |
| ৬১ | ১৫ | বিভাজ্য-বৃত্তি | বিভজ্য-বৃত্তি |
| ৬৩ | ১৩ | দশনের | দর্শনের |

## সংশোধন

| পৃষ্ঠা | ছত্র | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ৬৩ | ২০ | গীতায় | গীতার |
| ৬৪ | ১৭ | ফুটাতে | ফুটতে |
| ৬৪ | ২১ | তার | তাঁর |
| ৬৫ | ১০ | ঋতঃ-সুষমার | ঋত-সুষমার |
| ৬৬ | ১৬ | সমদ্রে | সমুদ্রে |
| ৬৬ | ১৯ | উধ্বর্ পরিণামের | উধ্বর্ পরিণামের |
| ৬৮ | ১৪ | প্রমাদ-শোক | প্রমাদ শোক |
| ৭২ | ১৩ | ধারণ ; | ধারণা |
| ৭৪ | ১০ | সম্প্রসারণে | সম্প্রসারণ |
| ৭৫ | ৯ | সহবেদন | সমবেদন |
| ৭৬ | ২৮ | ইন্দ্রিয় | ইন্দ্রিয়ের |
| ৭৬ | ২৩ | হাবভাবের | হাবভাবে |
| ৭৮ | ২৭ | উধ্বর্ | উধ্বর্ |
| ৭৯ | ২৪ | বেদান্তের | বেদান্তীর |
| ৮০ | ৬ | নিস্পন্দ | নিস্পন্দ |
| ৮৬ | ৯ | সমদশন | সমদর্শন |
| ৮৬ | ২৫ | দশনকে | দর্শনকে |
| ১১১ | ২১ | পারে | পারি |
| ১২১ | ২ | প্রজ্ঞাদক্ষতা | প্রজ্ঞা দক্ষতা |
| ১২১ | ৩ | অথই | অর্থই |
| ১২৫ | ৩০ | সিকেরই | রসিকেরই |
| ১২৭ | ২৯ | পিছিয়ে-আসে | পিছিয়ে আসে |
| ১২৮ | ১৯ | দঃখবোধ | দুঃখবোধ |
| ১৪৭ | ১ | বী | বীর্য |
| ১৪৭ | ১৬ | দিব্যদশন | দিব্যদর্শন |
| ১৫৪ | ২৫ | অথক্রিয়া | অর্থক্রিয়া |
| ১৫৫ | ৩ | বিমশ | বিমর্শ |

| পৃষ্ঠা | ছত্র | আছে | হবে |
| --- | --- | --- | --- |
| ১৫৮ | ১৫ | প্রসপণের | প্রসপণের |
| ১৬১ | ২৭ | ভাসিত | বাসিত |
| ১৭৬ | ২২ | উজ্বল | উজ্জ্বল |
| ১৭৭ | ১ | আঁধারের | আধারের |
| ১৭৮ | ২৬ | অপ্রমেয়র | অপ্রমেয়ের |
| ১৮০ | ৭ | ঋত-বৃহৎ | ঋতং বৃহৎ |
| ১৮৯ | ১৪ | আধারে | আধার |
| ১৯২ | ২৬ | দশন | দর্শন |
| ১৯৬ | ১৯ | স্থাণত্বের | স্থাণুত্বের |
| ২২৪ | ৫ | যে জগতের | সে-জগতের |
| ২২৯ | ২১ | সামথ্য | সামর্থ্য |
| ২৪৩ | ৯ | নিগঢ় | নিগূঢ় |
| ২৫৬ | ২৯ | করেছ | করেছে |
| ২৫৭ | ২০ | পুরুষবিধ তাকে | পুরুষবিধতাকে |
| ২৫৮ | ২৭ | নিগম পথে | নির্গম পথে |
| ২৬৭ | ৫ | দশন | দর্শন |
| ২৭৯ | ১০ | আত্ম-ব্যক্তি | আত্ম-ব্যাক্তি |
| ৩০৮ | ৩০ | জ্যোতিতে | জ্যোতিতে ও |
| ৩১০ | ৩ | মানসঋত-চিৎ | মানস ঋত-চিৎ |
| ৩২৪ | ১৫ | দশনে | দর্শনে |
| ৩২৯ | ২৮ | হবে | হতে |
| ৩৩০ | ৩ | ভুমিতে | ভূমিতে |
| ৩৩০ | ১৭ | পরিণাম। | পরিণাম, |
| ৩৩০ | ১৮ | ধরেই, | ধরেই। |
| ৩৩২ | ১৭ | ঊধ্বর্´-পরিণামিণী | ঊর্ধ্ব-পরিণামিনী |